গুনিয়াতুত্ তালেবীন



গুনিয়াতুত্ব-ত্বালেবীন

নাজাত লাভের একমাত্র সম্বল

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

অলীকুল শিরমণি

গাউছুল আজম বড়পীর

হযরত আবদুল কাদের জিলানী

(রহমাতুল্লা-হি 'আলাইহি)

অনুবাদ

এ, এন, এম, ইমদাদুল্লাহ

এম, এম,: বি. এ, (অনার্স): এম, এ,

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ	দি তাজ পাবলিশিং হাউস
৬ প্যারীদাস রোড.	৭/বি প্যারীদাস রোড.
ঢাকা-১১০০	ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
শেখ জামিল আহমদ
ফেন্সী লাইব্রেরী এণ্ড ষ্টেশনারী
৬, প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

সম্পাদনা ও পরিমার্জনা ঃ
মরহুম মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ

প্রকাশকাল ঃ ১৯৯১ ইং
১৩৯৮ বাংলা
২য় সংস্করণ ঃ ১৯৯৬ ইং

মূল্য ঃ সাদা ২৪০.০০ টাকা মাত্র ।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জনতা কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, বাংলাবাজার (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
আদর্শ ছাপাখানা
৫৬, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০ ।

গুনিয়াতুত্ব–ত্বালেবীন

নাজাত লাভের একমাত্র সম্বল

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

অগ্রকথাঃ

গাউছুল আজম হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে জানে না এমন ব্যক্তি সমগ্র মুসলিম জাহানে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। অধিক সংখ্যক মুহাক্কিক রেবর্গান এবং ওলামায় মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন এ বিষয় একমত পোষণ করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবায় কেরামদের পরেই বোযর্গী ও মর্যাদার দিক দিয়া তাঁহার স্থান। দুনিয়ার সমস্ত অলী-আউলিয়া, সুফি-সাধক এবং মাশায়েখ বুযর্গিগণ হযরত গাউছুল আজম (রহঃ)-এর নেতৃত্ব নত মস্তকে স্বীকার করেন। শরীয়ত ও মারেফাত উভয় দিকেই তাঁহার কামালিয়াত, জ্ঞানের গভীরতা ও অভিজ্ঞতা দুনিয়ার সমস্ত অলী-আবদাল ও গাউছ-কুতুবের মধ্যে সমধিক। হয়ত অনেকেই জানেন যে, একবার তিনি ভাবোন্মত্ততায় এমন একটি উক্তি করিয়াছিলেন, যেমন উক্তি তিনি ছাড়া আর কোন অলী-আউলিয়া কোনদিনই করেন নাই, আর করার কাহারও অধিকার এবং ক্ষমতাও ছিল না।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই চরণ যুগল জগতের সকল অলীদের কাঁধের উপর। জানা যায়, তখন দুনিয়ার যেখানে যত অলী-আবদাল জীবিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজেদের মাথা নোয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মস্তক অবনত করার মধ্য দিয়াই হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর কথার সত্যতা, সার্থকতা ও অতুলনীয় মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত গাউছুল আজম (রহঃ) একদিকে যেমন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলী এবং বাতেনী এলমে অপ্রতিদ্বন্দ্বি সত্তা ছিলেন, অন্যদিকে জাহেরী এলমেও তিনি তৎকালীন জগতের অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি আবাল্য সাধক ও সত্যপ্রিয় হিসাবে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগদ্বাসীর নিকট চিরদিনই অম্লান ও বিস্ময়কর হিসাবে বিরাজ করিবে। শিক্ষা লাভ এবং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে যে ভাবে তিনি কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই কর্মজীবনেও তিনি অপূর্ব সাধনায় রত ছিলেন। তিনি তৎকালীন জগতের শরীয়ত ও মারেফাতের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদগণের নিকট উভয় এলমে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন।

এলমে কোরআন, এলমে হাদীস, এলমে ফিকাহ এবং এলমে আদব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অভাবনীয় অভিজ্ঞতা হাসিল করিয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিধি ছিল সাগর তুল্য।

অধিকন্তু দ্বীন-ধর্মের বিষয়ের উপরে ওয়ায়েজ এবং গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি জগজ্জোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জীবনে অসংখ্য লোককে তিনি শরীয়ত ও মারেফাতের শিক্ষা-দীক্ষা দানে কামালিয়াতের উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ব্যক্তিগত ইবাদাত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা তদুপরি অসংখ্য শিষ্য-শাগরেদ এবং সাধারণ লোকজনকে শিক্ষা-দীক্ষা' তালীম-তালকীন প্রদান করার মধ্যেও তিনি সময় সুযোগ করিয়া গ্রন্থরচনার কাজেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ধারণাতীত নৈপুন্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের প্রত্যেকখানাই দ্বীনি জ্ঞানান্বেষীদের কাছে একেকখানা অমূল্য রত্ন সদৃশ। (ক) ফাতহুল গাইব (খ) আল-ফাতহুর রাব্বানী (গ) কাছীদায়ে গাউছিয়া (ঘ) মাকতুবাতে গাউছিয়া (ঙ) গুনিয়াতুত্ত্ব ত্বালিবীন প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শরীয়ত ও মারেফাতের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ অমূল্য দ্বীনী বিষয়ে পরিপূর্ণ। সমস্ত মুসলমানের জন্য এই গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা অপরিহার্য।

অন্যতম গ্রন্থ গুনিয়াতুত্ত্ব ত্বালিবীন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একখানা এমন জরুরী গ্রন্থ যাহা প্রত্যেকেরই অধ্যয়ন করা আমরা একান্ত জরুরী মনে করি। গ্রন্থখানাকে সহজ সরল বাংলা ভষায় অনুবাদ করতঃ আমরা বাংলাভাষী পাঠকদিগের কাছে পেশ করিলাম। আশা করি আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই এই গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিয়া নিজেদের দ্বীনী জ্ঞান লাভে পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হইবেন।

পরিশেষে কৃপাময় প্রভুর দরবারে আমাদের ফরিয়াদ এই যে, হে প্রভু! আপনি আমাদের এই প্রচেষ্টার সৎ উদ্দেশ্য সফল করুন এবং এই গ্রন্থখানাকে মুসলিম জনসাধারণের বিশেষ কল্যাণ এবং হিত সাধনের উঁসিলা বানাইয়া দিন।

আমীন– ছুম্মা আমীন
বিনীত–
অনুবাদক

বিষয় নির্দেশিকা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম প্রবাহ ঃ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

অপরের গৃহে প্রবশ

কোন প্রয়োজনে অপরের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বাড়ী মালিককে লক্ষ্য করিয়া বলিবে,'আসসালামু আলাইকুম'! তারপর তাহার কাছে এইভাবে অনুমতি তলব করিবে, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? হাদীসে বর্ণিত আছে, বনি আমের সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)এর বাড়ীর দরজায় আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিল। হুযুর (দঃ) তখন বাড়ীর ভিতরেই ছিলেন, তিনি এক খাদেমকে বলিলেন, তুমি বাহিরে গিয়া তাহাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখাইয়া দাও যে, অনুমতি এইভাবে নিতে হয়; আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি কি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি? আগন্তুক লোকটি রাসূলুল্লাহ (দঃ)এর শিখানো নিয়মেই অনুমতি প্রার্থনা করিল। হুযুর (দঃ)ও তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। লোকটি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

অনুমতি প্রার্থনাকারী আওয়াজ দিয়া দরজার দিকে পিঠ দিয়া দূরে গমন না করিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। অনুমতি প্রার্থনাকারী মনে করে যে, গেটের সম্মুখে দরজা হইতে ঘর অনেক দূরে থাকার কারণে কিংবা গৃহ মধ্যে কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকার কারণে হয়ত আওয়াজ শুনিতে পায় নাই, তবে এমতস্থলে তিনবারের বেশী বারও অনুমতি প্রার্থনা করা যাইতে পারে। হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। তিনবারের পরও যদি উত্তর না আসে, তবে ফিরিয়া চলিয়া যাইবে।

একবার এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমি নিজের মাতার বাড়ী প্রবেশ করিতে হইলেও কি অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি আমার মায়ের বাড়ীতে একই সঙ্গে থাকি। হুযুর (দঃ) বলিলেন, তথাপি মায়ের অনুমতি গ্রহণ করিবে। লোকটি বলিল, আমি তো মায়ের খেদমত করি। হুযুর (দঃ) বলিলেন, তবুও মায়ের অনুমতি লইতে হইবে। সর্বশেষে হুযুর (দঃ) তাহাকে বলিলেন, বিনানুমতিতে প্রবেশ করিয়া মাতাকে কি তুমি অনাবৃত দেহে দেখিতে চাও?

বাড়ীতে যদি কেবল দাসী বা স্ত্রী থাকে তবেই কেবল বিনানুমতিতে প্রবেশ করা যায়। কেননা, স্ত্রী বা দাসীকে যে কোন অবস্থায়ই দেখা যায়। বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় জুতা বা ছাতার দ্বারা শব্দ করিবে। তাহাতে বাড়ীর লোক তাহার আগমনের সংবাদ জানিতে পারিবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীকে সালাম করিলে সে ঘরে খুবই বরকত হয়।

বিদেশ হইতে রাত্রে বাড়ীতে ফিরিলে সে রাত্রে আর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে না। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এমতাবস্থায় বাড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাড়ীর মালিক যেখানে বসিতে দিবেন, সেইখানেই বসিবে। কোন ব্যক্তির আহারের সময় উপস্থিত হইলে সে যদি খুবই খুশীর সহিত তাহার সাথে খাইতে আহ্বান না করে তবে তাহার সহিত খানায় শরীক হইবে না।

ডান হাত ও বাম হাতের ব্যবহার

কোন বস্তু গ্রহণ করা, খানা-পিনা করা, মোসাফাহা করা প্রভৃতি কাজগুলি ডান হাত দ্বারা করিবে। তারপর জুতা পরিধান করা, অজু করা, কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি কাজগুলি ডান হাত এবং ডান পা দ্বারা শুরু করা মুস্তাহাব। পবিত্র জায়গা এবং মসজিদ প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিবার কালে প্রথমে ডান পা রাখা চাই। কিন্তু কতগুলি কাজ আছে, যেমন কোন ময়লা ফেলিয়া দেওয়া, নাসিকা পরিষ্কার করা, এস্তেঞ্জা করা, নাপাক বস্তু ধৌত করা প্রভৃতি কাজগুলি বাম হাত দ্বারা করিবে। মসজিদ হইতে বাহির হইবার কালে প্রথমে বাম পা বাড়াইবে।

পানাহারের রীতি-নীতি

কোনকিছু পানাহারের পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং খাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলিবে। কেননা যে কাজ আল্লাহর নাম লইয়া করা হয় ও কাজ সমাধা করার পর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা হয়, উহাতে বরকত হয় এবং শয়তান দূর হইয়া যায়। হাদীসে আসিয়াছে, ছাহাবাগণ হুযুরে পাক (দঃ)এর নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! প্রচুর

খাওয়া সত্ত্বেও আমাদের পেট ভরে না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহার কর। তাহা না করিয়া তোমরা একসাথে একত্রে আহার করিও এবং শুরু করিবার কালে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া লইও। খানায় বরকত হইবে।
জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন গৃহে প্রবেশ এবং শুরু করিবার সময় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে, তখন শয়তান তাহার শিষ্যগণকে তোমরা রাতে এই গৃহে থাকিতে ও পারিবে না এবং এই গৃহের লোকদের খানায় অংশ করিতে পারিবে না। তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। আর যদি ঐ গৃহের লোকগণ উক্ত আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান তার শিষ্যদেরকে বলে, আজ রাত্রে তোমরা অবস্থান করিবে এবং গৃহবাসীদের খানা-পিনায় অংশ গ্রহণ করিবে।
হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন হুযুরে পাক (দঃ)এর সহিত আহারে শরীক হইতাম, পর্যন্ত তিনি খাবারের পাত্রে হাত না দিতেন, আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদা হুযুরে পাক (দঃ)এর সাথে একত্রে আহারে বসিবার আয়োজনে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ গ্রাম্য আরব সকলকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়া সামনে আগাইয়া খাবার পাত্রের দিকে হাত বাড়াইয়া হুযুর (দঃ) তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে খাবারের উপর বলা না হয়, সে খাবারকে শয়তান নিজের জন্য হালাল মনে করে, শয়তানই এই গ্রাম্য এবং মেয়েটিকে লইয়া আসিয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, উহাদের সাথে সে একত্রে আহার করিবে, এই জন্যই তাহাদের হাত ধরিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে আল্লাহর আয়ত্তে আমার ও প্রাণ তাঁহার শপথ, এই দুইজনের হাতের সহিত শয়তানের হাতও আমার মুঠায় আবদ্ধ। সময় কেহ বিসমিল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই বলিবেঃ বিসমিল্লাহি লিহী ওয়া আখেরিহী।
আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুর (দঃ) বলেন, নেমক দ্বারা আহার শুরু করিবে এবং দ্বারাই আহার শেষ করিবে। ডান হাতে ছোট ছোট লোকমা তুলিয়া মুখে দিবে। খাবার বস্তু ভাবে চর্বন করতঃ ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিবে, খাদ্য দ্রব্যের যে কোন একটি দিক হইতে করিতে শুরু করিবে। আহারের বা পানীয়ের পাত্রে ফুঁক দিবে না। পানাহার করিবাব সময়ে বন্ধ হইয়া আসিলে পাত্র হইতে মুখ সরাইয়া শ্বাস গ্রহণ করতঃ পুনরায় পানাহার শুরু করিবে। পানাহার কালে কোন কিছুর সঙ্গে ঠেস দিয়া বসিবে না বরং সোজা হইয়া বসিয়া পানাহার করিবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা দুরস্ত নাই। স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে কলাই করা পাত্রেও পানাহার করা নিষিদ্ধ। এইসব পাত্রে করিয়া কেহ আহার্য বা পানীয় বস্তু আনিলে তাহা অন্য পাত্রে লইয়া খাইবে এবং ঐ ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের গোলাপদানি ব্যবহার করাও অনুচিত। এই ধরনের নাজায়েয এবং অনুত্তম কাজ যেখানে হইয়া থাকে, সেখানে গমন করিবে না। ঘটনাক্রমে যাইয়া পড়িলেও সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবে। আর গৃহ স্বামীকে বলিয়া দিবে যে, শরীয়তসিদ্ধ বস্তুসমূহের দ্বারা গৃহ সজ্জিত কর। কিন্তু যে সকল বস্তু হারাম বা নাজায়েয, তাহা ব্যবহার করিও না। যেহেতু উহার পরিণতি কখনও শুভ হইতে পারে না, এই সম্পর্কে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে বা স্বর্ণ বা রৌপ্যের কলাই করা পাত্রে পানাহার করে, সে ব্যক্তি দোজখের আগুন দ্বারা তার পেট ভর্তি করে।
খানা খাইবার কালে মুখের লোকমা কোন ক্রমেই মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে না। অবশ্য যদি মুখের লোকমা কোন ভাবে গলায় বাঁধিয়া যায় বা আটক হইয়া পড়ে, তখন যেভাবেই হউক গলার মধ্য হইতে সেই খানার লোকমা বাহির করিয়া ফেলিবে। খানা খাইবার সময় হাঁচি আসিলে মুখের উপর কিছু দিয়া বা হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিবে। অথবা খানা বন্ধ করিয়া খাবার স্থান হইতে দূরে গিয়া হাঁচি দিয়া আসিবে। খানা খাইবার সময় কোন খাদেম বা পরিচালক কাছে দাঁড়ানো থাকিলে তাহাকে বসিতে বলিবে। কোন ছোট বালক-বালিকা নিকটে দাঁড়াইলে বরতন হইতে ভাল ভাল খানা উঠাইয়া তাহার মুখে দিবে। বরতনে কিছু খানা লাগিয়া থাকিলে তাহা

রাখিয়া না উঠিয়া বরং ছাফ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। যাহাদের সঙ্গে খাইতে বসিবে, তাহাদের পদ-মর্যাদা অনুসারে তাহাদের সাথে ভদ্র আচরণ করিবে। সাধু দরবেশদের সাথে খাইতে বসিলে তাহাদের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বস্তু তাহাদের বরতনে দিবে এবং নিজের তুলনায় তাহাদের অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়া খাইতে বসিলে তাহাদের আপ্যায়নে দস্তদারাজী প্রদর্শন করিবে। আলেম-ফাজেলদের সহিত খাইতে বসিলে তাঁহাদের দ্বারা খানা-পিনা সম্পর্কিত আদব ও শিষ্টতা শিখিয়া লইবে। অন্ধ ব্যক্তি খাইতে বসিলে তাহার নিকট প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া উহা তাহার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে যেন সে কোন খাদ্য হইতে বঞ্চিত না থাকে।

কাহারও খাওয়া অন্যান্যদের পূর্বেই শেষ হইয়া গেলে বরতন হইতে হাত না উঠাইয়া সকলের সাথে অল্প অল্প খাইতে থাকিবে অথবা বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিবে। যখন সকলে খাওয়া শেষ করিয়া হাত উঠাইয়া লইবে, তখন তাহাদের সাথে একত্রে হাত উঠাইয়া লইবে।

মেহমানদের খানা খাইতে দিয়া তাহাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে হাড্ডি-কাটা-ঝুটা ইত্যাদির পাত্র তাহাদের সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইবে না। সকলের খাওয়া শেষ হইবার পরে উহা সরাইয়া নিবে।

খেজুর বা খোরমা খাইবার কালে এক সঙ্গে দুইটি মুখে পুরিবে না। ইহাকে হুযুরে পাক (দঃ) নিষিদ্ধ ফরমাইয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে ভক্ষণকারী যদি একাকী হয় বা সে যদি নিজেই আহার্য বস্তুর মালিক হয়, তবে উক্তরূপ (এক সাথে দুইটি খেজুর বা খোরমা) ভক্ষণ করা মাকরূহ হইবে না।

কোন মেহমানের জন্য মেজবানের নিকট নিজের ইচ্ছামত খানা তলব করা উচিত নহে। কারণ তাহা মেজবানের জন্য অসুবিধার কারণ ঘটাইতে পারে এবং ইহা তাহার জন্য অপ্রীতিকর ব্যাপারও বটে। সুতরাং মেহমানের উচিত মেজবান যাহা সরবরাহ করে, খুশী মনে তাহাই আহার করা। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং আমার পরহেজগার উম্মতগণ যে কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমাতিরিক্ত কাজ অপছন্দ করি। অবশ্য মেজবান যদি মেহমানের নিকট খাবার দ্রব্যে তাহার রুচি এবং পছন্দ-অপছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে তাহা প্রকাশ করায় দোষ নাই।

খাদ্য দ্রব্যে কোন বিষাক্ত প্রাণী পড়িলে বা মুখ দিলে তাহা পানাহার করা হারাম। যেমন সর্প, বিচ্ছু ইত্যাদি। কোন আহার্য বা পানীয় দ্রব্যে মাছি পতিত হইয়া উহার উভয় পাখা উহার ভিতরে ডুবাইয়া দিলে মাছিটি ফেলিয়া দিয়ে উহা পানাহার করা জায়েয।

খানা-পিনার কালে এক আদব হইল এই যে, কেহ যখন আহার করিতে থাকে তখন তাহার আহারের দিকে তাকাইয়া থাকিবে না।

বিবাহের জিয়াফতে দাওয়াত করিলে তাহাতে যোগদান করা মুস্তাহাব। অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইচ্ছা হইলে খানা খাইবে, না হইলে খাইবে না। (তাহাতে দোষ নাই কিন্তু) নব-দম্পতির জন্য দোয়া করিয়া আসিবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দাওয়াত কবুল না করে, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (দঃ)এর নাফরমানী করে আর যে বিনা দাওয়াতে জিয়াফত খাইতে যায়, সে চোর তুল্য ভিতরে প্রবেশ করে আর ডাকাত তুল্য বাহির হইয়া যায়। এই হাদীস অবশ্য শরীয়ত সিদ্ধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কোন স্থানে শরীয়ত বিরুদ্ধ কার্য হইতে দেখিলে সেখান হইতে চলিয়া আসিবে। গান-বাজনা, ঢোল, ঢাক-বাঁশী, নৃত্য ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ। কেবল দফ বাজানো বিবাহের অনুষ্ঠানে জায়েয আছে।

হযরত শিউলী (রহঃ)এর নিকট লোকগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল গান শুনা জায়েয কিনা? তিনি জবাবে বলিলেন, না, জায়েয নয়।

খানা শুরু করিবার কালে ও খানা খাওয়ার পরে উভয় হাত ধৌত করা মুস্তাহাব। কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন ভক্ষণ করা মাকরূহ, কারণ উহাতে দুর্গন্ধ বিদ্যমান। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুর্গন্ধ যুক্ত শাক-সবজি আহার করে সে যেন মসজিদে প্রবেশ না করে।

পেটে বদহজমি হইতে পারে এত বেশী পরিমাণ আহার করা মাকরূহ। মেজবানের অনুমতি ব্যতীত এক মেহমানের খানা অন্য মেহমানকে প্রদান করা মাকরূহ। কারণ মেজবানের খাদ্যের উপর মেহমানের শুধু নিজের খাইবার হক রহিয়াছে। অন্যকে প্রদান করার হক নাই।

খানা মেহমানের সামনে রাখিলেই সে খাইতে শুরু করিতে পারে তজ্জন্য মেজবানের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন করে না।

[illegible] বস্তু পান করিবার কালে উহা এক এক ঢোক করিয়া পান করিবে। বন্য পশু বা অন্যান্য জীব [illegible] একসাথে দীর্ঘটানে পান করিবে না। বরং তিনবার শ্বাস লইয়া তিন ঢোকে পান করিবে। [illegible] করিবার কালে বিসমিল্লাহ্ এবং পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ্ বলিবে।

[illegible] পানাহারের মধ্যে বারটি আদব। উহার মধ্যে চারিটি ফরজ। চারিটি সুন্নত এবং চারিটি [illegible]।

[illegible] চারিটি এইঃ আহার্য বা পানীয় বস্তু হালাল হওয়া, খাইবার কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, [illegible] সাথে পানাহার করা এবং খাইবার পরে আল্লাহর শোকর করা।

[illegible] চারিটি এইঃ বাম পায়ের উপর ভর দিয়া খাইতে বসা, তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করা, [illegible] দিক হইতে খাইতে শুরু করা এবং আঙ্গুলসমূহ চাটিয়া খাওয়া।

[illegible] চারিটি এইঃ ছোট ছোট লোকমা লওয়া, আহার্য দ্রব্য উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া, খাইবার [illegible] মানুষের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করা এবং কোন কিছুর সাথে ঠেস দিয়া বসিয়া আহার করা।

মেহমান অবস্থায় রোযা ইফতার করার দোয়া

[illegible] ব্যক্তি কাহারও গৃহে মেহমান থাকাকালে রোযার ইফতার করিবার সময়ে নিম্নোক্ত [illegible] পড়িবে।

[illegible] ইনদাকুমুছ ছায়িমা না অ আকালা ত্বোয়ামাকুমুল আবরারু অ তানায যালাত আলাইকুমুল [illegible]তু আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানা অ ছাক্বানা অ জাআলানা মিনাল মুসলিমীনা [illegible] মিনাদ্দ্বালালাতি অ ফাদ্দালনা আলা কাছীরিম মিম্মান খালাক্বাহু তাফদ্বীলা আল্লাহুম্মাশবা [illegible] উম্মাতি মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা অ আলবিস আরীহা অ আফি মারদ্বোয়াহা [illegible] গায়িবুহা অজমা' শামালা আহলিদ্দারি অরযুক্বহুম অজআল দুখুলানা বারাকাতান অ খুরুজানা [illegible]রাতান অ আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতান অ ফিল আখিরাতি হাসানাতান অ ক্বিনা [illegible]ন্নারি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

হাম্মাম খানার বিবরণ

[illegible] খানা তৈরী করা, বিক্রয় করা ভাড়া দেওয়া, ক্রয় করা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই মাকরূহ। ইহার [illegible] হইল, তথায় সতরে আওরাত রক্ষিত হয় না। বরং হাম্মামখানায় সচরাচর দৈহিক নগ্নতার [illegible] ঘটিয়া থাকে। হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে হাম্মাম খানা একটি খারাপ জায়গা, [illegible] লজ্জার পোশাককে উন্মোচন করিয়া ফেলা হয় এবং সেখানে কোরআনে পাক তেলাওয়াত [illegible] হয় না।

[illegible] কোন ওজর ব্যতীত হাম্মামে যাওয়া চাই না। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে [illegible] (রাঃ) হাম্মাম খানাকে খুবই খারাপ মনে করিতেন। ইহার কারণ হিসাবে তিনি বলিতেন যে, [illegible] খানায় গোসল করা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) ও [illegible] ইবনে সিরীন (রহঃ) এই সাধকদ্বয় কখনও হাম্মাম খানায় গোসল করিতেন না। ইমাম [illegible] ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর পুত্র বলেন যে, আমি আমার পিতাকে কখনও হাম্মাম খানায় যাইতে [illegible] নাই। এতদসত্ত্বেও যদি কখনও কোন বিশেষ জরুরত দেখা দেয়, তবে হাম্মাম খানায় যাওয়া [illegible] আছে। অবশ্য কাপড় দ্বারা নিজের সতর আবৃতাবস্থায় এবং অন্যের সতর হইতে নিজের চক্ষু [illegible] রাখিয়া। যদি হাম্মাম খানা কখনও জনশূন্য থাকে, তবে দিন বা রাত্র হউক, গুনাহর আশঙ্কা [illegible] না, তাই সে সময় হাম্মাম খানায় যাওয়া দোষণীয় নয়।

[illegible] আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)কে হাম্মাম সম্পর্কিত মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি [illegible], যদি তোমাদের জানা থাকে যে, হাম্মামের ভিতরে যাহারা আছে, সকলেই আবৃত-দেহ, [illegible] হইলে হাম্মামে যাওয়া যায়, নতুবা নহে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) [illegible] করিয়াছেন, হাম্মাম খানা ঘৃণিত স্থান, যেখানে পর্দা রক্ষিত হয় না এবং সেখানকার পানি [illegible] নহে।

[illegible] আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রোজ [illegible] বিশ্বাস রাখে, সে যেন কখনও কাপড় ছাড়িয়া হাম্মাম খানায় না যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে আ... উম্মতগণ! অচিরেই আজম এলাকা (ইরান রাজ্য) তোমাদের দখলে আসিবে। আর তোমরা ত... এমন সব গৃহ লাভ করিবে যাহা হাম্মাম বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু তোমাদের পুরুষগণ যেন ত... ভিতরে কাপড় ছাড়িয়া প্রবেশ না করে এবং তোমাদের মহিলাগণ যেন সেখানে হায়েজ-নে... মত বিশেষ ওজর ছাড়া প্রবেশ না করে।

হাম্মাম খানায় প্রবেশের রীতি

হাম্মাম খানায় প্রবেশ কালে সালাম বলিবে না, কোরআনের আয়াত পাঠ করিবে না। হযরত আ... (রাঃ) বলেন, হাম্মাম খানায় প্রবেশ কালে উলঙ্গ হইবে না, এমনকি গোসল করিবার কালেও কা... খুলিয়া লইবে না।

হযরত আবূ দাউদ (রহঃ) বাহাজ ইবনে হাকেম হইতে বলেন, তাঁহার দাদা আরজ করিলেন, ... রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি কাহার নিকট সতরে আওরত করিব এবং কাহার নিকট তাহা না করি... চলিবে? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, স্বীয় স্ত্রী এবং বাঁদী ব্যতীত অন্য সবার নিকট হই... সতর ঢাকিয়া রাখিবে। হাকেমের (রহঃ) দাদা বলেন, আমি আবার আরজ করিলাম, ই... রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যদি আমি একাকী থাকি? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, বান্দার নিকট ... অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালা অধিক হকদার, সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে শরম করা চাই।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিনা বস্ত্রে গোসল করি... দেখিয়া গিয়া মিম্বরে আরোহণ করতঃ আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করিলেন। অত... বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত লজ্জাশীল, পর্দায় অবস্থানকারী এবং তিনি লজ্জা ও পর্দাকে প... করেন। তোমরা যখন গোসল করিবে, তখন পর্দা করিয়া লইবে, যখন কেহ গোসলাদি কর... জন্য পানির ভিতরে নামিবে তখনও বিবস্ত্র নামিবে না, উহা মাকরূহ। পানির ভিতরেও ... অবস্থানকারী রহিয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযুরে পাক (দঃ) উলঙ্গাবস্থায় পানির ভিতরে নামিতে নি... করিয়াছেন। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, পানির ভিতরে বহু অবস্থানকারী রহিয়াছে, তাহ... সাথে আমাদেরই পর্দা রক্ষা করা বেশী প্রয়োজন।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ (রহঃ) বিবস্ত্রাবস্থায় পানির ভিতরে যাওয়া সিদ্ধ করিয়া... উহা তিনি মাকরূহ মনে করিতেন না। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, ... কেহ উলঙ্গাবস্থায় নদীতে গোসল করে এবং উহা কাহারও নজরে না পড়ে, তবে তাহার হুকুম কি... ইমাম সাহেব জবাবে বলিলেন, এইরূপ গোসল করায় দোষের কিছু নাই।

আংটি তৈরী ও ব্যবহার করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) যখন বিভিন্ন আজমী শাসকের কা... ইসলামী দাওয়াত পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করিলেন, তখন লোকগণ তাঁহার নিকট আরজ করিলেন ... ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! উহারা মোহরাঙ্কিত ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। একথা শুনিয়া হুযু... পাক (দঃ) রৌপ্যের দ্বারা মোহরযুক্ত আংটি বানাইবার নির্দেশ করিলেন। উহার উপরে মুহাম্ম... রাসূলুল্লাহ অঙ্কিত করা হইল। হযরত আনাস (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন, হুযুরে পাক (দঃ)এর আংটি... শুধুই রৌপ্যের ছিল এবং উহার নাগিনাটি ছিল হাবশী আকীক পাথরের। হযরত আবূ দাউদ (র... নাফে হইতে এবং নাফে ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) নিজের আংটি স্বর্ণ দ্ব... তৈরী করাইয়াছিলেন এবং উহার নাগিনা ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং উক্ত নাগিনার উপরে 'মুহাম্ম... রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল। হুযুরে পাক (দঃ)এর অভ্যাস ছিল, তিনি সর্বদা নাগিনার রোখ রাখি... নিজের স্বীয় হাতের তালুর দিকে। হুযুর (দঃ)এর যমানায় অন্যান্য লোকগণও স্বর্ণের আংটি বানাই... ব্যবহার করিত। হুযুর (দঃ) যখন এই অবস্থা লক্ষ্য করিলেন, তখন তিনি নিজের আংটি খুলি... ফেলিলেন এবং বলিলেন, আমি আর ইহা কখনই পরিধান করিব না। ইহার পর তিনি রৌপ্যে... আংটি বানাইয়া উহার নাগিনায় "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' নাম অঙ্কন করাইলেন। হুযুরে পাক (দঃ)এ... ইন্তেকালের পর এই আংটি হযরত আবুবকর (রাঃ) পরিধান করিতেন। তাঁহার পরে হযরত ও...

... অবর্তমানে ইহা হযরত ওসমান (রাঃ) ব্যবহার করিতেন। অতঃপর ঘটনাক্রমে ... তাঁহার আঙ্গুল হইতে খুলিয়া গিয়া একটি কুয়ায় পড়িয়া যায় এবং চিরদিনের জন্য ... যায়।

কিসের আংটি ব্যবহার করা চাই

... পিতলের আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। একদা এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিয়া হুযুরে ... দরবারে উপস্থিত হইলে হুযুর (দঃ) বলিলেন, কারণ কি, আমি যে তোমার শরীর ... গন্ধ পাইতেছি। এ কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি তন্মুহূর্তে তাহার আংটিটি খুলিয়া দূরে ...।

... সেই ব্যক্তি হাতে একটি লোহার আংটি পরিয়া হুযুর (দঃ)এর দরবারে হাজির হইল। ... (দঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওহে! কারণ কি, আমি যে তোমার দেহে ... গহনা দেখিতেছি। একথা শুনিয়া লোকটি তখনই তাহার আংটিটি খুলিয়া ফেলিয়া দিল ... করিল, ইয়া রাসূলালাহ (দঃ)! আমি কিসের দ্বারা আংটি তৈরী করাইব? হুযুরে পাক ... করিলেন, রৌপ্যের দ্বারা। তবে তাহা যেন সাড়ে চার মাশার বেশী না হয়।

আংটি কোন আঙ্গুলে ব্যবহার করিবে

... এবং শাহাদত আঙ্গুলে আংটি পরিধান করা মাকরূহ। হুযুরে পাক (দঃ) হযরত আলী ... এইরূপ আংটি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

... বাম হাতের অনামিকা আঙ্গুলে ব্যবহার করা উত্তম। হযরত আবূ দাউদ (রহঃ) হযরত ... ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুযুর পাক (দঃ) নিজের বাম হাতে আংটি ... করিতেন এবং তাহার রোখ থাকিত হাতের তালুর দিকে। হযরত আলী (রাঃ)এর বর্ণনা ... হয় যে, হুযুর পাক (দঃ)এর স্বীয় ডান হাতে আংটি ব্যবহার করিতেন। উল্লিখিত দুইটি ...তের ভিত্তিতে ডান বাম উভয় হাতেই আংটি ব্যবহার করা যায়।

...খানায় যাওয়া, পায়খানা করা এবং এস্তেঞ্জা করিবার রীতি-নীতি

... গমনের প্রাক্কালে সর্বপ্রথম শরীর হইতে কোরআনে পাকের আয়াত লিখিত যাবতীয় বস্তু ... তাবীজ, মোহর ইত্যাদি খুলিয়া রাখিবে। তারপর বাইতুল খোলা তথা পায়খানায় প্রথমে বাম ...বে এবং এই সময় পাঠ করিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

... ঃ বিসমিল্লাহি আউযু বিল্লাহি মিনাল খুবছি অল খাবায়িছি অ মিনার রিজসিন নাজসিশ ...ত্বোয়ানির রাজীম

... শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পায়খানায় শয়তান থাকে। সুতরাং, ... পায়খানায় প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকটে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আর পায়খানায় ... কালে পাঠ করঃ আউযুবিল্লাহি মিনার রিজসিন নাজসিল খাবীছিল শাইত্বোয়ানির রাজীম।

... গমন কালে মস্তক ডাকিয়া লওয়া চাই। পায়খানায় ঢুকিয়া হাজত দূর করার জন্য বসিবার ... বস্ত্র উন্মোচন করিবে (তাহার পূর্বে নয়) পায়খানায় বসিয়া বাম পায়ে বেশী ভর দিবে তাহাতে ... ও আসানির সাথে পায়খানা হইয়া যায়। পায়খানায় বসিয়া কোনরূপ কথাবার্তা বলিবে না, ...কেও সালামের জবাব দিবে না। পায়খানায় বসিয়া হাঁচি আসিলে মুখে না বলিয়া মনে মনে ...মদুলিল্লাহ বলিবে। এদিকে সেদিকে বা আকাশের দিকে তাকাইবে না।

...খানা সাধারণতঃ লোক বসতি হইতে একটু দূরে হওয়া চাই এবং পেশাবের স্থানের যমিন কিছুটা ... হওয়া চাই যাহাতে পেশাবের ছিটা ফিরিয়া আসিয়া শরীরে বা কাপড়ে লাগিতে না পারে।

পেশাব ও পায়খানা করিবার কালে লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে লজ্জা স্থান অপরের নজরে না আ
পেশাব করিবার কালে বাতাস প্রতিকূল থাকিলে গুপ্তাঙ্গ যমিনের সহিত মিশাইয়া রাখিবে। কি
সম্মুখে বা পিছনের দিকে রাখিয়া পায়খানা-পেশাবে বসিবে না, চন্দ্র-সূর্যের দিকে মুখ করিয়াও ক
চাই না। কোন ফলদার বা ছায়াদার বৃক্ষের তলায় পেশাব করিতে বসিবে না। মানুষের যাত
পথে রাস্তার উপরে বা পুকুরের ঘাটে পেশাব করিবে না।

পায়খানা পেশাবে বসিয়া কোরআনের আয়াত পাঠ বা আল্লাহ্‌র নামের যিকির-আযকার করিবে ন
অবশ্য মনে মনে শুধু বিসমিল্লাহ এবং আউযুবিল্লাহ কালাম দুইটি পাঠ করা যাইবে।

হাজত দূর করিবার (পায়খানা পেশাব করিবার) পর এই দোয়াটি পাঠ করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ غُفْرَانَكَ *

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আজা অ আফানী গুফরা-নাকা।

পায়খানার পরে কোন শুষ্কদ্রব্য কিংবা পানি উভয়ের দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়। শুষ্কদ্রব্য দ্বারা এ
করিলে পাথর কিংবা মাটির তিনটি পাক টুকরা হওয়া চাই। উহার একটি একটি বাম হাতে ল
উহাদ্বারা পায়খানার মকাম উত্তমরূপে রগড়াইয়া মল দূর করিয়া ফেলিবে।

পেশাবের মকামে শুষ্কবস্তু (ঢিলা বা শুকনা নেকড়া) পেশাবের ফোঁটা টপকানো পর্যন্ত লাগা
রাখিবে। যখন পেশাব টপকানো বন্ধ হইবে তখন উক্ত ঢিলা বা নেকড়া ফেলিয়া দিবে। একটি
পেশাবের মকামে লাগাইয়া ধরিয়া উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবে, উহা শুষ্ক কি সিক্ত। শুষ্ক থাকি
মনে করিবে যে, পেশাব টপকানো বন্ধ হইয়াছে। তিনটি ঢিলা দ্বারা পেশাব বা পায়খানার মক
সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হইলে পাঁচটি বা সাতটি ঢিলা ব্যবহার করিবে।

পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবার নিয়ম হইল, ডান হাতে পানি ঢালিয়া দিবে এবং বাম হাত দ
উত্তমরূপে রগড়াইয়া পেশাব-পায়খানার মকাম ধুইয়া ফেলিবে

শুষ্ক বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা শুদ্ধ হইলেও উত্তম রীতি হইল, শুষ্ক বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়া পানি দ্বারা ধু
মনের সন্দেহ দূর করা।

কোন কোন শুষ্ক বস্তুদ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়

শুষ্ক মাটি বা পাথরের ঢিলা, শুষ্ক নেকড়া, নারিকেলের বা শুপারির ছোবরা, বৃক্ষের শুকনা ছ
ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যায়, কিন্তু কোন খাদ্যদ্রব্য বা সম্মানিত ও মূল্যবান বস্তু যেমন কোন ফ
মূল বা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে না। ইহা ছাড়া কোনরূপ বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক ব
যেমন সীসা, কয়লা এবং কঙ্কর ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে না। তাহা ছাড়া জীব-জন্তুর কোনর
দেহের অংশ দ্বারা যেমন চামড়া হাড্ডি দ্বারাও এস্তেঞ্জা করা নিষেধ।

গোসলের বিবরণ

গোসল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রয়োজন অনুরূপ এবং পরিপূর্ণ গোসল। হদছে আকবার বা জানাবাতে
অবস্থা ব্যতীত প্রয়োজন অনুসারে গোসল করাকে প্রয়োজন অনুরূপ গোসল বলা যায় এবং হদ
আকবার বা জানাবাতের অবস্থায় যে গোসলের প্রয়োজন হয় উহাকে পরিপূর্ণ গোসল বলা হ
এইরূপ অবস্থায় গোসলকে ফরজ গোসলও বলা যায়। এই প্রকার গোসলে তিনটি কাজ ফরজ য
(১) কুলি করা (২) নাকের ভিতরে পানি পৌঁছানো এবং (৩) মস্তকসহ সর্বশরীরে পানি ঢালি
উত্তমরূপে ধৌত করা, যেন কোন একটি স্থান বাকী না থাকে। উল্লেখ্য যে, ফরজ গোসলে এক
পশমের গোড়া শুষ্ক থাকিলেও গোসল শুদ্ধ হইবে না।

গোসলের নিয়ম হইল, যদি পরিপূর্ণ বা ফরজ গোসল হয়, তবে হদছ বা জানাবাত দূর করার জ
গোসল করিতেছি এইরূপ নিয়ত করতঃ সর্বপ্রথম দুই হাত ধৌত করিবে, তারপর শরীরের কো
অংশে নাজাসাত লাগিয়া থাকিলে তাহা দূর করিয়া ফেলিবে। তারপর কুলি করা ও নাকে পা
দেওয়াসহ পুরা অজু করিবে। অজু শেষে বসিবার স্থান হইতে একটু সরিয়া গিয়া দুই পা ধুই
ফেলিবে। অতঃপর মস্তকসহ সর্ব শরীরে পানি ঢালিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে।

যে, এইরূপ পরিপূর্ণ বা ফরজ গোসল করিবার কালে অজুর নিয়ত না করিলেও ঐ গোসল সময় আদায় করিলে তাহা জায়েয হইবে, কিন্তু সাধারণ গোসলের সময় যদি অজু করা না হয়, সেই গোসল দ্বারা নামায পড়িলে তাহা আদায় হইবে না। —হাম্বলী মাযহাব।
গোসলে মধ্যম পরিমাণ পানি ব্যবহার করা উত্তম এবং মুস্তাহাব। প্রয়োজনের অধিক পানি ব্যবহার করা অন্যায়, আবার এত কম পানি ব্যবহার করাও ঠিক নহে, যাহাতে অজু ও গোসল ভাবে আদায় হয় না। এক রেওয়ায়েতে দেখা যায়, হুযুরে পাক (দঃ) এক মুদপানি দ্বারা অজু ...হা' পানি দ্বারা গোসল করিতেন।

অজুতে বিভিন্ন অঙ্গ ধৌতকালীন দোয়াসমূহ

ইস্তেঞ্জা করিবার পরে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الشَّكِّ وَالنِّفَاقِ - وَحَصِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاحِشِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা নাক্কি ক্বালবী মিনাশ শাক্কি অন্নিফাকি অ হাছছিন ফারজী মিনাল ফাওয়াহিশে।

অজু শুরু করিবার কালে বিসমিল্লাহর সাথে পড়িবেঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ শাইয়াত্বীন অ আউযুবিকা রাব্বি আইইয়্যাহ্‌দুরূন।

হস্তদ্বয় ধৌতকালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَي وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল ইউমনা অল্ বারাকাতা অ আউযুবিকা মিনাশ শুমি অল হালাকাতি।

কুলি করার সময়ে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِلَكَ *-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি কিতাবিকা অ কাছরাতিয যিকরি লাকা।

নাকে পানি দেওয়া কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَوْجِدْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আওজিদনী রায়িহাতাল জান্নাতি অ আনতা আন্নী রাদ্বিন।

নাক ঝাড়িবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ رَّوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ الدَّارِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনার রাওয়ায়িহিন নারি অ মিন সূয়িদ্দার।

মুখমণ্ডল ধৌত করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهَا اَوْلِيَائِكَ وَلَاتُسَوِّدْ وَجْهِى
يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهَا اَعْدَائِكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাইয়্যিদ্ব অজহী ইয়াউমা তাবইয়াদ্দু উজুহা আউলিয়ায়িকা অলা তাসওয়াদ্দু অজহী ইয়াওমা তাসওয়াদ্দু উজুহা আ'দায়িকা।

(৮) ডান হাত (কনুইসহ) ধৌত করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِىْ كِتَابًا بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًايَّسِيْرًا *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আতিনী কিতাবাম বিইয়ামীনী অ হাসিবনী হিসাবাই ইয়াছীরা।

(৯) বাম হাত (কনুইসহ) ধৌত করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تُؤْتِيَنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْمِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন তু'তিয়ানী কিতাবী বিশিমালী আওমিউ অরায়ি জাহরী।

(১০) মাথা মাসেহ্ করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّكَ *

১১। কর্ণদ্বয় মাসেহ্ কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِيْ مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبْرَارِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজআলনী মিনাল্লাযীনা ইয়াসতামিউনাল ক্বাওলা ফাইত্তাবিউনা আহসানাহ্। আল্লাহুম্মা আসমি'নী মুনাদিয়াল জান্নাতি মাআ'ল আবরার।

১২। গরদান মাসেহ্ করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ فَكِّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ফাককি রাক্বাবাতী মিনান্নারি অ আউযুবিকা মিনাস সালাসিলি অল আগলাল।

১৩। ডান পা ধৌত করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْقَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ اَقْدَامِ الْمُؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী আ'লাছ ছিরাতি মাআ আক্বদা মিল মু'মিনীন।

১৪। বাম পা ধৌত করিবার কালে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىْ مِنَ الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকাআন তাযিল্লা ক্বাদামী মিনাছ ছিরাতি ইয়াওমা তাযিল্লু আক্বদামুল।

১৫। অজু শেষ করতঃ আকাশের দিকে তাকাইয়া পড়িবেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ فَاغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ اَذْكُرُكَ وَاُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا *

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহু., সুবহানাকা অ বিহামদিকা লা-ইলাহা ইল্লাআনতা আমিলতুসুয়ান অ জালামতু নাফসী আসতাগফিরুকা অ আসয়ালুকাত্তাউবাতা ফাগফিরলী অতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা

আনতাত্তাওয়্যাবুর রাহীমু। আল্লাহুম্মাজআলনী মিনাত্তাওয়্যাবীনা অজআলনী মিনাল মুতাত্বোয়াহহিরীনা অজআলনী ছাবুরান শাকুরাউ অজআলনী আযকুরুকা অ উসাব্বিহুকা বুকরাতাউ অ আছীলা।

পোশাকের বিবরণ

পোশাক-পরিচ্ছদ পাঁচ ধরনের হইতে পারে, যেমনঃ ১। যাহা প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জন্য হারাম অর্থাৎ পরিধান করা নিষিদ্ধ (২) যাহা কাহারও জন্য হারাম এবং কাহারও জন্য হালাল, (৩) যাহা পরিধান করা মকরূহ (৪) যাহা পরিধান করা জায়েয এবং (৫) যাহা পরিধান করা নিষিদ্ধ নয়।

১। অপহরণকৃত পোশাক পরিধান করা হারাম।

২। রেশমী পোশাক পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম, কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্য হালাল। নাবালেগ বালকের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা কাহারও নিকট জায়েয এবং কাহারও নিকট নাজায়েয।

৩। পোশাক (পরিধেয় কাপড়) এত বেশী ঝুলাইয়া পরিধান করা যাহাতে গর্বের ভাব প্রকাশ পায়, এমন পোশাক মাকরূহ। রেশম এবং সুতা মিশ্রিত তৈরী পোশাক পরিধান করাও পুরুষের জন্য মাকরূহ ।

৪। যাহাতে রেশমের অংশ কম এবং সুতার অংশ বেশী এমন পোশাক পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয।

৫। কোন দেশ বা এলাকার প্রচলিত পোশাক পরিধান করা নাজায়েয বা নিষিদ্ধ নয়, তবে তাহা দ্বীন তথা শরীয়তের বিরোধী না হওয়া চাই।

পোশাকের প্রকার ভেদ ঃ পোশাক সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা ঃ (১) ওয়াজিব (২) মুস্তাহাব। ওয়াজিব পোশাক আবার দুই প্রকার। যথাঃ আল্লাহর তরফ হইতে নির্দেশিত পোশাক অর্থাৎ যে পোশাক দ্বারা সতরে আওরতের নির্দেশ পালিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার হইল, অবস্থা এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে যে পোশাক পরিধান করিতে হয়। যেমন, অধিক গরমের কারণে ঠান্ডা পোশাক পরিধান করা, ইহা না করিলে যদি রোগাক্রান্ত হইবার বা প্রাণহানি ঘটিবার আশংকা হয়, তবে জান- প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ পোশাক পরাও ওয়াজিব হইয়া থাকে।

মুস্তাহাব পোশাকও দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার হইল, জুমআ, ঈদ প্রভৃতি নামাযসমূহে দ্বীনি ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা হয়। (চাই তাহা বেশী মূল্যবান হইক, চাই কম মূল্যবান হইক)

আর দ্বিতীয় প্রকার হইল, নামায আদায় কালে অধিক মূল্যবান যে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা হয়, (উহা শরীয়তের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যমূলক না হইলেও উহার বিপরীত না হওয়া চাই। আর ঐরূপ পোশাক পরিধান করিয়া অপরকে ক্ষুদ্র মনে না করা চাই)

পাগড়ী বাঁধিবার রীতি ঃ পাগড়ী বাঁধিবার নিয়ম হইল উহার একমাথা দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া অন্য মাথা মস্তকে পেচাইবে, এই রীতি মুস্তাহাব।

লুঙ্গি পরিধানঃলুঙ্গির পানা অধিক লম্বা হওয়া চাই না। হাদীস শরীফে কাছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের লুঙ্গির (ইজার) পানা হইবে টাখনুর উপর পর্যন্ত। উহা টাখনুর নীচে ঝুলিয়া থাকিলে ইহা(টাখনুর নীচের অঙ্গ) দোজখের আগুনে জ্বলিবে। যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলাইয়া চলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে নজর করেন না।

নামাযের সময় চাদর এইরূপ আট-সাট করিয়া গায়ে দিবে না যাহাতে উহার ভিতর হইতে হাত বাহির করিতে কষ্ট হয়। এইরূপ ভাবে চাদর পরিধান করা মাকরূহ। চাদরের মধ্য ভাগ মাথার উপর দিয়া উহার দুই কিনার পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া ইয়াহুদীদের নীতি। নামাযের মধ্যে কাপড় দ্বারা নাক ও মুখ ঢাকিয়া লাওয়া মাকরূহ। শরীর নজরে আসে এই ধরনের কাপড় পরিধান করা মাকরূহ। যাহারা ইচ্ছাপূর্বক এই ধরনের পোশাক পরিধান করে, যাহার নীচ হইতে গুপ্তাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা ফাসেক বৈকি। এইরূপ কাপড় পরিয়া নামায পড়িলে নামায আদায় হইবে না। পুরুষের স্ত্রীলোকদের মত পোশাক পরা এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের মত পোশাক পরিধান করা অনুচিত। হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এইরূপ পোশাক পরিধানকারী পুরুষ ও রমণীগণকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদেরকে দোজখের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পায়জামা ঃ ইসলামী শরীয়তে পায়জামার প্রশংসা করা হইয়াছে। হুযুরে পাক (দঃ) পায়জামাকে অর্ধেক পোশাক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং উহাকে পুরুষের জন্য খুবই উত্তম এবং শোভনীয় পোশাক আখ্যা দিয়াছেন।

পায়জামার পা দুইটি খুব বেশী প্রশস্ত রাখা মাকরূহ। বরং সংকীর্ণ এবং সরু পা রাখা উত্তম। কারণ ইহাতে সতরে আওরত অনাবৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এক মহিলাকে প্রশস্ত পা বিশিষ্ট পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সাদা পোশাকের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ সর্বপ্রকার পোশাকের মধ্যে শ্বেত বর্ণের পোশাকই শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ছেলে-পেলেদেরকে সাদা পোশাক পরিধান করাও এবং মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, সাদা বর্ণের কাপড় পরিধান কর, তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম পোশাক।

নিদ্রা যাইবার রীতি-নীতি

নিদ্রা যাইবার পূর্বে পানির বরতন ঢাকিয়া রাখিবে। প্রদীপ নিবাইয়া দিবে, কোনরূপ ঘ্রাণযুক্ত খাদ্য আহার করিলে মুখ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে, যাহাতে কোন ক্ষতিকারক প্রাণী কোনরূপ ক্ষতি করিবার সুযোগ না পায়।

আবূ দাউদ শরীফে এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) বারা' ইবনে আযেব (রাঃ)কে এরশাদ করিয়াছিলেনঃ তোমরা নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণ করিবার পূর্বে নামাযের অজুর মত অজু করিয়া লও, তারপর বিছানায় ডান কাতে শয়ন করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ কর। এই দোয়া পাঠের পরে নিদ্রা যাইবার পূর্বে আর কোনরূপ বাক্যোচ্চারণ করিও না।

দোয়াটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু অজহী ইলাইকা, অ ফাওয়্যাদ্বতু আমরী ইলাইকা অলজা'তু জাহরী ইলাইকা রাগাবাতাউ অ রাহবাতান ইলাইকা আমানতু বি কিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমরা নিদ্রা যাইবার পুর্বে এই দোয়াটি পড়িয়া নিদ্রার মধ্যে মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমরা মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করিবে।

যদি তোমরা নিদ্রার জন্য শয্যায় শায়িত হও, তবে ডান কাতে কিবলামুখ হইয়া এমনভাবে শয়ন কর, যেমন ভাবে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শয়ন করানো হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি কেহ আল্লাহ তায়ালার আসমানও যমিন ব্যাপী শাসন ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া চিতভাবে শয়ন করে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতির কারণ নাই। কিন্তু উলটাভাবে অর্থাৎ উপুড় হইয়া শয়ন করা মাকরূহ।

নিদ্রার মধ্যে কোনরূপ ভীতিব্যঞ্জক স্বপ্ন দেখিলে কুফল হইতে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাহিবে এবং বাম কাতে ফিরিয়া তিনবার থুক ফেলিয়া পাঠ করিবেঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ خَيْرَ رُؤْيَاىَ وَاكْفِنِىْ شَرَّهَا *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মারযুক্বনী খাইরা রুইয়াইয়া ওয়াকফিনী শাররিহা।

যদি শরীর নাপাক না থাকে তবে উক্ত দোয়াটি পড়িয়া একবার করিয়া আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা নাস পাঠ করিবে। দৃষ্ট স্বপ্ন কেবল জ্ঞানী আলেম এবং উত্তম স্বপ্নবিশারদ লোকদের কাছে বর্ণনা করিবে। কোন অজ্ঞান এবং মূর্খ ব্যক্তির কাছে স্বপ্ন প্রকাশ করিবে না।

হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সত্য স্বপ্ন আল্লাহর তরফ হইতে আসে এবং বেহুদাহ স্বপ্নসমূহ আসে শয়তান হইতে। কাজেই এইরূপ বেহুদাহ খাব এবং কুস্বপ্ন দেখিলে বাম কাতে ফিরিয়া তিনবার থুক ফেলিবে এবং আল্লাহর দরবারে পানাহ প্রার্থনা করিবে। (এইরূপ আমলের দ্বারা কুস্বপ্ন দর্শন এবং কুস্বপ্নের ক্ষতিকর ফল হইতে নিরাপদ থাকা যায়)।

মুমিনের স্বপ্ন ঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ)এর এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, ফজরের নামায আদায় করিবার পর তিনি সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, আজ রাতে তোমরা কেহ কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ? তারপর তিনি পুনরায় বলিতেন, আমার পরে সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশই আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

হযরত উবাদা বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

গৃহ হইতে বাহির হইবার রীতি

গৃহ হইতে বাহির হইবার কালে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের দোয়াটি পাঠ করিবে। হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) যখনই গৃহ হইতে বাহিরে যাইতেন, আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিতেনঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন আদ্বিল্লা আও উদ্বাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আজলিমা আও উজলামা আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়্যা।"

অতঃপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করতঃ নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করিবেঃ

আল্লাহুম্মাজআলনী মিন আ'জামে ইবাদিকা ইনদাকা নাছীবান ফী কুল্লি খাইরিন তাক্বছীমুহু ফী হাযিহিল ইয়াওমি অ ফীমা বা'দাহু মান তাহদী বিহী অ রাহমাতান তানশুরুহা আও রিক্বান তাবসিতুহু আও খায়রান তাকশিফুহু আও যাম্বান তুগফিরুহু আও শিদ্দাতান তাদফাউহা আও ফিতনাতান তাদফাউহা আও মুআফাতান তামুন্নু বিহা বিরাহমাতিকা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

মসজিদ সংক্রান্ত আদব

মসজিদে প্রবেশ কালে ডাহিন পা প্রথম বাড়াইবে, তৎপর বাম পা বাড়াইবে। প্রবেশকালে এই দোয়া পড়িবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মাদিন অগফিরলী যুনূবী অফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

মসজিদে কোন লোক থাকিলে তাহাকে সালাম করিবে। আর লোক না থাকিলে বলিবে, 'আসসালামু আলাইনা মির রাব্বিনা আযযা অ জাল্লা।' অতঃপর দুই রাকয়াত নফল নামায পড়িয়া বসিয়া আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হইবে। দুনিয়াবী কোন কথা-বার্তা বলিবে না। একান্ত জরুরী কোন কথা বলিতে হইলে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিবে।

নামায আদায়ের পরে যখন মসজিদ হইতে বাহির হইবে তখন বাম পা আগে বাড়াইবে। বাহির হইবার নিম্নোক্ত সময়ে দোয়াটি পাঠ করিবেঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মাদিন অগফিরলী যুনূবী অফতাহলী আবওয়াবা ফাদ্বলিকা।

মসজিদে সর্বদা অজুর সহিত থাকা মুস্তাহাব। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অজুর সহিত (পবিত্র অবস্থায়) থাক।

গৃহে প্রবেশ এবং হালাল উপার্জন

গৃহে প্রবেশের পূর্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজার কড়া নাড়িবে এবং বলিবে 'আসসালামু আলাইনা মির রাব্বিনা।' কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, যখন মু'মিন বান্দা ঘর হইতে বাহির হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার ঘরের দরজায় দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যাহারা উক্ত বান্দার গৃহবাসীদের দেখা শুনা করে। পক্ষান্তরে শয়তান ঐ গৃহের দরজায় সত্তর জন শিষ্য শয়তানকে নিযুক্ত করে। বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া উক্ত মু'মিন বান্দা যখন ঘরের দরজার নিকটবর্তী হয়, তখন উক্ত ফেরেশতাদ্বয় বলে, হে মাবুদ! যদি এই বান্দা হালাল উপার্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া থাকে তবে তুমি তাহাকে তাউফীক ও বরকত এনায়েত কর। অতঃপর উক্ত বান্দা যখন অগ্রসর হইয়া দরজায় নাড়া দেয়, তখন ফেরেশতাদ্বয় তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, তারপর বান্দা যখন সালাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তানগুলি আত্মগোপন করে এবং ফেরেশতাদ্বয় বান্দার ডানে ও বামে দাঁড়াইয়া যায়। তারপর বান্দা যখন বিসমিল্লাহ বলিয়া দরজা খুলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ফেরেশতাদ্বয়ও ভিতরে প্রবেশ করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা গৃহের সকল কিছু সুশৃংখল এবং সুবিন্যস্ত করিয়া দেয়। তাহাতে উক্ত বান্দার অত্যন্ত আরাম এবং শান্তির সহিত অতিবাহিত হইতে থাকে। ফেরেশতাদ্বয় সর্বদা উহার মস্তকের উপর বিরাজ করিতে থাকে। উক্ত বান্দার সমস্ত খানা-পিনা হালাল এবং পবিত্র হইতে থাকে। তাহাছাড়া যত সময়ই বান্দা গৃহে অবস্থান করে, দিবারাত্রি সর্বসময়ই তাহার জান-মাল নিরাপদ থাকে।

আর যদি কোন মুসলমান উল্লিখিত রূপ আমল না করে, তবে ফেরেশতাদ্বয় তাহার গৃহ দরজা হইতে বিদায় হইয়া যায়। এবং গৃহ দরজায় অবস্থানরত শয়তানগুলি উক্ত বান্দার সহিত তাহার গৃহে প্রবেশ করে। উহারা গৃহের সমস্ত কিছু বান্দার নিকট অগুছান, অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছিত রূপ প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। বান্দা গৃহবাসীদের মুখে তাহার কাছে অপ্রীতিকর বাক্য শুনিতে থাকে যাহার কারণে তাহাদের সাথে তাহার কলহ-বিবাদ আরম্ভ হইয়া যায়। ঐ গৃহে তখন তাহার কলহ খানা-পিনা আরাম নিদ্রা সমস্ত কিছুই অশান্তিময় হইয়া উঠে।

হালাল কামাইঃ হালাল কামাই বা সদুপার্জন সম্পর্কে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা, পরিবার-পরিজনদের জন্য হালাল রুজি উপার্জন করা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি মেহেরবানী করা, এক কথায় দুনিয়াতে সৎ জীবন যাপন করাতেই অভ্যস্ত এবং রত, আল্লাহ তায়ালা রোজ কিয়ামতে তাহাকে এমন ভাবে উঠাইবেন যে, তাহার চেহারা চতুর্দশীর চন্দ্রের মত চমকাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যের তুলনায় নিজের মান-মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি এবং গর্ব ও অহঙ্কার জনিত কারণে সর্বদা ধন-দৌলতের অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, রোজ কিয়ামতে সে যখন আল্লাহর সম্মুখে হাজির হইবে, আল্লাহ তখন তাহার উপর নাখোশ এবং বেজার থাকিবেন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের কাছে সুয়াল করিয়া বেড়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী করিয়া রাখেন, আর যে ব্যক্তি অন্যের দরজায় ধর্ণা না দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী করেন না বরং তাহাকে অমুখাপেক্ষী করিয়া দেন। তোমরা যদি জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া উহার বদলে সামান্য খেজুরও সংগ্রহ করিয়া লও, তবে তাহাও অন্যের কাছে হাত বাড়াইবার চাইতে অনেক উত্তম। চাই তাহারা কিছু দেউক বা না দেউক।

এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য সুয়ালের (ভিক্ষা বৃত্তির) একটি দরজা খোলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য অভাবানটন এবং পরমুখাপেক্ষিতার সত্তরটি দরজা খুলিয়া দেন। আর এক রেওয়ায়েতে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, যে পরিবার-পরিজনওয়ালা ব্যক্তি পরিজনদের জন্য (হালাল) রুজী উপার্জন করে আল্লাহ তাহাকে খুবই ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি একেবারেই নিষ্কর্মা—দ্বীন দুনিয়ার কোন কাজই করে না, আল্লাহ তাহাকে মোটেই পছন্দ করেন না।

এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! আপনি আমার হাতকে আমার জন্য হালাল উপার্জনক্ষম করিয়া দিন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার হাতে লৌহকে নরম করিয়া দিলেন। উহা নরম মোম এবং আটার খামিরের ন্যায় হইয়া গেল। হযরত দাউদ (আঃ) উক্ত লোহা দ্বারা হাতিয়ার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বানাইয়া বিক্রয় করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য রুজী উপার্জন করিতেন।

হযরত দাউদ (আঃ)এর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! আমি আপনার দরবারে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আপনি আমাকে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ বানাইয়া দিন। আপনি আমার দোয়া কবুল করিয়া আমাকে তদ্রূপ বাদশাহ-ই বানাইয়া দিয়াছেন। ইহার পরও যদি আমি আপনার শোকর পুরাপুরি ভাবে আদায় করিতে না পারি তবে আপনি আমাকে এমন লোকের কথা বলিয়া দিন, যে আপনার শোকর আমার চাইতে বেশী আদায় করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে জানাইয়া দিলেন, হে সোলায়মান! আমার এক বান্দা নিজের হাতের খাটুনির দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালায় এবং আমার ইবাদাতেও লাগিয়া থাকে, সেই বান্দাই আমার শোকর তোমার চাইতে অধিক আদায় করে একথা শুনিয়া হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন, হে মাবুদ! তাহা হইলে আপনি আমাকেও নিজের হাতের খাটুনির দ্বারা রুজী উপার্জন শিক্ষা দান করুন। (তাঁহার দোয়া মঞ্জুর হইল) হযরত জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে খেজুর পাতার দ্বারা টুকরি তৈরী শিখাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ দুনিয়াতে সর্বপ্রথম জাম্বিল (টুকরি) নির্মাণকারী ব্যক্তি হইলেন হযরত সোলায়মান (আঃ)।

চারি ধরনের লোক দ্বারা দীন-দুনিয়া ঠিক থাকে

কোন এ জ্ঞানী বলেন যে, চারি শ্রেণীর লোক দ্বারাই দীন-দুনিয়া ঠিক থাকে। উহারা হইল, (১) আলেম (২) হাকিম (৩) মুজাহিদ (৪) রুজী উপার্জনে কোন পেশা অবলম্বনকারী।

১। আলেমগণ পয়গম্বরদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী, তাহারা পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শন করে। মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা, আমল ও চরিত্র শিক্ষা দেয়।

২। হাকীম বা আমীর-উমারা, শাসক-বিচারক মানুষের জন্য রক্ষক স্বরূপ. কেননা তাহারা মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

৩। মুজাহিদগণ আল্লাহ্ তায়ালার সৈন্য স্বরূপ। তাহারাই দুনিয়াতে অধর্ম ও নাস্তিকতা বিনাশ করিয়া আল্লাহর দ্বীন মানুষের মাঝে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। পেশা অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই দুনিয়াবী জীবনে মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাকারী। কেহ কৃষিকার্য, কেহ ব্যবসা-বাণিজ্য কেহ বা চাকুরী-বাকরীর মাধ্যমে এই কাজ করিয়া থাকে।

পেশা-জীবিদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের স্বভাবে যদি তিনটি জিনিস হইতে পরহেজ না থাকে তবে তাহারা ইহ-পরকালে পরমুখাপেক্ষী হইবে। জিনিস তিনটি এইঃ (১) মিথ্যা কথা হইতে বিরত থাকা (২) অনর্থক কথা হইতে নিবৃত্ত থাকা (৩) মিথ্যা কসম করা হইতে বাঁচিয়া থাকা। (ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই তিনটি অভ্যাস না থাকিলে লোকগণ তাহাদের দ্বারা প্রতারিত হয় এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জনে হারামের সংমিশ্রণ ঘটে)

বর্ণিত আছে, বান্দা হারাম উপার্জনের খানা খাইতে বসিয়া শুরুতে যখন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তখন শয়তান বলে, যখন তুমি ইহা কামাই করিয়াছিলে, তখন তো আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলে, সুতরাং এখন আমি দূরে যাইব না বরং তোমার সহিত খানায় শরীক হইব। যেমন আল্লাহ বলেনঃ অ শারেকহুম ফিল আমওয়ালে অল আওলাদ' "অর্থাৎ আল্লাহ্ শয়তানকে বলেন—তুমি তাহাদের মালে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও। এখানে মালের অর্থ হারাম মাল এবং সন্তান-সন্ততির অর্থ ব্যভিচার যুক্তি সন্তান-সন্ততি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জিত মালদ্বারা ছদকা-খয়রাত করে, তাহার ছওয়াব হাসিলের বদলে বরং সে আযাবকে ডাকিয়া লয়। আর তাহার হারাম মাল হইতে সে যাহা খরচ করে তাহাতে কোন বরকত অর্জিত হয় না। হারাম কামাই হইতে কেবল সেই ব্যক্তিই বাঁচিতে পারে যে সদা-সর্বদা দোজখের কথা চিন্তা করে। মানুষের উচিত যেন সে হারাম উপার্জন হইতে

নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে, পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাইয়া রাখে। আরও উচিত তাহার হারাম-খোরের নিকট না যাওয়া, না বসা, না তাহাদের খানা খাওয়া, না তাহাকে হারাম উপার্জনের পরামর্শ দেওয়া, পথ বাতাইয়া দেওয়া। কারণ ইহাতেও হারাম উপার্জনকারীর সমান হইয়া যাইবে। (স্মরণ রাখিবে) পরহেজগারীই দ্বীনের আসল বস্তু ইবাদাতের দৃঢ় ভিত্তি এবং পারলৌকিক সাফল্যের মূল উপাদান।

নির্জনতা ও মৌনাবলম্বন

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন (গোশা নাশিনী) নির্জনতা অবলম্বন কর। নির্জনে একাকী বসাও ইবাদাত বৈকি! তিনি বলেন, মু'মিন সেই ব্যক্তি, যে নিজের ঘরে অবস্থান করে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে ঘরে অবস্থান করিয়া নিজেকে মানুষের অপকার করা হইতে বাঁচাইয়া রাখে। (এবং নিজেও মানুষের অপকার হইতে বাঁচিয়া থাকে)।

বাশার হাফী (রহঃ) ছলফে ছালেহীনদের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি বলেন, এখন নীরবতা ও নির্জনতা অবলম্বনের যুগ। যখন হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সকলের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে একাকী থাকিতে লাগিলেন মানুষের সাথে উঠা-বসা পরিত্যাগ করিলেন তখন তাহাকে লোকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি হাট-বাজারে গমন এবং সভা-সমিতিতে যাওয়া এভাবে ছাড়িয়া দিলেন কেন? আর এভাবে একাকী থাকিতেই বা শুরু করিলেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি হাট-বাজারকে বেহুদা স্থান এবং সভা-সমিতিগুলিকে খেল-তামাসার স্থান ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। এইজন্য আমি নির্জনতাকেই নিরাপদ মনে করিতেছি।

ওয়াহাব ইবনুল ওয়ারদ (রহঃ) বলেন, আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত মানুষের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এমন একটি লোকও মিলিল না, যে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়াছে, আমার দোষ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, রাগের সময় আমাকে ক্ষমা করিয়াছে। আমি এমন কোন লোকও দেখিলাম না যাহার ভিতরে লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তির তাড়না নাই।

শা'বী (রাঃ) বলেন, আমি এতদিন মানুষের মধ্যে দ্বীনের প্রভাব দেখিয়াছি। তারপর দ্বীন খতম হইয়া ভদ্রতা ও শালীনতার প্রভাব দেখিয়াছি। তারপর তাহা খতম হইয়া লজ্জা ও শরমের প্রভাব দেখিয়াছি। তারপর তাহাও খতম হইয়া গিয়াছে। এখন মানুষের মধ্যে কেবল কিছুটা ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা বাকী আছে। আমার ধারণা, মানুষের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও কঠিন অবস্থা আসিয়াছে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, ইবাদাতের দশটি অংশ আছে। নয়টি অংশ নীরবতার ভিতরে এবং একটি অংশ নির্জনতার ভিতরে। নীরব থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নফসকে বশে আনিতে পারি নাই। তখন আমি নির্জনতা অবলম্বনের দিকে ঝুঁকিলাম। তখন আমার ইবাদাতের সেই নয়টি অংশও হাসিল হইল। ঐ ব্যক্তি আরও বলেন যে, কবর অপেক্ষা বড় উপদেশ দাতা আর কেহই নাই। কিতাব অপেক্ষা হৃদয়ে শান্তিদায়ক অন্য কিছুই নাই এবং নিরাপত্তা ও শান্তি দানকারী নির্জনতা ছাড়া অন্য কিছুই নাই।

বাশার বিন হারেছ বলেন, এলেম অর্জন দুনিয়া হইতে পালাইবার জন্য করা চাই, দুনিয়া লাভের জন্য নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর (দঃ) এর কাছে আরজ করা হইল, কাহার সঙ্গ লাভ করা উত্তম? হুযুর (দঃ) জবাব দিলেন যাহাকে দেখিলে তোমার আল্লাহকে স্মরণ হয়, যাহার বিদ্যা-বুদ্ধি তোমাকে আখেরাত স্মরণ করায় এবং যাহার সহিত কথোপকথন তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি বাড়াইয়া দেয়।

হযরত ঈসা (আঃ) উপদেশ দানকালে বলিলেন, হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহর ভালবাসা চাহিলে গুনাহগার ব্যক্তিকে ঘৃণা কর আল্লাহর নৈকট্য চাহিলে আল্লাহর অবাধ্য বান্দা হইতে দূরে থাক। জানিবে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁহার শত্রুদের অসন্তুষ্টির মধ্যে বিদ্যমান।

মানুষের সাথে একান্তই যদি উঠা-বসা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে আলেমদের সাহচর্যে থাক, কেননা হুযুর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের সংসর্গ ইবাদাত তুল্য। হুযুর (দঃ) আরও বলেন যে, মানুষের উচিত তাহার মনকে চিন্তায়, দেহকে ধৈর্যে এবং চক্ষুকে ক্রন্দনে নিয়োজিত রাখা। আগামী দিনের রুজীর চিন্তা করিও না। কারণ ইহা গুনাহর কার্য, যাহা আমলনামায় লিখিত হয়। মসজিদকে আঁকড়াইয়া থাকিবে এবং মসজিদে যাওয়াকে লাযেম করিয়া লইবে। আল্লাহর ঘর আবাদকারীই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা। মসজিদে অধিক আসা-যাওয়াকারীর কখনও হয়ত এমন কোন মুমিন বান্দার সহিত সাক্ষাত মিলিবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে বে-গুনাহ হইয়া গিয়াছে। কখনও

তাহার উপর আল্লাহর খাস রহমত নাযিল হইবে, সে যাহার জন্য আকাংখী হইয়া আছে। বা হয়ত হেদায়াত প্রাপ্তি কিংবা ধ্বংস হইতে মুক্তি মূলক কোন কথা তাহার নছীব হইবে। অপূর্ব ও অত্যন্ত মূল্যবান কোন এলেম সে হাসিল করিয়া ফেলিবে এবং আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার আযাব হইতে ভয় সৃষ্টির কারণে সে সমস্ত গুনাহর কার্য পরিত্যাগ করিবে। বাসকারীদের জন্য ইহা কোনরূপেই জায়েয নহে যে, তাহারা নির্জনে থাকার কারণে জামাত, ঈদের নামাজে শরীক হইবে না। জুমআর জামাত ধারাবাহিক ভাবে তরক করিলে সে নয়। হুযুর (দঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে (পর পর) তিন জুমআ তরক করে, আল্লাহ দিলে মহর মারিয়া দেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) বিদায়ী হজ্জের এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জানিয়া রাখ, এই শহরে এই বৎসরের এই মাসে আল্লাহ রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য জুমআ ফরজ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি চাই জালিম কিংবা ন্যায়পরায়ন হওয়া সত্ত্বেও জুমআর নামাজকে তুচ্ছ করে বা জুমআর ফরজ অস্বীকার করে বা আদায় না করে তবে আল্লাহ তাহার পেরেশানীকে দূর করিবেন না, তাহার -কর্ম পুরা করিবেন না। শুনিয়া রাখ, তাহার নামায কবুল হইবে না, যাকাত আদায় হইবে না, কবুল হইবে না, রোযা কবুল হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাওবা করে। আল্লাহ কারীর তাওবা কবুল করেন।

র নামায তরককারীর দ্বারা প্রকাশ্যেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেনঃ 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিচ্ছালাতি মিই ইয়াওমিল জুমুআতি আও ইলা যিকরিল্লাহি।'

অর্থঃ হে ঈমানদার বান্দাগণ! যখন তোমাদেরকে জুমআর নামাযের জন্য আহ্বান করা হইবে, তখন তোমরা আল্লাহর যিকির করার জন্য দ্রুত ধাবিত হও।

নির্জন বাস প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। মানুষের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া বা তাহাদেরকে অনর্থক দোষী মনে করিয়া দল ত্যাগ করা উচিত নহে। মানুষের সংশ্রব ত্যাগের মূল মনোভাব ও শ্য থাকিবে এই যে, একাধিক লোক এক স্থানে থাকিলেই একজন আর একজনের সহিত মিথ্যা বলিবার সুযোগ পাইবে। এবং অপরজন তাহা শ্রবণ করিবে। ব্যভিচারের মত জঘন্য কাজও দুইজন লোক একসাথে থাকিলে সম্ভব হইবে। হত্যা কার্যও সংঘটিত হইবে। দুইজন একস্থানে কিলে একজন হইবে হত্যাকারী বা ঘাতক, আর একজন হইবে নিহত। এইভাবে লুণ্ঠন, তাই-রাহাজানি ইত্যাদি অপকাজগুলিও একাধিক লোক মিলিয়া মিশিয়া থাকিলেই সংঘটিত হয়। একাকী অবস্থান করিলে এই ধরনের কাজগুলি হইতে নিরাপদ থাকে। অবশ্য যেখানে দ্বীনী মেলায় একজন অপর জনের সংস্পর্শে থাকিলে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হইবে সেখানে একাকী অবস্থান বা নির্জন বাস মোনাসেব নয়।

সফরের আদব

সফরের নিয়ত করিলে কিংবা হজ্জ্ব জিহাদ ইত্যাদির জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনের লক্ষ্যে প্রস্তুত হইলে সর্বপ্রথম দুই রাকয়াত নফল নামায আদায় করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাল্লিগ বালাগান মাবলাগা খাইরিন অ মাগফিরাতিম মিনকা অ রিদ্বওয়ানাম ইয়াদিকাল খাইরু অ আনতা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা আনতাছ ছাহিবু ফিস সাফারি অল খালীফাতু ফিল আহলি অল মালি অল অলাদি আল্লাহুম্মা হাওয়্যিন আলাইনাস সাফারা অ ত্বওয়ি আন্নাল বু'দু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযবিকা মিন অ'ছায়িস সাফারি অ কাআবাতিল মুনক্বালাবি সূয়িল মানজারি ফিল আহলি অল অলাদি অলমালি।

বৃহস্পতিবার কিংবা সোমবার দিন প্রত্যুষে সফরে রওয়ানা করিবে। বাহনে আরোহণ করতঃ ঠিকমত বসিয়া পাঠ করিবেঃ

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্যারা লানা হাযা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন অ ইন্না ইলা রাব্বিনাল মুনক্বালিবূন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামায পড়িবে এবং নিম্নের এই দোয়া পাঠ করিবে।

উচ্চারণঃ আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এইরূপই করিতেন। সফরের কাফেলায় যদি কো আমীরে সফর নির্দ্ধারিত না থাকে, তবে কোন অনভিজ্ঞ লোক উহার আমীর কিংবা কাফে পরিচালক না হওয়া চাই। এই ধরনের লোকেরা যেন পথিমধ্যে কোন স্থানে যাত্রা বিরতির পরাম না দেয়। যদি সফরে পথ-ঘাট জানা অন্য কোন ব্যক্তি সঙ্গে থাকে, তবে পথ চলা ও যাত্রা বির সম্পর্কে তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিবে। সফরে বেশী কথা না বলিয়া নীরবতা পালন করিবে সঙ্গীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে ও যথাসাধ্য তাহাদের উপকার করিবে। কোন ভয়-ভীতি স্থানে কখনও যাত্রা বিরতি করিবে না এবং অপছন্দনীয় পথে চলিবে না। যে সকল পথে সর্প-বি ব্যাঘ্র, ভালুকের ভয় আছে, সে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিবে না। প্রবৃত্তির কামনা পুরা কর হইতে বিরত থাকিবে এবং পথে কোন ভীতি সঙ্কুল স্থানে গিয়া রাত্রি হইয়া গেলে সেখানে রাত্রি যাপ না করিয়া ঐস্থান হইতে কিছু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বা পিছনে হটিয়া আসিয়া রাত্রিযাপন করিবে।

সফরে যাত্রার পূর্বে সর্বাপেক্ষা যাহা জরুরী কাজ, তাহা হইল, যাহাদের সাথে সম্পর্ক নাই, তাহাদে সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং সদ্ভাব স্থাপন করিবে। তাহাছাড়া পিতা-মাতা এবং অন্যান্য মুরব্বী গার্জিয়ানে নিকট হইতে অনুমতি লইয়া লইবে। সন্তান-সন্ততি সম্ভব হইলে সাথে নিয়া যাইবে নচেৎ এমন কোন নির্ভরযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষক নিযুক্ত করিয়া যাইবে, যে প্রবাসী ব্যক্তির অনুপস্থিত কালে তাহাদের সকল বিষয় দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করিবে।

সফরে সাথী বন্ধুদের সাথে সর্বরকম সদাচরণ প্রদর্শন করিবে। যেমন অসুস্থতা বা দুর্বলতা বশ কেহ পথের কোথাও যাত্রা বিরতি করিলে তাহার সহিত যাত্রা বিরতি করিবে। তাহাকে ফেলি চলিয়া যাইবে না। সাথী পিপাসার্ত হইলে তাহাকে পানি পান করাইবে। সাথী কড়া ব্যবহা করিলেও তাহার সহিত নরম ব্যবহার করিবে। কোন কারণে সাথী অসন্তুষ্ট হইলে তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া খুশী করিবে। মাল-সামান রাখিয়া সাথী ঘুমাইয়া পড়িলে উহা যাহাতে চুরি ন হয় বা খোয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি সাথীর নিকট পাথেয়ের অভাব দেখা দেয়, তবে নিজের পাথেয় হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিবে, সাথী কোন ব্যাপারে সঙ্কটাপন্ন বা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে সুপরামর্শ দিবে। তাহার বিপদ বা সঙ্কট দূরীকরণার্থে মনে-প্রাণে চেষ্টা করিবে।

সফরে ভীতিসঙ্কুল স্থানে পড়িবার দোয়াঃ আউযুবিল্লাহি অ বিকালিমাতি ত্তাম্মাতিল্লাতী লা ইউজাওি হুন্না বাররুন অলা ফাজিরুন অ বি আসমায়িল্লাহিল হুসনা কুল্লিহা মা আলিমতু মিনহা অ মাল আ'লাম মিন শাররি মা খালাক্বা অ যারাআ অ বারায়া অ মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামা অমা ইয়া'রুজু ফীহা অ মিন শাররি মা যারাআ ফিল আরদ্বি অমিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিন অমিন ফিতনাতিল্লাইলি অন্নাহারি অ মিন তারিক্বিল্লাইলি অন্নাহারি ইল্লা ত্বারিক্বান ইয়াত্বরুক্ব মিন বিখাইরিন ইয়া আরহামার রাহিমীন। অমিন কুল্লি দাব্বাতিন রাব্বী আখিযুম বিনাছিয়াতিহা ইন্ন রাব্বী আ'লা ছিরাত্বিম মুসতাক্বীম।

সওয়ারীর গলায় ঘন্টা বাঁধাঃ সওয়ারীর (উষ্ট্রের) গলায় ঘন্টা বাঁধা চাইনা। হুযুরে পাক (দঃ) এরশা করিয়াছেন, প্রত্যেক ঘন্টার সাথে শয়তান থাকে। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, ঐ সকল মুসাফিরদের সাথে ফেরেশতা থাকে না, যাহারা উটের গলায় ঘন্টা ব্যবহার করে। সফরে নিজে সঙ্গে লাঠি রাখা মুস্তাহাব। লাঠি ছাড়া কখনই সফর করিতে নাই। মাইমুন ইবনে মাহরান (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে শুনিয়া বলেন যে, লাঠি হাতে রাখা নবীদের সুন্নত এবং মুসলমানদের নীতি।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, লাঠির মধ্যে ছয়টি সুন্নত নিহিত। যথাঃ (১) লাঠি হাতে রাখ নবীদের সুন্নত (২) নেককার লোকদের অভ্যাস (৩) লাঠি অনিষ্টকারী জীব-জানোয়ার হইতে নিরাপত্তার হাতিহার (৪) দুর্বল লোকদের ভরসা (৫) মুনাফেকদের শায়েস্তাকারী এবং (৬) পুণ বর্দ্ধনকারী। বলা হইয়া থাকে যে, যে-মু'মিনের কাছে লাঠি থাকে, তাহার নিকট হইতে শয়তান দূরে পালায়। মুনাফেক এবং বদকারগণ লাঠিধারীকে ভয় পাইয়া থাকে। নামাযের সময় উহা নামাযী কিবলা অর্থাৎ সুতরার কাজ করে। শরীরে দুর্বলতা দেখা দিলে লাঠির দ্বারা সেই দুর্বল শরীরে ফায়েদা হাসিল হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতে লাঠি প্রসঙ্গে হযরত মূসার (আঃ) বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন; যথাঃ

আতাওয়াক্কাউ আলাইহা অ আহুশশু বিহা আলা গানামী অলিয়া ফীহা মা আরিবু উখরা।' অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি আমার লাঠির উপর ভর দিয়া চলি, নিজের বকরীদের জন্য ইহার দ্বারা বৃক্ষপত্র সকল পাড়িয়া দেই এবং ইহা ছাড়া ইহার দ্বারা অন্যান্য ফায়েদা-সমূহও হাসিল করিয়া থাকি।

জীব-জন্তু বা গোলাম নফরদের খাশী করা

কোন জীব জন্তু বা চাকর গোলামকে খাশী করিয়া দেওয়া জায়েয নহে। হারব এবং আবূ তালিবের রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ (রহঃ) এইরূপ উক্তি করেন। এইভাবে কোন জন্তুর চেহারায় কোনরূপ দাগ অঙ্কন করাও নাজায়েয। আবূ তালিব ইমাম আহমদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন জন্তু বা চতুষ্পদ জীবকে খাশী করিও না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, হুযুর পাক (দঃ) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জন্তুর কর্ণে দাগ অঙ্কন করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লিখিত উক্তির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চেহারা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ যেমন রান, কান, গরদান প্রভৃতি স্থানে দাগ অঙ্কন করা জায়েয আছে।

মসজিদের আদব

মসজিদের ভিতরে কোনরূপ অপবিত্র ও অপকর্ম করা একেবারেই নাজায়েয। ইহাছাড়া অন্যান্য মুবাহ্ কাজ যথা কাপড় সেলাই করা, কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা ও এই জাতীয় অন্যান্য কাজ করা মাকরূহ। তাহা ছাড়া আল্লাহর যিকির ব্যতীত দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাও মাকরূহ। মসজিদের ভিতরে থু থু নিক্ষেপ করা মাকরূহ। থু থু নিক্ষেপ করিয়া বসিলে প্রতিকার স্বরূপ উহার উপরে মৃত্তিকা দ্বারা উহা ঢাকিয়া ফেলিবে। মসজিদে সীমাতিরিক্ত কারুকার্য এবং সাজ-সজ্জা করাও মাকরূহ। বিদেশী মুসাফির এবং এ'তেকাফকারী ছাড়া অন্য কাহারও মসজিদে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ। মসজিদে দুনিয়াবী বিষয় বস্তু সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি না করা চাই। অবশ্য যে সকল কবিতা মানুষকে ধর্মভীরু হইতে সাহায্য করে তাহা পড়িতে কোন দোষ নাই। তবে তদপেক্ষা উত্তম কার্য হইল মসজিদে আল্লাহর যিকির করা ও ক্বোরআন তেলাওয়াত করা। কেননা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্ পাকের ইবাদাত এবং আল্লাহর যিকির করা। মসজিদের মৃত্তিকা নিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দেওয়া বা উহা দ্বারা অন্য কোন কাজ করা উচিত নহে, হাঁ, তবে মসজিদ ঝাড়িয়া মুছিয়া উহার ভিতরকার ধূলা বালি ও ময়লা ইত্যাদি বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া জায়েয বরং বিশেষ জরুরী। ইহা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ মসজিদ ধূলা-বালি ও ময়লা হইতে পরিষ্কার রাখা বেহেশতী হুরের মোহর স্বরূপ। নাবালেগ বালক-বালিকা এবং পাগল ব্যক্তিকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া চাই। জুনুব ব্যক্তি ও হায়েজ-নেফাসওয়ালী মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয। বিশেষ কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করিতে হইলে উহারা অজু করিয়া লইবে। উহার সহিত তাইয়াম্মুম করিয়া লওয়া আরও ভাল।

কবিতা আবৃত্তি ও ক্বোরআন তেলাওয়াত

কবিতা দুই ধরনের। এক ধরনের যাহা মুবাহ বা সিদ্ধ। আর এক ধরনের, যাহা নাজায়েয বা নিষিদ্ধ। যে সকল কবিতায় কোনরূপ বাজে বা বেহুদা বিষয় থাকে না তাহাই মুবাহ আর যে সকল কবিতায় বাজে বা বেহুদা বিষয়সমূহ থাকে সেগুলি পাঠ করা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয।

ক্বোরআনে পাকের তাজীম ও তারতীলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও যদি উহা গান বা সংগীতের ঢংয়ে পাঠ করা হয়, তবে তাহা মাকরূহ। মাকরূহ হইবার কারণ হইল, সংগীতের ঢংয়ে পড়িতে গেলে কালামে ক্বোরআনের মূল বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। যেমন শব্দের মদ, হামযাহ্ ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়। যে বর্ণের উচ্চারণটি লম্বা করিতে হয়, তাহা খাট এবং যাহার উচ্চারণ খাট করিতে হয়, তাহা লম্বা হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে একটি বর্ণ অন্য বর্ণের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ইহা ছাড়া গানের সুরে পাঠ করা মাকরূহ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, ক্বোরআন পড়ার মূল লক্ষ্য উহা দ্বারা মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হইবে, উপদেশমূলক বাণীগুলি শুনিয়া ও পড়িয়া পাঠক ও শ্রোতা আল্লাহর নাফরমানী হইতে ফিরিয়া থাকিবে। তাহাছাড়া ক্বোরআনী দলীল, কিচ্ছা-কাহিনী এবং দৃষ্টান্তসমূহ শুনিয়া উপদেশ এবং ফায়েদা লাভ করিবে। আল্লাহ্ পাকের ক্বোরআনে প্রদত্ত ওয়াদা-সমূহ

শুনিয়া মানুষ আশান্বিত হইবে। এই যাবতীয় ফায়েদাহসমূহ কালামে ক্বোরআনীকে গানের সুরে পড়িলে হাসিল হইবে না। আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেন, মু'মিন সেই ব্যক্তি, যাহার দিল আল্লাহর কালাম শুনিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়, ঈমানে দৃঢ়তা আসে, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু যাহারা একাগ্রতা ও মনোযোগ সহকারে আল্লাহ্র নাম শুনে তাহাদের চোখ অশ্রুসজল হয়। অথচ আল্লাহর কালাম যদি বিলাসী গানের সুরে পাঠ করা হয়, তবে তাহার ভিতরে উল্লিখিত অবস্থাসমূহের একটিরও সন্ধান মিলে না। আর এই কারণেই গানের সুরে ক্বোরআন শরীফ পড়া মাকরূহ।

ক্বোরআন সম্পর্কিত সতর্কতা ঃ বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবার কালে ক্বোরআন মজীদ সঙ্গে রাখিবে না। কেননা কোনক্রমে উহা কাফির মুশরেকদের হাতে পৌছিয়া গেলে তাহারা উহার বে-হুরমতী করিবে। কোন অপরিচিতা যুবতী রমণী ক্বোরআন পড়িতে থাকিলে সেদিকে কর্ণ নিয়োগ করিবে না।

প্রবৃত্তি চাঙ্গাকারী কবিতা ঃ এই শ্রেণীর আশআর বা কবিতা সম্পর্কে কেহ যদি বলে যে, আমি ঐগুলি শ্রবণ করিয়া উহার কদর্থ গ্রহণ না করিয়া উহার ভাল অর্থ গ্রহণ করি যাহাতে আল্লাহর দরবারে গুনাহগার হইতে না হয়, তাহা হইলে ঐ ধরনের কবিতা মাকরূহ হইবে কেন? তাহার এই কথা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজের ভিতরে কোনরূপ তারতম্য করে নাই (যাহা হারাম, তাহা সর্বাবস্থায়ই হারাম বৈকি)। যদি হারাম কার্য কাহারও জন্য জায়েয হইত, তবে নবীদের জন্য জায়েয হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। যদি কেহ এই কথা বলে যে, আমার মন খুবই সংযত। সুতরাং কোন যুবতী গায়িকার সঙ্গীত শুনিয়া আমার মনে কোনরূপ ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না। ইহাতেই তাহার জন্য কোন বাইজীর গান শুনা মুবাহ হইবে না। বা কোন লোক দাবী করে যে, শরাব পান করিলে তাহার নেশা হয় না, তবে শরাব পান করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। এইভাবে যদি কেহ বলে যে, আমি সুশ্রী বালক এবং রূপসী যুবতীদেরকে নিবিড় ভাবে এই জন্য দেখি যে, তাহাদের সৌন্দর্য দেখিয়া আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে স্বীয় আকীদাকে বদ্ধমূল করি। তবে ইহাতেই তাহার জন্য ঐরূপ কাজ করা জায়েয হইবে না। বরং ঐ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার জন্য ওয়াজিব বৈ কি। স্মরণীয় যে, শিক্ষা লাভ করা ও উপদেশ হাসিল করা এমন বহু কাজ হইতেই সম্ভব যাহা হারাম নয়। আসলে ঐরূপ পথ ও ঐরূপ মত শুধু তাহাদেরই যাহারা হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ পথের অনুসারী এবং হারামকেই ভালবাসে। কাজেই তাহাদের ঐসব পথ ও মত কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। আল্লাহ্ তায়ালা পাক ক্বোরআনে বলেনঃ আপনি মুমিনগণকে বলুন, তাহারা নিজেদের চক্ষুগুলিকে মুদিয়া রাখুক এবং লজ্জাস্থানসমূহ হেফাজত করুক। ইহাই তাহাদের জন্য পবিত্রতম কার্য। ইহার পরেও যাহারা গায়রে মাহরামকে দেখা শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক কাজ বলে, তাহারা তো ক্বোরআনের বাণীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে।

যে সকল জীব মারা জায়েয এবং যে সকল জীব মারা নাজায়েয

সাপ মারা ঃ গৃহাভ্যন্তরে সর্প দেখা গেলে তিনবার তাহাকে সাবধান করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার পরেও তাহাকে ঘরে দেখা গেলে মারিয়া ফেলিবে। বনে-জঙ্গলে সাপ দেখা গেলে সাবধান করা ব্যতিরেকেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। যদি এইরূপ কোন সাপ দেখা যায়, যাহার লেজ খুবই খাট অর্থাৎ কাটিয়া গিয়াছে বা খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় বা কোন সাপের পৃষ্ঠ দেশে যদি দুইটি কাল রেখা দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সাবধান করা ছাড়াই মারিয়া ফেলা চাই। সাবধান করার অর্থ হইল, সাপকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা যে, তুমি প্রাণ লইয়া পালাইয়া যাও, আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না। হাদীস শরীফে আছে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট গৃহে বাসকারী সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি জবাবে বলিলেন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে সর্প দেখিতে পাও তবে তোমরা তাহাকে বল, আমি তোমাকে সেই কথা কসম দিতেছি, হযরত নূহ (আঃ) তোমার নিকট হইতে যে কথার কসম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে সেই কথার কসম দিতেছি, হযরত সেলায়মান (আঃ) তোমার নিকট হইতে যাহার কসম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুমি এখান

হইতে চলিয়া যাও, আমাকে কষ্ট দিতে যাইও না। ইহার পরও যদি সে চলিয়া না যায়, তবে তাহাকে মারিয়া ফেল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন সাপই সামনে পড়ুক, তাহাকে মারিয়া ফেল। যে ব্যক্তি সাপ মারিতে ভয় পায় যে উহা তাহার শত্রু হইয়া যাইবে, তবে এইরূপ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সর্প মারিয়া ফেল। দুই রেখা ওয়ালা এবং লেজ কাটা সাপ উভয়ই অন্ধ করিয়া ফেলে এবং গর্ভপাত পর্যন্ত ঘটাইয়া দেয়। বর্ণনাকারী আরও বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) যে কোন প্রকার সর্পই দেখিতেন, তাহাকে মারিয়া ফেলিতেন। যেমন নাকি হযরত আবূ লুবাবা (রাঃ) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছিলেন যে, তিনি একটি সাপের গর্তের কাছে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাহাকে তিনি বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, হুযুরে পাক (দঃ) গৃহে বসবাসকারী সর্প মারিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তাহার সপক্ষে দলীল স্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, আবূ সায়েব (রহঃ) বলেন যে, একবার আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সমীপে গমন করিলাম। তথায় আমি একটি তখতীর উপরে উপবিষ্ট হইলাম। উহার নীচে কি একটি বস্তু নড়া-চড়া করিতেছে মনে হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম একটি সর্প নড়া-চড়া করিতেছে। তখনি আমি দাঁড়াইয়া গেলাম। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, একটি সাপ দেখা যাইতেছে। তিনি বলিলেন, এখন তুমি কি করিতে চাহিতেছ? আমি বলিলাম, আমি উহাকে মারিতে চাহিতেছি। তখন হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) স্বীয় গৃহের সম্মুখস্থ কোঠার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই কোঠায় আমার চাচাত ভাই বাস করিতেন। তিনি কেবল নূতন বিবাহ করিয়াছিলেন। জঙ্গে আহযাবের দিন তিনি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট হইতে গৃহে আগমনের অনুমতি চাহিলেন। হুযূর (দঃ)ও তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন এবং বলিলেন, তোমার হাতিয়ার সঙ্গে নিয়া যাও। তিনি গৃহে ফিরিয়া তাঁহার বিবিকে গৃহ দরজায় দাঁড়ানো দেখিলেন। ইহাতে তিনি বিবির দিকে নেজা (অস্ত্র বিশেষ) তাক করিলেন, (তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবেন) তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, হঠাৎ অঘটন ঘটাইও না। গৃহে ঢুকিয়া অবস্থা দেখিয়া লও (যে, কি কারণে আমি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি)। তখন তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় একটি ভয়ঙ্কর সাপ। সাথে সাথে তিনি হস্তস্থিত নেজা দ্বারা সাপটিকে বিদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিজেও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মরিয়া গেলেন। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, সাপটি ও আমার চাচাত ভাই ইহাদের মধ্যে কে আগে মারা গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার চাচাত ভাইয়ের পরিবার-পরিজন এবং বংশীয় অন্যান্য লোকজন আসিয়া হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের লোকটিকে আমাদের মাঝে ফিরাইয়া দেন। হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, তোমরা সর্প হত্যাকারী লোকটির মার্জনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, মদীনার একদল জিন দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা তোমাদের সাথে সর্পাকৃতিতে সাক্ষাত করে। কাজেই যখন তোমরা কোন সর্প দেখিবে, তখন তোমরা তিনবার তাহাকে সাবধান করিবে। ইহার পরেও যদি সে তোমাদের সম্মুখে আসে, তখন তাহাকে মারিয়া ফেল। কেননা সে শয়তান ছাড়া আর কিছু নহে।

গিরগিট (টিকটিকি বা রক্ত চোষা) হত্যা করা ঃ টিকটিকি মারিয়া ফেলাও জায়েয। আমের ইবনে সাঈদ (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে নকল করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) টিকটিকি মারার নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যাকারীর জন্য সত্তরটি নেকী রহিয়াছে।

পিপীলিকা হত্যা করা ঃ পিপীলিকা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ ক্ষতি না করে, তাহাকে হত্যা করা মাকরূহ। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একবার একটি পিপীলিকা জনৈক পয়গম্বরের দেহে দংশন করিল। পয়গাম্বর সাহেব উক্ত পিপীলিকার আস্তানাসহ জ্বালাইয়া দিবার নির্দেশ দান করিলেন। সাথে সাথে হুকুম পালিত হইল। তখন উক্ত পয়গাম্বরের

প্রতি অহী নাযিল হইল যে, তোমাকে একটি পিপীলিকায় মাত্র দংশন করিয়াছে, আর তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ স্বরূপ তুমি আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠকারী তাহার সমগ্র দলটিকেই জ্বালাইয়া দিলে?

ব্যাং বা ভেক হত্যা করা ঃ ব্যাং হত্যা করাও মাকরূহ। হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ঔষধ তৈরী করার জন্য ব্যাং হত্যার ব্যাপারে হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ব্যাং হত্যা করিও না এবং যে সকল জীব হত্যা করা জায়েয, তাহা আগুনে জ্বালাইও না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন জীবকেই আগুনের আযাব দেওয়া উচিত নহে। কেননা, আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আগুন সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ তায়ালার।

ক্ষতিকারক জীব-জন্তু ঃ যে সকল জীব জন্মগত ও স্বভাবগত ভাবেই মানুষের অনিষ্টকারী, যেমন সর্প বিচ্ছু ইত্যাদি। সেগুলির দ্বারা অনিষ্ট হউক কি না হউক সেগুলিকে হত্যা করা জায়েয।
পিপাসার্ত জীব জন্তুকে পানি পান করানো পুণ্যের কাজ, কিন্তু শর্ত হইল, অনিষ্টকারী জীব না হওয়া চাই। অনিষ্টকারী জীবকে পানি পান করানোর অর্থ হইল, উহাকে অনিষ্ট করার সুযোগ প্রদান করা।

কুকুর হত্যা করা ঃ বাড়ী-ঘর, ফসলের ক্ষেত এবং গৃহপালিত জন্তু ইত্যাদির হেফাজতের জন্য কুকুর প্রতিপালন করা জায়েয। এ সব কারণ ব্যতীত জায়েয নহে। আক্রমণকারী কুকুরকে মুক্তভাবে ছাড়িয়া রাখা মাকরূহ। মানুষকে অনিষ্ট মুক্ত রাখার জন্য আক্রমণকারী কুকুরকে হত্যা করা জায়েয। কোন কোন রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালন করিলে প্রতিদিন পালনকারীর নেকী হইতে দুই কীরাত করিয়া নেকী কমিয়া যাইতে থাকে।

জীব জন্তুর পিঠে অধিক মাল চাপানো ঃ কোন জীব-জন্তুর পিঠে উহার সাধ্যের বাহিরে মাল চাপাইয়া দেওয়া জায়েয নহে। চাই উহা যমিন কর্ষণের ক্ষেত্রে হউক বা মাল বহনের ক্ষেত্রে হউক। জীব-জন্তুকে প্রয়োজন অনুরূপ খোরাক প্রদান না করা গুনাহর কার্য। পক্ষান্তরে জানোয়ারকে তাহার প্রয়োজন এবং ইচ্ছার বেশী খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করাও মাকরূহ। কোন কোন লোক জানোয়ারকে অধিক মোটা তাজা ও শক্তিশালী করিবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকে। (ইহাতেও জানোয়ারের কষ্ট হইয়া থাকে)

সিংগা লাগানো ঃ সিংগা লাগানোর পেশা অবলম্বন করা ও ঐ পেশার মাধ্যমে রুজী উপার্জন করা মাকরূহ। কারণ ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, সিংগা লাগোনো পেশার দ্বারা অর্জিত রুজী অপবিত্র। হাম্বলী মাজহাবের বিভিন্ন আলেম উহাকে হারাম বলিয়াছেন। যেহেতু ইমাম হাম্বল (রহঃ) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

পিতা-মাতার হক

পিতা-মাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করা সন্তানদের প্রতি ওয়াজিব। আল্লাহ্ পাক ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করিয়াছেনঃ
'ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারু আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিউ ওয়ালা তানহার হুমা অকুল লাহুমা ক্বাওলান কারীমা।'
অর্থাৎ তোমার বর্তমানে যদি তোমার পিতা-মাতাদ্বয়ের একজন বা উভয়জন বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাহাদের প্রতি কখনও উহ্ শব্দ কিংবা ধমক প্রদান করিও না বরং তাহাদের সাথে বিনয়-নম্র ব্যবহার কর। আল্লাহ্ তায়ালা অন্যস্থানে এরশাদ করিয়াছেনঃ 'অ ছাহিব হুমা ফিদ্দুনইয়া মা'রূফা।'
অর্থাৎ এবং দুনিয়াতে ঐ দুইজনের সহিত সদয় ব্যবহার কর। অন্যস্থানে আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ 'আনিশকুরলী অলি ওয়ালিদাইকা।'
অর্থাৎ আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর এবং তোমাকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যদি কেহ্ পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে এক রাত অতিবাহিত করে, তবে তাহার জন্য দোজখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। যেই ব্যক্তি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে একটি দিন অতিবাহিত করে, তবে তাহার জন্যও দোজখের দরজা খুলিয়া

খোলা হয়। আর যদি পিতা-মাতার কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে, তবে তাহার জন্যও দোজখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়—পিতা-মাতা অন্যায় ভাবে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিলেও। হুযুর (দঃ) [illegible]শ তিন তিনবার বলিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পিতা-মাতার খুশীতে আল্লাহ তায়ালা খুশী। পিতা-মাতার না-খুশীতে আল্লাহ নাখোশ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইহাও বলেন, একবার এক ব্যক্তি হুযুর (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি জিহাদ করিতে বাসনা রাখি। হুযুর (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? সে উত্তর করিল, মাতা জীবিত আছেন। হুযুর (দঃ) বলিলেন, তাহার জন্য নিজের নফসের সহিত জিহাদ কর। (অর্থাৎ মাতার সন্তুষ্টি বিধানে চেষ্টিত হও) পিতা-মাতার প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাদিগকে দাও। কোন কথা বা কাজ দ্বারা তাহাদেরকে কষ্ট দিও না। তাহাদের সাথে নরম ও কোমল ভাষায় কথাবার্তা বল। তাহাদের কোন কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিও না। তাহাদের প্রতি বিরাগভাবাপন্ন না হইয়া বরং সরল ও অকপট মনে তাহাদের খেদমত করিবে। সাধারণ নফল ইবাদাত করা অপেক্ষা পিতা-মাতার খেদমত করা শ্রেয়। প্রত্যেক নামাযের পর পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবে। পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করিবে না। অবশ্য তাহারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে বলিলে সে নির্দেশ পালন করিবে না। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সৃষ্টির নির্দেশ পালনে এমন কোন কাজ করিও না, যাহা স্রষ্টার অসন্তুষ্টিজনক।

পিতা-মাতাকে খুশী রাখার একটি তরীকা ইহাও যে, তাঁহারা যাহাদের সাথে সংশ্রব রাখে না, তোমরাও তাহাদের সাথে সংশ্রব রাখিও না। আর তাহারা যাহাদের সাথে সংশ্রব রাখে, তোমরাও তাহাদের সাথে সংশ্রব রাখিও। যদি পিতা-মাতার কোন কথা, কাজ বা ব্যবহারে তোমাদের মনে অসন্তুষ্টি বা ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবেঁ তোমাদের শৈশব ও কৈশোরের যমানায় লালন-পালনে তাহাদের ক্লেশ, ভালবাসা, আন্তরিকতা ও মায়া-মমতার কথা স্মরণ করিয়া এবং ক্বোরআনের বাণী কুল লাহুমা ক্বাওলান কারীমা (তাহাদের সাথে কোমল মিষ্টি ভাষায় কথা বল)। কে কার্যে পরিণত করিয়া মনের সে অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধকে নিবৃত্ত কর। যদি তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করিয়া পিতা-মাতার সহিত কোনরূপ অসৎ আচরণ কর, তবে মনের ক্রোধ নিবৃত্ত হইবার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তাওবা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।

পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত কখনও এমন সফরে যাইবে না, যাহা তোমাদের উপর ওয়াজিব নহে। এমনকি পিতা-মাতার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে জিহাদেও যাইবে না। পিতা-মাতাকে কোন প্রকারেই সামান্য দুঃখ প্রদান করিবে না। আর খেয়াল রাখিবে, তোমাদের কারণে কোন লোক যেন তোমাদের পিতা-মাতাকে দুঃখ-কষ্ট দিবার সুযোগ বা উসিলা না পায়। হুযুরে পাক (দঃ) সেই লোকের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাতা ও তাহার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারণ হইয়া যায়। তোমাদের সংগৃহিত খানা-পিনার মধ্যে সর্বোত্তম খানা-পিনা তোমাদের পিতা-মাতাকে প্রদান কর। কেননা এক সময়ে তাহারাও তোমাদের জন্যেই উপবাস রহিয়াছেন এবং খানা-পিনার ক্ষেত্রে নিজেদের উপরে তোমাদের গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকিয়া তোমাদেরকে আহার করাইয়াছেন এবং নিজেরা বিনিদ্র থাকিয়া তোমাদেরকে ঘুম পাড়াইয়াছেন।

বিবিধ বিষয়

নাম ও কুনিয়াত ঃ কোন সন্তানের নাম ও কুনিয়াত উভয় হুযুরে পাক (দঃ)-এর নাম ও কুনিয়াতের সাথে হুবাহু মিলাইয়া রাখা মাকরূহ। কিন্তু শুধু নাম মিলাইয়া রাখা এবং কুনিয়াতে অমিল রাখা মাকরূহ নহে। যেমন কাহারও আবুল কাসেম মুহাম্মদ নাম রাখা। কিন্তু শুধু নাম বা শুধু কুনিয়াত মিলাইয়া রাখিলে ও অপরটি অমিল রাখিলে তাহা মাকরূহ হইবে না। ইমাম আহমদ (রহঃ) হইতে নাম ও কুনিয়াত উভয়ের সহিত নাম ও কুনিয়াত মিল করিয়া রাখা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী দুইটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে। একটি দ্বারা উহা জায়েয প্রমাণিত হইয়াছে এবং অপরটির দ্বারা না-জায়েয প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমার নাম রাখ, কিন্তু আমার কুনিয়াত রাখিও না।

পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমি তাহার নাম মুহাম্মদ এবং কুনিয়াত আবুল কাসেম রাখিয়াছি। ইহাতে আমাকে কেহ কেহ বলিয়াছে, এই কাজ হুযুরে পাক (দঃ)-এর পছন্দনীয় নহে। একথা শুনিয়া হুযুর (দঃ)) বলিলেন, সে এমন কি জিনিস যাহাতে আমার নামের অনুরূপ নাম রাখা জায়েয হইবে এবং আমার কুনিয়াতের অনুরূপ কুনিয়াত রাখা জায়েয হইবে না।

আবু ইয়াহইয়া এবং আবূ ঈসা কুনিয়াত রাখা মাকরূহ। নিজ গোলামের নাম আফলাহ, নাজাহ, ইয়াসার, নাফে, রাবাহ এবং দাসীর নাম বারাকাহ, বাররাহ এবং আসিয়া রাখা মাকরূহ।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে গোলামদের নাম ইয়াসার, বারকাত, রাবাহ, নাজাহ বা আফলাহ রাখা নিষিদ্ধ করিয়া দিব।

আল্লাহ তায়ালার নামের অনুরূপ নাম রাখা মাকরূহ। যেমন মালিকুল মুলক। শাহানশাহ ইত্যাদি। পারস্য রাজ্যে এইরূপ নাম রাখার প্রচলন রহিয়াছে। ইহা ও যে সকল নাম শুধু আল্লাহর জন্যই শোভনীয় তদ্রুপ নাম রাখাও মাকরূহ। যেমন কুদ্দুস, ইলাহ, খালেক, মুহাইমিন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ 'অ জাআলূ লিল্লাহি শুরাকা-য়া কুল সাম্মুহুম।' অর্থাৎ মুশরেকগণ আল্লাহর সাথে শরীক বানাইয়া লয়, বলিয়া দিন, ইহা তাহাদের মনগড়া নাম বৈকি।

নিজ ভাই বা গোলামকে না-মোনাসেব লকব দ্বারা সম্বোধন করা হারাম তথা নিষিদ্ধ কাজ। কেননা আল্লাহ বলেন, 'অলা তানাবাযূ বিল ইলক্বাবি।' অর্থাৎ তোমরা খারাপ লকব দ্বারা কাহাকেও ডাকিও না। আল্লাহ ইহাকে ফেসক (প্রকাশ্য গুনাহ) বলিয়াছেন। মুস্তাহাব হইল, নিজ ভ্রাতাকে এইরূপ নাম দ্বারা ডাক, যাহা তাহার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।

ক্রোধকালীন কর্তব্যঃ ক্রোধের সময় যদি কেহ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে তবে সে বসিয়া যাইবে। (ইহাতে ক্রোধ বারণ হয়) আর যদি বসা অবস্থায় থাকে, তবে সে শয়ন করিবে। ক্রোধের সময়ে চোখে-মুখে শীতল পানি ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে ক্রোধ বারণ হয়। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ক্রোধ আগুনের একটি অঙ্গার স্বরূপ, যাহা মানুষের মনে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকে। যদি কাহারও মনে এইরূপ অবস্থা হয়, তবে সে দাঁড়ানো থাকিলে বসিয়া যাইবে। আর বসিয়া থাকিলে বালিশে মাথা রাখিয়া দেহ এলাইয়া দিবে।

যদি কোন লোক তাহাদের গোপন কথা আলোচনা করিতে থাকে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া উপবিষ্ট হওয়া উচিত নহে। হুযুরে পাক এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিছু রৌদ্র এবং কিছু ছায়ার মধ্যে বসাও মাকরূহ। বাম হাতের উপর ভর করিয়া বসা উচিত নহে। যেখানে সব লোক উপবিষ্ট অবস্থায় আছে, সেখানে যাইয়া দেহ এলাইয়া দেওয়া বা পা বিছাইয়া শয়ন করা উচিত নহে. উহা মাকরূহ। কোন মজলিস হইতে উঠিয়া বিদায় হইবার কালে এই দোয়াটি পাঠ করিবেঃ

'সুবহানাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা লা-ইলাহা ইল্লা আনাত আস্তাগফিরুকা অআতুবু ইলাইকা।

কবরস্থানে যাইবার আদবঃ কবরস্থানে জুতা পায়ে দিয়া যাওয়া মাকরূহ। তথায় গমনকারীর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব।

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযাল আজসাদিল বালিয়াতি অল ইজোয়ামিন্নাখিরাতিল্লাতি খারাজাত মিন দারিদ্দুনইয়া অ হিয়া বিকা মুমিনাতুন ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মাদিন অ আনযিল আলাইহিম দাওহাম মিনকা অ সালামাম মিন্নী।

কবরস্থানে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিবেঃ আসসালামু আলাইকুম দ্বারা ক্বাওমিম মুমিনীনা অ ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিক্বুন।

কবর যিয়ারতকালে কোন কবরের উপর হাত রাখিবে না এবং কবরকে চুম্বন করিবে না। ইহা ইয়াহুদীদের প্রচলন। কবরের উপর বসিবে না ও উহার সহিত টেক লাগাইয়াও বসিবে না। যিয়ারত কালে কবর হইতে এতটুকু দূরে দাঁড়াইবে, মৃত লোকটির জীবিতাবস্থায় তাহার সহিত কথোপকথন কালে তাহার নিকট হইতে যতটুকু দূরত্ব রাখিয়া দাঁড়াইতে।

মাদফুন ব্যক্তির রূহে ছওয়াব রেসানী করার নিয়ম হইল, এগারবার সূরা ইখলাস এবং আরও কিছু আয়াতে কোরআনী পাঠ করিয়া তাহার রূহের উপর ছওয়াব বখশেষ করিবে। আল্লাহর দরবারে এইভাবে আরজ করিবেঃ

হে মাবুদ! আপনার এই পবিত্র সূরা ও আয়াতসমূহ যাহা আমি পাঠ করিলাম তাহার বাবত আপনি আমার জন্য যে ছওয়াব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই সমুদয় ছওয়াব আমি এই মৃত ব্যক্তির রূহের উপর হাদিয়া স্বরূপ বখশেষ করিলাম। অতঃপর আল্লাহর দরবারে নিজের অন্যান্য মাকছুদসমূহ পেশ করিবে।

অন্যদের সাথে সম্পর্কঃ প্রত্যেক লোকের সাথেই বিনয় এবং ভদ্রসুলভ আচরণ করা চাই। বয়স্কদের সাথে সম্মানসূচক এবং কনিষ্ঠদের সাথে স্নেহসুলভ আচরণ করিবে। ইহা মুস্তাহাব, ছোটদের দোষ-ঘাট, ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখিবে ইহা মুস্তাহাব। অবশ্য তাহাদেরকে আদব শিক্ষামূলক কাজে অবহেলা করিবে না।

রহমতের দোয়া ঃ প্রত্যেকের জন্যই এইরূপ দোয়া করা যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। অথবা অমুকের পুত্র অমুকের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হউক। ইহা জায়েয আছে।

কাফিরের সাথে মুসাফাহা ঃ জিম্মি কাফিরের সাথে মুসাফাহা করা মাকরূহ। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জিম্মিদের সাথে মুসাফাহা করিও না।

দোয়া করিবার রীতিঃ আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবার রীতি হইল, উভয় হাত বাড়াইয়া দিবে। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি জ্ঞাপন করতঃ হুযুরে পাক (দঃ)-এর উপরে দরূদ প্রেরণ করিবে। দোয়া করিবার কালে আকাশের দিকে নজর উঠাইবে না। দোয়া করিবার পর দুই হাত মুখমণ্ডলে স্পর্শ করাইবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দোয়া করিবার কালে দুই হাত বাড়াইয়া লইবে। অতঃপর উভয় হাত মুখমণ্ডলে ফিরাইয়া নিবে।

কোরআনী তদবীর ঃ কোরআনে পাকের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে রোগব্যাধি নিরাময় এবং বিপদাপদ মুক্তির প্রার্থনা করা জায়েয। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, 'ফাসতাইয বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম।' অর্থাৎ মারদূদ শয়তান হইতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা কর। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) যখন রোগাক্রান্ত হইতেন, তখন সূরা নাস এবং সূরা ফালাক পড়িয়া নিজের শরীরে দম করিতেন। তাহা ছাড়া তিনি এই দোয়াও পাঠ করিতেনঃ
আউযুবি অজহিল কারীমি অ কালিমা-তিহিত্তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্বা অযারায়া অ বারায়া অ মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন রাব্বী আখিযুম বিনাছিয়াতিহা।
কোরআনের আয়াত এবং আসমায়ে হুসনা রোগ-ব্যাধি শাফার নিয়তে পড়া জায়েয। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ অনুনাযযিলু মিনাল ক্বুরআনি মা হুয়া শিফাউউঁ অ রাহমাতুল্লিল আ'লামীন। অর্থাৎ আমি কোরআন শরীফে সেই সকল জিনিসও নাযিল করিয়াছি, যাহা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতের কারণ।
অন্য আয়াতে আছে, "হাযা কিতাবুন আনযালনাহু মুবারাকুন'। অর্থাৎ ইহা সেই কিতাব যাহা নাযিল করিয়াছি বরকতময় হিসাবে। হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন সম্পর্কে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তাহাদেরকে বদ নজর মুক্ত থাকার জন্য ঝাড়িয়া দাও।

জ্বরের তাবীজঃ ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন যে, আমার একবার জ্বর হইলে আমার জন্য এই তাবীজ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিলঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . وَبِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ يَانَارُكُوْنِيْ
بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَرَادُوْابِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ -
اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اِشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ
بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوْتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

ঝাড় ফুঁকঃ পিপড়া, সাপ, বিচ্ছু, ছাড়পোকা, মশা ইত্যাদিতে কাটিলে দোয়া কালাম দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা জায়েয। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর দ্বারা দংশিত স্থান ঝাড় ফুঁক করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার 'ছাল্লাল্লাহু আলা নূহিন আলা

নূহিস সালাম' কালামটি পাঠ করে, সেই রাত্রে এ লোককে বিচ্ছু দংশন করিবে না। হুযুরে পাক (দঃ) ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি কুল্লিহা মিন শাররি মা খালাক্বা পাঠ করিবে, সেই রাত্রে যে কোন বিষাক্ত দ্রব্য বা প্রাণী তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

বদনজরের চিকিৎসাঃ যাহার বদনজর লাগে সে নিজের চেহারা এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত এক বরতনে পানিতে ধুইয়া ঐ পানি বদনজর লাগা লোকটির শরীরে নিক্ষেপ করিবে। আল্লা৭র রহমতে তাহার বদনজরের ক্রিয়া দূর হইয়া যাইবে। আবূ উমামা বিন সাহাল বিন হানীফ (রাঃ) বলেন, আমি গোসল করিতেছিলাম। আমের ইবনে রাবিআ আমার শরীর দেখিয়া বিস্ময়করভাবে বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন দৃশ্য দেখিলাম, যেমনটি আর কখনও দেখি নাই। কোন পর্দানশীন রমণীর চামড়াও এতটা সুন্দর হয় না। অতঃপর আমার এমন এক রোগ দেখা দিল যে, আমি মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারিতাম না। লোকগণ হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বলিলে তিনি আমাকে এবং আমের বিন রাবিআকে ডাকাইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কেহ কি তাহার ভাইকে এমনভাবে মারিয়া ফেলে? যদি কাহারও কোন বস্তু দেখিয়া বেশী পছন্দ হয় তবে তাহার উচিত হইল, সে তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিবে। অতঃপর হুযুর (দঃ) আমেরকে হুকুম করিলেন, তুমি গোসল কর। আমের ইবনে রাবিআ উক্ত নির্দেশ মত গোসল করিলেন এবং তাঁহার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌতকৃত পানি ঐ লোকের গায়ে বহাইয়া দিলেন। আবূ উমামা বলেন, অতঃপর আমার অবস্থা এমন সুস্থ হইল যে, আমার হাঁটা-চলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতে আর কোন অসুবিধাই হইত না।

সহজে সন্তান প্রসবঃ অনেক আলেমের মতে নিম্নোক্ত দোয়াটি সহজে সন্তান প্রসবের জন্য বিশেষ কার্যকর। যে সকল রমণী সন্তান প্রসব কালে অত্যধিক কষ্ট পায়, তাহাদের সহজে সন্তান প্রসবের জন্য পরীক্ষিত কার্যকর ব্যবস্থা হইল, নিম্নোক্ত দোয়াটি পবিত্র চীনা বরতনে লিখিয়া উহা পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানির কিছুটা গর্ভবতী মহিলাকে পান করাইবে এবং কিছুটা তাহার বুকে ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে অতি সহজে সন্তান প্রসব হইবে। দোয়াটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ كَاَنَّهُمْ
يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ
لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ *

সর্প, বিচ্ছু, বোলতার দংশনের তদবীরঃ সর্প, বিচ্ছু, বোলতা, মশা, ছাড়পোকা প্রভৃতির দংশিত স্থানে দোয়া কালাম পড়িয়া দম করা জায়েয। খোদ হুযুরে পাক (দঃ) এইরূপ করিতেন এবং অন্যকেও করিবার অনুমতি দান করিতেন। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় "ছাল্লাল্লাহু আলা নূহিউ অ আলা নূহিস সালাম" কালামটি তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌র রহমতে সেই রাত্রে তাহাকে বিচ্ছু দংশন করিবে না। হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি কুল্লিহা মিন শাররি মা খালাক্বা' কালাম শরীফ তিনবার পাঠ করিবে, সেই রাত্রে কোন বিষাক্ত প্রাণী তাহাকে দংশন করিবে না।

বদ নজরের প্রতিকারঃ কাহারও উপর যাহার বদনজর লাগিবে, উক্ত বদনজর ওয়ালার কনুইসহ দুই হাত এবং হাঁটুসহ দুই পা ধুইয়া সেই পানি বদনজর লাগা ব্যক্তির শরীরে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে বদনজরের ক্রিয়া দূরীভূত হইবে। আবূ উমামা ইবনে ছহল ইবনে হানীফ (রাঃ) বলেন, একদা আমি গোসল করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমার দেহের প্রতি আমের ইবনে রবীয়ার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আজ যে দৃশ্য

অবলোকন করিলাম জীবনে আর কোনদিন আমি তদ্রূপ দৃশ্য দেখি নাই। অর্থাৎ কোন পর্দানশীন রমণীর দেহ লাবণ্যও এত সুন্দর নহে। আমার এমন ভাব বৈকল্য দেখা দিল যে, তাহা বলিবার নহে। আমের ইবনে রবীয়ার এই ঘটনার কথা লোকমারফত হুযুরে পাক (দঃ)-এর কর্ণগোচর হইল। আবূ উমামা ইবনে হানীফ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ-কে ডাকিলেন এবং আমাকেও তলব করিলেন এবং বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কেহ আপনা ভাইয়ের বিনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে কি? যদি কেহ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, তবে যেন সে তাহার বরকতের জন্য দোয়া করে। অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) আমের ইবনে রবীয়াকে বলিলেন, তুমি গোসল কর। তিনি হুযুর-(দঃ) এর নির্দেশ মত গোসল করিতে প্রস্তুত হইলেন, হুযুর (দঃ) বলিলেন, তোমার কনুইসহ দুই হাত, হাঁটুসহ দুই পা, বক্ষ-মুখ-মণ্ডল এবং চোতর সহ দুই জানু ধৌত পানি একটি পাত্রে রক্ষিত করিয়া উহা আবূ উমামা ইবনে সহল এর শরীরে ঢালিয়া দাও। আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) হুযুরে (দঃ)-এর এই নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করিলেন।

আবু উমামা ইবনে সহল (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবার হইতে অন্যান্য লোকদের সহিত বিদায় হইয়া চলিয়া আসিলাম।

সিংগা লাগান, গোল লওয়া ও ইঞ্জেকশন লওয়া

রোগ-চিকিৎসার জন্য কি পেটে সিংগা-লওয়া বা শরীরের যে কোন স্থানে ছিদ্র করা, দাগ লওয়া বা পায়ে গোল লওয়া, ইঞ্জেকশন গ্রহণ করা, শরবত বা আরক জাতীয় ঔষধ সেবন করা, কোন রগ কর্তন করা বা যখমাদি চিরিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলি জায়েয। বর্ণিত রহিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) রোগ চিকিৎসার্থে সিংগা লইয়াছেন, চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি চিকিৎসকদেরকে একথাও বলিয়াছেন যে, রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে তোমাদের পরামর্শই সার্থক ও গ্রহণযোগ্য।

একবার চিকিৎসকগণ হুযুর (দঃ)-এর দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের চিকিৎসা কার্য কি রোগারোগ্যের ক্ষেত্রে কার্যকর? হুযুর (দঃ) জবাবে বলিলেন, যিনি রোগ দান করিয়াছেন, তিনি চিকিৎসাও শিখাইয়াছেন?

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ)-এর কাছে শরীরে দাগ বা গোল লওয়ার মাসলা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি জবাব দিলেন যে, গ্রামের লোকগণ তো এই কাজ করিয়া থাকে। নিশ্চয় হুযুরে পাক (দঃ) ও তাঁহার সাহাবাবৃন্দ শরীরে দাগ লইয়া রোগ চিকিৎসা করিয়াছেন।

অবশ্য কোন ক্রমেই কোন হারাম বস্তুকে রোগের দাওয়াই বা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না। যেমন শরাব, বিষ, মৃত প্রাণী, নাপাক দ্রব্য প্রভৃতি দাওয়াইর যোগ্য নহে। মহিলাদের দুধও দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার করার যোগ্য নহে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, কোন হারাম দ্রব্যে আমার উম্মতের আরোগ্য নাই। হুযুর (দঃ) বলেন যে, সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের ভয়ে কোনস্থান হইতে পালানো জায়েয নহে। কিন্তু কোথাও যদি সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে তবে অন্যত্র হইতে সেখানে গমন করা উচিত নহে।

গায়রে মোহাররামের সাথে নির্জনে বসাঃ কোন গায়রে মোহাররাম রমণীর কাছে নির্জনে বসিবে না। হুযুরে পাক (দঃ) একাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে শয়তান আসিয়া হাজির হয় এবং সে উক্ত নর ও নারীকে গুনাহর দিকে প্ররোচিত করে।

যে কোন যুবতী নারীর দিকে বিশেষ ওজর ব্যতীত কোন ক্রমেই চক্ষু তুলিয়া তাকাইবে না। কেননা উহাতে ফেতনা লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দুইজন পুরুষ বা দুইজন রমণীর অনাবৃত দেহে এক বিছানায় শয়ন করা চাই না। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন।

দাস—দাসীদের সাথে নরম ব্যবহারঃ নিজ নিজ দাস-দাসীদের সাথে নরম ব্যবহার প্রদর্শন করিবে। সাধ্য-শক্তির বাহিরে কোন কাজ তাহাদের উপর চাপাইবে না। উহাদের স্বাভাবিক ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা রাখিবে। যদি উহারা বিবাহ-শাদীর জন্য লালায়িত হয় তবে তাহা করাইয়া দিবে। অবশ্য উহারা বিবাহ-শাদীতে বাধ্য বা সম্মত না থাকিলে জবরদস্তী বিবাহ করাইবে না। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে উহাদেরকে বিক্রয় করিতে পার। ইচ্ছা হইলে মুক্ত ও করিতে পার। যদি দাস-দাসী

মুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে তাহাদেরকে মুক্ত করিয়া দিবে অর্থাৎ দাস-দাসী যদি মজদুরী ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করিয়া দেয়, তবে তাহাকে তাহার বদলে আজাদ করিয়া দিবে। হাদীস শরীফ দ্বারা জানা যায়, হুযুরে পাক (দঃ) তাঁহার আখেরী অসিয়তে বলিয়াছিলেন, তোমরা নামাযের পায়বন্দ হইও এবং দাস-দাসীর প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

ক্বোরআন শরীফ সঙ্গে রাখাঃ শত্রুর দেশে যুদ্ধ চলাকালে ক্বোরআন শরীফ সঙ্গে রাখা মাকরূহ। কেননা, কোন প্রকারে উহা শত্রুর হাতে পড়িলে তাহারা উহার সাথে বেআদবী করিবে। হাঁ যদি মুসলিম বাহিনী প্রবল ও শক্তিশালী হয় এবং যুদ্ধজয়ের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা পাঠ করিবার জন্য সঙ্গে নিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার দোয়া

আয়না দেখিয়া পড়িবেঃ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِى سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَاشَانَ مِنْ غَيْرِىْ *

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাওয়্যা খালক্বী অ আহ্সানা ছুরাতী অ যানা মিন্নী মা শানা মিন গাইরী।

উল্লেখ্য যে, এই দোয়া হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাদীস হইতে সঙ্কলিত।

কানে ভো ভো শব্দ হইলে পড়িবেঃ

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কাহারও কর্ণে ভো ভো শব্দ হইতে থাকিলে পাঠ করিবেঃ

ذَكَرَاللّٰهُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِخَيْرٍ .

উচ্চারণঃ যাকারাল্লাহু মান যাকারানী বিখাইরিন।

বেদনা দূর করার দোয়াঃ

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কাহারও শরীরের কোন অঙ্গে বেদনা দেখা দিলে এই দোয়া পাঠ করিয়া বেদনা স্থলে দম করিবে।

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَآءِ اِغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا يَارَبَّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَآءً مِّنْ شَفَائِكَ عَلَى الْوَجْعِ الَّذِىْ بِهٖ *

উচ্চারণঃ রাব্বুনাল্লাহুল্লাযী ফিসসামায়ি তাক্বাদ্দাসাস্মুকা আমরুকা ফিসসামায়ি অল আরদ্বি কামা রাহমাতুকা ফিসসামায়ি, ইগফির লানা হুবানা অ খাত্বাইয়ানা ইয়া রাব্বাত্তাইয়্যিবীনা আনযিল রাহমাতাম মির রাহমাতিকা অ শিফায়াম্মিন শাফায়িকা আলাল অজইল্লাযী বিহী।

মুশরেক, নাছারা, ইয়াহুদীর বিরাট সমাবেশ দেখিলে পড়িবেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهً وَّاحِدًا لَّانَعْبُدُ اِلَّآاِيَّاهُ *

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ইলাহাউ ওয়াহিদাল্লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, এই দোয়া পাঠকারীর আমলনামায় আল্লাহ তায়ালা উক্ত বিধর্মীদের সংখ্যা পরিমাণ নেকী লিখিয়া দিবেন।

মেঘের গর্জন বা বজ্রপাতের আওয়াজ শুনিয়া পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা তাক্বতুলনা বি গাজাবিকা অলা তুহলিকনা বিআযাবিকা অ আফিনা ক্বাবলা যালিকা।

ঝড় তুফান শুরু হইলে পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ .

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খাইরা হা অ খাইরা মা উরসিলাত বিহী আউযুবিকা মিন শাররিহা অ শাররি মা উরসিলাত বিহী।

বাজারে যাইবার কালে পড়িবেঃ

নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া লইয়া হাট বাজারে গমন করিবে। খোদ হুযুরে পাক (দঃ) এই দোয়া পাঠ করিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا السُّوْقِ وَخَيْرَ مَافِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا فِيْهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাইন্নী আসয়ালুকা খাইরা হাযাস সূক্ব অ খাইরা মা ফীহি অ আউযুবিকা মিন শাররিহী অশাররি মা ফীহি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উছীবা ফীহা ইয়ামীনান ফাজিরাতান আও ছাফক্বাতান খাসিরাতান লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু অহুয়া হাইয়্যুল্লাইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

নূতন চন্দ্র দেখিয়া পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللّٰهُ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলইউমনি অলঈমানি অসসালামাতি অল ইসলামি রাব্বী অ রাব্বুকাল্লাহু

বিপদগ্রস্ত লোককে দেখিয়া পড়িবেঃ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا *

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী অফাদ্দ্বালানী আলাইকা অআলা কাছীরিম্মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা।

হজ্জ প্রত্যাগত হাজীকে দেখিয়া পড়িবেঃ

কোন লোক হজ্জ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দেখিয়া পড়িবেঃ

تَقَبَّلَ اللّٰهُ نُسُكَكَ وَاَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَخْلَفَ نَفْقَتَكَ *

উচ্চারণঃ তাক্বাব্বালাল্লাহু নুসুকাকা অ আ'জামাল্লাহু আজরাকা আখলাফা নাফক্বাতাকা।

কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মুমূর্ষু কিংবা মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলে পড়িবেঃ

اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ الْمُحْسِنِيْنَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاخْلُفْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ وَلَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهُ *

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অইন্না ইলা রাব্বিানা লামুনক্বালিবুন, আল্লাহুম্মা কতুবহু ইনদাকা মুহসিনীনা অজআল কিতাবাহু ফী ইল্লিয়্যীনা অখলুফ আলা আক্বিবাইহি ফিল আখিরীনা অলাল্লিহারুমুনা আজরাহু অলা তাফতিন্ন বা'দাহু।

মৃতকে কবরে রাখিবার কালে পড়িবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।'

হুযুরে পাক (দঃ) স্বয়ং এই দোয়া পাঠ করিতেন।

কবরে মাটি রাখিবার কালে পড়িবেঃ

اِيْمَانًابِكَ وَتَصْدِيْقًا بِرَسُوْلِكَ وَاِيْمَانًا بِبَعْثِكَ هٰذَا مَاوَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ *

উচ্চারণ ঃ ঈমানাম বিকা অ তাছদীক্বান বিরাসূলিকা অ ঈমানাম বি বা'ছিকা হাযা মা অ আদাল্লাহু অ রাসূলুহু অ ছাদাক্বাল্লাহু অ রাসূলুহু ।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে, সে মৃত্তিকার অসংখ্য টুকরা পরিমাণ নেকী লাভ করিবে।

বিবাহ—শাদী

আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই বিবাহ করিবে। আল্লাহ পাক ক্বোরআনে বলেন, যে রমণী তোমার পছন্দনীয় তাহাকে বিবাহ কর। তিন আরও বলেন, তোমাদের পছন্দনীয় ও নেককার রমণী দুই দুই, তিন তিন এবং চারি চারি সংখ্যায় বিবাহকর'। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা বিবাহ কর এবং সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি কর। কেননা তোমাদের সংখ্যার আধিক্য দ্বারাই অন্যান্য নবীর উপর আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাহার ধর্মের অর্ধেক পরিপূর্ণতা লাভ হয়। তিনি আরও বলেন, বিবাহ ধর্মের অর্ধাংশ। উত্তম বংশীয়া, অনাত্মীয়া, কুমারী এবং অধিক সন্তান প্রসবা রমণী বিবাহ করিবে।

উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচারের ভয় বা আশংকা থাকুক কিনা থাকুক, যে কোন অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব।

সাহাবী জাবের (রাঃ) এক বিধবা রমণী বিবাহ করিলেন। হুযুর (দঃ) তাহা জানিতে পারিয়া জাবের (রাঃ)-কে বলিলেন, তুমি কুমারী রমণী বিবাহ করিলে না কেন? তদ্রুপ করিলে তুমি তাহার সহিত খেল-তামাসা করিতে, সেও তোমার সহিত খেল-তামাসা করিত।

এক সাথে দুই সহোদর ভগ্নীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। বিবাহের পরে স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করিবে। তাহার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে না। মোহর বেশী ধার্য করা হইয়াছে এ অজুহাত দিয়া স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করিবে না। স্ত্রীর পিতা-মাতাকে গালাগালি করিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল নাখোশ হইয়া থাকেন। হুযুর (দঃ) বলেন, বিবিকে উপদেশ দান কর যেন সে সৎ কাজ করে

সে তোমার অধিনস্থা। তুমি তাহাকে সদুপদেশ দিতে পার। হুযুর (দঃ) বলেন, স্ত্রীর মোহর আত্মসাৎকারী ব্যক্তিকে রোজ কিয়ামতে এমনভাবে উঠানো হইবে যে, সে যেন সারা জীবন স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের দোষে দোষী। কটুভাষিণী ও স্বামীকে কষ্টদানকারিনী রমণী হইতে স্বামী দূর হইয়া থাকিবে, কিন্তু বদলা গ্রহণ করিবে না। এই শ্রেণীর স্ত্রীর অত্যাচার সহ্যকারী স্বামী আল্লাহর দরবারে গাজীর (ধর্মযুদ্ধ বিজয়ীর) সম্মান লাভ করিবে। ধনবতী নারী আপনা হইতে তাহার ধনসম্পদ স্বামীকে দান করিয়া দিলে স্বামী তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখাঃ বিবাহের পূর্বে পাত্রীর মুখ-হাত দেখিয়া লওয়া যায়। অবশ্য বিবাহের পূর্বে অন্য লোকের অনুপস্থিতিতে বা কোন নির্জন স্থানে পাত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করা চাই। বিবাহের পরে স্ত্রীর চেহারা বা গঠনাদি যাহাতে স্বামীর মনে তাহাকে তালাক প্রদানের ইচ্ছার উদ্রেক না ঘটায় তজ্জন্যই শরীয়ত বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়াছে। (অবশ্য স্বয়ং পাত্র ও তাহার পিতা, চাচা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের জন্যও এই অনুমতি রহিয়াছে। বাহিরের লোক বা নিছক বন্ধু-বান্ধবদের জন্য পাত্রী দেখা জায়েয নহে)

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ যখন তোমার মনে কোন মহিলাকে বিবাহ করার বাসনা জাগাইয়া দেয়, তখন তুমি সেই মহিলার হাত মুখ দেখিয়া লও যেন পরবর্তীতে তোমাদের মধ্যে মনের মিল হয় ও উহা অটুট থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, তাহার সেই অঙ্গ তুমি দেখিতে পার, যে অঙ্গ তোমাকে বিবাহের প্রতি অধিক আগ্রহান্বিত করে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার আমি এক রমণীকে বিবাহ করার খেয়ালে তাহাকে গোপনে দেখিলাম, আমি তাহাকে এমন অবস্থায় দেখিলাম, যাহাতে তাহাকে বিবাহ করার বাসনা আমার মনের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পাইল।

সুপাত্রীর গুণাবলী ঃ পাত্রীর জ্ঞানবতী ও ধার্মিকা হওয়া চাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পাত্রীর চারিটি গুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যথাঃ (১) ধন-সম্পদ থাকা (২) রূপবতী হওয়া (৩) সদ্বংশজাত হওয়া এবং (৪) ধর্ম প্রাণা হওয়া। এই সকল গুণ দেখিয়া যে বিবাহ করে সে ব্যক্তি পরম সৌভাগ্যবান । হুযুর (দঃ) বলেন, ধর্ম প্রাণা স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করে, স্বল্পে তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ধর্মহীনা স্ত্রী স্বামীকে পাপে ও কষ্টে লিপ্ত করে। এইরূপ স্ত্রী হইতে আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করেন, সেই মুক্তি পাইতে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর ও তাহার পক্ষ হইতে এমন বস্তুর আকাঙ্খা কর, যাহা (সন্তান) আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখিয়াছেন। নারীদের উচিত ব্যভিচার হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা। সন্তান লাভ ও পুণ্যের আশায় বিবাহ করা।

যিয়াদ ইবনে মায়মুন হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বলেন, মদীনায় হাওলা নাম্নী জনৈকা আতর বিক্রেতা ছিল। সে একদা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট আসিয়া বলিল, উম্মুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তি আমার স্বামী। আমি প্রত্যেক রাত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং স্বামীর মনোরঞ্জন স্বার্থে নিজেকে খুব সজ্জিত করি। আমার সেই সজ্জিতাবস্থা অন্য কেহ দেখিলে মনে করিবে যে আজই আমার বিবাহ হইয়াছে। অতঃপর আমার স্বামী গৃহে আসিলে আমি তাহার নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু আমার স্বামী আমার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হুযুর (দঃ)-এর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে হুযুরে পাক (দঃ) গৃহে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়েশা! এমন সুঘ্রাণ কিসের ? মনে হয় হাওলা আসিয়াছিল এবং তুমি তাহার নিকট হইতে আতর খরিদ করিয়াছ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি হাওলার নিকট হইতে কিছুই খরিদ করি নাই। অতঃপর তিনি হুযুর (দঃ)-এর নিকট হাওলার ঘটনা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) হাওলাকে বলিলেন, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও এবং স্বামীর খেদমত কর। হাওলা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহাতে কি আমার কোন নেকী হইবে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, যে স্ত্রী স্বামীর গৃহে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গৃহের কোন বস্তু যথাস্থানে তুলিয়া রাখে, উহার জন্য তাহাকে একটি নেকী দান করা হয়, একটি পাপ দূর করা হয় এবং একটি উচ্চ মরতবা দান করা হয়। যে স্ত্রী স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হয়, দিন ভর রোযা এবং রাত ভর ইবাদাত করে সে জিহাদের ন্যায় পুণ্যের অধিকারী হয়। তাহার প্রসব বেদনা শুরু হইলে প্রত্যেক বারের বেদনার জন্য একজন করিয়া গোলাম আজাদ করার ছওয়াব লাভ করে। সে তার শিশু সন্তানের প্রত্যেক ঢোক দুধ পান করানোর বিনিময়ে একজন করিয়া গোলাম আজাদ করার পুণ্যের অধিকারী হয়। শিশু যখন দুধ পান পরিত্যাগ করে, তখন

আসমান হইতে আওয়াজ দিয়া বলা হয়, ওহে রমণী! তুমি তোমার কাজ সমাধা করিয়াছ, এখন বাকী কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! স্ত্রী লোকদের তো এ ভাবে বহু ছওয়াব মিলিবে কিন্তু পুরুষদের অবস্থা কি? বিবি আয়েশার (রাঃ) প্রশ্ন শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) মুচকি হাসিয়া বলিলেন, যে পুরুষ স্ত্রীর হাত ধরিয়া ভ্রমণ করে, আল্লাহ তাহাকেও একটি পুণ্য দান করেন। যে স্ত্রীকে ভালবাসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখে তাহাকেও একটি পুণ্য দান করা হয়, যে পুরুষ স্ত্রী সহবাস কালে অত্যধিক খুশী ও আনন্দ লাভ করে, অতঃপর গোসল করার সময়ে তাহার যতটি পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছে ততটি পুণ্য হাসিল হয়, ততটি পাপ দূরীভূত হয় এবং ততটি উচ্চ মরতবা অর্জিত হয়। গোসলের পরিবর্তে তাহাকে এমন বস্তু দান করা হয় যাহার মূল্য দুনিয়ার কোন কিছু দিয়াই আদায় হইতে পারে না। সে সময় আল্লাহ তায়ালা গর্বিতভাবে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য কর। সে এই শীতের রাত্রে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে গোসল করিতেছে ও আমি যে তাহার প্রভু, সে কথা সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়াছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিলাম।

ইবনে মুবারক ইবনে ফুজালা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নারীদের সম্পর্কে তোমরা আমার উপদেশ পালন কর। কেননা তাহারা তোমাদের দাসী, তাহাদের নিজেদের কোন স্বাধীনতা নাই, তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানত তুল্য। আল্লাহর আদেশানুসারেই তাহাদের দেহ তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে তাহার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। আর যে স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে, সেও আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে রমণী আল্লাহর পথে ধৈর্য রক্ষা করে এবং আল্লাহর কাছে ধৈর্যের প্রতিদান চায়, সে দিবা রাত্রির মধ্যে হাজার শহীদের পুণ্য লাভ করে। এইরূপ রমণী বৃহৎ নয়ন বিশিষ্টা বেহেশতের হুর অপেক্ষাও বেশী মর্যাদার অধিকারিণী, যেমন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দুনিয়ার মানব জাতির উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী। আমার উম্মতের মধ্যে যে রমণী স্বামীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেকটি (শরীয়ত সিদ্ধ) কাজ সরলান্তঃকরনে আদায় করে, সেই শীর্ষস্থানীয়া। আর যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের সহিত ভাল ব্যবহার করে ও আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিয়া উহার প্রতিদান আল্লাহর নিকট কামনা করে, সে আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং সে দিবা রাত্রে একশত শহীদের পুণ্য হাসিল করে।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! স্ত্রীলোকগণ হাজার শহীদ এবং পুরুষগণ একশত শহীদের পুণ্য লাভ কেন করিবে?

হুযুর (দঃ) বলিলেন, ওমর। তুমি কি জাননা যে, রমণীরা পুণ্যর্জনে পুরুষাপেক্ষা অধিক অগ্রগামিনী। রমণীরা পুরুষদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ও তাহাদের জন্য দোয়া করে বলিয়াই আল্লাহ পুরুষের মর্যাদার উপর তাহাদের মর্যাদা দান করেন। তুমি একথাও জান যে, আল্লাহর সাথে শিরকের পর বড় গুনাহ স্বামীর আবধ্য হওয়া। তোমরা সতর্ক থাক যে, আল্লাহ তায়ালা রোজ কিয়ামতে ইয়াতীম এবং নারী এই দুই দুর্বল শ্রেণী সম্বন্ধে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যে ব্যক্তি এই দুই শ্রেণীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিবে। আর যে খারাপ ব্যবহার করিবে, সে শাস্তি ভোগ করিবে। তোমাদের উপর আমার যেমন হক, স্ত্রীর উপর পুরুষের তেমনি হক। যে আমার হক নষ্ট করে সে যেন আল্লাহর হক নষ্ট করে। আল্লাহর হক নষ্টকারী দোজখের শাস্তির যোগ্য, সে দোজখের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী বর্ণনা করেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি একদিন হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সেখানে আরও কতিপয় সম্মানিত সাহাবী উপস্থিত রহিয়াছেন। এমন সময়ে জনৈকা মহিলা আসিয়া সালাম করতঃ আরজ করিলেন, আমি নারীদের পক্ষ হইতে দূত হিসাবে আপনার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছি। তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতে অক্ষম হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! পুরুষ এবং নারীদের প্রভু আল্লাহ, পিতা আদম এবং মাতা হাওয়া। পুরুষগণ জিহাদ করিয়া শহীদ হইলে তাহারা আল্লাহর দরবারে জীবিত থাকে, আল্লাহ তাহাদেরকে রুজী দান করেন। যখন তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা যে প্রতিদান পাইবে, তাহা আপনি অবগত আছেন। আমরা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকি, আমাদের এই কাজের জন্য আমরাও কি পারিশ্রমিক পাইব?

হুযুর (দঃ) বলিলেন, ঐ সকল নারীদেরকে আমার পক্ষ হইতে সালাম দিয়া বলিও, তোমরা যে স্বামীদের খেদমত কর, তাহাদের মাল-আসবাব হেফাজত কর, সেজন্য পুরুষদের সমান ছওয়াব পাইবে। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক নারীই এইরূপ আজ্ঞাবহ রহিয়াছে। হযরত সাবেত হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, নারীরা যখন তাহাদের পক্ষ হইতে আমাকে আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করিল, তখন আমি তাঁহার সমীপে তাহাদের বিষয় আরজ করিলাম যে, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! পুরুষগণ বিপদাপদ বরণ ও জিহাদ করিয়া আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী নেকী অর্জন করিয়া থাকে। আমাদের জন্য এমন কোন করণীয় কাজ আছে কি, যাহার দ্বারা আমরা যুদ্ধজয়ীর তুল্য পুণ্য লাভ করিতে পারি? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, তোমাদের গৃহবাসের দ্বারা তোমরা যুদ্ধজয়ীর তুল্য পুণ্যলাভ করিবে।

ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, স্ত্রীলোকদের জিহাদের অংশ গ্রহণ করা জায়েয কিনা? হুযুর (দঃ) উত্তর করিলেন, নফসের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হওয়াই তাহাদের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ তুল্য।

স্ত্রীলোকদের উপর যেমন পুরুষের হক, পুরুষদের উপরও তেমন স্ত্রীলোকদের হক রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস রাখা চাই যে, কাফিরদের সাথে জিহাদ করা অপেক্ষা নিজেদের নফসের সাথে জিহাদ করা তাহাদের জন্য শ্রেয়। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) বলিয়াছেন, পুরুষ ও কবরের আলিঙ্গন ব্যতীত নারীদের জন্য আর কোন শ্রেষ্ঠতর বস্তু নাই। হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রীহীন ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত। লোকগণ আরজ করিল, হুযুর (দঃ)! ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ? হুযুর (দঃ) বলিলেন, হাঁ স্ত্রীহীন সম্পদশালী ব্যক্তিও অভাবগ্রস্ত। হুযুর (দঃ) আরও বলিলেন, স্বামীহীনা নারী দরিদ্রা। লোকগণ আরজ করিল, হুযুর (দঃ)! ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ? হুযুর (দঃ) জবাব দিলেন, হাঁ স্বামীহীনা নারী সম্পদশালিনী হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রা।

বিবাহের তারিখ ও সময়ঃ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিবাহ করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে দিন অপেক্ষা রাত্রে ভাল সময়। ইজাব কবুলের পূর্বে বিবাহের খুৎবাহ পাঠ করা সুন্নত। অবশ্য পরেও পাঠ করা চলে। নবপরিণীতা স্ত্রী গৃহে আসিবার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত রীতি অনুযায়ী কাজ করিবে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমি কুমারী পাত্রী বিবাহ করিয়াছি। আমার ভাবনা হইতেছে, আমার স্ত্রী না জানি আমাকে ভয় পায়, নাকি আমাকে তাহার অহিতাকাঙ্খী ভাবে। শুনিয়া আমি বলিলাম, প্রণয় আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়। আর অহিত কামনা শয়তানের কাজ। তোমার স্ত্রী তোমার গৃহে আসিবার পর তাহাকে তোমার পিছনে দাঁড় করাইয়া একত্রে দুই রাকয়াত নামায আদায় করতঃ এ দোয়াটি পাঠ কর। দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّىْ
اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا اِذَا جَمَعْتَ خَيْرَ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلٰى خَيْرٍ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লী ফী আহলী, আল্লাহুম্মারযুক্বনী মিনহুম অরযুক্বহু, মিন্নী আল্লাহুম্মাজমা বাইনানা ইযা জামা'তা খাইরা, অফার রাক্বি বাইনানা ইযা ফাররাক্বতা ইলা খাইর।

বিবাহ কার্য সরাসরি পাত্র-পাত্রীদের নিজেদের দ্বারাই সাধন করা বা অলী ওয়াকীলের মাধ্যমে সাধন করা উভয়ই সিদ্ধ। বিবাহ সমাধার পর উপস্থিত লোকগণ এই দোয়া করিবে।

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ وَّعَافِيَةٍ *

উচ্চারণঃ বারাকাল্লাহু লাকাঅবারাকা আলাইকা অ জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইরিউ ওয়া আফিয়াহ।

সহবাসকালীন দোয়া ঃ স্ত্রীসহবাস শুরুর পূর্বে এই দোয়া পাঠ করিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اَنْ قَدَّرْتَ اَنْ
تَخْرُجَ صُلْبِىْ اَللّٰهُمَّ اجْنُبْنِىَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنِىْ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমি আল্লাহুম্মাজ 'আল যুররিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাতান ইন ক্বাদ্দারতা আন তাখরুজা ছুলবী। আল্লাহুম্মাজনুবনিয়াশ শাইত্বানা অ জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রাযাক্বতানী।

সহবাসের পরের দোয়া ঃ সহবাস শেষে ওষ্ঠ না নাড়াইয়া মনে মনে এই দোয়াটি পাঠ করিবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী খালাক্বা মিনাল মায়ি বাশারান ফাজাআলাহু নাসাবাউ ওয়াছিহ্‌রান অকানা রাব্বুকা ক্বাদীরা।

এইরূপ সহবাসে যে সন্তান পয়দা হইবে, সে শয়তানের চক্রান্ত হতে দূরে থাকিবে। স্ত্রী গর্ভবর্তী হওয়ার পর যেন তাহাকে কোনরূপ হারাম খাদ্য না দেওয়া হয়; রবং সম্পূর্ণ হালাল খাদ্য খাইতে দিবে। তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ সন্তানের উপর শয়তান কোনরূপ চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে পারিবে না। তাহাছাড়া শিশুকেও হালাল খাদ্য খাওয়াইবে। কেননা হালাল খাদ্যের শিশু পিতা-মাতার অনুগত হয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে একনিষ্ঠ হয়। সহবাস করার পর স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া নাজাসাত ধৌত করতঃ অজু করিবে। পুনঃ সহবাস করার ইচ্ছা না থাকিলে তখনই গোসল করিয়া শয়ন করিবে। গোসল না করিয়া শয়ন করা মাকরূহ।

হুযুর (দঃ) বলেন, অত্যধিক শীতের কারণে, পানি বেশী দূরে থাকার কারণে বা পানির নিকট পৌঁছতে কোন বিশেষ অসুবিধা থাকার কারণে এই অসুবিধাগুলি দূর হইবার সাথে সাথে গোসল করিবে।

সহবাস কালে কিবলামুখী হইবে না, মাথা অনাবৃত রাখিবে না এবং খোলা-মেলা স্থানে সহবাস করিবে না, বরং কেহ দেখিতে বা বুঝিতে না পারে এমন নির্জন স্থানে সহবাস করিবে। হুযুর (দঃ) বলেন, সকলের অলক্ষ্যে সহবাস করিবে। সহবাস কালে গোপনীয়তা রক্ষা না করিলে ফেরেশতাগণ লজ্জিত হইয়া দূরে সরিয়া যায়; শয়তান নিকটে চলিয়া আসে এবং সন্তান জন্মে সহবাসকারীর অংশীদার হয়। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় সহবাস করিবে না। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া পশ্চাৎ দিক দিয়া সহবাস করা বিধিবিরুদ্ধ-হারাম।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া পিছন দিক দিয়া সহবাসকারী অভিশপ্ত। কাহারও সহবাস করার ইচ্ছা না থাকিলেও সহবাস করা একেবারে পরিত্যাগ করা চাই না। কেননা সহবাস না করিলে স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু স্ত্রীলোকদের কামোত্তেজনা পুরুষাপেক্ষা অনেক বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ স্ত্রীলোকদের সহবাস ইচ্ছা পুরুষদের অপেক্ষা নিরানব্বই ভাগ বেশী। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদিগকে অত্যাধিক লজ্জাশীলা বানাইয়াছেন।

কোন পুরুষেরই তাহার স্ত্রী হইতে চারি মাসের অধিক পৃথক থাকা উচিত নয়। যদি কোন পুরুষ ছয় মাসের অধিক প্রবাসে থাকে এবং এমতাবস্থায় স্ত্রী তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু পুরুষ বাড়ীতে আসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে না আসে, তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী উক্ত স্বামী হইতে পৃথক হওয়ার জন্য কাজীর নিকট আবেদন করিলে কাজীর উচিৎ ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া।

হযরত ওমর (রাঃ) জিহাদের অভিযাত্রীদের মুদ্দত নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিবাহিত অভিযাত্রীদের চারি মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার বাড়ীতে তাহার স্ত্রীর কাছে অবশ্যই আসিতে হইবে।

আজল অর্থাৎ বাহিরে বীর্যপাত করা ঃ গুপ্তাঙ্গের বাহিরে বীর্যপাত করা জায়েয নহে। এইরূপ করিতে হইলে স্বাধীনা স্ত্রীর নিকট হইতে অনুমতি নিতে হইবে। আর যদি সে কাহারও দাসী হয় তবে তাহার মুনিবের অনুমতি নিতে হইবে। হাঁ, তবে নিজের দাসী হইলে অনুমতির প্রয়োজন নাই। এক ব্যক্তি হুযুর (দঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলল্লাহ (দঃ)! আমার এক দাসী

যে। সে আমার খাদেমাও বৈ কি! আমি তাহার সাথে সহবাস করি কিন্তু আমি তাহার গর্ভধারণ করা পছন্দ করি না। হুযুর (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা করিলে আজল করিতে পার কিন্তু তাহার নছীবে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবে।

কুকাজ হইতে বাঁচার পন্থা ঃ কেহ যদি কোন পরস্ত্রীকে দেখিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, তবে তাহার উচিত গৃহে আসিয়া স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করা, তাহাতে তাহার কামোত্তেজনা প্রশমিত হইবে। এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কেহ কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, তবে তাহার স্বীয় স্ত্রীর কাছে গিয়া সহবাস করা চাই, কেননা শয়তান পরস্ত্রীর সুরতে উহার সামনে আসা-যাওয়া করে। আর যদি তাহার নিজের স্ত্রী না থাকে, তবে সে নিজের চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবে।

স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ না করা ঃ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ করা জায়েয নহে। ইহা পুরুষ বা স্ত্রী কাহারও জন্য সিদ্ধ নহে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত অন্যায় কার্য। হুযুরে পাক (দঃ) এর এক দীর্ঘ হাদীসে এই ব্যাপারে নিষেধ আসিয়াছে।

স্বামীর ফরমাবরদারী ঃ স্বামী তাহার স্ত্রীকে সহবাসের ইচ্ছা লইয়া নিকটে ডাকিলে যদি সে না আসে, তবে ইহা তাহার জন্য গুনাহর কার্য বটে।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে স্ত্রী তাহার স্বামীর সহবাসের বাসনা পুরা না করে, সে স্ত্রীর দুই কীরাত গুনাহ হয়, আর যে স্বামী তাহার স্ত্রীর সহবাসের বাসনা পুরা না করে তাহার এক কীরাত গুনাহ্ হয়। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ তাহার স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আহ্বান করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার চলিয়া আসা চাই। আর যদি সে না আসে এবং স্বামী সারা রাত মনে অশান্তি ও ক্রোধ নিয়া কাটাইয়া দেয়, তবে ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত ঐ রমণীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

স্বামীর মর্যাদা ঃ কাসেম ইবনে মাআদ (রাঃ) বলেন, আমি একবার হীরা গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, লোকগণ তাহাদের বাদশাহকে সিজদাহ করিতেছে। অতঃপর আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হুযুরে পাক (দঃ)এর দরবারে হাজির হইলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ(দঃ)! আপনি তো সিজদাহ লাভের অধিক যোগ্য। জবাবে হুযুর (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা বলত, তুমি আমার কবরের নিকট দিয়া যাইবার কালে উক্ত কবরকে সিজদাহ করিবে কি? আমি বলিলাম যে, না করিব না।

তখন হুযুর (দঃ) বলিলেন, তবে এমতাবস্থায় আমাকেও সিজদাহ করিও না। তারপর আবার তিনি বলিলেন, যদি আমি মনে করিতাম যে, (আল্লাহ্ ব্যতীত) কাহাকেও সিজদাহ্ করা যায়, তবে স্ত্রীলোকদেরকে তাহাদের স্বামীদেরকে সিজদাহ্ করিতে নির্দেশ দিতাম। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা স্ত্রীদের উপরে স্বামীর বহু হক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

স্ত্রীদের হক ঃ হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রহঃ) বলেন যে, আমার পিতা হুযুরে পাক (দঃ)এর নকট আরজ করিলেন যে, আমাদের উপর স্ত্রীদের কি হক রহিয়াছে? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, যখন তোমরা পানাহার কর, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও তোমাদের সাথে পানাহার করাও। তোমরা যেরূপ পোশাক পর, তোমাদের স্ত্রীদেরকেও তদনুরূপ পোশাক পরাও। প্রহার দ্বারা তাহাদের চেহারা বিকৃত করিও না। তাহার নিকট হইতে পৃথক থাকিও না। যদি তাহারা সহবাসে বাধ্য না হয় কিংবা বহু ঝগড়া-কলহের পরে রাজী না হয়, তবে প্রথমে তোমরা তাহাকে উপদেশ দিবে। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাইবে। তারপরও যদি সে তাহার জেদ বজায় রাখে তবে তাহাকে পৃথক শয্যায় শয়ন করাইবে এবং তিন দিন পর্যন্ত তাহার সহিত কথা বন্ধ রাখিবে। ইহার ফলে যদি সে পথে আসে তবে তো উত্তম, নতুবা তাহাকে মৃদু প্রহারও করিবে। অবশ্য প্রহার এমন ভাবে করিবে, যেন তাহাতে কোন নিদর্শন ফুটিয়া না উঠে। দোররা বা চাবুক দিয়া প্রহার করা চাই না। কেননা তাহাকে প্রহার করার লক্ষ্য তাহার মারাত্মক ক্ষতি সাধন বা প্রাণনাশ করা নহে। উদ্দেশ্য কেবল তাহার স্বভাবের পরিবর্তন।

অলীমা জিয়াফত ঃ বিবাহে অলীমার অনুষ্ঠান করা মুস্তাহাব। উহার সুন্নত তরীকা হইল অন্যূন একটি বকরী যবেহ করিবে। অলীমায় যে কোন রকমের খানার ব্যবস্থা করা জায়েয। কোনরূপ নির্দিষ্ট খানার ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা নাই। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনকার অলীমা দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় দিনের দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব এবং তৃতীয় দিনের দাওয়াত কবুল করা মুহাব।

অন্যূন একটি বকরী যবেহ করার সমর্থনে দলীল হইল-একদা হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) আবদুর রহমান (রাঃ) কে বলিলেন, একটি মাত্র বকরী দ্বারা হইলেও অলীমা কর। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিলেন, প্রথম দিনকার অনুষ্ঠানই মূল। দ্বিতীয় দিনকার অলীমা করা হয় প্রসিদ্ধির জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে বিবাহের দিনে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তাহা কবুল করে। যদি সে রোযাদার না হয় তবে সে খানায় শরীক হইবে এবং রোযাদার হইলে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আহারাদি ছাড়া বিদায় হইবে। সর্বাবস্থায় অনুষ্ঠানে যোগদান করা চাই।

বিবাহের রীতি ও শর্তাবলী ঃ বিবাহের প্রথম শর্ত মজলিসে জ্ঞানী ও আকেল অলীর উপস্থিতি, দ্বিতীয় শর্ত উক্তরূপ সাক্ষীর উপস্থিতি। তৃতীয় শর্ত পাত্র ও পাত্রীর হাম কুফু অর্থাৎ সমকক্ষতা। চতুর্থ এবং পঞ্চম শর্ত কাহারও মুরতাদ না হওয়া। ষষ্ঠ শর্ত পাত্রীর ইদ্দতের মধ্যে না থাকা। মোটকথা, বিশুদ্ধ বিবাহের কোন প্রতিবন্ধক না থাকা। তাহা ছাড়া বিবাহের পাত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া লওয়া এবং তাহা জুলুম জবরদস্তি ছাড়া হওয়া চাই।

পাত্রীর পক্ষ হইতে সম্মতি গ্রহণের পরে প্রথম খুৎবাহ পাঠ করিবে। খোদ পাত্রীর অলীর খুৎবাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। খুৎবাহ পাঠের পরে পাত্রীর অলী (পিতা কিংবা ভ্রাতা) পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে যে, আমি আমার কন্যা বা ভগ্নি অমুককে এত টাকা দেন মোহরের বিনিময়ে আপনার কাছে বিবাহ দিলাম। জবাবে পাত্র বলিবে, আমি কবুল করিলাম।

বিবাহানুষ্ঠানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত খুৎবাহটিই পাঠ করা। উত্তম এবং মুস্তাহাব। বর্ণিত রহিয়াছে যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কোন বিবাহের মজলিসে গিয়া তথায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খুৎবাহ পাঠ না হইতে দেখিলে তথা হইতে চলিয়া আসিতেন। খুৎবাহটি এইঃ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَا لِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. يَااَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًاسَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيْمًا*

উচ্চারণ ঃ আলাহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু অ নাস্তাঈনুহু অ নাস্তাগফিরুহু অ নাউযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা অ মিন সাইয়্যিআ-তি আ'মালিনা মাইয়্যাহদিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লা লাহু অমাইয়্যুদ্বলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু অ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহু। ইয়া আউয়্যুহান্নাসুত্তাকু রাব্বা-কুমুল্লাযী খালাক্বাকুম মিন নাফসিউ ওয়াহিদাতিউ অ

অখালাক্বা মিনহা যাওজাহা অ বাচ্ছা মিনহুমা রিজালান কাছীরাউ অ নিসায়া অত্তাকুল্লাহালাযী তাসাআলূনা বিহী অল আরহামা, ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাক্বীবা। ইয়া আউয়্যোহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা অকূলূ ক্বাওলান সাদীদাই ইয়ুছলিহ লাকুম আ'মালাকুম অ ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম অ মাই ইয়ুত্বিইল্লাহা অ রাসূলাহু ফাক্বাদ ফাযা ফাওযান আজীমা।
ইহার পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু পড়াও মুস্তাহাব।

فَانْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ - يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

উচ্চারণ ঃ ফানকিহুল আইয়া-মা মিনকুম অচ্ছালিহীনা মিন ইবাদিকুম অ ইমায়িকুম ইয়্যাকূনূ ফুক্বারআ ইউগনি হিমুল্লাহু মিন ফাদ্বলিহী অল্লাহু ওয়াসিউন আলীম। ইয়ারযুক্বু মাইয়্যাশাউ বিগাইরি হিসাব।

ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বারণ করণ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বান্দার প্রতি আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের নির্দেশ দিয়াছেন। এক জায়গায় আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন,
অল আমিরূনা বিল মা'রূফি অন্নাহী আনিল মুনকারি অলহাফিজুনা লিহুদূ দিল্লাহি।
অন্যস্থানে এরশাদ হইয়াছে, 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তা'মুরূনা বিল মারূফি অ তানহাওনা আনিল মুনকারি অতু'মিনূনা বিল্লাহি।'
অন্য এক স্থানে আল্লাহ বলেন, 'অলমু'মিনূনা অল মুমিনাতি বা'দুহুম আউলিয়াউ বা'দ্বিন ইয়ামুরূনা বিল মারূফি অ ইয়ানহাওনা আনিল মুনকারি।'
হাদীস শরীফের এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মানুষকে ভাল কাজ করিতে বল ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখ। নতুবা তোমাদের খারাপ কাজগুলি তোমাদের ভাল কাজের উপর প্রবল ও প্রভাবশালী হইয়া পড়িবে। তোমাদের মধ্যকার নেককারদের দোয়া কবুল হইবে না। হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ভালকাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখ। নচেত তোমাদের নেককারদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না ও তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনাও মঞ্জুর হইবে না। হে মুসলমগণ! একটু চিন্তা কর, এই কাজে তোমাদের রুজী উপার্জনের কাজে বাধা সৃষ্টি হয় না, জীবনের আয়ু কমিয়া যায় না। জানিয়া রাখ, ইয়াহুদী ও নাছারা আলেম এবং দরবেশগণ আমরে বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ তাহাদের পয়গাম্বরদের দ্বারা তাহাদের উপর অভিসম্পাত করাইয়াছিলেন এবং উহাদেরকে বিপদে লিপ্ত করাইয়াছিলেন।
হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন প্রত্যেক আকেল বালেগের উপর মানুষকে সৎ পথে আহ্বান করা ও অসৎ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য। হাঁ, তবে শর্ত হইল, অসৎ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখার সামর্থ্য থাকা চাই এবং এইরূপ আশংকা মুক্ত হওয়া চাই যে, ঐ কাজ করিতে গেলে তাহার জান-মালের ক্ষতি লোকসান ঘটিবে।
আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর লোক যেমন আলেম, হাকীম বা বাদশাহ প্রভৃতি হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই । তবে হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার শর্ত প্রয়োগের কারণ হইল, যাহার ভাল মন্দের জ্ঞান নিজেরই না থাকিবে সে অন্যকে কোন মন্দের বিষয় কি করিয়া বলিবে? তাহার জন্য কিছুতেই সম্ভব হইবে না।
আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকার শর্ত প্রয়োগের কারণ হইল, হুযুরে পাক (দঃ)এর এক হাদীসে আছে, যদি কোন কওমের কোন লোক গুনায় লিপ্ত হয় কিন্তু ঐ কওমের লোকদের তাহাকে ফিরাইয়া রাখার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ফিরাইয়া রাখে না, এমতক্ষেত্রে আল্লাহ তাহাদেরকে তাওবা করার অবসর না দিয়াই উক্ত কাওমের উপরে আযাব নাযিল করেন।

উল্লিখিত ক্ষেত্রে শক্তি ও সামর্থ্য থাকার অর্থ হল, কাওমের ভিতরে নেককারদের সংখ্যাধিক্য বা অন্যান্য শক্তির প্রাবল্য, শাসকের ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি। তবে যদি এই অবস্থা বহাল না থাকে, তাহা হইলে উল্লিখিত কাজটি আমল করা ওয়াজিব হইবে না। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, 'অলা তুলক্বু বি আইদীকুম ইলাত্তাহলুকাহ্' অর্থাৎ নিজের ধ্বংসের দিকে স্বীয় হাত বাড়াইও না।

অন্য আয়াতে রহিয়াছেঃ 'লা তাক্বতুলূ আনফুসাকুম' অর্থাৎ আত্মহত্যায় লিপ্ত হইও না।

ইহা ছাড়া হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিজেই নিজের অমর্যাদা ডাকিয়া আনা কোন মুমিনের কাজ নয়। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) ! তাহা কিরূপে ডাকা হয়? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, এমন কাজে নামিয়া পড়া, যাহা সাধ্যের বাহিরে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যাপারটি সংশোধন করিবার মত তোমার সামর্থ্য নাই, সেখানে ধৈর্য ধারণ করতঃ আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া থাক। যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তায়ালা উহা সংশোধন করিয়া দেন।

শেষকথা এই যে, যখন কাহারও নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, অন্যকে অন্যায় কার্য হইতে ফিরাইয়া রাখার মত সাধ্য ও শক্তি তাহার মধ্যে নাই, তখন তাহার উপর সে কাজ ওয়াজিব হইবে না। তারপর ভয় ভীতির প্রাবল্যের ক্ষেত্রে যদি কাহারও মনে একাজটি জায়েয, কি না জায়েয হওয়ার প্রশ্ন উদয় হয়, তবে আমাদের মতে ইহা জায়েয বলিয়াই মনে করি, বরং কার্যকারকের এক্ষেত্রে সবল মনের অধিকারী ও ধৈর্যশীল হওয়াই অত্যুত্তম। কেননা এক্ষেত্রে একাজ তাহার জন্য জিহাদের তুল্য। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত লোকমান এর কাহিনীতে এরশাদ করিয়াছেন ঃ অর্থাৎ সৎ কাজের নির্দেশ দাও অসৎ কার্যে নিষেধ কর এবং এ ব্যাপারে তোমার উপর যে দুর্যোগ বা বিপদ আসে, তাহাতে ধৈর্যাবলম্বন কর।

হুযুরে পাক (দঃ) হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন যে, আবূ হোরায়ারা! সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজে বারণ কর, আর যে বিপদ-আপদ আসে তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ কর।

জালিম বাদশাহর সামনে এবং কুফরীর প্রভাব ও প্রাবল্যের বেলায়ও যবানে ঈমানের বাক্য জারী রাখা সিদ্ধ। কেননা ঐ দুই অবস্থায়ই সত্য প্রকাশ করা ও জারী রাখা প্রয়োজন বলিয়া সকল ফোকাহা একই মত পোষণ করেন।

খারাপ কার্যে বাধা দেওয়া বা নিষেধ করার ব্যাপারে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উহার প্রথম ভাগ বাদশাহ বা আমীর-উমারা যাহারা বাধা প্রদান বা নিষেধ করার ব্যাপারে শক্তি সামর্থ্যবান। দ্বিতীয় ভাগ যাহারা এক্ষেত্রে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগে অক্ষম হইলেও মুখে তাবলীগ উপদেশ প্রভৃতি পন্থায় চেষ্টা করার সামর্থ্য রাখে অর্থাৎ ইহারা হইলেন আলেম শ্রেণী। তৃতীয় ভাগ ইহল, সাধারণ শ্রেণীর লোক যাহারা শক্তি প্রয়োগেও অক্ষম এবং তাবলীগ ও উপদেশাদি প্রদানেও অপারগ। যাহারা শুধু অন্যায় কাজ ও অন্যায়কারীর প্রতি মনে মনে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি পোষণ করিতে পারে। এই মর্মে এক হাদীস আসিয়াছে যথাঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ কাহাকেও কোন শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হইতে দেখ , তবে তাহাকে হাত দ্বারা বাধা দাও। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে তাহাকে মুখ দ্বারা বাধা দাও আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে মনে মনে তাহাকে খারাপ লোক মনে কর। আর ইহা অবশ্য দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। কোন কোন সাহাবী বলেন, যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখে, কিন্তু তাহাতে তাহার বাধা দেওয়ার শক্তি না থাকে , তবে এইরূপ তিনবার বলিবে, "হে মাবুদ! নিঃসন্দেহে ইহা গর্হিত কার্য।" তাহা হইলে অবশ্যই সে আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার অর্থাৎ সত্যের আহ্বান এবং অসত্যে বারণ করার ছওয়াব অর্জন করিবে।

আমরে বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকারের কার্যকারিতা সম্পর্কিত জন্নে গালেব বা প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, আদেশ করিলেও সে সৎ কাজ করিবে না এবং নিষেধ করিলেও অসৎ কাজ হইতে বিরত হইবে না, এমতাবস্থায় ইমাম আহমদ (রহঃ)এর মতে আমর বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকার ওয়াজিব হইবে না। আর যদি জন্নে গালেব অর্থাৎ প্রবল ধারণা এইরূপ হয় যে, আমরে বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকার কার্যকর হইতে পারে। তবে তেমন ক্ষেত্রে উহা অবশ্যই ওয়াজিব হইবে।

আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের পাঁচটি শর্তঃ যেমন (১) যে কাজের নির্দেশ করিবে ও সে কাজ হইতে নিষেধ করিবে নিজের তাহাতে ভাল এলম এবং জ্ঞান থাকা চাই। (২) উদ্দেশ্য থাকা চাই আল্লাহর খুশী হাসিল করা, দ্বীনের উন্নতি সাধন করা এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা। নিজের প্রসিদ্ধি এবং প্রশংসা লাভের আকাঙ্খা না থাকা। আদেশকারী ও নিষেধকারক যদি একাজে খালেস এবং অকপট হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহর তরফ হইতে তাহার সাহায্য মিলিবে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং তোমাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। (৩) নির্দেশ এবং নিষেধ নম্রতা এবং আন্তরিকতার সাথে হওয়া চাই, উগ্রতা ও রুক্ষতার লেশ না থাকা চাই। (৪) নির্দেশ ও নিষেধকারীর ধৈর্যগুণ ও সহনশীলতা থাকা চাই। সৎ স্বভাব এবং বিনয়গুণ থাকা চাই। (৫) যে নেক কাজের জন্য অন্যকে নির্দেশ দেওয়া হইবে, নিজের সে কজের অভ্যাস থাকা চাই। আর যে অসৎ কাজে অন্যকে নিষেধ করা হইবে, নিজের সে কাজ হইতে পরহেজ করার অভ্যাস থাকা চাই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী প্রনিধানযোগ্য যেমনঃ

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ *

উচ্চারণঃ আতা'মুরূনান নাসা বিল বিররি অ তানসাওনা আনফুসাকুম অ আনতুম তাতলুনাল কিতাবা আফালা তাক্বিলুন। অর্থাৎ তোমরা অপরকে তো সৎ কাজ করিতে বল কিন্তু নিজের ব্যাপার ভুলিয়া থাক। অথচ তোমরা আল্লাহর কোরআন পাঠ করিতেছ, তবু ও তোমাদের এতটুকু হুঁশ হইতেছে না? হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিতেছেন, আমি মেরাজের রাত্রে কতিপয় লোক দেখিলাম, কাঁচি দ্বারা যাহাদের ঠোঁট কাটা হইতেছে।

আমি ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম , ইহারা কাহারা? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, ইহারা আপনার উম্মতের মধ্যে বক্তা শ্রেণীর লোক, যাহারা অন্যকে সৎকাজ করিতে বলিত, কিন্তু নিজেদের ব্যাপার ভুলিয়া থাকিত। অথচ তাহারা কিতাবে ইলাহী পাঠ করিত।

এক শায়ের বলেনঃ

যে কাজ করনা নিজে অপরে করনা বারণ,
এ মত করিলে তব হইবে লজ্জার কারণ।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, একবার আমাকে লোকগণ বলিল, তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও, কিন্তু নিজেকে ভুলিয়া থাক। অপরকে আমার দিকে আহ্বান কর কিন্তু নিজে আমার নিকট হইতে দূরে থাক। তোমার এই প্রচেষ্টা নিরর্থক। এই শেষ কথাটির অর্থ হইল, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজ করিতে বলে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, কিন্তু নিজের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে না, তাহার এই উপদেশ-নসীহত কোন কাজে আসে না।

আমর ও নেহী একাকী করা ঃ সম্ভব হইলে আমর ও নেহী নির্জনে একাকী করা চাই। কেননা এইভাবে উপদেশ দিলে উহা মনে বেশী আছর করে এবং মানুষ অন্যায় কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও নির্জনে উপদেশ দান করে, যেন তাহাকে সংশোধন ও সুন্দর করার চেষ্টা করে, আর যে ব্যক্তি কাহাকেও মানুষের সামনে উপদেশ দান করে সে যেন তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি লোকের সামনে প্রকাশ করে।

তবে যদি কাহারও জন্য নির্জনে উপদেশ কার্যকর না হয়, তবে হুকুমতের তরফ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা চাই। মোটকথা, এই কাজ যেন তেন প্রকার করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে না যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা একাজ যেন তেন ভাবে করিয়া কর্তব্য শেষ করে বা একাজ হইতে উদাসীন থাকে। আল্লাহ তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, যাহারা অন্যায় ও অসৎ কাজ করিত এবং পরস্পরে একে অন্যকে এ ব্যাপারে নিষেধ করিত না, তাহারা ইহা খুবই অন্যায় করিত। যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে যে, লা ইয়াতানাহাওনা আম্মুনকারিন ফাআলুহু লবি'সা মা কানু ইয়াফআলূন। অর্থাৎ যে সকল লোক খারাপ কাজ করিত এবং পরস্পরে একে অপরকে নিষেধ করিত না, তাহাদের এই কাজ খুবই অন্যায় এবং জঘন্য ছিল।

ক্বোরআনে পাকের অন্য আয়াতে আছেঃ লাওলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়্যীনা আল আহবারু আন ক্বাওলিহিমুল ইছমা অ আকলিহিমুস সুহতা লবিসা মাকানু ইয়াছনাউন। অর্থাৎ দরবেশ এবং আলেমগণ মানুষকে মিথ্যা ভাষণ এবং হারাম ভোজন হইতে নিষেধ করিত না। তাহাদের এই কাজ অত্যন্ত অন্যায় এবং গর্হিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)এর উপরে অহী প্রেরণ করিলেন যে, আমি তোমার কওমের চল্লিশ হাজার নেককার এবং ষাট হাজার বদকার লোক ধ্বংস করিয়া দিব। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ) আরজ করিলেন, হে মাবুদ! বদকার লোকেরা তো অবশ্যই তাহাদের পাপের প্রতিফল পাইতে পারে, কিন্তু নেককারদেরকে ধ্বংস করার কারণ কি? আল্লাহ্ বলিলেন, কারণ হইল, উহারা আমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নাই এবং বদকারদের সাথে সদা-সর্বদা উঠা-বসা ও খানা-পিনা করিয়াছে।

স্রষ্টার পরিচয়

আয়াতে ক্বোরআনী এবং অন্যান্য দলীল প্রমাণ মতে স্রষ্টার পরিচয় জানার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি একীন রাখা দরকার, যথা ঃ আল্লাহ্ এক এবং একক। তাঁহার জন্মদাতা নাই, সন্তান নাই। তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই। কোন কিছুই তাঁহার বরাবর নাই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী। তাঁহার সমান কেহ নাই। কেহ সাহায্যকারী নাই, কেহ আশ্রয়দাতা বা আশ্রয় স্থল নাই, পরামর্শদাতা নাই। কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার কোন আকার বা আকৃতি নাই। তিনি এমন সত্তা নহেন, যাহাকে অনুভব করা যায় বা অবলোকন করা যায়, কিংবা যাহার বিষয় ভাবিয়া কিনারা পাওয়া যায়। তিনি এমন সত্তা যাঁহার অবস্থা চিন্তা করিয়া আয়ত্ত করা যায় না। তাঁহার কোন অংশ বা উসিলা নাই। তিনি অনন্ত, অসীম, তাঁহার কোন সীমা বা আদি-অন্ত নাই।

আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি

তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমানকে উপরে স্থাপন করিয়াছেন এবং যমিনকে নীচে বিছাইয়াছেন। তিনি কোন অন্ধকার বস্তুর মত নন আবার তিনি কোন উজ্জ্বল বস্তুর মতও নন। তাঁহার সর্ব বিষয়ের এলেম বিদ্যমান। সব কিছুই তিনি দেখেন। তিনি সব কিছুর উপরে শক্তিমান ও জয়যুক্ত। সকল কিছুর উপরে আদেশকর্তা এবং সব কিছুর মালিক এবং সর্বশক্তিমান। সবার উপর অনুগ্রহশীল। তিনি গুনাহ ক্ষমাকারী ও দোষ মোচনকারী । তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং অনস্তিত্বের জগত হইতে অস্তিত্বের জগতে আনয়নকারী। তিনি সকলের আদি ও সকলের অন্ত। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনিই সবার উপাস্য। তিনি এমন সত্তা যাহার কখনও মৃত্যু নাই, যিনি চিরস্থায়ী অর্থাৎ সদা জীবন্ত। তাঁহার কখনও বিনাশ কিংবা শেষ নাই। তাঁহার তন্দ্রা নাই। তিনি এমন শক্তিধর, যাঁহার কেহ কোনরূপ লোকসান বা ক্ষতি করিতে সক্ষম নয়। তাঁহাকে কেহ কোনরূপ অধীন করিতে পারে না। তাঁহার শানদার নাম রহিয়াছে। তিনি সর্বাধিক দাতা। তিনি সমগ্র জাহান ধ্বংস করিবেন। তিনি ক্বোরআনে পাকে ফরমাইয়াছেন, 'কুল্লুমান আলাইহা ফান অ ইয়াবক্বা অজহু রাব্বিকা যুলজালালি অল ইকরাম।' অর্থাৎ আসমান ও যমিনের উপরে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে, কেবল মাত্র তোমার সম্মানিত ও কারামতওয়ালা প্রভু বাকী থাকিবেন। তিনি সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার সম্পর্কে কোনরূপ ধ্যান-ধারণা মানুষের উপর ধ্যান-ধারণার অনুরূপ করিলে তাহা ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি নিজের তৈরী সৃষ্টি জগতের যে কোন কিছুর সহিত সামঞ্জস্য হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং অতি উচ্চে। প্রত্যেকে রোজ কিয়ামতে তাঁহার সামনে একাকী গিয়ে দণ্ডায়মান হইবে। আর সেদিন তিনি প্রত্যেক বদকারকে তাহার বদীর প্রতিফল এবং নেককারকে তাহার নেকীর পুরস্কার প্রদান করিবেন। সমস্ত মাখলূকের রুজী রিজিক দাতা একমাত্র তিনি, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট রুজীর জন্য মুখাপেক্ষী নহেন।

সাত আসমান-যমীন

আল্লাহ্ তায়ালা সাত আসমানকে একের উপরে আর এককে সৃষ্টি করিয়াছেন। তদ্রূপভাবে তিনি সপ্তস্তর যমিনকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্বোপরি যমিনের সাথে সর্বনিম্ন আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ এবং এক আসমান হইতে অন্য আসমানের দূরত্বও ঐ পরিমাণ। সপ্তম আসমানের

উপরে আরশ অবস্থিত ও আরশের উপরে স্বয়ং আল্লাহ বিরাজমান। তিনি সত্তর হাজার পর্দার অন্তরালে রহিয়াছেন। কতগুলি পর্দা নূরের, কতগুলি গাঢ় অন্ধকারের এবং আরও কতগুলি পর্দা রহিয়াছে। উহার খবর কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আরশ ধারণকারী ফেরেশ্তাগণ

আল্লাহর খাস এবং সুনির্দিষ্ট ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের আরশে আজীমকে ধারণ করিয়া আছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ 'আল্লাযীনা ইয়াহমিলূনাল আরশা অমান হাওলাহু'। আরশে আজীমের আয়তন এবং সীমা রহিয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু আল্লাহ-ই অবগত। আল্লাহর ফেরেশতাদিগের দ্বারা আরশে আজীম পরিবেষ্টিত । আরশ লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের তৈরী। উহার ব্যাপ্তি বা প্রশস্ততা সমগ্র আসমান এবং যমিন ব্যাপিয়া। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ 'আর রাহমানু আলাল আরশিসতাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আরশে আজীমে আসীন। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী একথা বলা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বস্থলে বিরাজমান নন। আল্লাহ তায়ালা এইরূপও বলিয়াছেন যে, 'ছুম্মাসতাওয়া আলাল আরশির রাহমান।'

শেষ রাতের নামায প্রথম রাতের নামায হইতে বেশী ফজীলত ওয়ালা

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ দারদা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ হযরত আয়েশার (রাঃ) এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই কারণেই ইহারা সকলেই শেষ রাতের নামাযকে প্রথম রাতের নামায অপেক্ষা উত্তম বলিতেন।

হযরত আবূবকর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা পনেরই শা'বানের রাতে আসমান হইতে দুনিয়ার দিকে অবতরণ করেন এবং এই সমস্ত লোক ছাড়া যাহাদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শিরক রহিয়াছে, অন্য সকলকে ক্ষমা প্রদান করেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নিজে শুনিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন রাতের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা আসমান হইতে আসমানী দুনিয়ার দিকে নামিয়া আসেন এবং বলিতে থাকেন, কিহে কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে নাকি? আমি তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিব। কোন কিছু প্রার্থনাকারী আছে নাকি? আমি তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। কেহ তাওবাহ করিবার ইচ্ছুক আছে নাকি? আমি তাহার তাওবাহ কবুল করিব। রাত ভোর পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে।

হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি যে বলিয়াছেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা আসমান হইতে দুনিয়ার দিকে নামিয়া আসেন আবার উপরে উঠিয়া যান'। আল্লাহ এভাবে নড়া-চড়া করেন, ইহা কিরূপ হাদীস? হযরত ইসহাক (রাঃ) জিজ্ঞাসাকারীকে বলিলেন, তুমি তো এই কথা বলিতে চাহ যে, আল্লাহ পাক বিনা নড়া-চড়াতেই অবতরণ ও আরোহণ করিতে সক্ষম? জিজ্ঞাসাকারী বলিলেন, হাঁ জনাব। তাহার কথার জবাবে হযরত ইসহাক বলিলেন, যদি তাই হয়, তবে তিনি যে নড়া-চড়া করিয়াও উঠিতে নামিতে পারেন, তাহাতে অবিশ্বাস কর কেন?

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) বলিলেন, যদি কোন মোতাজেলা পন্থি তোমাদের কাছে এইরূপ বলে যে, আমি এইরূপ প্রতিপালকের উপরে আস্থাশীল নহি, যিনি স্বস্থান হইতে নামিয়া আসেন, তবে তোমরা তাহাকে বলিবে যে, আমরা কিন্তু এইরূপ প্রতিপালকের প্রতি আস্থাবান যিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

হযরত শারীক ইবনে আব্দুল্লাহকে বলা হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে এইরূপ কিছু লোক আছে, যাহারা এই হাদীসগুলিকে অস্বীকার করে। একথা শুনিয়া শারীক (রাঃ) বলিলেন, দেখ! আমাদের কাছে নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি নাম পরিচয় কিসের মাধ্যমে আসিয়াছে? ইহা কি হুযুরে পাক (দঃ)এর তরফ হইতে বর্ণিত হইয়া আসে নাই এবং এই সমস্ত হাদীস দ্বারাই কি আমরা আল্লাহর পরিচয় লাভ করি নাই?

কোরআন মজীদ আল্লাহর বাণী

আমরা একীন এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, ক্বোরআন মজীদ আল্লাহর বাণী, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কথা-বার্তা এবং আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ। ইহা হযরত রাসুলে কারীম হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাযিল হইয়াছে।

ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) ইহা আল্লাহর তরফ হইতে বহন করিয়া আনিয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট পৌছাইয়াছেন।

খোদ আল্লাহ বলেন, 'নাযালা বিহির রুহুল আমীনু আলা ক্বালবিকা লিতাকূনা মিনাল মুনযারীনা বিলিছানিন আরাবিয়্যিম মুবীন।' অর্থাৎ ফেরেশতা জিব্রাইল ইহা আপনার দিলে পৌছাইয়াছে আরবী ভাষায়, যেন আপনি ইহার দ্বারা মানুষকে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন।

হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এই ক্বোরআনের বাণী আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে স্বীয় উম্মতদিগের কাছে পৌছাইয়া দিলেন, আল্লাহর সেই নির্দেশ হইলঃ

ইয়া আইয়্যুহার রাসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলাইকা মিররাব্বিকা'। অর্থাৎ হে নবী! আপনার প্রভুর তরফ হইতে আপনার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা (মানুষের মাঝে) প্রচার করুন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,.হুযুরে পাক (দঃ) হজ্বের সময়ে মানুষের সামনে নিজের পরিচয় প্রদান করতঃ বলিতেছিলেন, এরূপ কেহ কি আছে যে, আমাকে তাহার কওমের লোকদের কাছে নিয়া যাইবে। কোরায়েশগণ তো আমাকে (তাহাদের মাঝে) কোরআন প্রচারে বাধা প্রদান করিতেছে।

আল্লাহ পাক এক আয়াতে বলেনঃ 'অইন আহাদুম মিনাল মুশরিকীনাস তাজারাকা ফাআজিরহু হাত্তা ইয়াসমায়' কালামাল্লাহি।' অর্থাৎ যদি কোন মুশরেক আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহাকে আশ্রয় দিন যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পারিবে।

ক্বোরআনের বাণী কাদীম বা চিরন্তন বস্তু। আল্লাহ যেমন চিরন্তন, তেমন তাঁহার বাণীও চিরন্তন ইহাতে কোন তর্কের অবকাশ নাই। যাহারা ইহাকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলে। তাহারা অবিশ্বাসী কাফির।

ক্বোরআন যেমন কাদীম, তেমন হরূফে ক্বোরআন অর্থাৎ কোরআনে পাকের অক্ষরসমূহও কাদীম বা চিরন্তন মাখলুক বা সৃষ্ট নয়।

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ

আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটি পবিত্র নাম রহিয়াছে। যে ইহা স্মরণ (যিকির) করিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এই সমস্ত নাম ক্বোরআনে পাকের বিভিন্ন সূরায় নিহিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে পাঁচটি নাম তো সূরা ফাতিহাতেই রহিয়াছে যেমন (১) আল্লাহ (২) রাব্বুন (৩) রাহমানু (৪) রাহীমুন এবং (৫) মালিকুন।

সূরা বাকারাতে রহিয়াছে চব্বিশটি নাম যথা ঃ (১) মুহীতুন (২) ক্বাদীরুন (৩) আলীমুন (৪) হালীমুন (৫) তাওয়্যাবুন (৬) বাছীরুন (৭) ওয়াসিউন (৮) বাদীউন (৯) রাউফুন (১০) শাকিরুন (১১) আল্লাহু (১২) ওয়াহিদুন (১৩) গাফূরুন (১৪) হাকীমুন (১৫) ক্বাবিদ্বুন (১৬) বাসিত্বুন (১) লা ইলাহা ইল্লা হুয়া (১৮) হাইয়্যুন (১৯) ক্বাইয়্যুমু (২০) আলিয়্যুন (২১) আজীমুন (২২) অলিয়্যুন (২৩) গানিয়্যুন (২৪) হামীদুন।

সূরা আলে ইমরানে রহিয়াছে চারিটি নাম, যথা (১) ক্বায়িমুন (২) ওয়াহ্হাবুন (৩) সারীউন (৪) খাবীরুন।

সূরা নিসায় রহিয়াছে ছয়টি নাম, যথা ঃ (১) রাক্বীবুন (২) হাসীবুন (৩) শাহীদুন (৪) অকীলুন (৫) গাফূরুন (৬) মুক্বীতুন।

সূরা আনআমে রহিয়াছে পাঁচটি নাম, যথা ঃ (১) ফাতিরুন (২) ক্বাহিরুন (৩) ক্বাদিরুন (৪) লাত্বীফুন (৫) খাবীরুন।

সূরা আহযাকে রহিয়াছে দুইটি নাম, যথা ঃ (১) মুহিয়্যুন (২) মুমীতুন।

সূরা আনফালে রহিয়াছে দুইটি নাম, যথা ঃ (১) নি'মাল মাওলা (২) নি'মান্নাছীর।

সূরা হুদে রহিয়াছে সাতটি নাম, যথা ঃ (১) হাফীজুন (২) রাক্বীবুন (৩) মাজীদুন (৪) ক্বাওয়িয়্যুন (৫) মুজীবুন (৬) অদূদুন (৭) ফায়্যালুন।

সূরা হজ্বে রহিয়াছে দুইটি নাম যথা ঃ (১) কাবীরুন (২) মুতাআলুন।
সূরা ইব্রাহীমে রহিয়াছে একটি নাম, যথা ঃ (১) মান্নানুন।
সূরা হুজরে রহিয়াছে একটি নাম যথা ঃ (১) খাল্লাক্বুন।
সূরা নহলে রহিয়াছে একটি নাম যথা ঃ (১) বায়িছুন।
সূরা মারইয়ামে রহিয়াছে দুইটি নাম যথা ঃ (১) ছাদিক্বুন (২) ওয়ারিছুন।
সূরা মু'মিনূনে রহিয়াছে একটি নাম যথা ঃ (১) কারীমুন।
সূরা নূরে রহিয়াছে তিনটি নাম যথা ঃ (১) হাক্কুন (২) মাতীনুন (৩) নূরুন।
সূরা ফুরক্বানে রহিয়াছে একটি নাম যথা ঃ (১) হাদিয়্যুন।
সূরা সাবাতে রহিয়াছে একটি নাম, যথা ঃ (১) ফাত্তাহুন।
সূরা মুমিন এ রহিয়াছে চারিটি নাম যথা ঃ (১) গাফিরুন (২) ক্বাবিলুন (৩) শাদীদুন (৪) যাত্তুলি।
সূরা যাযযারিয়াতে রহিয়াছে তিনটি নাম যথা ঃ (১) রাযযাক্বুন (২) যালকুওয়্যাত (৩) মাতীনুন।
সূরা ইক্বতারাবাতিসসাআতে রহিয়াছে একটি নাম; যথা (১) মুক্বতাদিরুন।
সূরা রাহমানে রহিয়াছে তিনটি নাম, যথা ঃ (১) বাক্বীউন (২) যুলজ্বালালি (৩) অল-ইকরাম।
সূরা হাদীদে রহিয়াছে চারিটি নাম; যথা ঃ (১) আউয়্যালুন (২) আখিরুন (৩) জাহিরু (৪) বাত্বিনু।
সূরা হাশরে রহিয়াছে দশটি নাম যথা ঃ (১) কুদ্দুসুন (২) সালামুন (৩) মু'মিনুন (৪) মুহাইমিনুন (৫) আযীযুন (৬) জাব্বারুল (৭) মুতাকাব্বিরুম (৮) খালিক্বুন (৯) বারিয়্যুন (১০) মুসাব্বিরু।
সূরা বুরুজে রহিয়াছে দুইটি নাম যথা ঃ (১) মুবদিয়ু (২) মুইদুন। এবং সূরা ইখলাসে রহিয়াছে দুইটি নাম যথা ঃ (১) আহাদুন (২) ছামাদুন।

হযরত সুফিয়ান আইনিয়াহ (রহঃ) বর্ণিত আসমাউল হুসনাসমূহ এই এবং আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (রহঃ) আরও কিছু নাম যোগ করিলেনঃ যথাঃ (১) মুজিবুন (২) ক্বাহিরুন (৩) ফাদ্বিলুন (৪) খালিক্বুন (৫) রাক্বীবুন (৬) মাজিদুন (৭) জাওয়াদুন (৮) আহকামুল হাকিমীন।

আবূ বকর নাক্বাশ (রহঃ) কিতাবুত্তাফসীরুল আসমাউ অছছিফাতে হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ পাকের সর্বমোট তিনশত ষাটটি পবিত্র নাম রহিয়াছে। কোন এক রাওয়ায়েতে আছে যে, আল্লাহ তায়ালার নাম রহিয়াছে মোট একশত চল্লিশটি।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান কাহাকে বলেঃ আমাদের আকীদা মতে যবানে উচ্চারণ (স্বীকার) করা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও তদনুরূপ কাজ করার নাম ঈমান। ঈমান ইবাদাত দ্বারা বৃদ্ধি পায়, গুনাহর দ্বারা লাঘব হয়, এলম দ্বারা মজবুত হয়। মূর্খতার দ্বারা দুর্বল হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ বলেনঃ

'আম্মাল্লাযীনা আমানূ ফাযাদাত হুম ঈমানাউ অহুম ইয়াসতাবছিরূন।'

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা আনন্দিত হয়।

এইভাবে যাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হ্রাস প্রাপ্তও হইতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন; "অ ইহা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানান"। অর্থাৎ যখন তাহাদের সামনে আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাহাদের ঈমান বৰ্দ্ধিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ঈমান হ্রাস প্রাপ্তও হয় এবং বৃদ্ধিও পায়। তবে আশায়েরাদের মতে ঈমানের কোনরূপ কমি-বেশীর অবকাশ নাই।

ঈমানের শাব্দিক অর্থ ঃ অভিধানে ঈমানের অর্থ হইল কোন কিছুর উপর অন্তর দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা এবং শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ আল্লাহ পাকের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর নাম ও ছেফাতসমূহ জানিয়া লইয়া উহার উপরে একীন রাখা এবং ফরজ, ওয়াজিব এবং নফলাদি আদায় করা, গুনাহ ও অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকা।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের পরিচয়

ইসলামের পরিচয় যদিও ঈমান দ্বারা প্রদান করা যায়, কেননা ঈমানের মধ্যেই ইসলাম রহিয়াছে, কিন্তু ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমান না থাকা সম্ভব। যেহেতু ইসলামের অর্থ বাধ্যগত ও ফরমাবরদার হওয়া। আর প্রত্যেক মুমিনই বাধ্যগত ও ফরমাবরদার বৈকি। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুসলমান কিন্তু আল্লাহর উপর (আন্তরিক) বিশ্বাসী নহে, বরং অনেকেই মুসলমান হইয়াছে ভয়-ভীতি ও পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির কারণে।

ঈমান শব্দটি সর্ববিধ যবানী ও ফে'লী ছেফাত আয়ত্তকারী ও ইহার গণ্ডির ভিতরে আল্লাহ পাকের সর্বরকম ইবাদাত শামিল। পক্ষান্তরে ইসলাম শব্দের অর্থ হইল মুখে কালেমায় শাহাদাত উচ্চারণ করা, অন্তরে উহা বিশ্বাস করা এবং ইসলামের পঞ্চরোকন (বা ইবাদাত) পালন করা। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ঈমানকে ইসলাম হইতে ভিন্ন বস্তু বলেন। কারণ হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস রহিয়াছেঃ

তিনি বলেন, একদা আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। হঠাৎ ধবধবে শ্বেতবসন পরিহিত ঘন কাল চুল বিশিষ্ট এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চেহারা বা পোশাকে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল না। আমাদের মধ্যে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। লেকটি আসিয়াই রাসুলে খোদার (দঃ) জানুর সহিত স্বীয় জানু সংলগ্ন করিয়া বসিয়া পড়িল এবং স্বীয় হস্তদ্বয় নিজের হাটুর উপর রাখিয়া বলিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! বলুন তো ইসলাম কাহাকে বলে?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইসলাম হইল কালেমায় শাহাদাত। যথাঃ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু' পাঠ করা; পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, যাকাত দান করা, রমজান মাসের রোযা রাখা এবং সঙ্গতি থাকিলে হজ্জ্ব আদায় করা।

হুযুর (দঃ)-এর জবাব শুনিয়া লোকটি বলিল, হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি সম্পূর্ণ সঠিক এবং সত্য বলিয়াছেন। লোকটির কথায় সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল, কারণ সে-ই প্রশ্ন করিল, আবার সে-ই জবাবকে মানিয়া ও স্বীকার করিয়া লইল। তারপর লোকটি বলিল, হে নবী (দঃ)! আপনি ঈমানের পরিচয় বলুন। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল আল্লাহতায়ালা, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার নবী, কিয়ামত এবং অদৃষ্টের ভাল-মন্দের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। শুনিয়া সে লোকটি বলিল, আপনি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াছেন।

ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, হে নবী (দঃ)! বলুন তো এহসান (ইবাদাতের সৌন্দর্য) কাহাকে বলে? হুযুর (দঃ) জবাবে বলিলেন, এহসান উহাকে বলে যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত এইভাবে করিবে যেন আল্লাহকে তুমি, সামনে দেখিতেছ । আর যদি তাহা না হয়, তবে তোমার মনের অবস্থা অন্ততঃ এইরূপ থাকিবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন । লোকটি আবার আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি কিয়ামত সংঘটনের অবস্থার কথা বর্ণনা করুন । হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, কিয়ামতের সংঘটনের অবস্থা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে সে উহা জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী অবগত নয়।

তখন উক্ত লোকটি বলিল, তবে আপনি কিয়ামতের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করুন । হুযুর (দঃ) বলিলেন, কিয়ামতের আলামত হইল, কৃতদাসীগণ তাহাদের মুনিব প্রসব করিবে এবং গরীব, দুঃস্থ, নিরন্ন লোকগণ আমীর উমারা হইয়া পড়িবে।

বর্ণনাকারী বলেন যে, (লোকটি চলিয়া যাইবার পরেও) আমি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। অতঃপর হুযুর (দঃ) আমাকে বলিলেন, ওমর ! তুমি জান কি এই প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তাহা ভাল জানেন। তখন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইনি হইলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)। তোমাদেরকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য ইনি আসিয়াছিলেন । ইতিপূর্বে তিনি যখন যে আকৃতিতে আসিয়াছেন আমি সাথে সাথে তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি । কিন্তু এইবারকার আকৃতি দেখিয়া আমি তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে পারি নাই। একটু বিলম্বে চিনিতে পারিয়াছি ।

ঈমানের ভিতরে যে কমি-বেশী হয়, তাহা কেবল মাত্র রোযা-নামাযের কারণেই নহে; বরং আন্তরিক বিশ্বাসের পরে দ্বীনের বিভিন্ন আদেশ নিষেধের অনুবর্তিতা, তাকদীরে বিশ্বাস, আল্লাহর যে কোন কাজের উপরে খুশী ও সন্তুষ্টি, আল্লাহ্ প্রদত্ত রুজী প্রদানের ওয়াদার উপরে নির্ভরতা তথা কোন প্রকার সন্দেহ বা ইতস্তত না করা, নিজের শক্তি সামর্থ্য দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করার মনোভাব পোষণ না করা। তাহা ছাড়া বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আল্লাহতায়ালাকে যে কোন রকম দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত মনে করা এবং যেকোন অবস্থায় আল্লাহর উপর কোনরূপ দোষারোপ না করা প্রভৃতি কাজগুলির মাধ্যমেও ঈমানের ভিতরে কমি-বেশী হইয়া থাকে।

মুমিন হওয়ার দাবীঃ কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য একথা বলা জায়েয নয় যে, নিশ্চয় আমি ঈমানদার বা পাক্কা মুমিন। বরং বলা চাই যে, ইনশাআল্লাহ্ আমি মুমিন। ইহার কারণ হইল, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে বলে যে, আমি বেশক মু'মিন, সে বেঈমান। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে বলা হইল যে, অমুক ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চিতরূপে আমি মুমিন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি বেহেশতী হইবে, না দোজখী! লোকগণ তাহা জিজ্ঞাস করিল। লোকটি জবাবে বলিল, তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ কথা শুনিয়া বলিলেন, সে যখন দ্বিতীয় ব্যাপারটি আল্লাহর উপর সোপর্দ করিল, প্রথমটিকে কেন করিল না?

মূলতঃ সত্যিকার অর্থে খাঁটি মুমিন তো সেই ব্যক্তিই যে, আল্লাহর কাছে খাঁটি ঈমানদার এবং সেই ব্যক্তি বেহেশতীও হইবে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও ঈমানদার হওয়া, না হওয়ার প্রকৃত পরিচয় কেবল তখনই হইবে যখন সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করিবে। অথচ এই খবর বা ব্যাপারটি কাহারও জানিবার বা বুঝিবার কথা নহে। ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন এবং সে লোকটির ব্যাপারে কি ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাও শুধু মাত্র আল্লাহতায়ালাই জানেন। সুতরাং এই দৃষ্টিতে নিশ্চিতরূপে আমি মুমিন না বলিয়া ইনশাআল্লাহ্ আমি মুমিন বলাই সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত।

পক্ষান্তরে যাহারা 'নিশ্চিতরূপে আমি মুমিন' বলার পক্ষপাতি, তাহাদের পক্ষে যুক্তি হইল, যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে একীন রাখে যে, আল্লাহর বান্দার প্রকৃত কল্যাণ এবং জীবনের সার্থকতাই নিহিত আছে আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের ভিতরে, আর এই একীনের ভিত্তিতে যে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সে নিজের এই আন্তরিক বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করিতে গিয়া সেখানে যত বেশী জোর প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে এতটুকু মাত্র ত্রুটি বা সামান্য ইতস্ততঃও করিবে কেন? বরং সে তো নিশ্চিন্তায় ও নির্দ্বিধায়ই বলিবে যে, নিশ্চিতরূপে আমি মুমিন বা আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপনকারী।

কিসমত ও অদৃষ্টঃ আমাদের আকীদাহ হইল, আল্লাহতায়ালা রুজী পয়দা করতঃ তাহা বন্টন বা বান্দার জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যাহার জন্য যে রিজিক নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা কেই কোনরূপে বন্ধ করিতে পারে না বা অন্য কোথাও পরিবর্তনও করিয়া দিতে পারে না। আর এই

বন্টিত রিজিকে কেহ্ কোনরূপে কমি-বেশীও করিতে পারে না। কাহারও নরম খাদ্যকে কঠিন কিংবা কঠিন খাদ্যকে নরম করারও সাধ্য কাহারও নাই। কাহারও আগামী দিনের জন্য নির্দ্ধারিত খাদ্য অদ্য খাইবার কোন সাধ্য নাই।

আমাদের অদৃশ্যে বিশ্বাস ও আকীদা

আযাব ও ছওয়াব ঃ আমাদের বিশ্বাস মুমিন ব্যক্তি গুনাহ্ ছগীরাহ্ বা কবীরাহ্‌র ফলে দোজখে যাইয়া তথায় সে চিরকাল থাকিবে না। বরং অবশেষে সে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিবে। দোজখ তাহার জন্য পার্থিব জেলখানার ন্যায় হইবে। দোজখে সে তাহার গুনাহ্‌র পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। ঐ মুমিন ব্যক্তির মুখ এবং সিজদাহ্‌র স্থানসমূহ দোজখের আগুন স্পর্শ করিবে না। কেননা ঐ স্থানসমূহ দোজখের আগুনের পক্ষে জ্বালানো নিষিদ্ধ। মুমিন ব্যক্তি যতদিন দোজখে থাকিবে, তাহার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে রহমতের আশা এতটুকু মাত্র কমিবে না। এই অবস্থায়ই সে দোজখ হইতে বাহির হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে। দুনিয়াতে ইবাদাত-বন্দেগীর পরিমাণ অনুযায়ী বেহেশতে সে মর্যাদা লাভ করিবে।

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ইহার বিপরীত। তাহাদের মতে মুমিন ব্যক্তি কোনরূপ কবীরাহ্ গুনাহ করিলে তাঁহার অন্যান্য ইবাদাত নষ্ট হইয়া যায়। খারেজী সম্প্রদায়ও এইরূপ মত পোষণ করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা ভাল-মন্দ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ও উহার প্রতিদানস্বরূপ যেই পুরস্কার ও শাস্তি রহিয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস রাখা মুমিনদের প্রতি ওয়াজিব, দুনিয়াবী সুখ-শান্তি যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ মনে করিবে। এইরূপ কখনও মনে করিবে না যে, ইহা আমরা আমাদের চেষ্টায় লাভ করিয়াছি। অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে, এখন যাহা কিছু হইতেছে ও ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে তাহা সকলই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও আদেশে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। মানুষের ভাগ্য লাওহে মাহফুজে যাহা কিছু লিখিত রহিয়াছে, তাহা সবই অবশ্য কার্যে পরিণত হইবে। দুনিয়ার সর্বশক্তি মিলিয়াও কাহারও ভাগ্যের কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ বলেন, যদি আল্লাহ্ তোমাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহেন তবে শুধু সেই আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উহাতে বাধা দিতে সক্ষম নহে। আর যদি তিনি কাহাকেও সুফল দিতে চাহেন তবে তাহাতেও একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেহই বাধা দিতে পারে না। তিনি স্বীয় বান্দার যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ ও যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা প্রদান করেন।

যায়েদ ইবনে ওয়াহাব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুর (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন, মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য অবস্থান করে, পরে উহা চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট রক্তের আকার ধারণ করিয়া থাকে। তারপরে উহা চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটুকরা মাংস পিণ্ডের আকারে থাকে। তারপর উহা যখন একটি জীবিত সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে হইতে ভূমিষ্ট হয়, সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হুকুমে ফেরেশতা তাহার জীবিকা, কার্য, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য লইয়া হাজির হইয়া যায়। যাহার ভাগ্য ভাল লিখা থাকে, সে দুনিয়াতে যত পাপই করুক না কেন এমনকি তাহার ও দোজখের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুই হাতের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেও হঠাৎ সে পাপ বর্জন করিয়া পুণ্যের কাজ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং এই কাজ করিতে করিতেই তাহার মৃত্যু আসিয়া যায় এবং সে বেহেশতে প্রবেশ করে।

আর যাহার ভাগ্য মন্দ লিখা থাকে, সে দুনিয়াতে যত পুণ্যের কাজই করুক না কেন, এমন কি তাহার ও বেহেশতের মাঝে ব্যবধান মাত্র দুই হাতের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেও হঠাৎ পুণ্যের কাজ ছাড়িয়া দিয়া পাপের কাজ শুরু করে এবং এই কাজ করিতে করিতেই তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়ে এবং সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হয়।

হিশাম ইবনে আরওয়াহ্ বলেন, আমার পিতা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ্ বেহেশত প্রাপ্তির কাজ করে, অথচ লাওহে মাহফুজে তাহার ভাগ্যে দোজখ লিখিত রহিয়াছে। যখন সে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, তখন সে বেহেশত প্রাপ্তির কাজ পরিত্যাগ করিয়া দোজখের উপযুক্ত কাজ করিতে শুরু করে এবং এই অবস্থায় দোজখের যোগ্য কাজ করিতে করিতেই মৃত্যুবরণ করিয়া দোজখে প্রবেশ করে। আবার লাওহে মাহফুজে কোন ব্যক্তির ভাগ্যে হয়ত বেহেশত লিখা থাকে। অথচ সে দোজখের কাজ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে সহসা সে ঐ কাজ পরিত্যাগ করিয়া পূণ্যের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আর এই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করে।

আবদুর রহমান সালামী বলেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন হুযুর (দঃ)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল। উহা দ্বারা তিনি মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। সহসা তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, এমন কেহ্ নাই যাহার ভাগ্যে দোজখ কিংবা বেহেশত নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। এ কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! তবে আমার কি জন্য তাকদীরের উপর ভরসা করতঃ এবাদত-বন্দেগী, কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করতঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি না?

জবাবে হুযুর (দঃ) বলিলেন, কর্তব্য পালন করিয়া চল। আর স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্ যে কাজ যাহার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন, উহা সম্পাদন করা কর্তব্যপালনকারীর পক্ষেই সহজ সাধ্য হয়।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতার নিকট হইতে বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার হুযুর (দঃ)-এর কাছে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আপনি আমাকে জানাইয়া দিন যে, আমার ভাগ্যে যাহা লিখিত আছে আমি কি তাহাই করি, না যাহা কিছু করি, পরে তাহাই লিখা হয়? হুযুর (দঃ) জবাবে বলিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ্ যাহা কিছু করিবার প্রথম দিনেই করিয়াছেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমরা কেন ভাগ্যের উপর ভরসা করিয়া থাকি না? হুযুর (দঃ) বলেন খাত্তাব তনয়! তুমি কাজ করিয়া চল। যে ব্যক্তির জন্য যাহা নির্দ্ধারিত আছে, উহা তাহার পক্ষে করা সহজ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি অসৎ কর্মশীল হয়, সে অসৎ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়।

মে'রাজ এবং দীদারে ইলাহী

শবে মে'রাজঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) মে'রাজের রাত্রে স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে নিজের চর্মচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন। অন্তর চক্ষু দ্বারা নহে এবং স্বপ্নযোগেও নহে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) 'অলাক্বাদ রায়াহু নাযলাতান উখরা' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, আমি আমার প্রভুকে একেবারে সরাসরি সামনা-সামনি দেখিয়াছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং 'ইনদা সিদরাতিল মুনতাহার ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটে দেখিয়াছি। এমন কি প্রভুর চেহারার নূর আমার সামনে বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'অমা জাআলনার রুইয়াল্লাতী আরাইনাকা ইল্লা ফিতনাতাল্লিন্নাসি' আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় রুইয়া শব্দটির অর্থ চর্মচক্ষুর দর্শনই বলিয়াছেন। অর্থাৎ শবে মে'রাজে, আল্লাহ্ স্বয়ংকে রাসূলের (দঃ) চর্ম চক্ষুর দ্বারাই প্রদর্শন করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহ খলীলুল্লাহ এবং হযরত মুসা (আঃ) কে কালীমুল্লাহ (এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে রুহুল্লাহ) উপাধি দিয়াছেন, তদ্রূপ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে দীদারে ইলাহীর মর্যাদা দিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) নিজের প্রতিপালককে স্বীয় চর্মচক্ষু দ্বারা দুইবার অবলোকন করিয়াছেন। এই হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত (মুনকেরে রুইয়াতমূলক চর্মচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন নাই ছাবেতকারী) হাদীসটির সাথে সংঘাতমূলক নয়। কেননা সে হাদীসে না বোধক উক্তি এবং ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এ হাদীসে হাঁ বোধক উক্তি বর্তমান। আর বিধান হইল, এইরূপ ক্ষেত্রে হাঁ বোধক হাদীসকে না বোধক হাদীসের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। বিশেষতঃ এখানে যখন খোদ হুযুরে পাক (দঃ) তাঁহার নিজের চক্ষুর দ্বারা আল্লাহকে দেখার কথা বলিয়াছেন।

হযরত আবুবকর ইবনে সোলায়মান বলেন যে হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় প্রতিপালককে এগার বার অবলোকন করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা নয়বার দীদার হইয়াছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুনকার নাকীর ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, মুনকার নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় নবী-রাসূল ব্যতীত কবরে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোন ধর্মাবলম্বী? ইহারা যখন কবরে আগমন করে, তখন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ দান করা হয় এবং তাহাদেরকে উঠাইয়া বসানো হয়। প্রশ্নোত্তরের পর বিনা কষ্টে আবার তাহাদের প্রাণ দেহ হইতে বাহির করিয়া নেওয়া হয়।

যিয়ারতকারীকে মৃত ব্যক্তি চিনিতে পারে ঃ আমরা বিশ্বাস করি কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করিতে গেলে উক্ত মৃত ব্যক্তি সেই যিয়ারতকারীকে চিনিতে পারে। শুক্রবার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই পরিচিতি জ্ঞান বা শক্তি তাহাদের মধ্যে বেশী পরিমাণে থাকে।

কবর সংকীর্ণ কিংবা প্রশস্ত হওয়া ঃ গুনাহগার এবং কাফিরদের কবর আযাব এবং কবর সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ার উপরেও বিশ্বাস রাখা অবশ্য কর্তব্য। ঈমানদার এবং নেককারদের কবরে বিভিন্ন রকম শান্তি, ক্লেশ এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহ লাভের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। কিন্তু মু'তাজিলা সম্প্রদায় কবর আযাব, কবর সংকীর্ণ হওয়া এবং ফেরেশতা মুনকার নকীরের সুয়াল জওয়াব সম্পর্কে অনাস্থা পোষণ করে। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন কাল রং এবং উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্ট দুইজন ফেরেশতা হাজির হন। তাহাদের একজনের নাম মুনকার ও অন্য জনের নাম নকীর। তাহারা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলাল্লুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে তোমার মতামত কি? দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যে মত পোষণ করিত, তখন তাহার যবান হইতে তাহাই ব্যক্ত হইবে। যদি সে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান হয়, তবে বলিবে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাহার জবাব শুনিয়া ফেরেশতাদ্বয় বলিবে তুমি যে এইরূপ বলিবে তাহা আমরা জানিতাম। অতঃপর ঐ ব্যক্তির কবর সত্তর হাত দীর্ঘ ও সত্তর হাত প্রশস্ত এবং উহা আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি শুইয়া বিশ্রাম কর। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলিবে যে, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার পরিবার বর্গের কাছে গিয়া তাহাদিগকে আবার এই খবর জানাইয়া আসি। ফেরেশতাদ্বয় বলিবে, তুমি নববধূর মত শয়ন করিয়া থাক, যে নব বধূকে একমাত্র প্রিয় স্বামী ব্যতীত আর কেহ জাগ্রত করে না। আল্লাহই তোমাকে এই শান্তির নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিবেন। আর মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হইলে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাবে বলিবে যে, আমি তাহার সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করিব; আমি কিছু বলিতে পারি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলিবে যে, আমরা জানিতাম যে, তুমি এইরূপ জবাবই দিবে। তখন তাহারা যমিনকে আদেশ করিবে যে, ইহাকে পেষণ যন্ত্রের ন্যায় সবলে পিষিয়া ফেল। আদেশ মাত্র যমিন তাহাকে এমন ভাবে পিষিয়া ফেলিবে যে, তাহার এক দিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকে চলিয়া যাইবে। আল্লাহ তাহাকে কবর হইতে না উঠানো পর্যন্ত সে এই ভাবেই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ আতা ইবনে ইয়াসার বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে বলিলেন, হে ওমর! যখন তোমার জন্য সাড়ে তিনহাত দৈর্ঘ্যও দেড় হাত প্রস্থ যমিনের ব্যবস্থা করা হইবে, যখন তোমার আত্মীয় এগানারা তোমাকে গোসল করাইবে, সুগন্ধি লাগাইবে এবং কাফন পরাইয়া কবরে রাখিয়া আসিবে, তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে? তারপর মুনকির-নকীর ফেরেশতাদ্বয় হাজির হইবে, বিজলির মত তেজ বিশিষ্ট তাহাদের চোখের দৃষ্টি এবং রুক্ষ ঝুলন্ত চুল হইবে। তাহারা তোমাকে ধমকাইয়া ভীতি প্রদর্শন করিবে। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিবে, বল তোমার আল্লাহ্ কে? তোমার ধর্ম কি?

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) এখন আমার ভিতরে যে প্রাণ আছে, তখনও কি আমার ভিতরে সেই প্রাণ থাকিবে? রাসূলে খোদা (দঃ) বলিলেন, হ্যাঁ। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তাহাই আমার জন্য যথেষ্ট।

মিনহাল ইবনে আমর হযরত বারা' ইবনে আযেব হইতে বলেন, আমরা একদা হুযুর (দঃ)-এর সাথে জনৈক আনছারের জানাযায় উপস্থিত হইলাম। তখনও কবর তৈরী সমাপ্ত না হওয়ায় হুযুর (দঃ) উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অত্যধিক গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটিয়া উঠায় আমরা সকলে নীরব রহিলাম। হুযুর (দঃ) একখানা লাঠির দ্বারা মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, কবর আযাব হইতে আমি আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। এই কথাটি তিনি পর পর তিনবার বলিলেন, তারপর বলিলেন, যখন কোন মুমিন বান্দা দুনিয়ার মায়া কাটাইয়া পরলোক গমন করে, তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট সুন্দর ফেরেশতাগণ বেহেশতী কাফন এবং সুগন্ধি লইয়া মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট আসিয়া তাহার সামনে উপবেশন করে।

অতঃপর মালাকুল মাওত উপস্থিত হইয়া বলে, হে শান্ত ও পবিত্র রূহ্! তোমার প্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁহার রহমত এবং ক্ষমার দিকে রওয়ানা হও। তখন সে আত্মা এমন সহজ সরল ও প্রশান্ত ভাবে থাকে যে, ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিবামাত্র তাহাকে মালাকুল মাওত ধরিয়া ফেলে। কোন পাত্র হইতে পানির ফোটা ঝড়িয়া পড়ার মত ঐ আত্মা অতি সহজেই বাহির হইয়া আসে। যে সকল ফেরেশতাগণ কাফন ও সুগন্ধি লইয়া আসে, তাহারা মুহূর্তে আত্মাকে মালাকুল মাওতের হাত হইতে নিয়া কাফন পরাইয়া ও সুগন্ধি লাগাইয়া দেয়। ঐ সুগন্ধি কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। সত্যি বলিতে ঐরূপ সুগন্ধি দুনিয়াতে নাই।

ফেরেশতাগণ তাহাকে শূন্যে লইয়া যাইবার কালে শূন্য মণ্ডলের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করে যে, এমন সুঘ্রাণ কিসের? উত্তর দেওয়া হয়, অমুকের পুত্র অমুকের। খুবই তাজীম এবং শ্রদ্ধার সাথে তাহা বলা হয়। প্রথম আসমানের নিকট যাইয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলায় দরজা খুলিয়া দিয়া তথাকার ফেরেশতাগণ ঐ মৃত ব্যক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবে ও তাহারা তাহাকে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌছাইয়াদেয়। এই ভাবে সপ্ত আসমান অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, এই ব্যক্তির নাম ইল্লিয়্যীনের দপ্তরে লিখাইয়া দিয়া পুনরায় ইহাকে দুনিয়াতে লইয়া যাও। আমি তাহাকে মাটি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করাইতেছি, আবার তাহাকে মাটি হইতে উত্তোলন করিব।

ফেরেশতাগণ আত্মাকে দেহে ফিরাইয়া দিতেই অন্য দুইজন ফেরেশতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? সে উত্তর করে, আমার প্রভু আল্লাহ্ এবং ধর্ম ইসলাম। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে তোমার মতামত কি? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তিনি আমাদের জন্য সত্য ধর্ম আনিয়াছেন। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, একথা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? সে উত্তর দেয়, আমি পবিত্র ক্বোরআন

পড়িয়াছি ও ক্বোরআনের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। তাহাকে বেহেশতের বিছানা করিয়া দাও। বেহেশতের পোশাক পরাইয়া দাও। বেহেশতের সুগন্ধি লাভের জন্য বেহেহ্তের সকল দরজা খুলিয়া দাও। দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর এক সুদর্শন ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলে, আমি তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি ও আনন্দদায়ক সুসংবাদ প্রদান করিব। আজ উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার দিন। লোকটি জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? আগন্তুক উত্তর করে যে, আমি তোমার সৎ কাজ। তখন লোকটি বলে যে, হে প্রভু! আপনি কিয়ামত করিয়া দিন।

হুযুর পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিলেন, যখন একটি কাফির লোকের মৃত্যু আসন্ন হয়, পার্থিব সকল বিষয় ও ব্যাপার তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে শুরু করে। তখন আসমান হইতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য কালো মুখ বিশিষ্ট দুইজন ফেরেশতা আসিয়া তাহার নিকট উপবিষ্ট হয়। ফেরেশতাদ্বয় একটি চট লইয়া আসে। তাহার পরেই মালাকুল মাউত উপবিষ্ট হইয়া বলে, হে অপবিত্র রূহ। তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির দিকে রওয়ানা হও। এ কথা শুনিয়া রূহ লোকটির সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। মালাকুল মাউত উহাকে ধরিয়া এমনভাবে টানিয়া বাহির করে যেমন ভাবে ভিজা উল বা পশম হইতে লৌহ শলাকা বাহির করা হয়। তখন লোকটির যাবতীয় শিরা-উপশিরা ছিড়িয়া যায়। রূহ বা আত্মাকে তখন ফেরেশতাদের আনিত চটে পেচাইয়া রাখা হয়। উক্ত নাপাক আত্মার দুর্গন্ধ তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ আত্মাকে নিয়া যখন শূন্যমণ্ডলে যাওয়া হয়, তখন তথাকার ফেরেশতাগণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে তাহার পরিচয় দান করা হয়। তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানের দরজায় পৌছিলে উহা খুলিয়া দেওয়া হয় না। এইভাবে সমস্ত আসমান হইতে সে প্রত্যাখ্যাত হয়।

তখন আল্লাহ বলেন, এই ব্যক্তির নাম সিজ্জীনের দফতরে লিখাইয়া ইহার রূহকে দুনিয়ার দিকে ফেলিয়া দাও। সে মতে ঐ অপবিত্র আত্মাকে যমিনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ)এই আয়াত শরীফ পাঠ করিলেনঃ

'অমাইঁ ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাআন্নামা খাররা মিনাস সামায়ি ফাতাখত্বাফুত্বাইরু আও তাহওয়ী বিহীর রীহু ফী মাকানিন সাহীক্ব।' অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তাহাকে আসমান হইতে নিক্ষেপ করা হয়। পাখি তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যায় অথবা বাতাস তাহাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ ঐ আত্মা পুনরায় দেহে প্রবিষ্ট হয়। তখন দুইজন ফেরেশতা কবরে আসিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রভু কে? সে ব্যক্তি জবাব দেয়, হায় হায়! তাহা আমি তো জানি না, তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার মতামত কি? ইহার জবাবে সে বলে, হায় পরিতাপ! তাহাও তো জানি না।

তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে আওয়াজ আসে, এই ব্যক্তি সাফ মিথ্যাবাদী। ইহাকে দোজখের বিছানা করিয়া দাও ও ইহাকে দোজখের পোশাক পরাইয়া দাও এবং দোজখের সমস্ত দরজা কপাট খুলিয়া দাও, যাহাতে সে দোজখের শাস্তি ও দুর্গন্ধ পাইতে পারে। (সাথে সাথে এই আদেশ পালিত হয়। তদুপরি) কবরের সংকীর্ণতার জন্য লোকটির পাঁজরের হাড় চুরমার হইয়া যায়। ইত্যবসরে দুর্গন্ধি পোশাক পরিহিত কুৎসিত কুদৃশ্য এক ব্যক্তি আসিয়া লোকটিকে বলে, তুমি ধ্বংস হও, তোমাকে যেদিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, আজ সেইদিন। লোকটি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? সে জবাবে বলে, আমি তোমার অসৎকর্ম। তখন লোকটি ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে বলে, হায় হায়! কিয়ামত যেন না হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন কোন মুমিন লোককে কবরে রাখা হয় তখন তাহার কবর সত্তর হাত দীর্ঘ এবং সত্তর হাত প্রস্থ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর বেহেশতী সুগন্ধি

ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে বেহেশতী রেশমী পোশাক পরিধান করানো হয়। তাহার সীনায় কোরআনের কোন অংশ মুখস্ত থাকিলে তাহার নূরই কবরে তাহার জন্য যথেষ্ট। অন্যথায় (তাহার কবরে) সূর্যের ন্যায় আলো দান করা হয়। এই সময় তাহাকে নব বধূর ন্যায় শয়ন করানো হয়, সে সুখের নিদ্রা হইতে অতিপ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহাকে জাগ্রত করে না। সে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে মনে হয় যে, তাহার নিদ্রার রেষ এখনও কাটে নাই।

আর যখন কোন কাফির মুশরেককে কবরে রাখা হয়, তখন কবর এমন সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। তাহার জন্য কবরে উটের মত বড় বড় সাপ প্রেরণ করা হয়। উহারা তাহার শরীরের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলে। তাহার নিকট অন্ধ বধির এবং বোবা ফেরেশতা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা তাহাকে লৌহ মুগুর দ্বারা প্রচণ্ড বেগে প্রহার করিতে থাকে। ইহারা মৃত ব্যক্তির ক্রন্দন ও আর্তনাদ শুনিতে পারিবে না ও তাহার দুরবস্থা চোখে দেখিতে পায় না। কেননা যাহাকে তাহাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হইতে পারে। প্রতিদিন প্রতি সময়ে এই মৃত ব্যক্তি আগুনের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা মৃত ব্যক্তির জন্য কবর আযাব ও বেহেশতের নেয়ামত প্রাপ্তি প্রমাণিত হইতেছে। এখন কেহ যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যদি কোন ব্যক্তি আগুনে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায় বা পানিতে ডুবিয়া মরে বা কোন ব্যক্তিকে হিংস্র জন্তুতে একেবারে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে মুনকার নকীর কিভাবে কোথায় বসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিবে? আর তাহার কবর আযাবই বা কিভাবে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর হইল, শরীরের বিভিন্ন অংশ বা সর্বশরীর বিভিন্ন অবস্থায় নষ্ট হইয়া গেলেও আল্লাহতায়ালা আত্মাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিবেন এবং কার্যানুপাতে শান্তি বা শাস্তি প্রদান করিবেন। যেমন কাফিরদের আত্মার উপর সকাল-সন্ধ্যা দোজখের শাস্তি নাযিল হইয়া থাকে। আর রোজকিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে সশরীরে তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাহাকে অগ্নির সম্মুখস্থ করা হয়। যেদিন কিয়ামত হইবে, সেদিন আমি বলিব, ফিরআউন ও তাহার অনুসারীদিগকে ভয়াবহ শাস্তির সাথে দোজখে নিক্ষেপ কর।

শহীদ মুমিনদিগের আত্মা সবুজ রংয়ের পাখির কাঠামোর মধ্যে থাকে। উহা বেহেশতের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায় এবং আরশের নীচে নূরের ঝাড় লন্ঠনে অবস্থান করে। দ্বিতীয়বার সিংগা ফুঁকের সাথে সাথে উহারা হিসাব কিতাবের জন্য যমিনে আসিয়া নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের যে সকল ভাই ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির দেহের কাঠামোর মধ্যে রাখিয়াছেন। তাহারা বেহেশতে উড়িয়া বেড়াইতেছে ও আরশের নীচে নূরের লন্ঠনের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যখন তাহারা উত্তম খাবার ও সুগন্ধিময় পানি পান করে, তখন তাহারা বলিয়া থাকে যে, এমন কেহ আছে কি যে, আমাদের এই সংবাদ দুনিয়াতে পৌঁছাইয়া দেয় যে, আমরা জীবিত আছি এবং আমরা উত্তম পানাহার পাইতেছি। তোমরা কখনও জিহাদ হইতে ফিরিয়া থাকিও না। সর্বদা কাফিরদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হও।

কবর হইতে মৃত ব্যক্তির উঠা ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং বিনষ্ট অংশ পুনরায় একত্রিত হওয়ার উপরও ঈমান আনিতে হইবে। আল্লাহ বলেন, যেভাবে তোমাকে প্রথমে সৃষ্টি করা হইয়াছে, আবার সেইভাবেই সৃষ্টি করা হইবে। আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলিয়াছেন, 'মিনহা খালাক্বনাকুম অ ফীহা নুঈদুকুম অ মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।' অর্থাৎ আমি মাটি হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, পুনরায় তোমাদিগকে মাটিতেই ফিরাইয়া দিব, পুনরায় মাটি হইতেই তোমাদিগকে উঠানো হইবে।

যাহারা আল্লাহর পথের পথিক অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশ মানিয়া কাজ করিয়াছে, তাহদেরকে পুনরায় উঠাইয়া আল্লাহ্ তাহাদের ঐ সৎ-কর্মের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ বলেন, যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন এবং পুনরায় জীবিত করিবেন। যিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করায় সমর্থ, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতেও সক্ষম।

হুযুরে পাক (দঃ)-এর শাফায়াত

ছগীরাহ্ ও কবীরাহ্ গুনাহকারীদের জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শাফায়াত কবুল হইবে। ইহা বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। হিসাব কিতাবের সময়ে হুযুরে পাক (দঃ) দোজখে যাইবার পূর্বে সকল নবীর পাপী মুমিন উম্মতদের জন্য সাফায়াত করিবেন। তাহারা দোজখে যাইবার পর হুযুর (দঃ) বিশেষভাবে তাঁহার নিজের উম্মতদের জন্য শাফায়াত করিবেন। তাঁহার শাফায়াতে পাপীদিগকে ক্ষমা করিয়া দোজখ হইতে বাহির করা হইবে। তিনি ছাড়া তাঁহার নেককার ও পরহেজগার উম্মতের সুপারিশেও বহু দোজখী দোজখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। শেষ পর্যন্ত হুযুরে পাক (দঃ)-এর উম্মতদের এক ব্যক্তিও দোজখে থাকিবে না। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা শাফায়াত বিশ্বাস করে না। (কিন্তু) আল্লাহতায়ালার বাণী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শাফায়াত অবশ্যই হইবে।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছে, কিয়ামতে আমি সর্বপ্রথম মাটি হইতে উঠিব। এজন্য আমার কোন অহঙ্কার নাই। আমি সকলের উপর নেতা, এজন্যও আমার কোন অহঙ্কার নাই। আমি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবশে করিব, এজন্যও আমার কোন অহমিকা নাই। সকল লোকের আগে আমি বেহেশতের দরজার শিকল খট খট করিব এবং আমাকে মহান প্রভুর দরবারে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে, এবং আমাকে দীদারে ইলাহীর মর্যাদা দান করা হইবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হইব।

সিজদায় গেলে আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে প্রিয় মুহাম্মদ! তুমি তোমার মস্তক উত্তোলন করিয়া যাহা চাহিবার চাহ, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব। তখন আমি মাথা উঠাইয়া আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিতে থাকিব, ইয়া উম্মাতী, ইয়া উম্মাতী! অর্থাৎ হে আমার উম্মত! হে আমার উম্মত! তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আচ্ছা যাও তুমি, গিয়া দেখ, যাহার অন্তরে সামান্য একটি তিল পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে, তাহাকেও তুমি দোজখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, আমি আমার উম্মতের এত অধিক সংখ্যক লোক এইভাবে বাহির করিয়া আনিব যে, উহা পাহাড়ের উচ্চতার সমান হইবে। অতঃপর অন্যান্য নবীগণ আমাকে বলিবেন, আপনি আর একবার আল্লাহর দারবারে যাইয়া ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। তখন আমি বলিব দেখুন, আমি এতবার আল্লাহর দরবারে গিয়াছি যে, পুনরায় যাইতে শরম করিতেছে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করিয়াছেন, কবীরাহ্ গুনাহকারীদের জন্য আমার অবশ্যই সুপারিশ করিতে হইবে। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর দরবারে নবীদের যে কোন একটি দোয়া বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রত্যেক নবীই তাহাদের নিজ নিজ সেই দোয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি সেই দোয়া আমার উম্মতের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। রোজ কিয়ামতে উম্মতদিগের শাফায়াত স্বরূপ সেই দোয়া আমি কাজে লাগাইব। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, ইনশা আল্লাহ আমার দোয়া সেই ব্যক্তির জন্য মাকবুল হইবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যত সংখ্যক লোকমুক্তি প্রাপ্ত হইবে। হুযুরে পাক (দঃ)-এর শাফায়াত পুলছিরাত এবং মীযানের নিকটে হইবে। প্রত্যেক নবীই এইভাবে শাফায়াত করিবেন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিবেন, হে আমার প্রভু! আল্লাহ্ জবাব দিবেন, বল, কি

খলীল! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিবেন, ওহে মাবুদ! তুমি কি আদম সন্তানদেরকে আগুনে জ্বালাইয়া দিলে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন, যাহার অন্তরে একটি গম বা যবের তুল্য ঈমান থাকিবে, তাহাকে আগুন হইতে বাহির করিয়া নাও। এইভাবে প্রত্যেক নেককার এবং ছিদ্দীক বান্দার শাফায়াতও আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছে, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহর দরবারে একটি বিশেষ দোয়া করিবার হক প্রদান করা হইয়াছে, আর আমি আমার উম্মতের শাফায়াত করার জন্য উহা সংরক্ষণ করিয়াছি। আমার উম্মতের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিজ কবিলার লোকদের জন্য শাফায়াত করিবে, ইহাতে তাহার কবিলার লোকদেরকে ক্ষমা করা হইবে এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আবার কোন একটি লোক তাহার দলের লোকের জন্য শাফায়াত করিবে। ইহাতে ঐ দলের লোকেরা আল্লাহর অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এইভাবে কোন লোকের সুপারিশে তিনজন, কাহারও সুপারিশে দুইজন আবার কাহারও সুপারিশে একজন লোক দোজখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি সর্বদাই আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করিতে থাকিব এবং আমার প্রভুও তাহা কবুল করিতে থাকিবেন। পরিশেষে আমি আল্লাহর দরবারে আরজ করিব, হে প্রভু! আপনি সেই সকল লোকদের জন্যও আমার শাফায়াত কবুল করুন, যাহারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পাঠ করিয়াছে। তখন আল্লাহতায়ালা বলিলেন, হে প্রিয় মুহাম্মদ! এই সুপারিশ আপনার বা অন্য কাহারও করিতে হইবে না। আমি আমার ইয্যত এবং রহমতের কসম করিয়া বলিতেছি, আমার যে বান্দা একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাকে আমি আগুনে জ্বালাইব না।

পুলছিরাত

জাহান্নামের উপর পুলছিরাত স্থাপিত হইবে। ইহার উপরও ঈমান রাখা ওয়াজিব। ছিরাতের অর্থ রাস্তা বা পথ। তবে ইসলামী পরিভাষায় ইহার অর্থ পুল। ইহা জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এই পুলের উপর হইতে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা এই পুলের উপর দিয়া বেহেশতে পৌছাইয়া দিবেন। পুল অতিক্রমকারীদের আমল অনুসারে তাহাদের জন্য নূর বা আলো দান করা হইবে। কেহ কেহ এই পুলের উপর দিয়া স্বাভাবিকভাবে হাটিয়া যাইবে। কেহ বা দৌড়াইয়া ইহা পার হইবে। কেহ বা যানবাহনে চড়িয়া, কেহ বা হাটুতে আবার কেহ বা চোতড়ের উপর ভর দিয়া কিংবা হামাগুড়ি দিয়া পুল পার হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে এরশাদ করিয়াছেন, পুলের উপর সা'দান-এর কাঁটার ন্যায় কাঁটা হইবে। হুযুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সা'দানের কাঁটা চিন কি? সাহাবায় কেরাম বলিলেন, জি হাঁ। তখন হুযুর (দঃ) বলিলেন, এই কাঁটার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আল্লাহ-ই অবগত। ইহা মানুষকে চুম্বকের ন্যায় টানিয়া ধরিবে। কোন কোন লোক নিজেদের কু-কার্যের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেহ বা কাঁটার আঘাতে টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। অবশেষে এই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইবে। হুযুর (দঃ) আরও বলিলেন, দেহ ছিদ্র করার জন্যই এই কাঁটার ব্যবস্থা। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা খুব উত্তম জন্তু কোরবানী কর। কেননা এই জন্তু পুলের উপর তোমার জন্য বাহন হইবে।

হুযুর (দঃ) আরও বলিলেন, এই পুল চুল অপেক্ষা চিকন, অগ্নি অপেক্ষা গরম এবং তরবারী অপেক্ষা অধিক ধারাল। পারলৌকিক বৎসরের হিসাবে ঐ পুলের দৈর্ঘ্য তিন শত বৎসরের পথ। বদকারগণ ঐ পুল পার হইবার কালে কেহ বা পা' পিছলাইয়া আবার কেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া দোজখে পড়িয়া যাইবে। আর নেককারগণ নিরাপদে পুল পার হইয়া যাইবে।

কোন কোন লোক একথাও বলেন যে, ঐ পুলটির দৈর্ঘ্য পারলৌকিক হিসাব মতে তিন হাজার বৎসরের পথ।

হাউজে কাওছার

আহলে সুন্নতের একটি সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, রোজ কিয়ামতে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্য একটি হাউজ (পানীয়ের কুয়া) হইবে। মুমিনগণ উহার পানি পান করিবে। কাফিরগণ ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। বেহেশতে প্রবেশ করিবার পূর্বে এবং পুলছিরাত পার হইবার পর এই হাউজটি নবী (দঃ) প্রাপ্ত হইবেন। এই হাউজের পানি একবার পান করিলে সে আর পিপাসার্ত হইবে না। এই হাউজের প্রস্থ এক মাসের পথের সমান। ইহার পানি মধু হইতে মিষ্টি ও দুধ অপেক্ষা সাদা। হাউজের পার্শ্বে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় অগণিত পিয়ালা (পান-পাত্র) মৌজুদ থাকিবে। হাউজটির সাথে দুইটি নল সংযুক্ত থাকিবে। ঐ নল দিয়া বেহেশতের কাওছার হইতে হাউজে পানি বহিয়া আসিবে। উহার শাখা-প্রশাখাগুলি হাশরের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছিবে।

হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজকিয়ামতে আমি হাউজে কাওছারের পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিব। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, উক্ত হাউজের প্রশস্ততা কতখানি? হুযুর (দঃ) বলিলেন, আমার বসিবার স্থান হইতে আম্মান সাগর পর্যন্ত। উহার পানি দুগ্ধ হইতে সাদা ও মধু হইতে মিষ্টি। উহার সঙ্গে দুইটি নল সংযুক্ত। উহার একটি রৌপ্যের এবং অন্যটি স্বর্ণের। একবার উহার পানি পান করিলে জীবনে সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হইবার স্থান আমার এই হাউজ। উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একই সমান। মক্কা হইতে ইলিয়্যার দূরত্ব অপেক্ষাও উহার প্রস্থ বেশী। উক্ত শহর দুইটির দূরত্ব হইবে এক মাসের পথের অধিক। ইহার চারি পার্শ্বে তারকার ন্যায় অগণিত উজ্জ্বল পিয়ালা থকিবে। ইহার পানি হইবে রৌপ্যের মত সাদা। ইহা একবার পান করিলে জীবনে আর কোনদিন পিপাসার্ত হইবে না। এইভাবে সব নবীকেই একটি করিয়া হাউজ দেওয়া হইবে। কিন্তু নবী হযরত ছালেহ (আঃ) এর কোন হাউজ থাকিবে না। হাউজের বদলে তাঁহাকে উটের দুধের বাট দেওয়া হইবে। কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ব্যতীত সকল মুসলমানই উহা হইতে পানি পান করিবে।

আর এক হাদীসে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আদন হইতে আম্মানের দূরত্বের তুল্য আমার হাউজের প্রস্থ। এই হাউজের পার্শ্বে মোতির নির্মিত তাঁবু থাকিবে। এই হাউজের মৃত্তিকা হইতে মৃগনাভি অপেক্ষা অধিক সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইবে। ইহার পানি হইবে দুধ হইতে সাদা, মধু হইতে মিষ্টি এবং বরফ হইতে শীতল। ইহা হইতে এক কুলি পরিমাণ পানি পান করিলে সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন, উষ্ট্রের পাল হইতে যেমন অপরের উষ্ট্র তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। আমি এইরূপ করিতে নিষেধ করিলে আমাকে বলা হইবে, আপনি অবগত নন যে, আপনার মৃত্যুর পর ইহারা কত ও কেমন সব বেদয়াতের প্রচলন করিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিব যে, কিরূপ বেদয়াত? বলা হইবে যে, আপনার মৃত্যুর পর ইহারা দ্বীনী বিধান সব উলট পালট করিয়া দিয়াছে। একথা শুনিয়া আমিও বলিব, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও এবং আল্লাহর রহমত হইতে দূর হও।

মু'তাজিলা সম্প্রদায় হাউজে কাওছারের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। যদি ইহারা এই সম্বন্ধে তাওবাহ না করে এবং ক্বোরআন ও হাদীস এবং বোযর্গানের কথা অস্বীকারের ব্যাপারে তাওবাহ না করে, তবে তাহারা পিপাসার্ত অবস্থায়ই দোজখে নিপতিত হইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার শাফায়াতে অবিশ্বাসী ও হাউজে কাওছারে অবিশ্বাসী, সে কিয়ামতের দিবস আমার শাফায়াত হইতে

মু'তাজিলাগণ এই বেহেশতে অবিশ্বাসী। ইহারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। আমার জীবনের শপথ, চিরকালই তাহারা দোজখে থাকিবে। কেননা ইহারা বেহেশতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথচ আল্লাহর অনুগত বান্দাগণ একটা কবীরাহ্ গুনাহর জন্য সত্তর বৎসর দোজখের আগুনে জ্বলিবে একথাও তাহারা বলিয়া থাকে। আল্লাহর ক্বোরআন ও রাসূল (দঃ)এর হাদীস অনুযায়ী ইহারা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন বেহেশতের প্রস্থ্ আসমান ও যমিনের সমতুল্য। উহা খোদাভীরু লোকদের জন্য নির্মাণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ আরও বলেন, ঐ আগুনকে ভয় কর, যাহা কাফিরদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যখন আমি বেহেশতে প্রবেশ করিলাম, তখন হঠাৎ একটি ঝর্ণা ধারার নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। এ সময়ে আমি দেখিলাম, উহার উভয় পার্শ্বে মোতির তাঁবু। আমি ঝর্ণার প্রবাহিত পানি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলাম। মনে হইল, উহা কস্তুরীর ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? তিনি জবাবে বলিলেন, ইহা আল্লাহতায়ালা আপনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! কিসের দ্বারা বেহেশত নির্মাণ করা হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, উহার একখানা ইট স্বর্ণের এবং অন্যখানা রৌপ্যের। উহার গাথুনি সুগন্ধময় মেশকের, সুরকী মারওয়ারিদ ও ইয়াকুত পাথরের এবং মেঝে সুগন্ধময় জাফরানের। বেহেশতে প্রবেশকারীরা তথায় চিরকাল থাকিবে, তাহারা অমর হইবে এবং চিরযৌবন লাভ করিবে। তাহার পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হইবে না এবং যে কোন প্রকার বিপদাপদেও জড়িত হইবে না।

অত্র হাদীস বেহেশত ও দোজখের পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি হওয়া, বেহেশতের সুখ শান্তি চিরস্থায়ী হওয়া ও উহা কোনদিন বিলীন না হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাহা ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ বলেনঃ

উকুলুহা দায়িমুন অ জিল্লুহা অর্থাৎ বেহেশতের খাদ্যসমূহ (নেয়ামত রাশি) চিরস্থায়ী এবং উহার স্নিগ্ধ ছায়াও। অন্য আয়াতে আছেঃ লা মাক্বতুআতিউ অলা মামনূআতিন। উহার নেয়ামতসমূহ যেমন কোন সময় শেষ হইবে না, কখনও উহা ব্যবহারে বাধাও আসিবে না।

বেহেশতের হুর

বেহেশতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে আয়ত নেত্রবিশিষ্ট হুরও অন্যতম। উহাদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতের মধ্যে চিরস্থায়ী হিসাবে পয়দা করিয়াছেন এবং উহারা কোন দিনই তথা হইতে অন্তর্হিত হইবে না। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করিতেছে নির্মিলিত নয়নবিশিষ্ট সুন্দরী হুরীগণ। এখন পর্যন্ত তাহারা কোন মানব বা জ্বিন দ্বারা স্পর্শিত হয় নাই। আল্লাহ পাক আরও বলিতেছেন যে, হুরগণ সুরক্ষিত তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আপনি আমাকে "কাআমছালিললুয়িল মাকনূন" আয়াতের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিন। তিনি তখন বলিলেন, উহার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা ঠিক তদ্রূপ যেমন একটি ছেপের ভিতরে মোতি নিহিত থাকিলে তাহার অবস্থা হয়। এইরূপ মন্তব্যের পর তিনি এরশাদ করিলেন, হুরগণ বলিবে, আমরা সর্বদা থাকিব, কখনও মরিব না। চিরদিন খুশী-খোশাল থাকিব, কোন দিনই আমাদের ভিতরে ক্রোধ বা বিরক্তির উদ্রেক হইবে না। অতঃপর হুযুর (দঃ) বলিলেন, হুরগণ সত্য সুন্দর গৃহের অধিবাসিনী, সত্যভাষিণী। হুযুরে পাক (দঃ) যেহেতু পরম সত্যবাদী, তাই তাঁহার দ্বারা সত্য কথা ছাড়া অন্য কোনরূপ কথা বলার প্রশ্ন আসে না। তিনি বলেন, হুরগণ চিরকাল থাকিবে, তাহারা কখনও মরিবে না।

পরকালের স্ত্রী

হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন স্ত্রী দুনিয়াতে তাহার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন সেই ব্যক্তির জন্য পরকালের নির্দ্ধারিত হুর সেই স্ত্রীকে বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি তাহাকে কষ্ট দিও না। সে তো কয়েকদিনের জন্য তোমার মেহমান। অচিরেই সে তোমার নিকট হইতে আমার নিকট চলিয়া আসিবে।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন বেহেশত ও দোজখ কখনও বিলীন হইবে না, তেমন তদুভয় মধ্যকার কোন বস্তুও ধ্বংস বা বিলীন হইবে না। বেহেশতে যাহারা প্রবেশ করিবে, কোন দিন তাহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করাও হইবে না, উহাদের আর কখনও মৃত্যুও হইবে না। বেহেশতের মধ্যে তাহাদের সুখ ও শান্তি কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না বরং আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

আল্লাহর নির্দেশে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী স্থানের দেয়ালের উপরে মৃত্যুকে একটি জন্তুর আকারে স্থাপন করতঃ যবেহ্ করা হইবে। যবেহের পর এক অদৃশ্য আওয়াজ হইবে, হে বেহেশতীগণ! তোমরা অমর-চিরঞ্জীব, তোমাদের আর কোনদিন মৃত্যু স্পর্শ করিবে না। হে দোজখীগণ! তোমরা অনন্তকাল জীবিত, তোমাদের আর কোনদিন মৃত্যু হইবে না।

সমস্ত মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর সব নবী রাসূলের নেতা। তাঁহার উপর নবুয়ত শেষ হইয়াছে! তিনি দুনিয়ার মানব এবং জ্বিন জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এবং তুমি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।

আবূ ইমামাহ্ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সকল নবীর উপর আল্লাহ্ আমাকে চারিটি ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। যথাঃ (১) আমি দুনিয়ার সর্বস্থানের সকল লোকের জন্য নবী। ঐ হাদীসে আরও বলা হইয়াছে যে, (২) তাঁহাকে এই ধরনের মো'জেযাহ্সমূহ দান করা হইয়াছে, যাহা তিনি ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কোন কোন মুহাদ্দিসীনের মতে এই মো'জেযাহ্র সংখ্যা এক সহস্র। ঐ মো'জেযাহ্বলীর অন্যতম হইল, কুরআন শরীফ।

হযরত ইবনে ইমামাহ্ (রাঃ) বলেন, হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ আমাকে নবীদের উপরে চারিটি ব্যাপারে ফজীলত দিয়াছেন। যথাঃ আমাকে দুনিয়াতে সমগ্র মানব জাতির হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পাঠানো হইয়াছে। হাদীসে রহিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ)কে আল্লাহ্ সেই মো'জেযাহ্গুলি দিয়াছেন, যাহা তিনি অন্য কাহাকেও দেন নাই। কোন কোন আলেম এই মো'জেযাহ্র সংখ্যা একহাজার বলিয়াছেন। পবিত্র কুরআন সেই মো'জেযাহ্গুলি অন্যতম। আরবের যাবতীয় গ্রন্থের ভাষা হইতে ক্বোরআনের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ক্বোরআনের ভাষা, বাচন ভঙ্গি, ছন্দ বিন্যাস, বালাগাত ফাসাহাত অন্যান্য গ্রন্থের এই গুণগুলি হইতে সর্বদিক দিয়া শ্রেয়। এইরূপ ভাষা সাহিত্য গঠনে সমগ্র আরববাসী অসমর্থ। যখন আল্লাহ্তায়ালা হুযুরে পাক (দঃ)কে বিরুদ্ধ-বাদীদেরকে ক্বোরআনে পাকের সূরার মত একটি সূরা তৈরী করিতে বলিলেন, একটি সূরা তো দূরের কথা, একটি বাক্য তৈরী করিতেও তাহারা অপারগ হইয়াছিল। তাহাদের এই অপারগতার প্রমাণ হইল যে, ক্বোরআন হযরত রাসূলে কারীম (দঃ)-এর মো'জেযাহ্, যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর জন্য লাঠি ছিল এক মো'জেযাহ্। হযরত মুসা (আঃ) এমন এক সময়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছিলেন যখন দুনিয়ার সর্বত্রই সাহের বা যাদুগরদের প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল। এই যাদুগরদের সাথে হযরত মুসার (আঃ) মুকাবেলা হইল। যাদুগরগণ তাহাকে যাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করিল। তাহারা যাদুর দ্বারা কতগুলি সর্প তৈরী করিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন হযরত মুসা (আঃ) এর হাতের লাঠিখানা একটি সর্প তৈরী করিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন হযরত মুসা

মুসা (আঃ)-এর হাতের লাঠিখানা একটি সর্পরূপ ধারণ করিয়া উহাদের কৃত্রিম সর্পগুলিকে গিলিয়া ফেলিল। এ অভাবিত ব্যাপার দেখিয়া তাহারা হযরত মুসার (আঃ) নিকট হার স্বীকার করিল এবং মুহূর্তে তাহারা হযরত মুসার (আঃ) উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হইল।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মো'জেযাহ্ ছিল মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান করা এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করা। হযরত ঈসার (আঃ) যুগে বড় বড় চিকিৎসক ছিল। যে কোন রোগ তাহারা নিরাময় করার ক্ষমতা রাখিত। তাহা সত্তেও তাহারা হযরত ঈসার (আঃ) নিকট হার মানিয়া তাহার অনুগত হইয়াছিল।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠিকে সর্পে পরিণত করা যেমন মো'জেযাহ, পবিত্র ক্বোরআন হুযুরে পাক (দঃ)-এর জন্য তেমনি মো'জেযাহ্। ইহা ছাড়াও হুযুরে পাক (দঃ) এর আরও বহু মোজেযাহ ছিল। যেমন আঙ্গুলের মধ্য হইতে পানি প্রবাহিত হওয়া, স্বল্প পরিমাণ খাদ্য দ্বারা বহু সংখ্যক লোককে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান, বিষ মিশ্রিত মাংসের যবানে কথা বলা যে, হুযুর (দঃ)! আপনি আমাকে খাইবেন না, চন্দ্রের দুই টুকরা হইয়া যাওয়া, খেজুর গাছের ক্রন্দন করা, উটনীর কথা বলা, বৃক্ষের হাটিয়া আসা প্রভৃতি প্রায় সহস্রাধিক মো'জেযাহ তাঁহার ছিল।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, হুযুরে পাক (দঃ)কে হযরত মুসার (আঃ) ন্যায় লাঠিকে সর্পে পরিণত করা ও হযরত ঈসার (আঃ) ন্যায় মৃতকে জীবিত করার মত মো'জেযা কেন দেওয়া হয় নাই? ইহার উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণ তাহাদের নবীদের ঐ সব মো'জেযাহসমূহকে মিথ্যারোপ করিয়া নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল। হুযুরে পাক (দঃ) এর উম্মতগণও যেন ঐরূপ মিথ্যারোপ করিয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিতে না পারে, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল।

আর একটি কারণ এই যে, পরবর্তী নবীদের মত মো'জেযাহসমূহ প্রকাশ পাইলে লোকগণ বলিত, ইহাতে আর তেমন বিস্ময়াপন্ন হওয়ার কি আছে? হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) ও তো এইরূপ মো'জেযা দেখাইতেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তো কেবল তাহাদেরই অনুসরণ করিতেছেন, যে সকল মো'জেযাহ্ কেহ দেখায় নাই, অদ্রূপ কোন মো'জেযাহ্ না দেখান পর্যন্ত আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিব না। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা এক নবীকে যে মো'জেযাহ্ দান করিয়াছেন, অন্য নবীকে তাহা দেন নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ পৃথক পৃথক মো'জেযাহ্ দিয়াছেন।

হুযুরে পাক (দঃ)এর উম্মতের ফজীলত

আহলে সুন্নতুল জামাতের আকীদা হইল, হুযুরে পাক (দঃ)-এর উম্মত অন্যান্য সব উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং হুযুর (দঃ)-এর যমানার লোকগণ তামাম যমানার লোকদের অপেক্ষা উত্তম—যাহারা হুযুর (দঃ)কে সচক্ষে দেখিয়াছে, তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, জিহাদ করিয়াছে, স্বীয় জান মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার হোদায়বিয়ার সন্ধিতে শরীকদারগণ অত্যুত্তম, যাহারা একটি বৃক্ষতলে বসিয়া হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাতে হাত রাখিয়া বাইয়াত করিয়াছেন। ছোলেহ্ হোদায়বিয়ায় শরীক দলের লোকসংখ্যা ছিল এক হাজার চারিশত। আর ইহাদের মধ্যে বদরের মুজাহিদগণ সর্বাধিক উত্তম, যাহাদের সংখ্যা ছিল মোট তিনশত তেরজন।

আশারায়ে মুবাশশারাহঃ বদরের মুজাহিদগণের মধ্যে আবার নিম্নোক্ত দশজন সাহাবী অধিক উত্তম, যাহাদের বেহেশতী হইবার সাক্ষী হুযুরে পাক (দঃ) পূর্বাহ্নেই প্রদান করিয়াছেন। যথাঃ (১) হযরত আবূ বকর (রাঃ) (২) হযরত ওমর (রাঃ) (৩) হযরত ওসমান (রাঃ) (৪) হযরত আলী (রাঃ) (৫) হযরত ত্বালহা (রাঃ) (৬) হযরত জোবায়ের (রাঃ) (৭) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)

(৮) হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) (৯) হযরত সাঈদ (রাঃ) (১০) হযরত আবূ ওবায়দা (রাঃ)। উল্লিখিত সাহাবী দশজনের ভিতরে আবার প্রথমোক্ত চারজন তথা খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সর্বাধিক ফজীলতের অধিকারী।

এই চারিজন খলীফা হুযুরে পাক (দঃ)-এর রেহলতের পরে তাঁহার সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে সর্বমোট ত্রিশ বৎসর কাল খেলাফতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) দুই বৎসরের কিছু বেশী সময়, হযরত ওমর (রাঃ) দশ বৎসর, হযরত ওসমান (রাঃ) বার বৎসর এবং হযরত আলী (রাঃ) ছয় বৎসর কাল খলীফা ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে হযরত আমীরে মুআবিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের আমীর পদে প্রায় নয় বৎসরকাল সমাসীন ছিলেন। অবশ্য ইহার আগেই দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) আমীরে মুআবিয়া (রাঃ)কে সিরিয়ার শাসকপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ পদে তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল বহাল ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদীন

খোলাফায়ে রাশেদীনের কোন খলীফাই অস্ত্র কিংবা অন্য কোনরূপ শক্তির জোরে খেলাফত লাভ করেন নাই। বরং প্রত্যেকেই তাহারা ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন সম-সাময়িক লোকদের মধ্যে স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ফজীলতের মাধ্যমে এবং সাহাবায় কেরামের ঐক্য ও রাজী-রগবতের ভিত্তিতে।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর খেলাফত ঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুহাজির ও আনছার উভয় শ্রেণীর সাহাবাগণের সম্মিলিত অনুমতি, ইচ্ছা এবং আগ্রহের ফলে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর কতিপয় আনছার নেতা এইরূপ প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, আমাদের আনসারদের পক্ষ হইতে এক জন এবং আপনাদের মুহাজিরদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি যুক্তভাবে খলীফা নিযুক্ত হউক কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ইহার জবাবে বলিলেন হে আনছার সম্প্রদায়! আপনাদের কি এ কথা স্মরণ নাই যে হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকর (রাঃ)কে নামাযের ইমামতের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। আনছারগণ সমস্বরে বলিয়াছিলেন, হাঁ, তাহা সত্য। হযরত ওমর (রাঃ) আবার বলিলেন, হে আনছারগণ! বলুন তো, কে এমন আছে যে, মর্যাদায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) অপেক্ষা অগ্রগণ্য? আনছারগণ বলিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) আমরা কেহই তেমন দাবী করি না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বলুন তো আপনাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আল্লাহর রাসুল (দঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)কে যেখানে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে তাঁহাকে হটাইয়া দিবেন? আনছারগণ বলিলেন, আমরা কেহই এমন কাজ করিতে চাহি না বরং এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মোটকথা, তখন আনছার ও মুহাজিরগণ সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাতে বায়াত করিলেন। বায়াতকারীদের মধ্যে হযরত আলীও (রাঃ) ছিলেন। এক ছহীহ্ রেওয়াতে বর্ণিত আছে, সকলের বায়াতের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) পরপর তিনদিন পর্যন্ত সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, হে মুসলিম ভাইগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ আমার হাতে খেলাফতের বায়াত করাকে অপছন্দ করিলে বল, আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে সদা প্রস্তুত। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর এইরূপ উক্তি শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) অগ্রবর্তী হইয়া বলিয়াছিলেন, জনাব! আমরা কেহই আপনার বায়াত প্রত্যাহারকামী নই এবং কেহ এই খেলাফত পদ লাভের জন্য আকাঙখীও নই। কেননা খোদ রাসূলে কারীম (দঃ)ই আপনাকে অগ্রগণ্য করিয়া গিয়াছেন। এমন কে আছে যে, আপনাকে সেখান হইতে পিছাইয়া দিতে পারে?

নির্ভরশীল সাহাবী এবং রেওয়ায়েতকারীদের বর্ণনা এই যে, হযরত আলী (রাঃ)ই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর ভূমিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক বর্ণনায় আছে, যুদ্ধে জামালের পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকু (রাঃ) নামক এক সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, জনাব! হুযুরে পাক (দঃ) তাঁহার অবর্তমানে খেলাফতের দায়িত্ব বহন সম্পর্কিত কোন কথা কি আপনার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, এ ব্যাপারে আমি বহু অনুসন্ধান এবং চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, নামায দ্বীন ইসলামের প্রধান রোকন। তদুপরি আমরা আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে সেই জিনিসকেই গ্রহণ করিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ) যাহা আমাদের দ্বীনের জন্য পছন্দ করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার রোগাবস্থায় নিজের স্থানে (অর্থাৎ নামাযের ইমামতে) হযরত আবূ বকর (রাঃ) কেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বেলাল আযান প্রদান করিয়া যখন হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি বলিয়া দিতেন, আবূ বকর (রাঃ)কে বল, সে নামায পড়াইয়া দেউক।

ইহা ছাড়া হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকর (রাঃ) সম্পর্কে এমন বহু উক্তি করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা মনে হইত যে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর অবর্তমানে খেলাফত পদের জন্য হযরত আবূ বকর (রাঃ)ই সর্বাধিক উপযুক্ত।

হযরত ইবনে বাতহা হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি নকল করিয়া বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ)এর খেদমতে আরজ করা হইয়াছিল যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমরা আপনার পরে কাহাকে আপনার খলীফা বানাইব? হুযুরে পাক (দঃ) জবাব দিলেন, যদি তোমরা আবূ বকরকে খলীফা বানাও তবে তাহাকে পরম বিশ্বস্ত, দুনিয়াবিরাগী এবং পরকাল আকাঙ্খী দেখিবে। যদি তোমরা ওমরকে খলীফা বানাও তবে তাহকে হিম্মতওয়ালা শক্তিমান এবং এমন বিশ্বস্ত দেখিবে যে সে আল্লাহর কোন কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনাকেই পরোয়া করিবে না। আর যদি তোমরা আলীকে খলীফা বানাও তবে তাহাকে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত এবং সুপথ প্রদর্শক হিসাবে দেখিবে। হুযুরে পাক (দঃ)-এর এই এরশাদ মুতাবেকই সমস্ত সাহাবা হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর খেলাফতকে বিনা মতভেদে সমর্থন করিলেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস রহিয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার মে,রাজের কালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আরজ করিলাম হে মাবুদ! তুমি আমার পরে আলীকে আমার প্রতিনিধি বানাইও। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আল্লাহ পাক সকল কিছুই নিজ ইচ্ছানুযায়ী-ই করিয়া থাকেন। আপনার পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা হইবেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমার নিকট এরশাদ করিয়াছেন, হুযুরে পাক (দঃ) এই দুনিয়া হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় গ্রহণ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আমার নিকট হইতে এই প্রাতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহার পরে খলীফা হইবেন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পরে হযরত ওমর (রাঃ), তাহার পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আলী ইবনে আবি তালিব।

ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-কে খলীফারূপে মনোনয়ন করিয়াছিলেন স্বয়ং পূর্ববর্তী খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ)। অতঃপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর হস্তে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আমীরুল মুমিনীন খেতাব প্রদান করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কে খলীফারূপে মনোনীত করিবার পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবূ বকর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবূ

বকর (রাঃ) ! আপনি ওমর (রাঃ)-এর রুক্ষ প্রকৃতির মেজাজের কথা জানা সত্ত্বেও যে আপনি তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিলেন, কালকিয়ামতে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিবেন?
জবাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি জবাব দিব যে, হে মাবুদ! আমি তোমার বান্দাগণের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলীফা বানাইয়াছিলাম।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত ঃ হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খেলাফতের আসন লাভ করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় সন্তানগণকে খেলাফতের দাবী হইতে দূরে রাখিয়া ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর দ্বারা একটি পরামর্শ সংসদ গঠন করিলেন যে তাঁহারাই পরামর্শ ও আলাপালোচনার দ্বারা খলীফা নির্বাচন কার্য সমাধা করিবেন। এই ছয়জন সাহাবা ছিলেন, হযরত তালহা (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ) হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) হযরতর আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আলাইহিম আজমায়ীন।

হযরত জোবায়ের (রাঃ) ও হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এই দুইজন নিজেদেরকে খেলাফতের দাবী হইতে দূরে রাখিলেন। তখন আর চারিজন মাত্র বাকী রহিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) উদ্যোগী হইয়া হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)কে প্রস্তাব করিলেনঃ আমি আল্লাহর ও আল্লাহর রাসূল এবং সমগ্র মুসলমানের দিকে চাহিয়া আপনাদের কোন একজনকে খলীফা নির্বাচন করিব। এই কথা বলিয়া প্রথমেই তিনি হযরত আলীর (রাঃ) হস্তধারণ করতঃ বলিলেন, হে আলী! আপনার উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গীকার যিম্মাদারী ও হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর যিম্মাদারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা আপনার হাতে বায়াত করবার পর আপনাকে আল্লাহ্ও আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি বিধান এবং মুসলমানদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আর আপনাকে হযরত রাসূলে করীম (দঃ) হযরত আবু বকর (আঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর চরিত্র অবলম্বন করিতে হইবে। হযরত আলী (রাঃ) নিজের ভিতরে এই সামর্থ্য অনুভব করিলেন না। অতএব তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর প্রস্তাবে সাড়া প্রদান করিতে বিরত থাকিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হাত ধারণ করিয়া অনুরূপ প্রস্তাব দান করিলেন। তিনি উহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতে বায়াত করিলেন। পরদিন সর্বসাধারণের বায়াত অনুষ্ঠিত হইল। এইভাবে হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবাদিগের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে খলীফা নির্বাচিত হইয়া শাহাদত বরণের দিন পর্যন্ত নিখুঁৎ হকের উপর এই পদে বহাল ছিলেন। সারা জীবনে তাঁহার যবান হইতে এমন একটি উক্তি বা বাক্য নির্গত হয় নাই, যাহাকে তাঁহার শাহাদাতের কারণ হিসাবে পেশ করা যায়। রাফেজী সম্প্রদায় এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণকারী। আল্লাহ তাহাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতঃ হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফত পদ লাভও জনগণের ঐক্য এবং সাহাবাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হইয়াছিল। আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে বুতহা মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (রহঃ)-এর রেওয়াত নকল করিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (রহঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন বিরোধীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন আমি হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, শীঘ্রই আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)কে হত্যা করা হইবে। হযরত আলী (রাঃ) একথা শুনা মাত্র দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি তখন তাঁহার নিরাপত্তার জন্য তাঁহার কমর জড়াইয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও। অতঃপর তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, ইতিমধ্যেই আমীরুল মুমিনীন ওসমান (রাঃ) শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) সেখান

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতঃ ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছু পরেই লোকগণ আসিয়া বাহির হইতে দরজা নাড়িতে লাগিল। তাহারা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করতঃ খবর দিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছে। এখন মুসলমানদের জন্য খলীফার প্রয়োজন। আমাদের মতে আপনি ব্যতীত এই পদের যোগ্য এখন আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, তোমরা আমাকে খলীফা বানাইবার খেয়াল পরিত্যাগ কর। আমি খলীফা হওয়া অপেক্ষা তোমাদের জন্য পরামর্শদাতা হওয়া উত্তম মনে করি। লোকগণ বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা খেলাফতের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা আমার কথা একান্তই না শুন তবে আমি বলি, তোমরা গোপনে আমার বায়াত করিও না। বরং আমি মসজিদে আসিতেছি, যে আমার বায়াত করিতে চায় সে যেন তথায় আসিয়া আমার বায়াত করে। এই কথা বলিয়া হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে নববীতে চলিয়া গেলেন। জনসাধারণ সেখানে তাঁহার হাতে বায়াত করিল। সেইদিন হইতে তিনি তাঁহার শাহাদাতের দিন পর্যন্ত পূর্ণ হকের উপর খেলাফতের পদে বহাল ছিলেন। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহার বিপরীত কথা বলে আল্লাহ তাহাদেরকে হেদায়াত দান করুন। উহারা বলে যে, হযরত আলী (রাঃ) কখনই হকের উপর ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহি) অবশ্য হযরত তালহা (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে হযরত আলীর (রাঃ) যুদ্ধের প্রসঙ্গটি থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এইভাবে বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সাথে হযরত আলীর (রাঃ) বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপারে সকলেই নির্বাক থাকা চাই। কেননা সাহাবায় কেরামদের মাঝে এই অনৈক্যের ব্যাপারগুলির সুষ্ঠু ফায়ছালা রোজ কেয়ামতে স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই করিবেন।

অবস্থা ও ঘটনা বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা যায় যে, সমসাময়িক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকগণ বিশেষতঃ মদীনার অধিবাসীগণ সকলেই একযোগে বিনা দ্বিধায় হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতকে স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন, কেননা খোদ হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের সত্যতা ও হকের উপর পূর্ণ আস্থাবান এবং দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। একারণে খেলাফতের বিরোধীগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করার সত্যিকার অধিকার এবং অনুমতি ছিল। পক্ষান্তরে হযরত তালহা (রাঃ), হযরত জোবায়ের (রাঃ) এবং আমীরে মুআবিয়া (রাঃ)ও সত্যের উপর বহাল ছিলেন। কেননা তাঁহারা মজলুম খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খুনের বদলার দাবীদার ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘাতকদল হযরত আলীর (রাঃ) সৈন্যদের মাঝে শামিল ছিল। এই দিক দিয়া লক্ষ্য ও বিচার করিলে দেখা যায় উভয় পক্ষেরই যুদ্ধ করার সিদ্ধ এবং ন্যায্য অধিকার ছিল। এইজন্যই ঐ বিষয়ে আমাদের যে কোন প্রকার উক্তি হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমীরে মুআবিয়ার শাসন ঃ আমীরে মুআবিয়ার (রাঃ) শাসন বা খেলাফত হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদাত এবং হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর খেলাফতের দাবী পরিত্যাগের মধ্য দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার ভিতর দিয়াই হুযুরে পাক (দঃ)-এর এক মহান হাদীসের সত্যতা বাস্তবরূপ লাভ করে। উক্ত হাদীসটি এই ছিলঃ হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) বাল্যকালে ইমাম হাসানের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার এই সন্তান (নাতী) এমন এক মহান সর্দার, যাহার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের দুইটি প্রধান দলের মধ্যে আপোষ ঘটাইয়া দিবেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের পর ইমাম হাসানের (রাঃ) আমীরে মুআবিয়ার (রাঃ) সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়াই সেই কাজটি সাধিত হইয়াছিল। এই সন্ধি চুক্তি সম্পন্নের পর সমস্ত মুসলমানই আমীরে মুআবিয়ার খেলাফতকে স্বীকার করিয়া লইল।

আমীরে মুআবিয়ার (রাঃ) খেলাফতের স্বীকৃতি হুযুরে পাক (দঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছিলেন, আমার পরে ৩৫, ৩৬ কিংবা ৩৭ বৎসর পর্যন্ত ইসলামের চাকা ঘুরিতে থাকিবে। চাকা ঘুরিবার অর্থ দ্বীন ইসলামের শক্তি-সামর্থ। হুযুরে পাকের (দঃ) অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে যে, আমার পরে ইসলামের খেলাফত ত্রিশ বৎসর স্থায়ী থাকিবে। হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতের পরে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর খেলাফতের ছয় মাসকালসহ সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়ছিল। ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর বাকী সময়টাই ছিল হযরত আমীরে মুআবিয়ার (রাঃ) শাসন আমল এবং হুযুরে পাক (দঃ) খেলাফতের ত্রিশ বৎসরের সাথে সেই সময়টাকে মিলাইয়াই বলিয়াছিলেন যে, আমার পরে পয়ত্রিশ ছত্রিশ কিংবা সাইত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ইসলামের শান শওকতঅক্ষুণ্ন থাকিবে।

উম্মুহাতুল মু'মিনীন এবং আহলে বাইতের ফজীলত

আমরা মুসলমান সমস্ত উম্মুহাতুল মু'মিনীনের প্রতি অত্যন্ত উচ্চ এবং নেক ধারণা পোষণ করি। হুযুরে পাক (দঃ)-এর সেই পবিত্র বিবিদের সম্পর্কে আমাদের সকলের আকীদা ও দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা সকলেই আমাদের মুমিন মুসলমানদের কাছে মাতৃস্থানীয়া ও অতিশয় সম্মানের পাত্রী। তাঁহাদের অন্যতমা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। দুনিয়ার সমস্ত নারীদের মধ্যে নেত্রীস্থানিয়া মহিলা। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা ও পাকদামানীর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা স্বীয় পবিত্র ক্বোরআনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

একইভাবে আমরা হুযুরে পাক (দঃ)এর আহলে বাইতের অন্যান্য সকলের সম্পর্কেও পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি। হুযুর পাক (দঃ)এর কনিষ্ঠ কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) দুনিয়ার সমস্ত নারীদিগের সর্দাররূপে গণ্য। যিনি হইবেন বেহেশতবাসিনী রমণীদিগের রাণী। আল্লাহ তাঁহার উপর, তাঁহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণের উপরও সন্তুষ্ট থাকুন। আমাদের উপর তাঁহার পিতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর প্রতি মোহাব্বত রাখা যেমনি ওয়াজিব, একইভাবে আমাদের তাঁহার প্রতিও মোহব্বত রাখা ওয়াজিব। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, ফাতিমা আমার দেহের (কলিজার) টুকরা, যে তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করে, সে আমাকে ক্লেশ প্রদান করে।

সাহাবাদের মরতবা

মহান সাহাবায়ে কেরামের শান ও মরতবা অফুরন্ত ও অপরিসীম। উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। স্বয়ং আল্লাহতায়ালা পবিত্র ক্বোরআনে তাঁহাদের তারীফ এবং প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা রাসূলে কারীম (দঃ) এর যামানায় উভয় কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা ক্বোরআনে বলেন, যাহারা ফতেহ মক্কার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনে ইলাহীর জন্য মালদৌলত খরচ করিয়াছে ও দ্বীনের জন্য জিহাদ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের সমশ্রেণীর নহে, বরং তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে উচ্চ মর্যাদার পাত্র, যাহারা ফতেহ মক্কার পরে আল্লাহর পথে জান-মাল খরচ ও জিহাদ করিয়াছে। অবশ্য আল্লাহতায়ালা এ উভয় সম্প্রদায়কেই কল্যাণ ও মঙ্গল প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন।

ক্বোরআনে পাকের একস্থানে এরশাদ হইয়াছেঃ 'অল্লাযীনা মাআনু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুক্কাআন সুজ্জাদাইঁ ইয়াবতাগনা ফাদ্বলাম মিনাল্লাহি অ রিদ্বওয়ানান, সীমাহুম ফী উঁজূহিহিম মিন আছারিছ ছুজূদি, যালিকা মাছালুহুম ফিত্তাওরাতি অ মাছালুহুম ফিল ইঞ্জীলি কাযারইন আখরাজা শাতয়াহ ফা আযারাহু ফাসতাগলাজা ফাসতাওয়া আলা সূক্বিহী ইউজিবুয যুররাআ লিইয়াগীজা বিহিমুল কুফফার।'

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে হযরত জাফর ছাদেক (রহঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)এর উক্তি নকল করিয়া বলেন যে, 'অল্লাযীনা মাআহু' দ্বারা বলা হইয়াছে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কথা। যিনি সুখে-দুঃখে সর্বসময়ে হুযুরে পাক (দঃ)এর একনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহচর ছিলেন।

আর 'আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি' কালাম দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে ওমর ইবনে খাতাব (রাঃ)এর দিকে। 'রুহামাউ বাইনাহুম' এর ইঙ্গিত হযরত ওসমান (রাঃ)এর দিকে। আর 'রুক্কাআন সুজ্জাদান' কালাম দ্বারা বলা হইয়াছে হযরত আলীর (রাঃ) কথা। 'অ ইয়াবতাগূনা ফাদ্বলাম মিনাল্লাহি অ রিদ্বওয়ানা' দ্বারা হুযুরে পাক (দঃ) দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের (রাঃ) এর কথা বলা হইয়াছে। 'সীমাহুম ফী উজুহিহিম মিন আছারিস সুজূদ' দ্বারা ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত সাঈদ (রাঃ), হযরত আবদুল রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং হযরত আবূ ওবাইদাহ ইবনে জাররাহর (রাঃ) দিকে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায় কেরামদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ বেহেশতের সুখবর প্রাপ্ত দশজন বিশিষ্ট সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আহলে সুন্নত অল জামাআতের সুসিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যাপার নিয়া সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে অনৈক্য বা মতভেদ দেখা গিয়াছে, সে ব্যাপারে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ থাকিবে, কোনরূপ মতব্য প্রকাশ করিবে না। সাহাবাদের প্রতি কোনরূপ অশোভন উক্তি প্রয়োগ না করিয়া শুধু তাহাদের ফজীলত ও গুণাবলীর চর্চা করিবে। হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত মুআবিয়া (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের প্রসঙ্গ যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা নিয়া আমাদের কোন রূপ আলোচনা সমালোচনার বদলে যবান বন্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য। বরং আমাদের উচিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের বোযর্গী ও ফজীলতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করা। আল্লাহ বলেনঃ

'তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত লাহা মা কাসাবাত অ লাকুম মা কাসাবতুম অলা তুসয়ালূনা আম্মা কানু ইয়া'মালূন।'

অর্থাৎঃ ইহারা সেই বিগত সম্প্রদায়। তাহাদের কৃত কার্যাবলী তাহাদেরই যিম্মায় আর তোমাদের যিম্মায় শুধু তোমাদেরই কার্যাবলী। তাহাদের কার্যাবলীর বিষয় তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা যখন আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আলোচনা কর, তাহাদের প্রতি কোনরূপ কটুক্তি করিও না। অন্য হাদীসে আসিয়াছে, তোমরা আমার সাহাবাদের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কে কোনরূপ উক্তি না করিয়া নীরব থাক। তাহাদের কাহারও উপরে কোনরূপ দোষারোপ করিও না। জানিয়া রাখ, তোমাদের কেহ আল্লাহর রাস্তায় পাহাড় তুল্য স্বর্ণ খরচ করিয়াও সাহাবাদের ছওয়াবের শত ভাগের একভাগ ছওয়াব অর্জন করিতে পারিবে না।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কতই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে ঈমানের সাথে আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার সহিত সাক্ষাতকারীকে দেখিয়াছে। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি গালাজ করিও না। সাহাবীদেরকে গালী বর্ষণকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, শেষ যমানায় এমন একটি দলের অভ্যুদয় ঘটিবে, যাহারা আমার সাহবীদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় থাকিবে। খবরদার! তোমরা উহাদের সাথে উঠাবসা করিও না। উহাদের সাথে বিবাহ-সাদির সম্পর্ক করিও না। উহাদের জানাযা পড়িতে যাইও না। উহাদের উপর অভিশাপ প্রদান করাও দুরস্ত।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হোদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে যাহারা আমার হাতে বায়াত করিয়াছে, তাহারা কখনও দোজখী হইবে না। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বদরের মুজাহিদদের অবস্থা দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যাও, এখন তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করিয়া দিলাম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সদৃশ। তোমরা তাহাদের মধ্যকার যাহারই অনুসরণ করিবে, সোজা পথ প্রাপ্ত হইবে। অন্য হাদীসে

আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার কোন সাহাবী যে যমিনে মৃত্যুবরণ করিবে, সে সেই যমিন ওয়ালার জন্য রোজকিয়ামতে সুপারিশকারী হইবে। হযরত সুফিয়ান ইবনে উনাইজ (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ)এর কোন সাহাবী সম্পর্কে কেহ যদি একটি খারাপ কথাও উচ্চারণ করে, তবে সে গোমরাহ এবং কুপথগামী হইবে।

ইমাম এবং হাকীমদের পায়রবী

আহলে সুন্নত অল জামাত্রের সব লোক ইহাতে একমত যে, মুসলমান ইমাম এবং তাঁহাদের অনুসারীদের নির্দেশ শুনা ও পালন করা সকলের প্রতি ওয়াজিব। আর নেককার বা গুনাহগার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বা তাহাদের মনোনীত লোকের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয হইবে। আহলে সুন্নাত অল জামাতের মতে কোন নামাযী নেককার বা গুনাহগার হউক, তাহার বেহেশতী বা দোজখী হওয়া সম্পর্কে কোন একীনী মন্তব্য করা চাই না। আহলে সুন্নত অল জামায়াত এই ক্ষেত্রেও একমত যে, নবী-রাসূলদের মো'জেযাহ ও আউলিয়াদের কারামত বরহক। (সুতরাং উহা বিশ্বাস এবং স্বীকার করা কর্তব্য)। কোন দ্রব্যের মূল্যের উর্দ্ধগতি আল্লাহর তরফ হইতে হয়। ইহাতে আকাশের কোন তারকা কিংবা রাজ্যের বাদশাহর কোন দখল নাই। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, নিঃসন্দেহে উর্দ্ধমূল্য ও নিম্নমূল্য আল্লাহরই দুইটি ইচ্ছাস্বরূপ। আল্লাহর যখন কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করার ইচ্ছা হয় তখন তিনি ব্যবসায়ীদের মনে লালসা বাড়াইয়া দেন। তাহারা দ্রব্যের ঘাটতি দেখাইয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করে। আবার আল্লাহর যখন কোন দ্রব্যের মূল্য কমাইবার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি ব্যবসায়ীদের মনে খোদাভীতির সৃষ্টি করিয়া দেন, আর তখন তাহারা ঐ দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দিয়া উহার মূল্য কমাইয়া দেয়।

সুন্নত অল জামাতের পায়রবি

জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ মুমিনদের জন্য উত্তম, সুন্নত অল জামাতের অনুবর্তী হওয়া এবং বেদায়াত হইতে বাঁচিয়া থাকা। দ্বীনের ভিতরে বেশী প্রশ্ন করা ও অধিক ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা চাই না। তাহা হইলেই গোমরাহী হইতে বাঁচা যাইবে এবং পদস্খলনের ভয় থাকিবে না। উহা ধ্বংস প্রাপ্তির ও কারণ বটে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা সুন্নাতের অনুবর্তী হও এবং বেদায়াত হইতে বাঁচিয়া থাক। তোমাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, তোমরা গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে বিরত থাক। আর এই কথা বলিও না যে, এইরূপ কেন হইল? মুজাহিদ (রাঃ) যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর এই উক্তিটির কথা শুনিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রথম দিকে আমরা কোন কোন বিষয়ের হুকুম সম্পর্কে বলিতাম, এ কেমন হুকুম? কিন্তু এখন আর এরূপ বলি না। কেননা ঈমানদার লোকের কর্তব্য হইল সুন্নতের অনুবর্তিতা ও জামাতের পায়রবি। সুন্নাত ঐ তরীকাকে বলে, যাহা হুযুরে পাক (দঃ) শুরু করিয়াছেন এবং উহার উপর বহাল রহিয়াছেন। আর জামাত উহাকে বলে, খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকের যমানায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাহার উপর একমত পোষণ করিয়াছেন।

বেদয়াতীদের হইতে সরিয়া থাকা

জ্ঞানী মুমিনদের কর্তব্য হইল বেদয়াতীদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং তাহাদের সাথে আত্মীয়তা ও মোহব্বত না করা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতীকে সালাম করিল, সে যেন তাহার সহিত ভালবাসা স্থাপন করিল। (কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পরে বেশী করিয়া সালাম আদান প্রদান কর, তাহাতে ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে।) জ্ঞানী মুমিনদের ইহাও উচিত যে, তাহারা যেন বেদয়াতীদের সাথে উঠাবসা না করে,

তাহাদের নিকটে না যায়, তাহাদের আনন্দ উৎসব ও খুশীর ব্যাপারে খুশী প্রকাশ এবং ধন্যবাদ প্রদান না করে, তাহাদের জানাযার নামাযে শরীক না হয়, তাহাদের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রার্থনা না করে। বরং সর্বরকম তাহাদের হইতে পৃথক থাকে। আর শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাহাদের সাথে শত্রুতা করে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বেদয়াতীদের সাথে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুশমনি রাখে, তাহার অন্তরকে আল্লাহ্ ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। আর যে ব্যক্তি বেদয়াতীকে আল্লাহর শত্রু জানিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে, রোজকিয়ামতে আল্লাহ তাহাকে নির্ভয়ে ও নিরাপদে রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি বেদয়াতীদেরকে অপদস্থ করে, তাহার জন্য বেহেশ্‌তে যাওয়ার একশত দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতীর সাথে খুশী মনে ও প্রসন্ন বদনে সাক্ষাত না করে, সে যেন সেই দ্বীনকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করিল, যাহা আল্লাহতায়ালা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উপর নাযিল করিয়াছেন। আবু মুগীরাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেদয়াতী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত বেদয়াতকে বর্জন না করে, আল্লাহতায়ালা তাহার নেক আমলসমূহ কবুল করেন না। হযরত ফুজাইল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বেদয়াতীদের সাথে দোস্তী রক্ষাকারীদের নেক কাজসমূহ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ তাহাদের অন্তর হইতে ঈমানের নূর বাহির করিয়া দেন। আর যাহারা বেদয়াতীদের সাথে শত্রুতা রাখে, তাহাদের নেক আমল অল্প হইলেও আল্লাহ তাহাদেরকে মাফী বখশেষ করেন। তোমরা পথিমধ্যে যখন কোন বেদয়াতীকে দেখিবে, তখন অন্য পথ দিয়া যাইও। হযরত ফুজাইল ইবনে আব্বাস (রহঃ) বলিতেন, আমি স্বয়ং হযরত সুফিয়ান (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতী ব্যক্তির জানাযার সাথে গমন করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রত্যাবর্তন না করে, আল্লাহর গজব তাহার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত নাযিল হইতে থাকে।

হুযুরে পাক (দঃ) বেদয়াতীদের উপরে অভিসম্পাত করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ভিতরে কোন নূতন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে এবং কোন বেদয়াতীকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহার উপরে আল্লাহর সমস্ত ফেরেশতাদের এবং সমগ্র মানবদিগের অভিসম্পাত। আল্লাহতায়ালা যে শুধু তাহাদের ফরজ কবুল করিবেন না তাহা নহে, তাহাদের নফলও কবুল করিবেন না। হযরত আবু আইউব (রহঃ) বলেন, যদি তোমরা কাহারও নিকট হুযুরে পাক (দঃ)এর হাদীস বর্ণনা করিতে থাক, আর সে যদি বলে যে, রাখিয়া দাও ওসব, ক্বোরআনে যাহা কিছু আছে, তাহাই বল, তবে মনে করিবে যে, ঐ লোকটি গোমরাহ।

বেদয়াতীদের নিদর্শন

বেদয়াতীদের কতগুলি নিদর্শন আছে, যাহা প্রকাশ্য। একটি হইল, তাহারা মুহাদ্দিসদিগকে মন্দ বলে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, হাদীসকে বাতিল প্রতিপন্ন করা। উহারা আহলে হাদীসদিগকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে। উহাদের এই কার্যকলাপ সমস্তই আহলে সুন্নত অল জামাতের সাথে হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যাহাই বলুক না কেন, উহাতে কিছুই যায় বা আসে না। মক্কার কাফির কুরাইশগণ হুযুরে পাক (দঃ)কে শায়ের, যাদুগর ইত্যাদি কত কিছুই না বলিয়াছেন কিন্তু তাহার কোনটাই টিকে নাই। বরং তিনি আল্লাহর নবী ও আল্লাহর রাসূল। ইহাই তাঁহার চিরন্তন পরিচয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। উহারা তাঁহার যত দোষই প্রচার করুক না কেন, তিনি আল্লাহর নিকট, আল্লাহর ফিরেশতাদের নিকট এবং সমগ্র মানবদিগের নিকট চির পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইয়া আছেন এবং সর্বদা থাকিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপথগামী ফেরকাসমূহের পরিচয়

দ্বীন ইসলামের বিপথগামী ফেরকাসমূহের অভ্যুদয়ের আভাস হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে লাভ করা গিয়াছে। হযরত কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতা এবং দাদা হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, শুনিয়া রাখ, হযরত মুসা (আঃ)-এর হেদায়াতের বিপরীত বনি ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের ভিতরের একাত্তরটি ফেরকার (দলের) সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার মধ্যে কেবল একটি দল ছাড়া বাকী সবগুলিই ছিল পথভ্রষ্ট। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল বাহাত্তরটি ফেরকা। আর তাহারও মাত্র একটি ফেরকা ছাড়া বাকী সবগুলিই গোমরাহ্ ফেরকা ছিল। কিন্তু আমার উম্মত তথা তোমাদের মধ্যে অভ্যুদয় ঘটিবে মোট তিয়াত্তরটি দলের। আর উহার মধ্যে মাত্র একটি দল ছাড়া বাকী সব দলগুলি গোমরাহ ও বেদ্বীন হইবে। কেবল ঐ একটি মাত্র দলই প্রকৃত মুসলমানরূপে গণ্য হইবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে আমার উম্মতগণ তিয়াত্তরটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইবে। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার (দঃ) জন্য সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হইবে, সেই দলটি, যাহারা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে দ্বীনী বিধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং হালালকে হারাম বানাইবে এবং হারামকে হালাল বানাইবে।

আবদুল্লাহ ইবেন যায়েদ (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, বনি ইস্রাঈল কাওম একাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি ব্যতীত বাকী সবগুলিই দোজখী হইয়াছে। আর আমার উম্মতগণ তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হইবে। যাহার মধ্যে একটি ব্যতীত আর সবগুলি দোজখী হইবে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) সেই দলটি কিরূপ হইবে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, ঐ দলটি আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করিবে।

উল্লেখ্য যে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর উম্মতদের এই দল বিভক্তির ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার নিজের যমানায় বা তাঁহার সাহাবী বা তাবেয়ীদের যমানায়ও বাস্তবায়িত হয় নাই। হইয়াছে হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের কয়েকশত বৎসর পরে। যখন মদীনায় মোনাওয়্যারার সপ্ত-ফকীহ্র অন্তর্ধান ঘটিয়াছে, তাঁহারা ও অন্যান্য শহরসমূহেরও ওলামায় কেরাম এবং ফোকাহাগণ দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন। ইহাদের মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়া হইতে এলেমের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইবার ফলে দুনিয়াতে খুবই ক্ষুদ্র একটি দল মাত্র হক পথের অনুসারী রহিল। তখন আল্লাহ্ এই ক্ষুদ্র দলটির দ্বারাই তাঁহার দ্বীনের হেফাজাত করাইয়াছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ মানুষকে এলেম শিখাইবার পর উহা তাহারা তাহাদের সিনায়ই রাখিয়া দিবে, অন্যান্য লোকদের মাঝে প্রচার করিবে না। এমতাবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইবে এবং তাহাদের সাথে সাথে এলেমও দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দুনিয়াতে শুধু মূর্খ লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। যাহারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করিবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) অন্য এক রেওয়ায়েতে বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা মানুষের দিল হইতে এলেমকে টানিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর সাথে সাথে এলেমেরও বিলুপ্তি ঘটিবে। এইভাবে যখন আর কোন আলেম থাকিবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকেই নিজেদের নেতা বানাইয়া লইবে এবং তাহাদের নিকটেই দ্বীনী মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিবে, আর তাহারা উহা না জানা সত্ত্বেও ঐ সম্পর্কিত ফতোয়া প্রদান করিবে। যাহার ফল এই হইবে যে, নিজেরা তো গোমরাহ আছেই অন্যকেও গোমরাহ্ করিয়া দিবে। কাছীর ইবেন আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রহঃ) স্বীয় পিতা এবং দাদা হইতে বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সর্প যেমন লেজ গুটাইয়া নিজের গর্তের দিকে ফিরিয়া আসে, এইভাবে দ্বীন ইসলামও সঙ্কুচিত হইয়া মক্কা এবং মদীনাতে চলিয়া আসিবে এবং দ্বীনের কিছু হেফাজাত সেখানেই হইবে। যে রকম হরিণের নিরাপত্তা তাহার পর্বত শৃঙ্গে আরোহণের কারণে হইয়া থাকে। দ্বীনের প্রকাশ এইভাবে গরীবীর মধ্য দিয়া হইয়াছিল, আবার

ইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই গরীবীই অবলম্বন করিবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক যুগেই মানুষ একেকটি করিয়া সুন্নতের বিলোপ সাধন করিবে ও একেকটি বেদয়াত সৃষ্টি করিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আমাদের মধ্যে ফাতনার বিষয় উল্লেখ করিলে আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ)! সেই ফাতনা হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? তিনি জবাবে বলিলেন, আল্লাহর কিতাব। ইহা প্রকৃত হেকমত এবং নসীহত ভাণ্ডার এবং সহজ সরল পথ। ইহা সেই মহাগ্রন্থ যাহার উচ্চারণ শুনা মাত্র জ্বিন সম্প্রদায় বলিয়া উঠিয়াছিল 'ইন্না সামি'না কুরআনান আজাবা'। হযরত আরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর পিছনে ফজরের নামায আদায় করিলাম, অতঃপর তিনি এমন চিত্তাকর্ষক নসীহত শুরু করিলেন যে, আমাদের চক্ষুগুলি অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার হইল এবং দেহে গরীমার আবির্ভাব ঘটিল। আমরা তখন আরজ করিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নসীহত শুনিয়া তো আমাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, নাজানি আপনি আমাদেরকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় এবং শাসকের আনুগত্যের জন্য নসীহত করিতেছি, চাই শাসক হাবসী গোলামই হোকনা কেন। আমার পরে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে। সে সময় তোমাদের আমার তরীকা এবং আমার ঐ সমস্ত অনুসারীদের তরীকা ধারণ করিয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। যাহারা আমার পরে তোমাদেরকে সোজা পথ প্রদর্শন করিবে, তাহাদেরকে তোমরা সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে এবং দ্বীন ইসলামের ভিতরে যে কোন রকম নূতন বিধান হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা দ্বীনের ভিতরে যে কোন নূতন বিধান বেদয়াত ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং যে কোন বেদয়াতই গোমরাহী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে দাওয়াত প্রদানকারী (মুবাল্লিগ) সোজা রাস্তার দিকে আহবান করিবে, তাহার অনুসরণ করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পথ প্রদর্শনকারীদেরও তাহাদের অনুসরণকারীদের তুল্য ছওয়াব মিলিবে। অথচ তাহাতে অনুসরণকারীদের ছওয়াব এতটুকু হ্রাস পাইবে না। একইভাবে যাহারা গোমরাহীর দিকে আহ্বান করিবে, তাহাদের অনুসারীদের তুল্য তাহাদেরও আযাব মিলিবে অথচ তাহাতে অনুসারীদের আযাব এতটুকু মাত্র কমিবে না।

তিহাত্তর ফেরকার বিবরণ

শেষ যমনার উম্মতের মোট তিহাত্তর ফেরকা মূলতঃ মূল দশটি ফেরকার শাখা-প্রশাখা। সেই দশটি ফেরকা হইলঃ (১) আহলে সুন্নত (২) খারেজী (৩) শিয়া (৪) মু'তাযিলা (৫) মারজিয়া (৬) মুশাব্বাহা (৭) জাহমিয়া (৮) জারারিয়া (৯) নাজ্জারিয়া এবং (১০) কালাবিয়া।

আহলে সুন্নতের কোন শাখা-প্রশাখা নাই। উহা একক, কিন্তু খারেজী বা খারেজিয়ার শাখা পনেরটি, মু'তাযিলার ছয়টি, মারজিয়ার বারটি, শিয়ার বত্রিশটি, মুশাব্বাহার তিনটি এবং জারারিয়াহ, কালাবিয়াহ ও জাহমিয়াহ এই তিনটির প্রত্যেকটির মোট একটি করিয়া এই সর্বমোট তিহাত্তরটি শাখা।

(১) নাজিয়াহ ঃ আহলে সুন্নতের অন্য নাম ফেরকায় নাজিয়াহ। ইহাদের আকীদা এবং মত ও পথ এতক্ষণ উল্লেখ করিয়াছি। মু'তাযিলাহ ফেরকার লোকেরা আহলে সুন্নত অর্থাৎ নাজিয়াহ ফেরকার লোকদেরকে মু'জবেরাহ বলে। কেননা দুনিয়ার সমগ্র মাখলুক মাশিয়াতে ইলাহী ও কুদরতে ইলাহীর আওতাধীন।

আর ফেরকায় মারজিয়াহর লোকেরা নাজিয়াহ ফেরকার লোকদেরকে শাকাকিয়াহ বলে। কেননা এই ফেরকার লোকগণ ঈমানের জন্য মাশিয়াতে ইলাহীকে শর্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের মতে যদি কেহ এই কথা বলে যে, ইনশা আল্লাহ আমি ঈমানদার। তবে ইহা দুরস্ত হইবে।

ইহা ছাড়া জাহমিয়াহ এবং নাজ্জারিয়াহ সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেরকায় নাজিয়াহকে মুশাব্বাহা এবং বাতেনিয়া ফেরকার লোকেরা হাশবিয়াহ বলে।

(২) খারেজিয়াহ ঃ খারেজীদেরও বিভিন্ন নাম এবং লবক আছে। উহাদেরকে খারেজী বলার কারণ হইল, ইহারা হযরত আলী (রাঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারীদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। আরবী ভাষায় যে বাহির হইয়া যায়, তাহাকে খারিজ বলে। ইহাদের আর একটি নাম হাকামিয়া।

এই নামকরণের কারণ হইল, ইহারা হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার রায়দানকারী হিসাবে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ও হযরত আমার ইবনুল আস (রাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ) যখন উক্ত সাহাবীদ্বয়কে রায় বা হুকুমদাতা হিসাবে মানিয়া নিলেন, তখন খারেজীগণ বলিল যে, হুকুম প্রদান করার অধিকার শুধু আল্লাহতায়ালার। কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে হুকুম প্রদান কোন মানুষই করিতে পারে না।

ইহাদের আর একটি নাম হারুরিয়াহ্। হযরত আলীর (রাঃ) দল ছাড়িয়া কুফা হইতে বাহির হইয়া ইহারা হারুরা নামক একটি স্থানে গিয়া অবস্থান নিয়াছিল। সুতরাং ঐ স্থানের নামটির দ্বারাও উহারা পরিচিত হইত। ইহা ছাড়াও খারেজিয়াহদের আরও কতগুলি নাম রহিয়াছে। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এই খারেজিয়াহদের সম্পর্কেই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, উহারা দ্বীন হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেমনভাবে ধনুক হইতে হঠাৎ তীর বাহির হইয়া যায়। উহারা আর কখনই দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করিবে না। সত্যিই উহারা ইসলাম ধর্ম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, ইসলামের অনুসারীদের হইতে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সত্যপথ পরিহার করিয়াছে। ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছে এবং মুসলমানদের রক্ত ও জানমাল হালাল মনে করিয়াছে। ইহারা ইহাদের প্রতিপক্ষ তথা প্রকৃত মুসলমানদেরকে কাফির আখ্যা দিয়াছে। হযুরে পাক (দঃ)-এর সাহাবী আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করিয়াছে এবং এই সমস্ত করা তাহাদের জন্য সিদ্ধ এবং ন্যায্য বলিয়া মনে করিয়াছে।

এই খারেজীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কবর আযাব এবং হাউজে কাওছারকে বিশ্বাস করে না। হযরত রাসূলে করীমের (দঃ) শাফায়াতের উপরও আস্থা রাখে না। ইহারা বলে যে, যাহারা একবার দোজখে যাইবে, তাহারা আর তথা হইতে বাহির হইবে না। আরও বলে যে, যে একবার ঝুট বলে বা ছগীরাহ কিংবা কবীরাহ গুনাহ করে, অতঃপর তাওবা না করিয়া মারা যায় সে কাফির হইয়া মারা যায় এবং সে চিরকালের জন্য দোজখে থাকিবে। ইহারা ইহাদের বিপক্ষ মুসলমানদের সাথে এক জামাতে নামায পড়ে না। নিজেদের ইমামের পিছনেই নামায পড়ে এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করে। চাঁদ না দেখিয়া রোজা রাখে ও ঈদ করে। নগদ লেন-দেনে এক টাকার বদলে দুই টাকা নেওয়া বা দেওয়াকে জায়েয মনে করে। অর্থাৎ পরিষ্কার সুদ লেন-দেনকে হারাম মনে করে না। চামড়ার মোজার উপর মোসেহ করাকে ইহারা জায়েয মনে করে না। তাহাদের আকীদা এই যে, বাদশাহ বা শাসকের আনুগত্য জায়েয নয় এবং খেলাফত কোরায়েশ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত হয় নাই।

ইহাদের অধিক সংখ্যক লোক আম্মান, মোসেল এবং হাজারামৌত প্রভৃতি এলাকায় বাস করে। সর্বমোট পনেরটি শাখায় ইহারা বিভক্ত। উহার একটি শাখার নাম নাজরাহ্। নাজরাহ্ ইবনে আমের হানাফীর নামানুসারে এই নাম হইয়াছে। ইহাদের আকীদা এই যে, যে ব্যক্তি একবার মিথ্যা কথা বলিয়াছে, বা ছগীরাহ্ গুনাহ্ করিয়াছে, এবং তাওবা করে নাই, সে মুশরেক হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্ত চুরি, শরাবখোরী বা ব্যভিচার করিয়া তাওবা করিয়াছে, সে মুসলমান বৈকি! উহাদের মতে ইমাম ও মাজহাবের কোন প্রয়োজন নাই। শুধু আল্লাহর কোরআনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

উহাদের আর একটি শাখার নাম আরযাকাহ্। নাফে' ইবনে আরযাকের-এর নামানুসারে এই নামটি হইয়াছে, ইহাদের আকীদা হইল, গুনাহ্ কবীরাহ্ করা শিরক এবং দুনিয়া কুফরীর স্থান। তাঁহাদের আর এক অভিমত হইল, হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীর মুআবিয়া (রাঃ) তাঁহাদের মাঝে ফায়ছালার জন্য আবু মুসা আশআরী (রাঃ) এবং আমর ইবনুল আস (রাঃ)কে শালিস নির্বাচন করিয়া উভয়ে কাফির হইয়া গিয়াছেন (নাউযুবিল্লাহি) এই দলের লোকেরা জিহাদে মুশরিকদের নাবালেগ বাচ্চাদেরকে কতল করা জায়েয মনে করে এবং ব্যভিচারীকে ছঙ্গেছার (প্রস্তরাঘাতে প্রাণহরণ)কে হারাম জানে।

খারেজীদের আর এক শাখার নাম ফাদাকিয়াহ। জনৈক ইবনে ফাদিকের নামানুসারে এই নাম হইয়াছে। ইহাদের আর এক শাখার নাম আত্বয়িয়্যাহ। আত্বিয়্যাহ ইবনে আসোয়াদেব নামানুসারে এই নাম হইয়াছে।

আর একটি শাখার নাম উজারাওয়াহ। আবদুর রহমান ইবনে উজার হইতে এই নাম হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নাতনী, পৌত্রী, ভাতিজী এবং ভাগিনী ইত্যাদির সহিত বিবাহ জায়েয মনে করে। ইহাদের আর এক বিশ্বাস এই যে, সূরা ইউসূফ মূলতঃ কোরআনে পাকের অংশ নহে।

ইহাদের একটি শাখার নাম জামিয়াহ। এই শাখাটি আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উহারা একটির নাম হইয়াছে মালুমিয়াহ। তাহারা বলে, যাহারা আল্লাহতায়ালাকে তাহার নামের দ্বারাই চিনতে না পারে তাহারা মূর্খ।

ইহাদের একটি শাখার নাম মাজহুলিয়াহ। আর এক শাখার নাম ছালাতিয়াহ। ইহাদের আকীদাহ এই যে যাহারা তাহাদের মতে ও দৃষ্টিতে মুসলমান তাহাদেরও নাবালেগ সন্তান-সন্ততি মুলসামন নহে। বালেগ হওয়ার পরে যখন দেখা যাইবে যে, তাহারাও তাহাদের মতে ও দৃষ্টিতে মুসলমানরূপে বিবেচিত, তখনই তাহারা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইবে।

ইহাদের আর এক শাখার নাম জাযিয়াহ এবং আর এক শাখার নাম আখনিয়াহ। উহাদের আর এক শাখার নাম জাফরিয়াহ। এই শাখার আর এক শাখার নাম হাফছিয়াহ। ইহাদের আকীদা এই যে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাসী, চাই সে রাসূল, ফিরেশতা, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি সবকিছুই অবিশ্বাস করুক না কেন, নিজে বড় বড় গুনাহের মুরতাকেব হোকনা কেন এবং হত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি কাজগুলিকে জায়েয মনে করুক না কেন, সে প্রকৃত ঈমানদার।

খারেজিয়াহর আর একটি শাখার নাম বাহনামিয়াহ। আবি বাহনামের নামানুসারে এই নাম হইয়াছে।

ইহাদের আর এক শাখার নাম শামরাখিয়াহ। ইহাদের আকীদা এই যে, বার্দ্ধক্যে মা-বাপকে হত্যা করিয়া ফেলা জায়েয। উহাদের এই আকীদাহ যখন প্রকাশ পাইল, তখন অন্যান্য খারেজী শাখা এই শাখাটির সাথে তাহাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

ইহাদের আর এটি শাখার নাম বাদইয়্যাহ। ইহারা বলে যে, দুই ওয়াক্তের নামাযই কেবল ফরজ। যথাঃ ফজরের দুই রাকাত এবং মাগরিবের দুই রাকাত।

৩) **শিয়াহ ঃ** শিয়াহ ফেরকাটিও বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন ইহাকে রাফেজী, গালিয়াহ শিয়াহ তাইয়্যারাহ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়। ইহাদেরকে শিয়াহ বলার কারণ হইল, ইহারা হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুবর্তীতার দাবী করে এবং তাঁহাকে সমগ্র সাহাবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। ইহাদেরকে রাফেজী বলার কারণ এই যে, ইহারা অধিকাংশ সাহাবাকেই পরিত্যাগ করিয়াছে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর খেলাফতকে অস্বীকার করিয়াছে। কেহ কেহ রাফেজী নামকরণের কারণ এইরূপ বলে যে, যখন হযরত জয়নুল আবেদীনের মুখ হইতে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি সম্প্রীতিমূলক উক্তি প্রকাশ পাইল, তখন উহারা হযরত জয়নুল আবেদীনের সঙ্গ এবং আনুগত্য পরিত্যাগ করিল। হযরত জয়নুল আবেদীন (রহঃ) বলিলেন যে ইহারা আমাকে ছাড়িয়া গেল। এই কারণে উহাদিগকে রাফেজী বলা হয়। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, শিয়াহ তাহারাই যাহারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর উপর হযরত আলীকে (রাঃ) প্রধান্য দেয়। অর্থাৎ শিয়া বা রাফেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)কে হযরত ওসমান (রাঃ) অপেক্ষা আফজাল ও শ্রেষ্ঠ মনে করে।

শিয়াহদের একটি শাখার নাম ক্বাতিয়্যাহ এবং অন্য আর এক শাখার নাম গালিয়্যাহ। এই শাখার লোকেরা হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে অনেক অতিশয়োক্তি করিয়া থাকে এবং বহু ধরনের অশোভন কথাবার্তা বলে ও মত পোষণ করে। তাহাদের মতে হযরত আলীর (রাঃ) ভিতরে প্রভুত্ব এবং নবুয়তের অংশ বিদ্যমান।

রাফেজী সম্প্রদায় ঃ রাফেজীদের মূল শাখা তিনটি। যথাঃ (১) গালিয়া, (২) যায়েদিয়া ও (৩) রাফেজিয়া। গালিয়ার আবার বারটি শাখা। যথাঃ (১) বুনানিয়াহ (২) ত্বাইয়্যারাহ (৩) মানছুরিয়াহ (৪) মাগীরিয়াহ (৫) খেত্তাবিয়াহ (৬) মুআম্মারিয়াহ (৭) আবজালিয়াহ (৮) মুফজালিয়্যাহ (৯) তানাছিখা (১০) শারইয়্যাহ (১১) খাবতিয়্যাহ (১২) মাফুজিয়্যাহ।

যায়েদিয়ার শাখা ছয়টি। যেমনঃ (১) জারুদিয়্যাহ (২) সোলায়মানিয়াহ (৩) বাতরিয়্যাহ (৪) নাঈমাতিয়াহ (৫) ইয়াকুরিয়াহ (৬) তানাসাখিয়্যাহ।

এইভাবে রাফেজিয়ারও ষোলটি শাখা রহিয়াছে। যথা ঃ (১) ফাতিয়াহ (২) কেসানিয়্যাহ (৩) মুরতাবিয়্যাহ (৪) আমিরিয়্যাহ (৫) মুহাম্মদিয়্যাহ (৬) হুসাইনিয়া (৭) বাদসাইয়্যাহ (৮)

ইসমাইলিয়া (৯) কারামাতিয়্যাহ (১০) মুবারাকিয়্যাহ (১১) শামীতিয়্যাহ (১২) আসাদিয়্যাহ (১৩) মাত্বমুরিয়্যাহ (১৪) মাওসুয়িয়্যাহ (১৫) ইমামিয়্যাহ (১৬) খাবারিয়্যাহ।

রাফেজীদের আকীদা ঃ রাফেজিয়ার প্রত্যেকটি শাখার সম্মিলিত আকীদা এই যে, হযরত আলী (রাঃ) হুযুরে পাকের (দঃ) সমগ্র সাহাবাদের মধ্যে আফজাল বা সর্ব শ্রেষ্ঠ। এমন কি হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর অবর্তমানে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রাঃ)ই খেলাফতের ন্যায্য দাবীদার এবং এই পদে একমাত্র তাঁহারই অধিকার। রাফেজীগণ হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায় কেরামের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তাহাদের অভিমত, হুযুরে পাক (দঃ)-এর পরে হযরত আলীর (রাঃ) হস্তে খেলাফতের বায়াত না করার কারণে ছয়জন লোক ছাড়া অন্য সবাই-ই মুরতাদ হইয়া গিয়াছেন। ঐ ছয় ব্যক্তি হইলেন, (১) হযরত আলী (রাঃ) (২) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) (৩) হযরত মেকাদাদ ইবনে আসোয়াদ (রাঃ) (৪) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এবং আরও অন্য দুইজন।

উহাদের আর এক আকীদা এই যে, সমস্ত ইমাম যাবতীয় ভুল ত্রুটিবিমুক্ত এবং পবিত্র। দুনিয়াতে যাহা কিছু হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে তাহা সবই ইমামগণ অবগত। চাই যাহা পার্থিব হউক বা পারলৌকিক। এমন কি যমিনে কতগুলি বালুকণা আছে, যমিনে বৃষ্টির কতগুলি ছিটা পড়ে, তাহা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত বৃক্ষের পাতার সংখ্যা কত, ইহা সবই ইমামগণ বলিতে পারেন। ইহাছাড়া নবী-রাসূলদের মত ইমামগণও মো'জেযার অধিকারী।

রাফেজীদের আর এক খেয়াল হইল, যাহারা হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা সকলেই কাফির হইয়া গিয়াছে। ইহাদের কতগুলি আকীদা ইয়াহুদীদের আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন—ইয়াহুদীরা বলে, ইমামত শুধু হযরত দাউদ (আঃ)-এর সন্তানগণ ছাড়া আর কাহারও জন্য সিদ্ধ নয়, ঠিক তদ্রূপ রাফেজীরা বলে যে, ইমাম হযরত আলীর (রাঃ) সন্তান ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ছহীহ নহে। ইয়াহুদীরা বলে যে, যখন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) একগাছি রশি ধরিয়া আসমান হইতে যমিনে অবতরণ করিবেন তখন জিহাদ হইবে। ইহার পূর্বে কোন ধর্ম যুদ্ধ হইতে পারে না। একইভাবে রাফেজীরাও ইহা বলে যে যখন পর্যন্ত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন না করিবেন ও এক ব্যক্তি আসমানের দিক হইতে আওয়াজ না দিবে, তখন পর্যন্ত জিহাদ হইতে পারে না। ইয়াহুদীরা মাগরিবের নামায একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করে, তদ্রূপ রাফেজীগণও অত্যন্ত দেরী করিয়া মাগরিবের নামায পড়ে। তাহাছাড়া ফজরের নামায আদায়ের ব্যাপারেও ইয়াহুদীদের সাথে রাফেজীদের মিল রহিয়াছে। ইয়াহুদীরা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে, রাফেজীগণও এই একই মত পোষণ করে। ইয়াহুদীরা স্ত্রীলোকের ইদ্দত পালনের প্রয়োজন মনে করে না, রাফেজীগণও এই মতের সমর্থক। ইয়াহুদীগণ তাওরাতের তাহরীফ করিয়াছে। রাফেজীগণ কোরআনে পাকের তাহরীফ করিয়াছে। তাহারা বলে যে, কোরআনে পাকের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। ইয়াহুদীরা ফিরেশতা জিব্রাইলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে! রাফেজীদের একটি শাখাও তাহাই করে। তাহারা বলে যে, ফিরেশতা জিব্রাইল আল্লাহর অহী পৌছানোর ক্ষেত্রে ভুল করিয়াছে। সে হযরত আলীর (রাঃ) নিকট অহী না পৌছাইয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট অহী পৌছাইয়াছে। অথচ আল্লাহতায়ালা হযরত আলীর (রাঃ) নিকটই অহী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ফেরকায় গালিয়ার আকীদা ঃ এই ফেরকার লোকদের আকীদা এই যে, হযরত আলীর (রাঃ) মর্তবা সকল নবীদের অপেক্ষা বেশী। তাহাদের মত এই যে, হযরত আলী (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদের মত যমিনে সমাহিত হন নাই। বরং তিনি মেঘের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি সেখান হইতেই আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। শেষ যমানায় আবার তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে এবং তিনি তখন শত্রুদেরকে হত্যা করিবেন। উহারা আরও বলে যে, হযরত আলী (রাঃ) এবং ইমামদের কেহই মৃত্যুবরণ করেন নাই বরং ইহারা সকলেই রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। গালিয়া ফেরকার লোকেরা ইহাও বলে যে, হযরত আলী (রাঃ) নবী ছিলেন। ফিরেশতা জিব্রাইল অহী পৌছাইতে ভুল করিয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কাছে উহা পৌছাইয়াছেন। এমনি উহাদের কেহ কেহ এই কথাও বলে যে, হযরত আলী (রাঃ)ই মাবুদ ছিলেন। (নাউযুবিলাহ) এই ফেরকাহর লোকগণ এই সমস্ত আকীদা এবং কথা দ্বারা ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। উহাদের উপরে

সর্বদা আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হইতেছে। উহাদের এই ধরনের আকীদা ও মনোভাব হইতে আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন।

৪) ফেরকায় মারজিয়্যাহ ঃ মারজিয়্যাহ ফেরকাহটিরও বারটি শাখা রহিয়াছে। যথাঃ (১) জাহমিয়া (২) ছালেহিয়া (৩) শামরিয়া (৪) ইউনুসিয়্যাহ (৫) ইউনানিয়াহ (৬) নাজ্জারিয়াহ (৭) গীলানিয়্যাহ (৮) শাবীতিয়্যাহ (৯) হানফিয়্যাহ (১০) মুআযিয়্যা (১১) মারসিয়্যাহ (১২) কারামিয়্যাহ।

মারজিয়্যাহদের আকীদা হইল, ঈমান কথার নাম কাজের নাম নয়। অর্থাৎ কালেমায় তাইয়্যেব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) উচ্চারণকারী যত বড় গুণাহগারই হোক না কেন, সে কখনও দোজখে যাইবে না। তাহারা আরও বলে যে, ঈমানের মধ্যে কোনরূপ কম বেশী হয় না। সুতরাং তাহাদের মতে সাধারণ লোকের ঈমান, নবী-রাসূলদের ঈমান এবং ফিরেশতাদের ঈমান সবই এক বরাবর। ইহার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য, ব্যবধান বা কমি-বেশী নাই।

৫) ফেরকায় মু'তাযিলাহঃ মু'তাযিলাহ নামাকরণেরে কারণ হইল, এই দলটি হক পথ হইতে একদিকে সরিয়া গিয়াছে। আরবী ভাষায় মুতাযিলা শব্দের মূল শব্দ ই'তেযাল-এর অর্থ হইল একদিকে সরিয়া যাওয়া।

মু'তাযিলাহ সম্প্রদায় প্রকৃত পক্ষেই কয়েকভাবে মুসলামনদের বিশ্বাস আকীদা এবং ধারণা হইতে সরিয়া গিয়াছে । যেমন ঃ (১) ইহাদের একদল বলে যে, গুনাহ কবীরাহর মুরতাকিব কাফির হইয়া যায় । (২) ইহারা হযরত হাসান বছরীর (রহঃ) দরবার হইতে সরিয়া গিয়াছিল । অতঃপর হযরত হাসান বছরী (রহঃ) যখন তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহাদেরকে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে, ইহারা পার্থক্য সৃষ্টিকারী ।

মু'তাযিলাহ সম্প্রদায়ের আর এক নাম কাদরিয়্যাহ। এই দলটিরও ছয়টি শাখা রহিয়াছে। যথাঃ (১) হাযলিয়্যাহ (২) নেজামিয়্যাহ (৩) মুআম্মারিয়াহ (৪) জামারিয়্যাহ (৫) কাবিয়্যাহ (৬) হাশমিয়াহ।

মু'তাযিলার অন্য নাম কাদরিয়্যাহ হওয়ার কারণ হইল, এই দলের লোকদের আকীদাহ এই যে, মানুষের গুনাহ কাজা ও কদরের আওতাধীন নহে। বরং তাহাদের মতে গুনাহর স্রষ্টা মানুষ নিজেই। ইহাদের আর এক আকীদা হইল, আল্লাহ বান্দার সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন বাসনা পোষণ করেন, বাস্তবে যাহার বিপরীত হয়, ঠিক এইভাবেই আল্লাহ বান্দার জন্য যে রুজী নির্দিষ্ট করিয়াছেন, বান্দা সেই রুজীর বদলে অন্য রুজী খায়। তাহা ছাড়া উহাদের আর এক বিশ্বাস, আল্লাহ বান্দার জন্য যে নির্দিষ্ট আয়ু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, অনেক সময় ঘাতকের হত্যা দ্বারা তাহার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইয়া যায়।

মু'তাযিলাদের মত এই যে, মু'মিন ব্যক্তি গুনাহ কবীরাহ করিয়া যদিও বেঈমান না হয় কিন্তু তাহার ঈমান চলিয়া যায়। তাহাছাড়া গুনাহ কবীরাহর কারণে তাহার যাবতীয় নেকী বরবাদ হইয়া যায় এবং কবীরাহ গুনায় লিপ্ত ব্যক্তি সর্বদাই দোজখে থাকিবে। উহারা হযরত রাসূলে করীম (দঃ)এর শাফায়াতকেও অবিশ্বাস করে। উহাদের অধিক সংখ্যক লোক কবর আযাবকেও অবিশ্বাস করে। উহারা রোজকিয়ামতে নেকী-বদির ওজনকেও অস্বীকার করে। উহারা আরও বলে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহের উপরে জীবিতদের দোয়া প্রার্থনা, দান-খয়রাত ইত্যাদি কোন কিছুরই ছওয়াব বা তাছীর পৌঁছে না। ইহারা এইরূপ আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমনকি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাথেও কখনও কোন কথাবার্তা বলেন নাই, এমনকি তিনি ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল, মিকাইল, ইস্রাফীল এবং আরশ ধারণকারী ফেরেশতাদের সাথেও কথা বলেন নাই এবং রোজকিয়ামতে তিনি তাহাদের কাহারও দিকে চক্ষু উঠাইয়া পর্যন্ত তাকাইবেন না।

মু'তাযিলা ফেরকার বিভিন্ন শাখার আরও কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকীদা রহিয়াছে। সেগুলিতে উহারা পরস্পরে একে অন্যের সাথে একমত পোষণ না করিলেও মৌলিক বিষয়গুলিতে সকলেই একমত পোষণকারী। উহাদের সম্মিলিত আকীদার মধ্যে ইহাও একটি যে, বান্দা যখন ইচ্ছাপূর্বক নামায তরক করে, তখন উহার কাজা করা আর বান্দার যিম্মায় ওয়াজিব থাকে না।

৬) ফেরকায় মুশাব্বাহাঃ এই ফেরকার তিনটি শাখা রহিয়াছে। যথাঃ (১) হিশামিয়াহ (২) মুকাতালিয়া এবং (৩) ওয়াসেমিয়াহ।

ফেরকায় মুশাব্বাহার তিনটি শাখাই এই আকীদা পোষণ করে যে আল্লাহতায়ালার দেহ রহিয়াছে। কেননা কোন বস্তুর জ্ঞান রাখার জন্য জ্ঞানী বা জ্ঞানবানের নিজের জন্য দৈহিক স্বত্তা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, রাফেজিয়া ও কেরামিয়া প্রভৃতি ফেরাকাহগুলি এই ফেরকায় মুশাব্বাহার আকীদার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

মুশাব্বাহা ফেরকাহর হিশামিয়া শাখা এই মনোভাব পোষণ করে যে, আল্লাহতায়ালার দেহ আছে ও তাঁহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে এবং আল্লাহ এক অত্যুজ্জ্বল নূর সদৃশ এবং তাঁহার এক নির্দিষ্ট আকার আছে। আল্লাহ কখনও দাঁড়ান, কখন বসেন এবং চলা ফিরাও করেন আবার কখনও শান্তভাবে একই স্থানে অবস্থানও করেন।

মু'ক্বাতালিয়া শাখা আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহতায়ালা অবিকল মানবের মত আকৃতি ও দেহধারণকারী। সে দেহে রক্ত-মাংসও আছে এবং ঐ দেহ ঠিক মানুষের মত হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাবিশিষ্ট। অবশ্য পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আল্লাহর দেহের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির আকার-আকৃতি, গঠন এবং রূপআদি অন্য কাহারও সহিত সামঞ্জস্যকর নহে।

(৭) **ফেরকায় জাহমিয়াহঃ** জাহম ইবনে ছাফওয়ান নামক এক ব্যক্তির দ্বারা এই ফেরকাহর সূত্রপাত হয় বলিয়া ইহার নাম ফেরকায় জাহমিয়াহ।

এই জাহমিয়াহ ফেরকাহর ধারণা এই যে, মানুষ যে কাজ করে, উহার প্রকৃত কর্তা মানুষ নয়। বরং মানুষের সাথে ঐ কাজের সম্পর্ক হইল মাজাযান বা গৌণতঃভাবে। কাজটির সাথে প্রকৃত সম্পর্ক হইল আল্লাহতায়ালার, অর্থাৎ আল্লাহর দ্বারাই কাজটি হইয়া থাকে। যেমন মানুষ বলে, গাছটি বড় হইয়াছে, ফুলটি ফুটিয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, গাছটি নিজের ইচ্ছায় ও নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছে, বরং অর্থ হইল, আল্লাহই উহাকে বড় করিয়াছেন এবং তাহার ফলেই উহা বড় হইয়াছে। ফুলটি ফোটার ব্যাপারও এইরূপ অর্থাৎ উহা ফুটিয়াছে ঠিকই, তবে তাহা আল্লাহর কার্য। ফুলের সে কাজে কোন হাত নাই।

জাহমিয়া ফেরকাহর দ্বিতীয় আকীদা হইল, কোন বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আল্লাহর ঐ বস্তু সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা খবর থাকে না বরং সৃষ্টির পরেই আল্লাহ উহার বিষয় সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।

উহাদের তৃতীয় আকীদা হইল, বেহেশত ও দোজখ উভয়ই অস্থায়ী। উহার কোনটাই চিরস্থায়ী নহে।

(৮) **ফেরকায় জারারিয়াহঃ** জারার ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এই ফেরকাহর নামকরণ করা হইয়াছে। এই ফেরকার আকীদা হইল প্রাণীর রূহ ও দেহের মধ্যে কোন পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য নাই বরং এতদোভয়ের একটির সাথে অন্যটির গভীর সম্পর্ক। একটির অবর্তমানে অন্যটির অস্তিত্ব আশা করা যায় না।

(৯) **ফেরকায় নাজ্জারিয়াহঃ** হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা এই ফেরকার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

এই ফেরকাহরও আকীদা হইল কোন কার্যের মূল কর্তা মানুষ নহে বরং আল্লাহতায়ালা। আর উহাদের মতে আল্লাহতায়ালা ইচ্ছার মালিক (ইয়াফআলু মাইঁ ইয়াশাউ)-এর অর্থ হইল, আল্লাহতায়ালা কোন ক্ষেত্রে বা কোন ব্যাপারেই দুর্বল, অক্ষম এবং পরাজিত নহেন। ঠিক একইভাবে উহাদের মতে আল্লাহতায়ালার মুতাকাল্লিম (বাক্যোচ্চারণকারী) হওয়ার অর্থ হইল, তিনি বাক্যোচ্চারণ করা বা কথা-বার্তা বলায় অক্ষম নহেন।

(১০) **ফেরকায় কালাবিয়াহঃ** আবু আবদুল্লাহ ইবনে কালাব নামক ব্যক্তি দ্বারা ফেরকায় কালাবিয়াহর উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই ফেরকাহর আকীদা হইল, আল্লাহর ছিফাত কাদীম বা হাদেছ কোনটিই নয়। তাহারা বলে যে, আল্লাহর অবস্থানের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। তিনি পূর্বে যেখানে ছিলেন, এখনও সেখানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকিবেন। আর যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় আছেন এবং সেই অবস্থায়ই থাকিবেন। আর আল্লাহ পাকের কোন নির্দিষ্ট অবস্থান স্থল নাই। অবশ্য তাহারা পরিষ্কারভাবে একথাও বলে না যে, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান।

পূর্বোল্লিখিত তিহাত্তর ফেরকাহর উৎস যে দশটি ফেরকাহর বিষয় এখানে উল্লেখ করিলাম, ইহা ছাড়াও দ্বীন ইসলামের মিথ্যাদাবীদার রূপী আরও কতগুলি ফেরকাহর অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের আকীদা ও মতবাদের বিষয় উল্লেখ করতঃ প্রসঙ্গটি আর দীর্ঘায়িত করিব না। অতএব ভণ্ড ফেরকাহগুলির প্রসঙ্গটি আমরা এইখানেই শেষ করিতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

কোরআন ও হাদীসের ওয়াজ

আউযুবিল্লাহ পাঠের ফায়েদা ও ফজীলত

প্রথম মজলিস

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

অর্থঃ যখন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, তখন আল্লাহ্র কাছে এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

অর্থাৎ এইভাবে বল, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম—আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

উল্লিখিত আয়াত শরীফ সূরা নহল হইতে উদ্ধৃত। উক্ত আয়াত শরীফের শানে নুযুল হইল, হুযুরে পাক (দঃ)-এর উচ্চঃস্বরে সূরা তেলাওয়াত কালে শয়তানও উচ্চশব্দে উহা পাঠ করিত এবং উহার ভিতরে নিজের তরফ হইতে কিছু কথাবার্তা মিলাইয়া লইত। ইহা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদের কারণ ছিল। তাই আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াত শরীফের মাধ্যমে হুযুরে পাক (দঃ)কে অবহিত করাইয়া দিলেন যে, তুমি কোরাআন তেলাওয়াত কালে শয়তান হইতে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, যাহাতে সে ঐরূপ কুকাজ করিতে না পারে ও তুমি তাহার ষড়যন্ত্র হইতে বিমুক্ত থাক।

শয়তান শব্দটি শাত্বানুন শব্দ হইতে উদ্ভুত। উহার অর্থ হইল, দূর হওয়া। শয়তান যেহেতু ভালাই এবং কল্যাণ হইতে দূরবর্তী তাই উহাকে শয়তান বলা হয়।

রাজীম শব্দটি মারজুম শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। মারজুম অর্থ বিতাড়িত, অভিশপ্ত। বস্তুতঃ শয়তান আল্লাহর দরবার হইতে বিতাড়িত ও আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত। সে আল্লাহতায়ালা হইতে দূরবর্তী, সর্বরকম ভালাই হইতে দূরবর্তী, বেহেশত হইতে দূরবর্তী, কিন্তু দোজখ হইতে নিকটবর্তী। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবী ও তাঁহার উম্মতগণকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা উক্ত শয়তান হইতে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাহা হইলে দোজখ হইতে দূরবর্তী ও বেহেশতের নিকটবর্তী হইতে পারিবে। তদুপরি তোমাদের শাস্তি ও সাজাদাতার মালিক আল্লাহতায়ালার দীদার তোমাদের নছীব হইবে। আল্লাহতায়ালার এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রতি মুহূর্তে আমাদের সতর্ক থাকা চাই যে, কোন ক্রমেই যেন আমরা শয়তানের ফাঁদে আবদ্ধ না হই এবং সে যেন কোন প্রকারেই আমাদের উপর তার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতে না পারে। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকার অর্থ হইল, জীবনের সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ হইতে বিরত থাকা ও নিজের জান-মাল এবং সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে যত রকমের কাজ আছে, সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা রাখা। যদি বান্দা তাহার সকল কার্যে এই রীতি ও নীতিকে রক্ষা করিয়া চলে, তবে তাহার মুক্তি ও কল্যাণ এবং মঙ্গল অবধারিত। এই শ্রেণীর সকল বান্দা আল্লাহর নিকটস্থ জান্নাতুল মা'ওয়া নামক বেহেশতে নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন, শোহাদা ও ছালেহীনদের সাথে একত্রে বসবাস করিবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই শ্রেণীর বান্দাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়াই শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *

অর্থঃ নিশ্চয় আমার খাস বান্দাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। আর এক আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ *

অর্থঃ নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরাও তাহাকে শত্রু মনে কর। ঐ শয়তান বহু লোককেই গোমরাহ্ করিয়া ছাড়িয়াছে। তোমরা কি তাহা উপলব্ধি করিতেছ না? মোটকথা, শয়তানের অনুবর্তীতাই যত রকমের দুর্ভাগ্য এবং বিপদাপদের আসল কারণ। আর শয়তানের বিরুদ্ধাচারণই হইল সৌভাগ্য-সুখ-শান্তি এবং বেহেশত লাভের প্রকৃত পথ।

তায়াউযঃ আউযবিল্লাহ পাঠের পাঁচটি উপকারিতাঃ আউযু বিল্লাহ্—পাঠে পাঁচটি উপকার লাভ হয়। যথাঃ (১) ধর্মে সুদৃঢ় থাকা (২) শয়তানের প্রেরণা ও ক্লেশ প্রদান হইতে রক্ষা লাভ করা (৩) সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। (৪) শান্তিপূর্ণ বা আরামপ্রদ স্থানে অবস্থান করা (৫) পয়গম্বর, সিদ্দিকীন ও শোহাদাদের সাহচর্য লাভ করা এবং যমিন ও আসমানের সাহায্য পাওয়া।

শয়তান আল্লাহতায়ালাকে বলিয়াছিল যে, আমি তোমার বান্দাকে সম্মুখ-পিছন এবং ডান-বাম হইতে ধোকা প্রদান করিব। আল্লাহ বলিয়াছিলেন, আমার ইযযত এবং বোযর্গীর কসম আমি আমার বান্দাদিগকে আউযু—পাঠের নির্দেশ দান করিব। যখন সে উহা পাঠ করিবে, তখন আমি তাহাকে এইভাবে রক্ষা করিব যে, তাহার ডান দিকে হেদায়েত, বাম দিকে অনুগ্রহ, পিছনে পাহারা এবং সামনে আমার সাহায্য ও করুণা থাকিবে। হে মালউন! এমতাবস্থায় তুই আমার বান্দার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবি না।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ একবার আউযুবিল্লাহ পাঠ করিলে আল্লাহ তাহাকে সারাদিন হেফাজতে রাখেন। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, তোমরা আউযুবিল্লাহ পাঠের দ্বারা পাপের দরজা বন্ধ কর ও বিসমিল্লাহ পাঠ দ্বারা ইবাদাতের দরজা খুলিয়া লও।

কথিত আছে যে, জনৈক মু'মিনকে গোমরাহ্ করিবার জন্য শয়তান প্রত্যহ তিনশত ষাটটি অনুচর প্রেরণ করিয়া থাকে। ঐ মু'মিন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাহার অন্তরের দিকে তিনশত ষাটবার দৃষ্টিপাত করেন। আর প্রত্যেক দৃষ্টিতে একেকটি (অনুচর) শয়তান ধ্বংস হইয়া যায়। আউযবিল্লাহ পাঠ এবং মারেফাতের নূরের ছটাকে শয়তান ভয় করে। তুমি আরেফ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি না হইলে আরেফ হওয়া পর্যন্ত আউযুবিল্লাহ পাঠ করা তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য করিয়া লও। আরেফ হওয়ার পর তোমার অন্তরের নূরের ছটা শয়তানের শক্তি খর্ব করিয়া দিবে, শয়তানের অনুচর তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। সে সময় তুমি তোমার ভাই ও অনুসারীদিগকেও রক্ষা করিতে পারিবে। যেমন হুযুরে পাক (দঃ) হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, হে ওমর! তুমি যেই জঙ্গলে যাও, শয়তান তথা হইতে অন্য জঙ্গলে চলিয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, শয়তান হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিলে ভয়ে পাগল হইয়া যাইত।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, শয়তান যখন জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি সত্যবাদী ও তাহার ঘোর বিরোধী তখন সে তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু চুপে চুপে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, সে একটু অসতর্ক হইলেই তাহার উপর হামলা চালাইবে। অতএব এই পুরাতন ঘোরতর শত্রু হইতে সতর্ক থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। এই শয়তান মানুষের শিরায়, উপশিরায় রক্ত প্রবাহের সাথে চলা ফিরা করে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বৃদ্ধকালে প্রার্থনা করিতেন হে খোদা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, তুমি আমাকে ব্যভিচারী ও ঘাতক হওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখ। লোকগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এখনও ব্যভিচারীতে লিপ্ত হওয়ার ভয় আছে নাকি? তিনি জবাব দিলেন, কেন থাকিবে না! আমার শয়তান এখনও জীবিত আছে।

শয়তানের সাথে যুদ্ধ করিবার বড় হাতিয়ার কালেমায় তাউহীদ এবং আল্লাহ পাকের যিকির। হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে, কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আমার দুর্গ। যে এই কালেমা পাঠ করে, সে আমার দুর্গে প্রবেশ করে। তাহার আযাবের কোন ভয় নাই। হুযুর (দঃ) আরও বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে কালেমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যখন কোন ব্যক্তি কালেমায় তাউহীদ পাঠ এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ রীতিমত পালন করে, শয়তান তাহার নিকট হইতে ভাগিয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ঢাল বা বর্ম দ্বারা যেমন শত্রুর হামলা হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি কালেমায় তাউহীদ পাঠে শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

শয়তানের বিরুদ্ধে সাফলের‍্য জন্য বিসমিল্লাহ শরীফও বহু পরিমাণ পাঠ করা চাই। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম, শয়তান ধ্বংস হউক। আমি লোকটিকে বলিলাম, এইরূপ বলিলে শয়তান মনে করে আমি বাহাদুর। আমার ইযযতের শপথ আমি এই লোকটির উপর জয়যুক্ত। অতএব উহার বদলে (ঐ কথা না বলিয়া) তুমি বলঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। উহা পাঠ করিলে শয়তান ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় এতটুকু হইয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত দুনিয়ার কোন ধনবান ব্যক্তির ধন-সম্পদের লালসা করে, তাহার লালসা করে এবং পার্থিব ধন-সম্পদ জমা করিবার চিন্তায় মগ্ন হয়, তবে সে যেন শয়তানের সাহায্য কামনা করিল। তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শয়তানের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে পরিণত হয়।

এই জন্যই সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করিবে। পার্থিব কোন বিষয়বস্তু বা ব্যক্তির উপর ভরসা করিবে না, সমস্ত হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি হালাল ও হারামের মধ্যে তারতম্য করে না, আল্লাহও তাহার সম্বন্ধে পরওয়া করেন না যে, সে দোজখে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহ বলেন, যে রাহমানের (আল্লাহর) যিকির হইতে বিমুখ থাকে, আমি তাহার উপর শয়তান প্রবল করিয়া দেই। শয়তান এই ব্যক্তির পরম সঙ্গী হইয়া যায়। সে কখনও-বা তাহার নামাযের ক্ষতি করে, কখনও বা তাহাকে হারাম হালালের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে দেয় না। সৎ-কাজ শীর্ঘ করিতে বাধার সৃষ্টি করে। ইবাদাত-বন্দেগী করিতে নিষেধ করে। এই ব্যক্তির বার্দ্ধক্যে প্রায়শঃ শয়তান তাহার ঈমান নষ্ট করিয়া দেয়। রোজ কিয়ামতে লোকটি শয়তান, হামান, ফিরাউন ও কারুনের সাথে হাশর করিবে।

আমাদের ঈমানের মজবুতি ও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে শয়তানের তাবেদারী না করার জন্য আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

মাকাতিল জাহরী হইতে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ) হইতে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, সালমান, আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ হুযুরে পাক (দঃ)-এর তালাশে আসিলেন, এমন সময় তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন তাঁহার ললাটে ঘর্ম-বিন্দু মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তিনি উহা মুছিতে মুছিতে তিনবার এরশাদ করিলেন, এই মালউনের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার জনক-জননী আপনার উপর কোরবান হউক। আপনি কাহার উপর অভিসম্পাত করিলেন? হুযুর (দঃ) জবাবে বলিলেন, শয়তানের উপর এই মরদুদ স্বীয় লেজ গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইয়া সাতটি ডিম্ব প্রসব করিয়াছে এবং উহা হইতে সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উহারা মানব সন্তানকে ছলনা ও প্রতারণা করার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

উহাদের একটির নাম তাদহেশ। তাহার কাজ আলেমদিগকে লোভ লালসায় উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন রাস্তায় কুপ্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করা।

উহাদের দ্বিতীয়টির নাম হাদীস। সে নামাযীদের জন্য নির্দ্ধারিত । সে নামাযীদেরকে নামায ভুলাইয়া দেয়, ক্রীড়া কৌতূকের দিকে আকৃষ্ট করে। কখনও কখনও তন্দ্রাভিভূত করিয়া দেয় এবং নামাযী ঘুমের ঘোরে শয়ন করে। নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলে কেহ যদি বলে যে, তুমি তো ঘুমাইয়াছিলে, এখন অজু করিয়া পুনঃ নামায পড়। তখন সে ব্যক্তি বলে, না আমি নিদ্রা যাই নাই। অতঃপর সে অজু ছাড়াই নামায পড়ে।

অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যেই আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাহার কসম, এমন ব্যক্তি নামাযের পুণ্য অর্ধেক অথবা এক চতুর্থাংশ বা এক দশমাংশ পাইবে না। বরং পুণ্য অপেক্ষা পাপই অধিক হইবে।

উহাদের তৃতীয়টির নাম জালবানুস। উহারা হাটে-বাজারে অবস্থান করিয়া (বিক্রেতাকে) মাপে কম দিতে, বেচা-কিনায় মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত করায়।

উহাদের চতুর্থটির নাম বেহতের। সে মানুষকে বিপদাপদের কালে অধৈর্য করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্ষ চাপড়ায়, মস্তকে আঘাত এবং হায়-হুতাশ করায়।

উহাদের পঞ্চমটির নাম মানশুত। সে একে অপরের দ্বারা গীবাত, শেকায়েত, দুর্ণাম, চোগলখুরী ও অপবাদ ইত্যাদি করাইবার কাজে নিয়োজিত।

উহাদের ষষ্ঠটির নাম দামস। সে নর ও নারীদের লজ্জাস্থানে কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত। সময় সময় ইহারা পুরুষ রমণী উভয়ের লজ্জাস্থানে দম করে, আর তাহারই ফলে উভয়ের মনে পরস্পরের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল বসনা সৃষ্টি হয়।

উহাদের সপ্তমটির নাম আওয়ার। সে মানুষের দ্বারা চুরি করাইবার কাজে নিয়োজিত। সে অভাবগ্রস্ত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া কানে কানে বলে, চুরি কর, তোমার দুঃখ-কষ্ট ও অন্নাভাব দূর হইবে, করজ পরিশোধ হইবে। সুখ-শান্তিতে থাকতে পারিবে। পরে তাওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

শয়তানের উল্লিখিত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতেই মানব জাতির অপরিহার্য কর্তব্য হইল, এক মুহূর্তের জন্যও যেন শয়তানকে ভুলিয়া না যায় এবং নিজেদের কোন কাজে কর্মেই যেন শয়তানের ষড়যন্ত্র হইতে অসতর্ক না থাকে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অজুর উপরে একটি শয়তান কর্তব্যে রত। উহা হইতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই। হাদীস শরীফে আছে, নামাযের কাতারে পরস্পর মিলিত হইয়া দঁড়াইবে, যেন (দুইজনের মধ্যকার) খালিস্থানে শয়তান দঁড়াইতে না পারে! স্থান খালি থাকিলে ছাগল ছানার ন্যায় শয়তান আসিয়া সেই খালিস্থানে দাঁড়াইয়া যায়।

ওসমান ইবনে আস একবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার নামায ও কিরাতের মধ্যে শয়তান আসিয়া দাঁড়ায়। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, ঐ শয়তানের নাম খানযাব। যখন তুমি উহার আগমন উপলব্ধি কর, তখন তিনবার আউযু পাঠ এবং বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ কর। ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি এইরূপ করায় শয়তান আমার নিকটে ঘেঁষিতে পারে নাই।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একটি করিয়া শয়তান আছে। লোকগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার সাথেও? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ। তবে আল্লাহ আমাকে আমার শয়তানের উপর বিজয়ী করিয়া দিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, হাঁ তবে আল্লাহ উহাকে আমার অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এখন সে আমাকে সৎকাজে প্রেরণা দেয়। বর্ণিত আছে, আল্লাহ যখন ইবলীস শয়তানকে অভিশাপ দেন। তখন হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় তাহার পাঁজর হইতে তাহার পত্নীকে পয়দা করিয়া দেন। শয়তান উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করায় স্ত্রী গর্ভবর্তী হইয়া একত্রিশটি ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিম্ব হইতে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বন-জঙ্গল ও সাগরে ছড়াইয়া পড়ে। উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি ডিম হইতে দশ হাজার করিয়া বাচ্চা পয়দা হয়। তারপর তাহারা পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, মরু-প্রান্তর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি আমাকে ছাড়া শয়তান ও উহার বংশধরকে বন্ধুতে পরিণত করিয়াছ? অথচ উহারা তোমদের শত্রু। ঐসব অত্যাচারীদের জন্য অশুভ প্রতিদান রহিয়াছে, যাহারা শয়তান ও উহার বংশধরদের অনুসরণ করিয়াছে, এই অবস্থায় তাওবা ব্যতীত যাহারা মৃত্যবরণ করিয়াছে, তাহারা ধ্বংস হইয়াছে এবং সর্বদা শয়তানের সাথে দোজখে থাকিবে।

বান্দার র্কতব্য নিজের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা এবং নিজেকে শয়তান ও অপকর্ম হইতে বাঁচাইয়া রাখা। অসত্যের প্রতি আহ্বানকারী ও শয়তানের অনুচর হইতে পৃথক থাকিয়া আল্লাহর প্রতি আসক্ত হওয়া এবং আল্লাহর আদেশ পালন করা। যাহারা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান কল্পে স ৎকাজকারী, আল্লাহর দিকে আহ্বান দানকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী, আল্লাহর আযাবকে ভয়কারী,

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আখেরাতে আসক্ত, রাতে নামায আদায়কারী, দিনে রোযা আদায়কারী, দিবারাত্র ইবাদাতে কালক্ষেপকারী, এইসব লোকদের সঙ্গলাভ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে ও সর্বদা আল্লাহর যিকির করিবে।

আল্লাহ বলেন, আল্লাহর যিকিরে হৃদয় উজ্জ্বল হয়, অন্ধকার এবং আলস্যের পর্দা দূর হইয়া যায়। দিলের মরিচা বিলীন হয় এবং আল্লাহর স্মরণে যাবতীয় বিপদাপদ তিরোহিত হয়। এই কারণেই আল্লাহর যিকির করা ধর্মভীরুতা বা পরহেজগারী। পরহেজগারী পারলৌকিক দরজার চাবি স্বরূপ। আল্লাহ বলেন, কোরআনে যাহা কিছু আছে স্মরণ কর, হয়ত তোমরা পরহেজগারে পরিণত হইবে। (আল্লাহ) আরও বলেন, আল্লাহর স্মরণে বান্দা ধর্মানুরাগী হয়।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ছোট যুদ্ধ হইতে বড় যুদ্ধের দিকে ধাবিত হও। বড় যুদ্ধের অর্থ নফস (কুরিপু) এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা।

শয়তানের সাথে যুদ্ধঃ যুদ্ধ দুই প্রকার। যথা ঃ প্রকাশ্য ও গোপনীয়। মুসলমানের প্রকাশ্য যুদ্ধ হয় কাফির ও মুশরেকদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ করিতে হয় হাতিয়ার তথা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা । এই যুদ্ধ চলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই কারণে এই যুদ্ধকে জিহাদের আছগর বা ছোট যুদ্ধ বলে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আর একটি যুদ্ধ করিতে হয় তাহার প্রধান শুত্রু নফস (কুরিপু) এবং শয়তানের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে মু'মিন মুসলমানের স্বপক্ষীয় সৈন্য হইল তাঁহার ঈমান এবং স্বাভাবিক প্রশান্ত অন্তঃকরণ। মনে প্রাণে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়কে সাহায্য করেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এই যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নাই। সারা জীবন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই কারণেই ইহাকে বড় যুদ্ধ বা জিহাদে আকবর বলে। জিহাদে আছগর বা কাফির মুশরেকদের সাথে যুদ্ধের ফলে বেহেশত লাভ করা যায়, একইভাবে শয়তান ও কুরিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলেও বেহেশত লাভ করা যায়। অধিকন্তু ইহার দ্বারা দীদারে ইলাহী বা আল্লাহর সাক্ষাতও লাভ করা যাইবে।

বিমমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–এর ফজীলত ও মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় মজলিস

হযরত জাবের ইবনে আবুদুল্লাহ (রাঃ) হইতে আতা বলেন, যখন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হইল, তখন মেঘপুঞ্জ পূর্বদিকে ধাবিত হইল, বায়ু সঞ্চালন স্তব্ধ হইয়া গেল। সাগরসমূহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, চতুষ্পদ জন্তু উহা শুনিবার আশায় কর্ণ নিয়োগ করিল, শয়তানকে আসমান হইতে বিতাড়িত করা হইল। আল্লাহ তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তির কসম করিয়া বলেন, আমার নাম কোন রোগীর উপর পাঠ করিলে সে আরোগ্য হইবে। যে বস্তুর উপর আমার নাম পাঠ করা হইবে, তাহাতে বরকত হইবে। যে ব্যক্তি আমার নাম পাঠ করিবে, সে বেহেশতী হইবে।

আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দোজখরক্ষী উনিশজন ফিরেশতা হইতে মুক্তি পাইতে চায়, সে যেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে। কেননা বিসমিল্লায় রহিয়াছে উনিশটি বর্ণ। উহার প্রত্যেকটি বর্ণ একেকজন ফিরেশতা হইতে বাঁচার জন্য একেকটি ঢাল স্বরূপ। তাউস ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওসমান (রাঃ) হুযুর (দঃ)-এর নিকট 'বিসমিল্লাহ' বিষয় অবগত হইতে চাহিলেন। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। উহা এসমে আজমের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্কিত যেমন চোখের ভিতরকার কাল মণির সাথে সাদা অংশের গভীর ও নিকট সম্পর্ক।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম লিখিত কোন কাগজখণ্ড মানুষের পদতলে পরিবে বা অন্য কোনরূপে উহার অপদস্থতা ঘটিবে, এই ভয়ে উহা যমিন হইতে উঠাইয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়, আল্লাহর দরবারে তাহার নাম ছিদ্দীকীনদের দপ্তরে লিখিত হয় এবং তাহার জননী মুশরেকা হইলেও তাহার শাস্তি কমাইয়া দেওয়া হইবে।

বর্ণিত আছে যে, তিনটি দিন মরদূদ ইবলীস বে-হাল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এমনভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল, যেমন করিয়া সে সারাজীবনে আর কোনদিন কাঁদে নাই। প্রথম দিন হইল, যে দিন আল্লাহ তাহাকে মারদূদ এবং মালউন ঘোষণা করিয়া স্বীয় দরবার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় দিন হইল, যে দিন হযরত রাসূলে করীম (দঃ) জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় দিন হইল, যে দিন সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহসহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। সালেম ইবনে জা'লা বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাযিল হইল, তখন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, সর্ব প্রথম যখন এই আয়াতটি হযরত আদম (আঃ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমার বংশধরেরা যতদিন পর্যন্ত ইহা তেলাওয়াত করিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা আযাব হইতে মুক্ত থাকিবে। অতঃপর বিসমিল্লাহকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তারপর নমরুদ যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে চরকে চড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আবার বিসমিল্লাহ নাযিল হইল। যাহার বরকতে উক্ত অগ্নিকুণ্ড নিরাপদ বস্তুতে পরিণত হইয়া গেল। ইহার পর আবার বিসমিল্লাহ উঠাইয়া লওয়া হইল। পুনরায় ইহা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সময়ে অবতীর্ণ হইল। এই সময় ফেরেশতাগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়ায় আপনার রাজত্ব পূর্ণতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর আবার বিসমিল্লাহ উঠাইয়া লওয়া হইল। পুনরায় ইহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। অবতীর্ণ হইবার কালে হুযুরে পাক (দঃ) বলিয়াছিলেন, অতঃপর যখন আমার উম্মতের নেকী-বদী ওজন করা হইবে, তখন বিসমিল্লাহকে এক পালায় রাখা হইবে। এই সময়ে বিসমিল্লাহর বরকতে নেকীর পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবে। হুযুর (দঃ) আরও এরশাদ করিলেন, তোমরা বিসমিল্লাহসহ পত্র লিখ এবং পাঠ কর।

আকরামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম লাওহ্ ও কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর নির্দেশ দিলেন, হে কলম! লিখ, সে মতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে, কলম তাহা মাহফুজে লিখিল। অর্থাৎ কলম প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিল। বিসমিল্লাহ আল্লাহ মানুষেকে এই শর্তে নিরাপত্তা ও শান্তি দান করিলেন যে, মানুষ উহা সর্বদা পাঠ করিবে। সাত আসমান যমিনে যত বোযর্গ লোক, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত যত ফিরেশতা কাতার আল্লাহর ইবাদাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের অজিফা হইল, বিসমিল্লাহ প্রথম যখন হযরত (আঃ)-এর উপর বিসমিল্লাহ নাযিল হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যতদিন পর্যন্ত আমার রেরা বিসমিল্লাহ পাঠ করিবে, ততদিন তাহারা বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকিবে। হযরত মুসা -এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ হইবার কালে উহার সহিত বিসমিল্লাহও অবতীর্ণ হয়। হযরত (আঃ) উহা পাঠ করিয়া ফিরাউন, হামান ও কারুনের উপর জয়লাভ করিলেন।

ঈসা (আঃ)-এর উপর যখন ইঞ্জীলের সহিত বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি তাহার রীদিগকে এই শুভ সংবাদ দান করিলেন। আল্লাহতায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন, হে কুমারী তার পুত্র! তোমার উপর যাহা অবতীর্ণ হইল, উহা শান্তির আয়াত এবং উহার নাম বিসমিল্লাহির মানির রাহীম। শয়নে-স্বপনে, চলিতে-ফিরিতে, উঠিতে-বসিতে, উঁচু-নীচু স্থানে যাওয়া-আসা রিতে উহা পাঠ করিতে থাক। যে ব্যক্তির আমল নামায় আট শতবার বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়াছে লিয়া লিখিত থাকিবে এবং সে যদি মু'মিন এবং আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাসী থাকে, তাহার সম্পর্কে ল্লাহ বলেন, আমি তাহাকে দোজখের আগুন হইতে নিষ্কৃতি দিব এবং তাহাকে বেহেশতে স্থান করিব। প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যেক দোয়া অজিফা এবং নামাযের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা কান্ত কর্তব্য।

অবস্থায় অভ্যস্ত থাকা কালে মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুর তিক্ততা, মুনকার-নাকীরের সুয়াল জওয়ার, বরের সংকীর্ণতা ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাইবে। আমার রহমত তাহার সাথী হইবে। যতদূর দৃষ্টি য়, ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত হইবে এবং কবর আলোকিত করা হইবে, আপাদমস্তক জ্বল করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে। তাহার হিসাব-নিকাশ সহজ করা হইবে। নেকীর পাল্লা রী করা হইবে। পুলসিরাত পার হইবার সময় তাহার সম্মুখে নূরের আলো থাকিবে, সেই আলোর সাথে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এক ফিরেশতা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবেন, এই বান্দা ত্যন্ত সৌভাগ্যবান, আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্গত।

হযরত ঈসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে পরোয়ারদেগার! যে নিয়ামত তুমি দান করিলে, তাহা কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট? উত্তর হইল, হাঁ তোমার ও তোমার অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মতদিগকে এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, আল্লা বলিয়াছেন যে, আমার পর আহমদ নামক একজন নবীর আবির্ভাব হইবে, অতঃপর তিনি হুযুর (দঃ)-এর গুণাবলী র্ণনা করিলেন। ইহার পর তাঁহার উম্মতদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে, শেষ নবীর বির্ভাব হইলে তাহারা সেই নবীর আজ্ঞানুবর্তী হইবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমানে চলিয়া ওয়ার পর তাঁহার বিশ্বস্ত হাওয়ারীগণ ঈসায়ী ধর্মে বহাল থাকেন। তাহাদের মৃত্যুর পর ধর্মে নিত্য ন-রীতি নীতির প্রচলন করিয়া সকলেই ধর্মভ্রষ্ট হইয়া গেলে আল্লাহতায়ালা তাহাদের অন্তর হইতে বিসমিল্লাহ উঠাইয়া লইয়া যান। শুধু যে কয়জন ইঞ্জীলের নির্দেশ মানিয়া চলিত, তাহাদের অন্তরে উহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তাহাদেরই একজন বুহাইরা (রাহেব)।

শেষে আল্লাহতায়ালা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে নবুয়তী নিয়ামত বখশেষ করিয়া প্রেরণ করেন। মুয়াযযমায় সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ হইবার সময়ে উহার সহিত বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য সূরা, চিঠি পত্র, বই পুস্তক এবং দফতরের

কার্যাবলীতে প্রথম বিসমিল্লাহ লিখার প্রচলন হয়। হুযুরে পাক (দঃ)-এর উপর ইহা নাযিল হওয়া একটি বিজয় তুল্য ছিল। আল্লাহ বলেন, আমার সম্মান এবং প্রতিপত্তির শপথ, যে ব্যক্তি সকল কাজের প্রথম ইয়াকীনের সাথে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে, আমি তাহার কাজে বরকত দিয়া থাকি। যখন কোন মু'মিন বিসমিল্লাহ পাঠ করে, তখন বেহেশত বলে যে, হে আল্লাহ! বিসমিল্লাহর বরকতে তোমার এই বান্দাকে আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দাও। বেহেশতে প্রবেশ করানোর জন্য বেহেশত যখন কাহারও সম্বন্ধে সুপারিশ করে, তখন তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো ওয়াজিব হইয়া পড়ে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে যখন আমর উম্মত বিসমিল্লাহ পাঠ করিতে করিতে আসিবে, তখন তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। তখন অন্যান্য নবীদের উম্মতগণ জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদের পাল্লা কেন ভারী হইল, আমাদের পাল্লা কেন হইল না? মুহাম্মদ(দঃ)-এর উম্মতগণকে কেন আমাদের উপর মর্যাদা দান করা হইল? তাহাদের নবীগণ উত্তর করিবেন, মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতগণ কোন কথা বা কাজ শুরু করার পূর্বে তিনবার আল্লাহর তিনটি নামোচ্চারণ করিত। উক্ত নামত্রয় এত বেশী বরকত বিশিষ্ট যে, উহা এক পাল্লায় রাখিয়া অন্য পাল্লায় দুনিয়ার যাবতীয় পাপ রাখিলেও আল্লাহর সেই নামের পাল্লা ভারী থাকিবে।

হুযুর (দঃ) বলেন, কোন দোয়া করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করিলে সেই দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বিসমিল্লাহর এমন শক্তি দান করিয়াছেন যে, উহা রোগ আরোগ্য করে, গরীবকে ধনী করে। দোজখের আগুন হইতে নিরাপদ রাখে । বিসমিল্লাহ পাঠকারী যাবতীয় বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকে। আল্লাহর যিকিরকারীদের জন্য বিসামিল্লাহ একটি বড় নিয়ামত। উহা শক্তিশালীর জন্য মর্যাদাকর, দুর্বলের জন্য আশ্রয় স্থল। উহার বন্ধুদের জন্য উহা একটি নূর এবং উহার আসক্তদের প্রতি উহা আনন্দদায়ক। বিসমিল্লাহ প্রাণের শান্তির উৎস। দৈহিক সর্বপ্রকার আপদ-বিপদের মুক্তির উছিলা, উহা বক্ষস্থলের নূর সদৃশ, সমস্ত কাজ সমাধা করার উপায়। বিসমিল্লাহ আরেফদের মাথার মুকুট। আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ। যাহারা আল্লাহর আশেক, বিসমিল্লাহ তাহাদিগকে অন্যের নিকট হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দেয়। এক এক হরফ করিয়া বিসমিল্লাহ পাঠ কর। তাহা হইলে উহা দ্বারা তুমি হাজার পুণ্যের অধিকারী হইবে। আল্লাহ যাবতীয় পাপ মার্জনা করিবেন। মৌখিক বিসমিল্লাহ পাঠকারীর জন্য উহা পরকালে সাক্ষী হয়। আর যে ব্যক্তি গোপনের বিসমিল্লাহ্ পাঠ করেন তাহার সাক্ষী থাকেন স্বয়ং আল্লাহ। বিসমিল্লাহ পাঠকারীর মুখ মিটা হয়, অন্তর নিশ্চিন্ত হয়। সকল নিয়ামত বিসমিল্লাহর ভিতরে নিহিত। ইহা পাঠে আযাব দূর হইয়া যায়, এই কালামটি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

আল্লাহ বলেন, বিসমিল্লাহ পাঠ কর। যে বিসমিল্লাহ পাঠ করে এবং আমার নির্দেশ মানিয়া চলে, সে আমার নৈকট্য লাভ করে। অতঃপর আনুগত্যের নূরের দরুন সে দিব্য দর্শনের নিয়ামত প্রাপ্ত হয়। সে সকল কিছু হইতে স্বাধীন ও অমুখাপেক্ষী হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহার কোন কিছুরই অভাব থাকে না। সে অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হয়। তাহার অন্তর আল্লাহর অফুরন্ত রহস্য জ্ঞানের সাগরে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভ করে, তাহার আনন্দের অবধি থাকে না। সে চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা ও বিরহ বেদনা হইতে মুক্তি পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে পৌছার ভাগ্য অর্জন করে। তাহার সমস্ত বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়, নৈরাশ্যের কোন নিদর্শন থাকে না।

বিসমিল্লাহর নিগূঢ় অর্থ

আতিয়া আওফি (রহঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে শুনিয়া বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী তাঁহাকে এলম শিক্ষার জন্য ওস্তাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। ওস্তাদ তাঁহাকে বলিলেন, পড়, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' । হযরত ঈসা (আঃ) ওস্তাদকে বলিলেন, আপনি কি বলিতে পারেন বিসমিল্লাহ কি জিনিস? ওস্তাদ বলিলেন, না,

তাহাতো বলিতে পারি না। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, বা (ب) তো আল্লাহর নূর এবং সীন (س) তাঁহার সুউচ্চ মর্যাদা এবং মীম (م) তাঁহার রাজত্ব।

হযরত আবু বকর ওয়ারাক (রহঃ) বলেন, বিসমিল্লাহ্ বেহেশতের বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা। ইহার প্রত্যেকটি হরফের পৃথক পৃথক অর্থ রহিয়াছে। যেমন বা এর অর্থ ছয়টি। যথাঃ (১) বা এর দ্বারা বারী অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অর্থ বুঝা যায়। যথাঃ আল্লাহ্ বলেনঃ হুয়াল্লাহুল খালিক্কুল বারিউ'। অর্থাৎ আরশ হইতে ভূধর (পাতাল) পর্যন্ত সব কিছুরই স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা। (২) বা এর দ্বারা বাছীরুন অর্থ প্রকাশ পায়। যথাঃ আল্লাহ্ বলেন, অল্লাহু বাছীরুন বিমা তা'মালূন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্মই দেখিতে পান। (৩) বা এর দ্বারা বা ক্বসিতুন এর অর্থও বুঝা যায়। যথাঃ আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহু ইয়াবসুতুর রিযক্বা লিমাই ইয়াশাউ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার রুজী-রিজিক বৃদ্ধি করিয়া দেন। (৪) বা এর দ্বারা বাক্বী অর্থাৎ অব্যয় ও অক্ষয়ের অর্থও বুঝা যায়। যথাঃ 'কুল্লু মান আলাইহা ফান অ ইয়াবক্বা অজহু রাব্বিকা যুল-জালালি অল ইকরাম'। অর্থাৎ সমগ্র মাখলুকই বিলীন অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কেবল মাত্র তোমার প্রভুই অবশিষ্ট থাকিবেন। (৫) বা এর দ্বারা বা'ছ অর্থাৎ পুনরুত্থানের অর্থ বুঝা যায়। যেমনঃ আল্লাহ্ বলেনঃ ইন্নাল্লাহা ইয়াব আছু মান ফিল ক্বুবরি।' অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে হিসাব-নিকাশ ও বিচারের জন্য কবর হইতে পুনরায় উঠাইবেন। (৬) বা এর দ্বারা বার অর্থাৎ এহ্সানের অর্থও বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ 'হুয়াল বাররুর রাহীম'। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) সমগ্র মাখলুকের সাথে অনুগ্রহশীল এবং দয়ালু।

বিসমিল্লাহর দ্বিতীয় হরফ সীন (س) এর পাঁচটি অবস্থা। অর্থাৎ উহা দ্বারা পাঁচটি নামের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যেমন (১) প্রথম ইশারা করা হইয়াছে সামীউন এর দিকে। যথাঃ 'আম ইয়াহসাবুনা আন্না লা নাসমাউ সিররাহুম অ নাজওয়া হুম। অর্থাৎ তাহারা এইরূপ ধারণা করে যে, আমি তাহাদের অনুচ্চ শব্দের কথা ও গোপন কথা শুনিতে পাই না। (২) সীন এর দ্বারা দ্বিতীয় ইশারা করা হইয়াছে সাইয়্যেদ এর দিকে। যেমনঃ 'আল্লাহুছ ছামাদ'। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা অমুখাপেক্ষী সরদার। (৩) সীন এর দ্বারা তৃতীয় ইশারা করা হইয়াছে, সারীউন এর দিকে। যেমন— 'আল্লাহ্ সারীউল হিসাব' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪) চতুর্থ ইশারা করা হইয়াছে সালামুন এর দিকে। যেমন 'আসসালামুল মুমিনু' অর্থাৎ তিনি স্বীয় সমগ্র মাখলুকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী। (৫) সীন এর দ্বারা পঞ্চম ইশারা করা হইয়াছে যাতের এর দিকে। যেমনঃ গাফেরিজ জামবি ক্বাবিলিত্তাওবি। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা গুনাহ্ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী। উল্লেখ্য যে, এখানে গাফেরিজ জামবি এর অর্থ সাতিরিজ জামবি। অর্থাৎ গুনাহ্ আচ্ছাদনকারী।

বিসমিল্লাহ্র তৃতীয় হরফ মীম এর রহিয়াছে বারটি অবস্থা। অর্থাৎ ইহার দ্বারা বারটি নামের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যথাঃ (১) ইশারা করা হইয়াছে মালিক নামের দিকে। যেমন মালিকুল খালক্বি। অর্থাৎ আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের কর্তা। (২) দ্বিতীয় ইশারাও করা হইয়াছে মালিক নামের দিকে। যেমন, মালিকুল মুলকি অর্থাৎ আল্লাহ্ সারা জাহানের বাদশাহ্। (৩) তৃতীয় ইশারা করা হইয়াছে, মান্নান নামের দিকে। যেমন 'মান্নানুন আলাল খালক্বি।' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিকুলের উপর অনুগ্রহশীল। (৪) চতুর্থ ইশারা করা হইয়াছে মাজীদুন নামের দিকে। যেমন 'যুল আরশিল মাজীদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ বোযর্গ আরশওয়ালা। (৫) পঞ্চম ইশারা করা হইয়াছে মু'মিন নামের দিকে। যেমন 'আ-মানাহুম মিন খাওফ' অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় মাখলুকের নিরাপত্তা দানকারী (৬) ষষ্ঠ ইশারা করা হইয়াছে মুহাইমিন নামের দিকে। যেমন 'আলমু'মিনুল মুহাইমিনু' আল্লাহ্ স্বীয় মাখলুকের উপরে পুরাপুরি খবরদার। (৭) সপ্তম ইশারা করা হইয়াছে, মুক্বতাদিরুন নামের দিকে। যেমন 'মাক্বআদি ছিদক্বিন ইনদা মালিকিম মুক্বতাদিরিন' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা স্বীয় মাখলুকের উপরে পরিপূর্ণ

সামর্থ্যবান (৮) অষ্টম ইশারা করা হইয়াছে, মুক্বীতুন নামের দিকে। যেমন 'আল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়্যিম্মুক্বীত' অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত কিছুরই উপরে পুরাপুরি সামর্থ্যবান। (৯) নবম ইশারা করা হইয়াছে, মুকরিমুন নামের দিকে। যেমন 'অলাক্বাদ কাররামনা বাণী আদামা।' অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করিয়াছি। (১০) দশম ইশারা করা হইয়াছে, নাঈমুন নামের দিকে। যেমন 'অ আসবাগা আলাইকুম নি'মাতান জাহিরাতান অ বাত্বিনাতান' অর্থাৎ আল্লাহ সারা জগৎকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'মত দান করিলেন। (১১) একাদশ ইশারা করা হইয়াছে, মুফাজ্জিলুন নামের দিকে। যেমনঃ ইন্নাল্লাহা লাযু-ফাদ্বলিন আল্লান্নাসি।' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় বান্দার উপর একান্ত মেহেরবান। (১২) দ্বাদশ ইশারা করা হইয়াছে, মুছাওয়্যিরুন নামের দিকে। যেমন 'আল খালিকুল বারিয়্যুল মুছাওয়্যিরু'। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা সৃজনকারী ও আকৃতি গঠনকারী।

আল্লাহ নামের তাৎপর্য ঃ আল্লাহ নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন বোযর্গানে দ্বীন ও ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বর্ণনা পেশ করিয়াছেন। যেমনঃ খলীল ইবনে আহমদ এবং আরবের একদল আলেম বলেন যে, আল্লাহ খোদাতায়ালার এমন একটি নাম যে নামের কোন তুলনা এবং সমতুল্যই নাই। যেমন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেনঃ 'হাল তা'লামু লাহু সামীয়্যা।' অর্থাৎ তোমরা এই নামের তুল্য আর কোন নাম জান কি? (নিশ্চয়ই তাহা জাননা এবং তেমন নাইও কোন নাম)। আল্লাহ এমনই এক নাম যে তাহার দ্বারা সব কিছুর উপরে পূর্ণ মালিকানার অর্থ আপনা হইতে প্রকাশ পায় এবং সারা জাহানে আর এমন একটি নামের সন্ধান মিলিবে না, যে নামের ভিতরে আল্লাহ নামের ভাব-বৈশিষ্ট্য এবং অর্থ পুরাপুরি পাওয়া যায়।

আল্লাহ নামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম অক্ষর আলিফকে বাদ দিলে 'লিল্লাহ' শব্দটি থাকে এবং তাহার ভিতরেও আল্লাহকে পাওয়া যায়। আলিফের পরে উহার প্রথম লামটিকে তুলিয়া নিলে 'লাহু' শব্দটি বাকী থাকে এবং তাহার ভিতরেও আল্লাহর অর্থ নিহিত। তারপর উহার দ্বিতীয় লামটিকেও তুলিয়া নিলে 'হুয়া' শব্দটি থাকে। হুয়া অর্থ সে, অর্থাৎ ইহার মধ্যেও সেই আল্লাহই নিহিত।

বিসমিল্লাহর ভিতরে আল্লাহর ছিফাতী নাম দুইটি 'আররাহমান ও আররাহীম' এর অর্থ ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে ওলামায় কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন আলেমের মতে দুইটি নামেরই একই অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরম দয়াময় ও কৃপাবান। কিন্তু অন্যান্য ওলামার মতে নাম দুইটর অর্থের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। তাহারা বলে, 'আর রাহমান' ইসমে মুবালাগা বা অর্থের আধিক্য মূলক শব্দ। অর্থাৎ আল্লাহু রাহমানুন এর অর্থ হইল, আল্লাহর দয়া দুনিয়ার সকল কিছুই পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে আর রাহীম নামটির অর্থের দিক দিয়া ব্যাপকতা আর রাহমান নামটির তুলনায় কিছুটা কম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আর রাহমান নামের অর্থ আল্লাহতায়ালা সমগ্র মাখলুকের উপরে কৃপা বিতরণকারী সমভাবে, চাই মাখলুক আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হউক, চাই অনাস্থাশীল। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার মু'মিন গায়রে মু'মিন সকলকেই একইভাবে প্রতিপালন করেন, রুজী-রিজিক দান করেন। ইহাতে কোন প্রকার তারতম্য করেন না। পক্ষান্তরে আর রাহীম নামের অর্থ আল্লাহতায়ালা স্বীয় খাছ মু'মিন বান্দার উপর রহমত বিতরণকারী। যেমন দুনিয়াতে তিনি মু'মিন বান্দাকে হেদায়াত প্রাপ্তি নছীব করেন এবং পরকালে তাহাদেরকে কল্যাণ এবং সাফল্য দান করিবেন। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর রহমতে বেহেশত লাভ করিবে।

মুজাহিদ বলেন যে, দুনিয়াবাসীদের প্রতি রহমত বর্ষণের দিক দিয়া আল্লাহ রাহমান এবং পরকালবাসীদের প্রতি রহমত বর্ষণের দিক দিয়া আল্লাহ রাহীম বৈকি! যেমন দোয়া-মুনাজাতের ভিতরে আল্লাকে 'ইয়া রাহমানাদ দুনইয়া এবং রাহীমাল আখিরাহ বলা হইয়াছে। দাহাক (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ আসমানবাসীদের প্রতি রাহমান এবং যমিনবাসীদের প্রতি রাহীম।

তাওবাহর বিবরণ

তৃতীয় মজলিস

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, মুক্তিলাভ করিবে। আল্লাহতায়ালা এই বাণী দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে সম্বোধন করিয়াছেন। আরবী ভাষার আভিধানিক অর্থে তাওবাহ বলা হয়, বিরত থাকাকে। যেমন যদি বলা হয় যে, অমুক লোকটি এই কাজ হইতে তাওবাহ করিয়াছে, তবে তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, লোকটি এই কাজ হইতে বিরত রহিয়াছে। পরিভাষাগত অর্থে তাওবাহ বলা হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে সমস্ত খারাপ কার্য হইতে বিরত হইয়া শরীয়ত সিদ্ধ উত্তম কার্যগুলিতে মশগুল হওয়াকে তাওবাহ বলা হয়।

এ ব্যাপারে ইয়াকীন রাখা চাই যে, পাপ বা গুনাহ মানুষের ধ্বংস ডাকিয়া আনে। আল্লাহ এবং বেহেশত হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। পাপ বর্জনকারী বেহেশতী এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী। আল্লাহ বলেন, তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করিয়া আমার দিকে আস। তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা পরকালে তোমদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আমার নিকট পাইবে এবং ভাবী জীবনে সার্বক্ষণিক নিয়ামতসমূহ পাইতে থাকিবে এবং পরম সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিবে । আর নেককারদের জন্য তৈরী বেহেশতের অধিকারী হইবে। এক কথায় তোমাদের জীবনের মুক্তি, কল্যাণ, মঙ্গল এবং প্রকৃত সাফল্য আসিয়া তোমাদের কাছে ধরা দিবে। আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমরা এখনই তাওবায় নাছুহা কর ও আল্লাহর দিকে অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন। আর এমন বেহেশতে তোমাদেরকে প্রবেশ করাইবেন, যাহার বৃক্ষছায়ার নীচে স্বচ্ছ সলীলের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।

তাওবায় নাছুহার অর্থ হইল, সম্পূর্ণ নিখুঁৎ এবং খালেছ তাওবাহ। যাহার ভিতরে কোন রকমের কপটতা, প্রতারণা বা দুর্বলতার লেষ মাত্র নাই। ছোট-বড় সর্ব-রকম গুনাহ হইতেই তাওবাহ করা চাই। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানেই তাওবাহকারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একস্থানে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে, তাওবাহকারী ও পবিত্র লোকদের সাথে আল্লাহ তায়ালা বন্ধুত্ব রাখেন। আল্লাহ তাহাদেরকে পছন্দ করেন।

অন্যস্থানে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, হে নবী ! আপনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা তাওবাহকারী, সিজদাহকারী, আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনকারী, শরীয়ত মুতাবেক নির্দেশ দানকারী ও খারাপ কাজ হইতে লোকদিগকে বিরতকারী।

গুনাহ ছগীরাহ ও কবীরাহ

কবীরাহ গুনাহর পরিচয় ঃ গুনাহ দুই প্রকার। যথা—ছগীরাহ ও কবীরাহ। উভয় প্রকার গুনাহ হইতেই তাওবাহ করা কর্তব্য। তবে কোন কোন কাজ কবীরাহ গুনাহ ও কবীরাহ গুনাহর সংখ্যা কত, তাহা নিয়া ওলামায় কেরামদের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কবীরাহ গুনাহর সংখ্যা চার, কেহ সাত, কেহ নয় এবং কেহ উহার সংখ্যা এগার বলিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই উক্তিটি শুনিতে পাইলেন যে, কবীরাহ গুনাহর সংখ্যা সাত, তখন তিনি বলিলেন যে, সাত বলার চাইতে উহার সংখ্যা সত্তর বলিলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, আল্লাহ যে কাজগুলি করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাই কবীরাহ গুনাহ। কোন কোন আলেম বলেন যে, কবীরাহ গুনাহর প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহতায়ালা গোপন রাখিয়াছেন। উহার সত্যিকার সংখ্যা সঠিকভাবে কেহই বলিতে পারে না। যেমন শবে কদরের নির্দিষ্ট তারিখ এবং জুমআর দিনের দোয়া কবুল হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময়টির কথা কেহই জানে না। আল্লাহতায়ালার বান্দাকে ইহা না জানাইবার প্রধান কারণ হইল, বান্দার মনে ভয় থাকিবে যে, নিষিদ্ধ কাজগুলির মধ্যে না জানি কোনটি কবীরাহ গুনাহ। তাই যে কোন গুনাহর কার্য হইতে বান্দা পরহেজ করিবে।

কোন কোন আলেম বলেন যে, যে সকল গুনাহর কারণে দোজখের আগুনে জ্বালাইবার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাই কবীরাহ্ গুনাহ্। আবার এক শ্রেণীর আলেম কবীরাহ্ গুনাহর সংখ্যা মোট সতেরটি বলিয়া উলেখ করিয়াছেন। উহার চারটির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। যেমন (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) সর্বদা পাপের কাজে লিপ্ত থাকা (৩) আল্লাহর রহমতে নিরাশ হওয়া এবং (৪) আল্লাহর আযাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকা।
চারটির সম্পর্ক জিহ্বার সাথে, যেমন (১) মিথ্যা সাখ্য দেওয়া (২) পর্দানশিন ও পাক-পবিত্র রমণীদিগকে ব্যভিচারের দুর্ণাম প্রদান করা (৩) মিথ্যা কসম খাওয়া এবং (৪) যাদু করা।
তিনটির সম্পর্ক পেটের সাথে, যেমনঃ (১) শরাব ও অন্যান্য নেশার জিনিস খাওয়া (২) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা এবং (৩) জানিয়া-শুনিয়া সুদ খাওয়া (আদান-প্রদান করা)।
দুইটির সম্পর্ক গুপ্তাঙ্গের সাথে, যেমন ঃ (১) স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুরষ-রমণীতে ব্যভিচার করা এবং (২) পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করা।
দুইটির সম্পর্ক হাতের সাথে, যেমনঃ (১) অন্যায় ভাবে কাহাকেও হত্যা করা এবং (২) কাহারও মাল চুরি করা।
একটির সম্পর্ক পদদ্বয়ের সাথে, যেমনঃ কাফিরের সাথে ধর্মযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করা।
একটির সম্পর্ক সমস্ত দেহের সাথে, যেমনঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত হক-হুকুম পূর্ণ না করা বা তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার করা।
ছগীরাহ গুনাহর পরিচয়ঃ ছগীরাহ্ গুনাহর সংখ্যার শেষ নাই। ইহার সংখ্যা অবগত হওয়া যেমন কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, তেমন ছগীরাহ্ গুনাহ্ চিনিয়া লওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে শরীয়তের মাপকাঠি এবং বাতেনী নূরের সাহায্যে যতটা অবগত হওয়া গিয়াছে, এখানে কেবল তাহাই বর্ণনা করা হইবে। আল্লাহ্ বলেন, প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় পাপ তথা অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাক।
কিছু কিছু ছগীরাহ গুনাহ এই ধরনের, যেমনঃ সুন্দর সুশ্রী পুরুষ বা রমণী দেখিয়া তাহাদের সাথে জিনা বা ব্যভিচার করার উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা, তাহাদিগকে চুম্বন করা, তাহাদের কাছে শয়ন করা, কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া, কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করা, প্রহার করা, পরনিন্দা করা, ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি আরও বহু কাজ আছে যাহা ছগীরাহ্ গুনাহর মধ্যে গণ্য। বান্দা যখন কোন কবীরাহ্ গুনাহ্ হইতে তাওবাহ্ করে, তখন তাহার ছগীরাহ্ গুনাহ্সমূহও মার্জিত হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, নিষিদ্ধ কবীরাহ্ গুনাহ্ হইতে যদি তাওবাহ্ কর, তবে আমি তোমাদের সব অপরাধ মার্জনা করিব।
ছগীরাহ্ গুনাহ্ হইতেও তাওবাহ্ করা চাই। উহাকে কখনও ছোট মনে করা চাই না। কেননা ছোট ছোট কঙ্করের সমাবেশেই বিরাট পাহাড় সৃষ্টি হয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার হুযুরে পাক (দঃ) সাহাবাদের সঙ্গে লইয়া এক ময়দানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন কাঠ বা লাকড়ী ছিল না। যতদূর দৃষ্টি গেল, কোন বস্তুই দেখা গেল না। হুযুর (দঃ) আদেশ করিলেন, তোমরা লাকড়ী যোগাড় কর। সাহাবাগণ বলিলেন, হুযুর (দঃ)! কোথায় লাকড়ীর নাম নিশানাও দেখিতেছি না। হুযুর (দঃ) বলিলেন, যাহা কিছুই পাও না কেন, সামান্য মনে না করিয়া তাহাই আনিয়া আমার নিকট জমা কর তখন সকলেই লাকড়ীর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং যেখানেই লাকড়ীর অনুরূপ যাহা কিছু পাইলেন, উহা আনিয়া এক স্থানে জমা করিলেন। অচিরেই লাকড়ীর একটি বড় স্তুপ হইয়া গেল। তখন হুযুর (দঃ) সাহাবাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখতো, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু মিলিয়া কত বড় স্তুপে পরিণত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্যকেও এইরূপ মনে কর। ছগীরাহ্ গুনাহও ছগীরাহ্ গুনাহর সহিত মিলিয়া এইরূপ বিরাট আকারে পরিণত হয়। পাপ ও পুণ্যের এই একই রকম অবস্থা।
বর্ণিত আছে, বান্দা কোন পাপকে ছোট মনে করিলে উহা আল্লাহর নিকট বিরাটে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে উহাকে বড় মনে করিলে আল্লাহ্ উহাকে ছোট মনে করেন।
অতএব একজন মু'মিন সামান্য ছোট পাপকেও বড় মনে করিয়া থাকেন। কেননা তিনি ঈমানের পূর্ণতায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি নিজের পাপকে মাথার উপর

তুল্য ভয় করিয়া থাকে। নাজানি উহা কখনও মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর মুনাফিকগণ নাকের ডগার উপর মাছির ন্যায় মনে করে যে, যখন ইচ্ছা তাড়াইয়া দিতে পারিবে। কিছু আলেম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি যে ছগীরাহ্ গুনাহ্ করিয়াছি, উহার ন্যায় আরও ছগীরাহ্ গুনাহ্ আছে। এইরূপ বলা তাহার পক্ষে অন্যায়। এইরূপ বলায় তাহার ঈমানের হয়, মারেফাতে আলস্য দেখা দেয়, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং মনে হয় যে, সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মহানতা সম্বন্ধে অজ্ঞ। যদি সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখিত, তবে গুনাহকেই কবীরাহ্ গুনাহ্ মনে করিত এবং কোন পাপকে ক্ষুদ্র মনে করিত না।

তায়ালা তাঁহার কোন পয়গম্বরের নিকট অহী প্রেরণ করিয়াছিলেনঃ উপঢৌকনের স্বল্পতা না বরং প্রেরণকারীর মহানতা এবং বোযর্গীর প্রতি খেয়াল কর। কোন পাপকে ছোট মনে না। বরং যাহার সামনে দাঁড়াইয়া জবাবদিহী করিতে হইবে এবং তাহার মহানতা ও -প্রতিপত্তির প্রতি খেয়াল কর, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, সেই ব্যক্তি কোন কেই ছোট মনে করে না। আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের নিষেধসমূহকেই সে কবীরাহ গুনাহ করিয়া থাকে।

কোন সাহাবী তাবেঈনদিগকে বলিতেন, কোন কোন কাজকে তোমরা চুল অপেক্ষাও কা-পাতলা মনে করিতেছ, অথচ রাসূলের যমানায় আমরা সেগুলিকে গুরুতর অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে করিতাম। কারণ সাহাবায় কেরামগণ আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল (দঃ)এর সান্নিধ্য লাভে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

মূলতঃ এই কারণেই ওলামায় কেরাম একটি ক্ষুদ্র অপরাধের কাজ করিলে তাহা মারাত্মক বলিয়া অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে কোন জাহেল দ্বারা সেইরূপ কাজ হইলে কেহ্ তৎপ্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপও করে না বরং উহাকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়। তবে সে যাহাই হোক না কেন আসল কথা হইল আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ফরজ। কেননা এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার -প্রত্যঙ্গ হইতে কোন না কোন পাপ অনুষ্ঠিত না হয়। আর যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন পাপ না করে, তবে তাহার অন্তর হয়ত পাপের চিন্তা বা পাপের খেয়াল বিরাজ করে আর যদি তাহাও না হয়, তবে অন্ততঃ শয়তান তাহার অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। কেননা শয়তান প্রত্যেক ব্যক্তির পিছনেই লাগিয়া আছে। শয়তান প্রতি মুহূর্তে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আর যদি কেহ্ শয়তানের সে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবু আল্লাহর যাত ও ছেফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের দিক দিয়া সকলেরই কিছু না কিছু অভাব থাকে এবং তাহাতে ভুল করারও সম্ভাবনা থাকে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন লোক নাই যাহাকে ভুল ও ত্রুটির উপাদান দিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই। তাই তাওবাহ্ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সকলেরই জন্য। অবশ্য একথা সত্য যে, তাওবাহ্কারীদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য রহিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের তাওবাহর অর্থ হইল পাপ কাজ হইতে বিরত থাকা আর খাস বা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের তাওবাহ্ হইল, আলস্যকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও বা কিছুর প্রতি অন্তর ঝুঁকিয়া না পড়া। হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন যে, সাধারণের তাওবাহ্ পাপ হইতে এবং খাস বা বিশেষ লোকের তাওবাহ্ হইল অলসতা হইতে।

হযরত আবুল হাসান নূরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়ারই নাম তাওবাহ্। অতএব পাপ এবং অলসতা হইতে তাওবাহ্ করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

নবী-রাসূলগণও তাওবাহ্ করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, আমি দিবারাতে সত্তর বার আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ করিয়া থাকি।

হযরত আদম (আঃ)এর তাওবাহ্ ঃ হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে বেহেশতী বসন খসিয়া পড়িল। তিনি উলঙ্গ হইয়া গেলেন। অবশ্য মাথার তাজ এবং শাহী মুকুট থাকিয়া গেল। ফিরেশতাগণ ইহা খুলিয়া নিতে লজ্জানুভব করিতেছিলেন। তৎক্ষণেই ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া তাঁহার মাথা হইতে ঐ দুইটি বস্তুও লইয়া গেলেন। অতঃপর

হযরত আদম (আঃ) তখন লজ্জিতভাবে বিবি হাওয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি দুঃখজনক আমাদের পাপের পরিণতি! হায়! কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হইলাম! তখন তাঁহারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা করতঃ নিজেদের কৃত পাপের জন্য রোনাজারী ও আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) জীবনে এই একটি মাত্র অপরাধই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই যখন তাঁহাদেরকে ঐরূপভাবে তাওবাহ করিতে হইয়াছিল, তখন অন্য সাধারণ লোকগণ (যাহারা গুনাহ ও অপরাধের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে) কি করিয়া তাওবাহর ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারে!

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)এর তাওবাহ কবুল করিলেন, তখন সমস্ত ফিরেশতা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার সামনে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আপনার তাওবা কবুল হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে খোদ আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন, আদম (আঃ) আল্লাহর দরবার হইতে তাওবাহর বাক্য শিখিয়া লইয়া আল্লাহর নিকট তাওবাহ করিলেন। আল্লাহ তাঁহার তাওবাহ কবুল করিলেন। আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী ও পরম করুণাময়।

হযরত আদম (আঃ) ফিরেশতাদের সরদারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওহে জিব্রাইল! আমার তাওবাহ কবুল হওয়ার পরেও যদি আমি আল্লাহর দরবারে আমার এই ভুলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হই না জানি তখন আমার উপায় কি হইবে!

হযরর আদম (আঃ)এর এই মন্তব্যের পর আল্লাহর তরফ হইতে অহী অবতীর্ণ হইল, হে আদম! তুমি তোমার সন্তানদের জন্য তোমার নিজ হইতেই বিপদাপদ এবং তাওবাহর মিরাস রাখিয়া গেলে। অতঃপর তাহাদের যে কেহ তোমার মত বিপদাপন্ন হইয়া আবার ঠিক তোমারই মত আমার দরবারে তাওবাহর জন্য ধর্ণা দিবে, আমি তাহার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিব (অর্থাৎ তাহার তাওবাহ কবুল করিয়া লইব এবং তাহার পাপ মোচন করিয়া বেহেশতে তাহার স্থান করিয়া দিব। হাসি মুখে তাহাকে কবর হইতে উঠাইব।)

হযরত নূহের (আঃ) তাওবাহ ঃ হযরত নূহ (আঃ)এরও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি আল্লাহর নবী হিসাবে দ্বীন প্রচার করিতেছিলেন। লোকগণ তাহাকে মিথ্যারোপ করিল। তাহাতে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন, তখন আল্লাহ সে দোয়া কবুল করিয়া লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মানসে সারা দুনিয়ার বুকে পানির প্লাবন ঘটাইয়া দিলেন। হযরত নূহ (আঃ)কে দ্বিতীয় আদমও বলা হয়। কেননা পানিতে সকল লোক ডুবিয়া মরার পর হযরত নূহ (আঃ)এর সন্তানদের দ্বারাই আবার এই দুনিয়ায় মানুষের আবাদ হয়। যাহারা হযরত নূহের (আঃ) সাথে জাহাজে আরোহণ করিয়া জীবিত ছিল, তাহাদের কাহারও সন্তানাদি হয় নাই। কেবল হযরত নূহ (আঃ)এর তিন পুত্র শাম, হাম এবং ইয়াফেল জীবিতি ছিলেন। তাহাদের সন্তানাদির দ্বারা মনুষ্য বংশ পুনঃ বিস্তার লাভ করে। ভাবিয়া দেখার কথা বৈ কি! হযরত নূহ (আঃ) এত বড় নবী হওয়া সত্তেও আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে মাবুদ। আমি তোমার দরবারে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তবেই আমি কৃতকার্য হইব।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর তাওবাহ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর অতি বড় নবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে নিজের খাস বন্ধু হিসাবে খলীল উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া তাঁহাকে বহু সংখ্যক নবী ও রাসূলের পিতার সম্মান দান করিয়াছিলেন। এক রেওয়ায়েতে আছে তাঁহার বংশধরদের মধ্যে প্রায় চার হাজার নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি দুনিয়ার যত প্রধান প্রধান নবী-রাসূল যেমন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) প্রমুখ তাঁহারই বংশোদ্ভুত নবী ছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই ধরনের বিশেষ মর্যাদাশালী নবী হওয়া সত্তেও আল্লাহর দরবারে তাওবাহ, আযীযী এবং বিনয় প্রকাশে অবহেলা করেন নাই। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এইরূপ দোয়া পেশ করিয়াছিলেন, যথাঃ

সেই মাবুদ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আমাকে সুপথ প্রদান করিয়াছেন। তিনিই আমাকে রুজী-রিজিক দিতেছেন। আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন। তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন। আবার মৃত্যুর পরে তিনিই আমাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন। তাঁহারই নিকট রোজ কিয়ামতে আমি গুনাহ খাতাসমূহের মা'ফীর আশা পোষণ করিতেছি।

তিনি আল্লাহর দরবারে আরও বলিয়াছিলেন, হে মাবুদ! তুমি আমাকে তোমার ইবাদাত করিবার বিধি শিখাইয়া দাও । আমার উপর তোমার রহমত নাযিল কর। তুমি অতিবড় তাওবাহ কবুলকারী এবং পরম অনুগ্রহশীল।

হযরত মুসা (আঃ)এর তাওবাহ ঃ হযরত মুসা (আঃ) অতিবড় শানদার নবী ছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ নিজের সহিত বার বার কথাবার্তা বলিবার মর্যাদা প্রদান করতঃ তাহাকে কালিমুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে অতি প্রিয় নবী হিসাবে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহরূপে বহু প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য মো'জেযার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন লাঠি দান করিয়াছিলেন। (যে লাঠি একবার সর্প হইয়া ফিরাউনের যাদুকরদের সকল গর্ব খর্ব করিয়াছিল।) তাঁহারই বংশ বনি ইস্রাইলের উপর আল্লাহ বেহেশতী খানা মান্না ও সালাওয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতবড় নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর দরবারে এইরূপ মুনাজাত করিয়াছিলেন, হে মাবুদ! তুমি আমাকে ও আমার ভ্রাতা হারুনকে মার্জনা করিয়া দাও এবং তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্তদের শামিল করিয়া লও। তুমিই তাওবাহ কবুলকারী ও সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহশীল।

হযরত দাউদ (আঃ)এর তাওবাহ ঃ হযরত দাউদ (আঃ)ও এক অতি বড় মর্যাদাশীল নবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে বিরাট বাদশাহী দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মহলের দ্বার রক্ষী ও প্রহরীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। তাঁহাকে আল্লাহ এমন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি স্বীয় জবানে জাবুর কিতাব তিলাওয়াত করিতেন, তখন তাঁহার মাথার উপরে শূন্যে সকল পাখিরা আসিয়া কাতার বাঁধিয়া স্থির হইয়া থাকিত এবং নদী ও সাগরের পানি প্রবল বেগে বহিতে থাকিত। তাহাছাড়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দুনিয়ার যাবতীয় জীব-জন্তু আসিয়া সমবেত হইত। পাহাড়-পর্বতসমূহ আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ শুরু করিত; কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, আল্লাহ তাঁহাকে এত শান ও মরতবা দান করা সত্তেও তিনি সিজদায় গিয়া একাধারে চাল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করিতেন। এমন কি তাঁহার চোখের পানিতে শুষ্ক যমিন সিক্ত হইয়া তাহাতে ঘাস গজাইয়া উঠিত। ইহাতে আল্লাহ তাঁহার উপরে দয়ার্দ্র হইয়া এরশাদ করিলেনঃ

হে দাউদ! আমি তোমাকে মাফ করিয়াছি। আর নিশ্চয়ই সে আমার নৈকট্য এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল লাভ করিয়াছিল।

হযরত সোলায়মান (আঃ)এর তাওবাহ ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)ও বিরাট রাষ্ট্রের বাদশাহ ছিলেন। বাতাস তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী ছিল। মাত্র দুই প্রহরে তিনি এক মাসের পথ অতিক্রম করিতে পারিতেন। তিন এমন বিরাট রাজ্যের অধিপতি ছিলেন যে, তাঁহার পরে এত বড় রাজ্যের বাদশাহ দুনিয়াতে আর কেহই হয় নাই। তাঁহার অজানাভাবে তাঁহারই প্রাসাদে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটি ছবির পূজা হইয়াছিল। তাঁহার এই অজানা অপরাধের দরুন তিনি তাঁহার কেরামতি আংটি হারাইয়া ফেলিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাজ্যহারা হইয়া ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের দরজায় হাত বাড়াইয়া এইরূপ বলিতেছিলেন, আমি দাউদের (আঃ) পুত্র সোলায়মান, কিন্তু লোকগণ তাঁহার কথায় তাঁহার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিত, তাঁহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিত এবং বলিত, এই ভিখারী লোকটি নাকি দাউদের (আঃ) পুত্র সোলায়নান (আঃ)! কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিত না। তিনি একদিন এক ব্যক্তির ঘরের দরজায় গিয়া কিছু খাবার দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। উক্ত ঘরের লোকেরা তাঁহাকে দরজা হইতে তাড়াইয়া দিল। এমন কি এক রমণী তাঁহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, এক রমণী নাকি তাঁহার পবিত্র মস্তকে প্রস্রাব ভর্তি একটি পাত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে একটি মাছের পেট হইতে তিনি তাঁহার হারানো আংটি ফিরিয়া পাইয়া আঙ্গুলে পরিধান করিলেন। আংটি পরিধান করা মাত্রই পাখিকুল আসিয়া তাঁহার মাথায় ছায়া দিতে লাগিল। জ্বিন, শয়তান এবং হিংস্র জন্তুসমূহ তাঁহার খেদমতে হাজির হইল। যে সকল লোকেরা তাঁহাকে নানাভাবে অপমান করিয়াছিল, এবার তাহারা তাঁহকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে যেই ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাগিকে শাস্তি দিব না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকীদও করিব না। আমার এই অবস্থা আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশক্রমেই হইয়াছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাওবাহ করায় আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার রাজত্ব ও শান-শওকত আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

আল্লাহর এত প্রিয় মহান নবীদের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ওহে দুর্ভাগা! তোমার ও আমার অবস্থা কি হইবে? তুমি অহংকারে আবদ্ধ আছ, শয়তান তোমার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তুমি তোমার প্রকাশ্য নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের গর্বে গর্বিত। প্রকাশ্য পাপ ও অপরাধ হইতে তুমি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ বলিয়া কতই না আত্মতৃপ্ত! কিন্তু তোমার অভ্যন্তরটা বাতেনী ইবাদাত হইতে যে একেবারেই খালি। পরহেজগারী-ধর্মভীরুতা বিনয়, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি, আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, আল্লাহর দানে সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী হইতে তোমার বক্ষদেশ সম্পূর্ণ শূন্য। অথচ এইগুলির পরিবর্তে তোমার অন্তঃকরণ অসৎ গুণাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ।

তোমার ভিতরে পাপরূপ বৃক্ষ শাখায়-প্রশাখায়, পত্র-পল্লবে ও ফলে-ফুলে পূর্ণ হইয়া উহার জড় আরও মজবুত হইয়াছে। যে কাজে বিপদ ডাকিয়া আনে, দীন-দুনিয়াকে ধ্বংস করে তাহা হইল আল্লাহর নি'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর বিধানে অসন্তুষ্টি। আর যাহারা আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া চলে, তাহারা নির্লজ্জতা, সম্মান ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা, হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, কৃপণতা, সম্পদে লিপ্সা, শিরক এবং নিজেকে বোযর্গ এবং মর্যাদাশীল মনে করা প্রভৃতি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। কেহ যদিও বা কোন ভাল কাজ করে, উহার পিছনে থাকে আত্মাভিমান, আত্মপ্রশংসা এবং লোক দেখানোর অসৎ উদ্দেশ্য। কেহ তাহাকে কোন উচিত কথা বলিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয়, অথচ নিজের দোষত্রুটির ব্যাপারে উদাসীন থাকে। আল্লাহ যে বস্তু দান করেন, তাহা আল্লাহর দান স্বীকার না করিয়া নিজের শ্রমলব্ধ বলিয়া প্রকাশ করে, অথবা বলে যে, ইহা অমুক ব্যক্তি হইতে দান প্রাপ্ত বস্তু।

তুমি শুধু প্রকাশ্য বিষয়-বস্তুই দেখিতেছ। অথচ আল্লাহর নির্দ্ধারিত রীতিনীতি সম্পর্কে মোটেই খেয়াল করিতেছ না। কোন কাজই তোমার দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। নিজের খুশী ও আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন হইয়া আছ। আল্লাহর ভয় অন্তর হইতে বিসর্জন দিয়াছ। স্মরণ রাখিও, যাহার হৃদয় আল্লাহর ভয় শূন্য, তাহার ধ্বংস অনিবার্য। তাহার হৃদয়ে কখনও আল্লাহর হেকমতের নূর স্থান পাইবে না। আর এইভাবে অন্তর নূরশূন্য হওয়া ভীষণ বিপদের কারণ বৈ কি। কারণ এই নূরের আধিক্যই আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের উসিলা স্বরূপ। এই নূরের সহিত যাহার যত বেশী সংস্রব থাকিবে, সে তত বেশী মানুষের অমুখাপেক্ষী থাকিবে। এইরূপ ব্যক্তিগণই চিরস্থায়ী ও পূর্ণ নি'মতের অধিকারী হইয়া থাকে। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর ভয়ে হীন ও অপদস্থ হইয়াও ধৈর্য ধারণ করে, তখনই সে প্রকৃত পুণ্যবান হয় এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আবদালের পর্যায়ে উপনীত হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে তোমার অবস্থা হইল, যখনই দ্বীনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখনই তোমার মধ্যে অলসতা আসে এবং দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাথে তোমার বিরোধ বাঁধিয়া যায়। যাহারা আল্লাহর বন্ধু শ্রেণীর লোক, আল্লাহর পথের পথিক, আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বানকারী, আল্লাহর ভয় প্রদর্শনকারী। আল্লাহর রহমত এবং বেহেশতের প্রতিশ্রুতিদানের কথা ঘোষণাকারী। তাহারাই তোমার শত্রু। দেখিলে তো তোমার অবস্থাটা কি? তোমার বন্ধুত্ব ঠিক তোমারই মত লোকদের সাথে, আর আল্লাহর বন্ধু শ্রেণীর লোকদের সাথে তোমার শত্রুতা।

স্মরণ রাখিও, যাহারা ধর্মের পথে চলিয়া ক্লেশে জীবন-যাপন করে, অথচ আল্লাহর নি'মতের শোকর আদায় করে, বিনা দ্বিধায় আল্লাহর আদেশ পালন করে, পার্থিব লোভ-লালসা, সম্মান-প্রতিপত্তির প্রতি লালসা না থাকে, তাহারাই দয়াবান আল্লাহর প্রতিবেশী। কেননা ইহারাই আল্লাহর বেহেশতে বাস করিবে। আল্লাহ প্রদত্ত নি'মতসমূহ উপভোগ করিবে। বেহেশতের যাবতীয় উপভোগ্য বস্তু সদা-সর্বদা তাহাদের সম্মুখে হাজির থাকিবে। এই সমস্ত লোকের সাথেই তোমার বিরোধ। অস্থায়ী দুনিয়ার লোভ-লালসায় তুমি স্থায়ী পরকাল ভুলিয়া আত্মগর্বে ডুবিয়া আছ।

(তুমি কি দেখ নাই, বা শুন নাই?) অফুরন্ত ধন-সম্পদ ও সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ফিরাউন, কারুন, নমরুদ, সাদ্দাদ, আদ, কায়সর, কিসরা প্রমুখের অবস্থা কি, তাহারা আজ কে কোথায়? সকলেই তো কালের গ্রাসে আজ বিলীন হইয়াছে। উহাদের কেহই কালের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় নাই। শয়তান তাহাদেরকে আল্লাহর পথ ভুলাইয়া রাখিয়াছিল এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মোহে উহারা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু যথাসময়ে সেই শাহানশাহের নির্দেশনামা আসিয়া পৌছিয়াছিল, অমনি মুহূর্তে সব কিছুর মায়া ও বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। যেই সুদৃঢ় রাজপ্রাসাদকে তাহারা দুর্ভেদ্য দুর্গতুল্য মনে করিয়াছিল, সেই প্রাসাদ হইতে তাহাদেরকে নিজেদের লোকেরাই বাহির করিয়া দিল। যেই বাদশাহী, ঐশ্বর্য, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বড়াই এবং গর্ব করিয়া বেড়াইত, তাহার পরিবর্তে অতর্কিতে তাহাদের ভাগ্যে আসিয়া জুটিল যারপর নাই হীনতা এবং দৈন্য। যে আমানত তাহাদের মাথায় অর্পিত হইয়াছিল, উহার জবাবদিহি হইতেও তাহাদের রেহাই মিলিল না, আর যে আযাব সম্পর্কে তাহারা অবিশ্বাসী ছিল ইহা তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল।

এই সকল লোকের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি তোমার ধারণা পরিবর্তিত হইতেছে না? কিছু সময় আগেই তো তাহারা রাজ্যের অধীশ্বর ও রাজপ্রাসাদের মালিক ছিল। আবার একটু পরেই তাহাদেরকে সব কিছু হইতে বঞ্চিত করা হইল। যাহারা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অত্যাচার চালাইত, গরীব ও দুর্বলদের প্রতি অনাচার করিত, পিঠে লাঠি ভাঙ্গিত, কিন্তু এখন সেই অত্যাচারী জুলুমবাজেরা গেল কোথায়?

আজ তাহাদের কাথারও অস্তিত্ব আছে কি? এ তো গেল তাহাদের দুনিয়াবী বঞ্চনা, পরকাল তাহাদের জন্য আরও ভয়ঙ্কর। আরও বিপদসঙ্কুল। তাহাদের পার্থিব কার্য-কলাপের প্রতিবিধানে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করতঃ প্রতিটি অবাঞ্ছিত কাজের বদলা তাহাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চিতরূপে ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের এমন কঠিন স্থানে অনন্ত জীবন যাপন করিতে হইবে, যে স্থান হইতে কোন দিনই তাহাদের আর মুক্তি বা নিষ্কৃতি নছীব হইবে না। বরং শুধু অকল্পনীয় ভয়ংকর আযাব তাহাদের ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

পরিশেষে, হে পরকাল প্রত্যাশী! তোমাকে বলিতেছি, তুমি উহাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নিজের মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে এখনি তাওবাহ করতঃ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমল করিতে থাক এবং পরকালের সেই সুকঠিন অবস্থার শিকার যাহাতে না হইতে হয় সেইভাবে চল।

তাওবাহর শর্ত এবং উহার অবস্থা

তাওবাহর শর্ত তিনটি। প্রথম শর্ত হইল, আল্লাহর আদেশের খেলাফা যে সকল কাজ করা হইয়াছে সেই কাজগুলি সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, লজ্জা এবং সঙ্কুচিত হওয়াই তাওবাহ। উহার লক্ষণ হইল, অন্তর বিনয়ী এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, তাওবাহকারীদের সাহচর্য অবলম্বন কর। কেননা তাহারা নম্র ও বিনয়ী।

তাওবাহর দ্বিতীয় শর্ত, সর্বদা পাপ কাজ হইতে বিরত থাকা। আর তৃতীয় শর্ত হইল কৃত পাপের পুনরাবৃত্তি না করা ।

আবুবকর ওয়াস্তীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, খালেছ তাওবাহর লক্ষণ কি? তিনি জবাবে বলিলেন যে, তাওবাহকারীর প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন প্রকার পাপের চিহ্ন থাকিবে না। যে ব্যক্তি খালেছ তাওবাহ করিবে, সে বলিতে পারিবে না যে, কখন সন্ধ্যা হইল বা কখন ভোর হইল। খালেছ

তাওবাহ্‌কারীর অন্তরে এমন সুদৃঢ় এরাদা বদ্ধমূল হয় যে, যে পাপ সে করিয়াছে, আর কখনও সে সেই পাপ করিবে না। সে ভালভাবেই উপলব্ধি করিবে যে, পাপই হইল মানুষ ও তাহার মাবুদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পর্দাস্বরূপ। পাপ মানুষের পারলৌকিক সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। হাদীস শরীফে আছে, পাপের কারণে লোকের রুজীর আধিক্য হ্রাস পায়। ব্যভিচার মানুষের অভাব-অনটনের কারণ ঘটায়।

কোন কোন বোযর্গ বলেন যে, তোমাদের জীবনের কোন অশুভ পরিবর্তন এবং খাদ্যভাব দেখিলে মনে করিবে যে, আমি মাবুদের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছি, শয়তানের অনুসরণ করিতেছি। যখন কেহ্ তোমাকে কোন প্রকার অত্যাচার করে বা তোমার ধন-সম্পত্তি বা সন্তান-সন্ততিদের উপর কোনরূপ বিপদ-আপদ আসে তখন মনে করিও যে, তুমি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়াছ। আল্লাহর কোন বিধানে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছ কিংবা আল্লাহর কোন কাজে কাহাকেও অংশীদার করিয়াছ বা আল্লাহর কোন কাজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার নাই।

তাওবাহ্‌কারী যখন এইসব বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে, তখন সে লজ্জিত হয়। এই লজ্জায় তাহার অন্তরে এক বিশেষ ধরনের ব্যথার সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন জানিতে পারে যে, আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখনই তাহাদের অন্তর হইতে কান্নার রোলও বাহির হইয়া আসে। তখন সে বলে, যে কাজ দ্বারা আমি এইভাবে বিপদাপন্ন হইয়াছি, যাহা আমার জন্য বিষের পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া আমার মুখের সামনে ধরিয়াছে, সে কাজ আর কখনও করিব না। মোটকথা, পাপে ধ্বংস ডাকিয়া আনে আর পুণ্যে সুখ নিয়া আসে। আল্লাহ্ এই পাপের সৃষ্টি না করিলে তাহা কতই না সুখের হইত। পাপের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দুঃসহ্ ফল ভোগ করিতে হয় অনন্তকাল ধরিয়া।

পাপ পরিত্যাগ করিয়া তাওবাহ্ করার পর তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইলঃ (১) যেমন বর্তমানে পাপ পরিত্যাগ করা (২) ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া ও (৩) বিগত সময় সম্পর্কে চিন্তা করা। অর্থাৎ তাওবাহ্ করার বর্তমান সময়ের পূর্বে তাহার বয়সের কত বৎসর, কত মাস এবং কত দিন চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর লক্ষ্য করা চাই ইবাদাতের প্রতি এবং কি কি পাপ করিয়াছে তৎপ্রতি।

ইবাদাত যদি নামায সম্বন্ধীয় হয়, তবে খেয়াল করিবে, আমি কি মোটেই নামায পড়ি নাই? যদি পড়িয়া থাকি, তবে তাহার আরকান-আহকাম ঠিক ভাবে আদায় করা হয় নাই। উহার কাজা করিতে হইবে।

বিদেশ ভ্রমণ বা অসুস্থতা হওয়ার কারণে রোযা রাখিতে না পারিলে উহার কাজা আদায় করিবে। যাকাত আদায় করিয়া না থাকিলে যতদিন ধরিয়া ধন-সম্পদের মালিক অর্থাৎ ছাহেবে নেছাব হইয়াছে, সেইদিন হইতে হিসাব করিয়া যাকাতও আদায় করিবে। হজ্জ্ব ফরজ হওয়া সত্তেও হজ্জ্ব না করিলে পরে যদি গরীব হইয়া যায় এবং আবার সম্পদশালী হয় বা হজ্জের শর্তসমূহ পাওয়া যায়, তাহা হইলে হজ্জ্ব আদায় করিবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জ্ব করায় সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ হজ্জ্ব না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, তবে সে যেন ইয়াহুদী-নাছারা বা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীর ন্যায় মৃত্যুবরণ করিল। অন্য এক হাদীসে আছে, হজ্জ্ব করার সমর্থ ব্যক্তি হজ্জ্ব আদায় না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মৃত্যু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মৃত্যুর তুল্য হইবে।

তাওবাহ্‌কারীর পক্ষে কাফফারা বা মানত আদায় করার থাকিলে উহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে। যে পাপ আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন ব্যভিচার করা, গান-বাদ্য শুনা, বিনা অজুতে কোরআন স্পর্শ করা, নাপাক অবস্থায় সিজদাহ্ করা বা বেদয়াতী কাজ করা। এই অবস্থায় নিজের কতৃকর্মের জন্য পরিতাপ করিবে। অনুনয় বিনয় সহকারে তাওবাহ্ করিবে। যত বেশী পাপ কাজ করিয়াছ ততোধিক পুণ্যের কাজ করিবে। আল্লাহ্ বলেন, পুণ্য পাপকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় কর। প্রত্যেকটি পাপের পর পুণ্যের কাজ কর, যাহা তোমার পাপকে বিনষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেকটি পাপের কাফফারা পাপের পরে নেকের কাজ করা যাহা পাপের ক্রিয়াকে দূর করে। যেমন মদ্য পান করিলে উত্তম শরবত পান করিবে। গান শুনিলে কোরআন, হাদীস এবং বোযর্গদের উপদেশ শুনিবে। নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসিলে (পাক অবস্থায়) এ'তেকাফে বসিবে। বিনা অজুতে

কোরআন স্পর্শ করিলে অজু করিয়া বার বার কোরআন তেলাওয়াত করিবে এবং কোরআনকে অত্যন্ত তাজীম ও সম্মান করিবে।

কাহাকেও জুলুম-উৎপীড়ন করাও মহাপাপ। কেননা আল্লাহতায়ালা সুদ খাওয়া, ব্যভিচার করা এবং মদ্যপান করার মত জুলুম করা হইতেও বিরত থাকিতে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব জালিম ব্যক্তির তাই লজ্জিত হওয়া ও তাওবাহ্ করা এবং ভবিষ্যতে এইরূপ কাজ না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। কাহাকেও কোন প্রকার কষ্ট দিলে তাহার উপকার করিবে এবং তাহার কল্যাণের নিমিত্ত দোয়া করিবে। পরনিন্দা করিলে তাহার প্রশংসা করিবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, লোকটি মুসলমান এবং সুন্নত অল জামাত ভুক্ত কিনা।

জবরদস্তিমূলক কাহারও কিছু লওয়া, চুরি করা, আমানতের খেয়ানত করা, কোন প্রকার ধোকাবাজি করা, বিক্রেয় মালের দোষ গোপন করা, পারিশ্রমিক না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া যথার্থ মালিকের হক আদায় করিয়া দিবে। মৃত্যুর পূর্বেই এই কাজ সমাধা করিবে, যেন মৃত্যুর পরে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে না হয়। রোজ কিয়ামতে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে তখন যেন নিজের এসব অন্যায় কাজের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া লজ্জায় পড়িতে না হয়। সেই সময় ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করার জন্য সময় চাহিবে, কিন্তু তাহাকে সময় দেওয়া হইবে না। কেহই তাহার জন্য সুপারিশ করিবে না। তাহাকে বলা হইবে, জীবন-ভর তুমি পাপ কাজ করিয়া গর্ব করিয়াছ, জানিয়া-শুনিয়া সজ্ঞানে-অজ্ঞানে কুরিপু ও শয়তানের অনুসরণ করিয়াছ। পক্ষান্তরে মহান প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়াছ, এতটা অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তোমার ওজর-আপত্তি কিভাবে কবুল হইতে পারে? এই কারণেই তাহার হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হইবে। নিরাশায় ও হতাশায় তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, লজ্জায় তাহার মাথা অবনত হইয়া থাকিবে। তাহার সমস্ত পুণ্য ছিনাইয়া লওয়া হইবে। পাপের বোঝা দিগুণ করিয়া দেওয়া হইবে। দোজখের ফিরেশতাগণ তাহাকে দোজখে ঠেলিয়া লইয়া যাইবেন। হামান, ফিরাউন ও অন্যান্য কাফেরদের সাথে সে দোজখে শাস্তি ভোগ করিবে।

অত্যাচারীর পাপ ক্ষমা করা হয় না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন বান্দাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হইবে, তখন তাহার পুণ্য হয়ত পাহাড় তুল্য থাকিবে। সেই পুণ্যে কোনরূপ ঘাটতি না হইলে সে বেহেশতী হইবে। যখন এই ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমস্ত পুণ্য ঐ লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। পরিশেষে তাহার আর একটি পুণ্যও অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন ফিরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরজ করিবেন, হে মাবুদ! এখনও অনেক পাওনাদার বাকী রহিয়াছে, অথচ তাহার আর কোন পুণ্য অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ বলিবেন, উৎপীড়িত ব্যক্তিদের পাপ উহার ঘাড়ে চাপাইয়া দাও এবং তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ কর। অতএব ঐ ব্যক্তি পাপের বোঝা মাথায় লইয়া দোজখে চলিয়া যাইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমলনামার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হইল, আমলনামাধারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। দ্বিতীয় পর্যায় হইল, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। তৃতীয় পর্যায় হইল, অন্যায়ের প্রতিবিধান ব্যতীত মাফ করা হইবে না। প্রথম পর্যায়ের ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধ শুধু আল্লাহর সাথে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক কাফির-মুশরেক। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, যে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে তাহার জন্য বেহেশত হারাম, দোজখই তাহার স্থান। তৃতীয় পর্যায়ের লোক অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান রোজকিয়ামতে আমার উম্মতদের মধ্যে কাহারা গরীব হইবে? সাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (দঃ)! যাহাদের ধন-সম্পদ নাই, তাহাকেই তো আমরা গরীব বলিয়া থাকি। হুযুর (দঃ) বলিলেন নামায-রোযা করা সত্ত্বেও যাহারা অন্যকে ব্যভিচারী বলিয়া গালি দেয়, অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাত করে, অন্যায়ভাবে লোক হত্যা করে বা প্রহার করে, তাহার পুণ্য উৎপীড়িত ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে যখন তাহাদের সমস্ত নেকী শেষ হইয়া যাইবে অথচ তাহার পরেও পাওনাদার বাকী থাকিয়া যাইবে, তখন পাওনাদারদের পাপ উক্ত অত্যাচারী ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। এই কারণেই যথাশ্রীঘ্র তাওবাহ্ করা চাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করিতে বিলম্ব করে এবং বলে তাওবাহ্ করার সময় এখনও হয় নাই, সে

ব্যক্তি ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। লোকমান হেকীম তাঁহার ছেলেকে উপদেশ দিতেন—তাওবাহ্ করাকে আগামী দিনের জন্য রাখিয়া দিও না। কেননা মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী। সহসা আসিয়া হাজির হইবে। এদিকে তুমি অলসতার মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং সকলেরই দ্রুত তাওবাহ্ করা কর্তব্য। সকাল-সন্ধ্যা কোন সময়েই তাওবাহ্ করা হইতে বিরত থাকিবে না। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সকালে তাওবাহ্ না করে এবং এমতাবস্থায় রাত উপস্থিত হয়, তবে এমন ব্যক্তিকে জালেম বলা যাইবে।

জুলুম-অত্যাচার করা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। সদা-সর্বদা বেশী পরিমাণে নেক কাজ করার জন্য চেষ্টা চালাইবে। রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ যখন বিচারের রায় প্রদান করার জন্য নেকী ও বদীকে মীযানে উঠাইবেন, তখন নেকী যেন বদী অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, সেদিকে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়া যাইবে। এইরূপ না করিলে কোনক্রমে যদি অন্যের পাপও ঘাড়ে আসিয়া পড়ে তখন কি অবস্থা হইবে? মৃত্যু কিন্তু সর্বদা মানুষের পিছনে লাগিয়া আছে। প্রায়শঃই দেখা যায় মানুষ (ভবিষ্যতে নেককাজ করিবার আশা পোষণ করে ঠিকই কিন্তু) নেক কাজ করিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। এই জন্যই এতটুকু মাত্র বিলম্ব না করিয়া তাওবাহ্ করা কর্তব্য। যাহাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছে, তাহাদেরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। তারপরও আল্লাহকে ভয় করিবে ও তাঁহার রহমতের আশা পোষণ করিবে। যে কাজে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট সেই কাজ হইতে বিরত থাকিবে। পূর্ণোদ্যমে সৎ কাজ করিতে ধাবিত হইবে। এমতাবস্থায় মৃত্যু হইলে আল্লাহতায়ালা উত্তম প্রতিদান দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর তালাশে ঘর হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহার শুভ প্রতিফল দান করিয়া থাকেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ব যমানার কোন এক ব্যক্তি নিরানব্বইজন লোক হত্যা করিয়া দেশের বিজ্ঞজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করিল যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তাহারা তাহাকে মরুবাসী এক দরবেশের নিকট যাইতে উপদেশ দিল। লোকটি দরবেশের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিল, এখন আমি তাওবাহ্ করিলে আল্লাহ্ উহা কবুল করিবেন কি? দরবেশ বলিলেন, না। তোমার মত পাপীর তাওবাহ আল্লাহ্ কবুল করিবেন না। এই কথা শুনামাত্র লোকটি দরবেশকে হত্যা করিয়া তাহার হত্যার সংখ্যা একশত পুরা করিল। অতঃপর আবার সে বিভিন্ন লোকের নিকট নিজের মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে আর একজন আলেমের সন্ধান দিল। তখন লোকটি সেই আলেমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি একশত লোককে হত্যা করিয়াছি, এখন আমি আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করিলে তাহা কবুল হইবে কি? আলেম বলিলেন, কেন হইবে না? তুমি অমুক দেশে যাও, সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আছেন যাহারা ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া পার্থিব কোন কাজের সাথে জড়িত নন। তুমিও গিয়া তাহাদের সাথে মিলিত হইয়া ইবাদত-বন্দেগী করিতে থাক, এই দেশে আর ফিরিয়া আসিও না।

আলেমের নির্দেশ মত সেই ব্যক্তি উক্ত নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যেই তাহার মৃত্যু শমন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় রহমতের ফিরেশতা এবং আযাবের ফিরেশতাদের মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হইল, কাহারা তাহার জানটি নিয়া যাইবেন। রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাকে পুণ্যবান এবং আযাবের ফিরেশতাগণ তাহাকে বদকার মনে করিতেছিলেন। এমন সময় মনুষ্যের আকৃতিতে জনৈক ফিরেশতা সেখানে উপনীত হইলেন। উভয় পক্ষ ফিরেশতা

তাহাকে বিচারক নির্বাচন করিলেন। মনুষ্যাকৃতি ফিরেশতা বলিলেন, রাস্তা মাপিয়া দেখ, যেই দিকের পথ কম হইবে, সেইদিকের ফিরেশতাগণ তাহার জানবহন করিয়া লইয়া যাইবেন। মাপিয়া দেখা গেল, লোকটি তাওবাহ্ করার (মুক্তি লাভ করিবার) জন্য যেইদিকে যাইতেছিল, সেই দিকের পথ কম। তখন রহ্মাতের ফিরেশতাগণ তাহার জানবহন করিয়া লইয়া গেলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ লোকটি হইতে বোযর্গ লোকদের দিকের পথ মাত্র অর্দ্ধ হাত কম ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আল্লাহতায়ালা ঐ সময়ে একদিকের পথকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ হইয়া যা এবং অন্য দিকের পথকে বলিয়াছিলেন যে, ছোট হইয়া যা। পথ সেই নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া নেওয়ার পরে উহা মাপিয়া দেখা গেল যে, বোযর্গ লোকদের দিকে যাইবার পথ অর্দ্ধ হাত কম। অতএব সেই ব্যক্তির মুক্তি নছীব হইল।

উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাওবাহ্ করার নিয়ত ও চেষ্টা করা কত বেশী উপকারী। স্মরণ রাখিবে, পুণ্যকর্ম বা নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া ব্যতীত কেহ কখনই নাজাত পাইবে না। জানিয়া রাখিবে, তাওবাহ্কারীর জন্য অধিক নেক কাজ করা ও নফল ইবাদাত ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যেহেতু পাওনাদারের দাবী বা বান্দার হক আদায় করার জন্য উহাই একমাত্র পথ। উহার পুণ্য দ্বারা তাহাদের দাবী ও হক মিটানো সম্ভব হইবে। তদুপরি উহার দ্বারা ফরজের পূর্ণতা আসিবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে মুসলিমগণ! ফরজের পূর্ণতা দানের জন্য বেশী পরিমাণে নফল ইবাদাত কর। হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য কর, সন্দেহজনক ও হারাম বস্তু হালাল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখ। হারাম সব পাপের মূল। হালাল খাওয়া ও পরিধান করা ধর্মের আসল বস্তু। কেননা পানাহারই হইল নেকী-বদীর উৎস। যে লোকমা হালাল তাহা দ্বারা নেকীর সৃষ্টি হয়, আর হারাম লোকমায় পাপের সৃষ্টি হয়। সুতরাং আলেমদের সাহচর্যের প্রয়োজন। অবশ্য সালেকদের পথ রহস্যজনক, অপরের নির্দেশও তত্ত্বাবধান ছাড়া সেই পথে চলা সম্ভবপর নয়। সেই পথের নির্দেশকারী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মুর্শিদের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, আল্লাহ তাহাকে নিরাশ করেন না। কেননা আল্লাহ অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। তিনি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহতায়ালা সকলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন, তিনি তাওবাহ করিলে খুবই সন্তুষ্ট হন। বহু দূরদেশ হইতে বহুদিন পরে পুত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে পিতা-মাতা যেমন খুশী হন, তাওবাহ্কারীর প্রতিও আল্লাহতায়ালা তেমনি সন্তুষ্ট হন।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিপদসঙ্কুল জঙ্গলের পথ অতিক্রম করার কালে হঠাৎ তাহার যাবতীয় পাথেয় অর্থাৎ খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সব কিছু সহ বাহন হারাইয়া যায় এবং তাহার অন্বেষণে সে খুব হয়রান হইয়া পড়ে, অবশেষে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন যদি সে মনে করে যে, যেখান হইতে আমার বাহনাদি হারাইয়া গিয়াছে, সেখানে গিয়াই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব। এই উদ্দেশ্যে সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হইয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার পাথেয় ও আসবাব পত্র, বাহন তাহার নিকটে উপস্থিত। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি যেমন খুশী হয়, তাওবাহকারী ব্যক্তির প্রতিও আল্লাহ তেমনি খুশী হইয়া থাকেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ কোন পাপ করিবার পর যদি অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহর নিকট মাফী ভিক্ষা করে, তবে আল্লাহ তাহাকে মার্জনা করিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া যদি অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহতায়ালাকে ক্ষমাশীলই পাইবে।

কাহারও অসাক্ষাতে নিন্দা করিলে ক্ষমা প্রার্থনা কালে নিন্দার সব কথা তাহার নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। কেননা যদি সে তাহার নিন্দনীয় বিষয়গুলি জানিতে পারে তবে সে নিন্দাকারীকে ক্ষমা করিতে রাজী হইবে না; বরং পরকালে নিন্দাকারীর পুণ্যের অংশ পাওয়ার জন্য ক্ষমা করা হইতে বিরত থাকিবে। কাজেই আকারে-ইঙ্গিতে তাহাকে নিন্দার বিষয়ের আভাস দান করিয়া তাহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি তাহার নিকট হইতে ক্ষমা পাওয়া না যায় তবে অত্যধিক পরিমাণে পুণ্য কাজ শুরু করিবে এবং তাহা দ্বারা নেকী অর্জন করিবে। রোজ কিয়ামতে যদি সে মজলুম জালেম ব্যক্তির নেকীসমূহ নিয়া নেয় তবে যেন সেই নেকী দিবার পরেও জালেম ব্যক্তির এই পরিমাণ নেকী অবশিষ্ট থাকে, যাহার দ্বারা সে নিজেও বেহেশতে যাইতে পারে।
যাহার হক নষ্ট করা হইয়াছে, ছাহেবে হক যদি সে খবর না রাখে এবং হক বিনষ্টকারীর মনে এই আশংকা হয় যে, যদি তাহার হক নষ্টের কথা তাহাকে জানাইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাওয়া হয় তবে সে হয়ত ক্ষমা করিবে না বরং উল্টা প্রতিশোধ গ্রহণেরও উদ্দেশ্য নিতে পারে, তবে এমতাবস্থায় উহার প্রতিকারের উপায় হইল, তাহার সহিত অত্যন্ত সদয় এবং উত্তম ব্যবহার শুরু করিবে। নানাভাবে তাহার উপকার এবং সাহায্য সহযোগিতা করিবে। শক্তি সাধ্য অনুযায়ী তাহার বিপদ-আপদ দূর করিবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে সহায়তামূলক ব্যবহার এবং আচরণের ফলে অবশ্যই তাহার মন হক নষ্টকারী ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আর যদি এই জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রতিকারের অন্যতম পন্থা হইল খুব বেশী পরিমাণে নেক কাজ আরম্ভ করিবে। তাহা হইলে এই নেকী উহার হক নষ্ট করার পাপের প্রতিবিধান স্বরূপ হইতে পারিবে।
পরহেজগারী ঃ বান্দার যে হক নষ্ট করা হইয়াছে বা লোকের উপর যে অন্যায়-অত্যাচার করা হইয়াছে, সেই অপরাধ মুক্ত হওয়ার আশায় যদি কেহ আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী ও অত্যধিক পরহেজগারীর দিকে মনোনিবেশ করে, তবে ইহাই রোজ কিয়ামতে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজ করিয়া দিবে। রোজ কিয়ামতে পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ হওয়া অবধারিত। উহা হইতে রেহাই লাভ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে। হাঁ তবে এ কথা সত্য, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের হিসাব নিজে করে, নিজের হক বুঝিয়া লয়, পরের হক যথাযথ ভাবে আদায় করে, পরকালে তাহার আর হিসাবের ভয়টা কিসের? হাদীস শরীফে আছে, রোজ কিয়ামতে পরহেজগার বা খোদাভীরু লোকদের হইতে আল্লাহতায়ালা হিসাব গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইবেন। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, তোমার নিকট হইতে হিসাব লওয়ার আগেই তুমি তোমার হিসাব গ্রহণ কর। তোমার আমলসমূহ ওযন দিবার পূর্বেই নিজে তুমি তোমার আমল ওযন করিয়া দেখ।
এই হাদীস দ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন ব্যতীত অযথা কাজ হইতে দূরে থাক। শরীয়ত নির্দেশিত পথই শুধু অনুসরণ কর। শরীয়তের গণ্ডির বাহির হইও না। হযুর (দঃ) বলেন, সন্দেহজনক কাজ পরিত্যাগ কর বরং সন্দেহশূন্য কাজে আগ্রহশীল হও। তিনি আরও বলেন, মুমিন ব্যক্তি ধীর-স্থির ভাবে ও চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করে। মুনাফিকগণ লা-পরোয়াভাবে কাজ করে। তিনি আরও বলেন, তোমরা নামায পড়িতে পড়িতে ধুনকের ন্যায় বক্র এবং রোযা রাখিতে রাখিতে তৃণের ন্যায় সরু হইয়া যাও। তবুও পূর্ণ পরহেজগার না হইলে কোন ভাবেই উপকৃত হইবে না। অন্য হাদীসে মুমিনগণ অনুসন্ধানী হইয়া থাকে। হুযুরে পাক (দঃ) বলিয়াছেন, পানাহারের বস্তু কিভাবে অর্জিত হইল, এই সম্বন্ধে যে ব্যক্তি চিন্তা না করে সে ব্যক্তি কোন দরজা দিয়া দোজখে প্রবেশ করিবে আল্লাহতায়ালাও সেই সম্বন্ধে চিন্তা করেন না।
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকগণ! জীবিকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেহই মৃত্যুবরণ করিবে না। অতএব জীবিকা অর্জনে তাড়াহুড়া করিও না এবং আল্লাহকে ভয় কর। জীবিকা অর্জনে সৎপথ অবলম্বন কর। যাহা হালাল তাহা গ্রহণ কর। হারাম বর্জন কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হারাম দ্রব্য আহারকারী ও দানকারীর জন্য কোন পুণ্য নাই। হারাম বস্তু খরচ করিয়াও কোন বরকত নাই। যাহা কিছু খরচ করা হয়, উহা তাহাকে দোজখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, আল্লাহ পাপ দ্বারা পাপ দূর করেন না, কিন্তু পুণ্য দ্বারা পাপ বিনষ্ট করেন। ইমরান ইবনে হাসনাইন বলেন, হুযুর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, ওহে আমার বান্দা! আমি তোমার জন্য যাহা ফরজ করিয়াছি, তাহা আদায় কর। তাহা হইলে তুমি আবেদগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে। নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে পরহেজগার হইবে। আর তোমাকে প্রদত্ত রুজীর উপর খুশী থাক। তাহা হইলে তুমি স্বাধীন অর্থাৎ নিশ্চিন্ত থাকিবে।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন, তুমি পরহেজগার (অর্থাৎ খোদাভীরু) হও, তাহা হইলে বড় আবেদ হইতে পারিবে। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, এক মেছকাল পরহেজগারী হাজার মেছকাল নামায রোযা হইতে উত্তম। আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অহী নাযিল করিয়াছিলেন, অন্যান্যদের অপেক্ষা পরহেজগার ব্যক্তি আমার অধিক নৈকট্যবর্তী। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রৌপ্যের হালাল এক দেরহামের ষষ্ঠাংশ দান করা একশত বার হজ্জ্ব অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রোজ কিয়ামতে পরহেজগার ও সংসার বিমুখ লোকগণ আল্লাহর প্রতিবেশী হইবে।

ইবনে মুবারক বলেন, একটি হারাম পয়সা পরিত্যাগ করা একশত পয়সা দান করা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। তিনি আরও বলেন যে, সিরিয়া থাকা কালে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করিতেন। একদিন তাহার কলম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অন্য একজনের নিকট হইতে তিনি একটি কলম ধার নেন। লিখা শেষ করার পর ভুলবশতঃ তিনি কলমটি নিজের নিকট রাখিয়া দেন। সিরিয়া হইতে 'মারুদ' পৌঁছিয়া সেই কলম নিজের নিকট দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে আবার সেই সুদূরবর্তী সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যাহার কলম তাহাকে ফেরত দিয়া আসেন।

নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, হালাল ও হারাম প্রকাশ্য। তবে উহাদের মধ্যে সন্দেহজনক বস্তুও আছে, যাহার সম্বন্ধে অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুকে বর্জন করিল, যে ধর্মকে পবিত্র করিল এবং স্বীয় লজ্জাকে বাঁচাইয়া রাখিল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ না করে সে হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন কোন রাখাল কোন শস্যক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক বাদশাহর জন্যই একটি চারণ ভূমি থাকে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর চারণভূমি হারাম। তোমরা সাবধান থাক। মানুষের মধ্যে এমন একটি মাংসের টুকরা আছে, যদি উহা সৎ হয়, তবে মানুষের সমগ্র দেহই সৎ হইবে। আর উহা অসৎ হইলে সর্বাঙ্গই অসৎ হইবে। এই মাংস টুকরার নাম আত্মা।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক বস্তুরই একটা সীমানা আছে। মানুষের সীমানা হইল পরহেজগারী, তাকওয়া, ধৈর্য এবং শোকর। পরহেজগারী সকল কাজের মূল। ধৈর্য দোজখ হইতে মুক্তিদাতা এবং শোকর হইল বেহেশত-প্রবেশের উপায়।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) একবার মক্কা শরীফ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হযরত আলীর (রাঃ) বংশের একজন যুবক কাবাগৃহের প্রাচীরের সহিত হেলান দিয়ে ওয়াজ করিতেছেন। তিনি উক্ত যুবকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বীন কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? যুবক উত্তর করিলেন, পরহেজগারীর উপর। হাসান বছরী (রাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বীনের প্রতিবন্ধক কি? যুবক জাবাব দিলেন, লোভ-লালসা। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) এ জবাব শুনিয়া বিস্ময়বোধ করিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, পরহেজগারী দুই রকম। একটি ফরজ এবং অন্যটি ভয়। ফরজ যেমন পাপ হইতে দূরে থাকা। আর ভয় যেমন হারাম এবং সন্দেহজনক উভয় হইতেই বিরত থাকা। সাধারণ লোকের জন্য হারাম এবং সন্দেহজনক বস্তু উভয় হইতেই বিরত থাকা চাই। আর বিশিষ্ট লোকদের পরহেজগারী এমন সব বস্তু হইতে বিরত থাকা, যাহা হইতে নফস আনন্দ লাভ করে এবং নিজের ইচ্ছাকে সফল করিতে পারে। নিজের ইচ্ছা যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইতে পরহেজ করা অতি বিশিষ্ট লোকের পরহেজগারী।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রাজী বলেন, পরহেজগারী দুই প্রকার। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও জন্য কোন কিছু না করা প্রকাশ্য এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান অন্তর মধ্যে না হওয়া অপ্রকাশ্য। ইয়াহইয়া বলেন, যে ব্যক্তি খুব বিশেষভাবে পরহেজগারীর দিকে খেয়াল না করে, তাহার মঙ্গলও বোযর্গী কোনটাই হাসিল হয় না। আর যে ব্যক্তি বিশেষ পরহেজগার, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তাহার মর্যাদা উন্নত করিবেন। ইয়াহইয়া আরও বলেন, কথাবার্তায় পরহেজগারী

অবলম্বন করা স্বর্ণ এবং রৌপ্য অপেক্ষা শ্রেয়তর। নেতৃস্থানীয় থাকাবস্থায় ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে পরহেজগারী করা অপেক্ষা বৈরাগ্য এবং ধর্মভীরুতা অবলম্বন করা উত্তম। আবু সোলায়মান দারানী বলেন, বৈরাগ্য পরহেজগারীর সূচনা। যেমন অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর বিধানে তুষ্ট থাকা। আবু আফজাল বলেন, পরহেজগারী হিসাব-নিকাশকে সহজ করে। ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রাজী বলেন, দরবেশীর সাথে যদি কাহারও পরহেজগারী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি প্রকাশ্যে হারাম ভক্ষণকারী। আবু ইউনুস ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, সন্দেহের একটি কাজ হইতে বিরত থাকা এবং প্রতিমুহূর্তে নিজের নফসের হিসাব লওয়াই পরহেজগারী। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন, যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ হয়, উহা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা পরহেজগারীর সহজ পন্থা আমার জানা নাই। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহা তোমার অন্তরকে সন্দেহপ্রবণ করিবে, তা-ই পাপ। তিনি আরও বলিয়াছেন, পাপ অন্তরের উপরে নখের দাগস্বরূপ। অর্থাৎ যে বস্তু তোমার অন্তরকে বিচলিত করে তাহাই পাপ। যাহা তোমার অন্তরকে সন্দেহপ্রবণ করে, তাহা পরিত্যাগ কর আর যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় না, তাহাতে ঝুঁকিয়া পড়।

মারুফ কারখী বলেন, পরনিন্দা করা হইতে যেমন জিহ্বাকে সংবরণ করিতে হয় অন্যের প্রশংসা করা হইতে তদ্রূপ বিরত থাক। বিশরে ইবনে হারেস বলেন, তিনটি কাজ কঠিন। সামান্য বস্তু হইতে দান করা, নির্জনে পরহেজগারী করা এবং যাহার নিকট পাওয়ার আশা থাকে বা যাহাকে ভয় করা হয়, তাহার সামনে সত্য বলা।

বর্ণিত আছে, বিশরে ইবনে হারেস হাফীর বোন একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইমাম সাহেব! আমি যখন আমার ঘরের ছাদের উপর বসিয়া সূতা কাটি তখন আমার প্রতিবেশীর ঘরের আলো আসিয়া আমার ছাদের উপর পড়ে। সেই আলোতে সূতা কাটা আমার পক্ষে জায়েয কিনা? ইমাম সাহেব বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি কে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি বিশরে হাফীর ভগ্নি। ইহা শুনিয়া ইমাম সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, পরহেজগারী প্রকাশ তোমাদের ঘর হইতেই হইয়া থাকে। ঐ আলোতে তুমি সূতা কাটিও না। আলী আত্তার (রহঃ) বলেন, আমি বছরার এক গলি পথ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম, এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট। আর ছেলে-পেলেরা তাহার সামনে খেলা-বেড়া করিতেছে। আমি বলিলাম, বৃদ্ধ লোকের সামনে খেলিতে তোমাদের লজ্জা হইতেছে না? একটি ছেলে জবাবে বলিল, বৃদ্ধের পরহেজগারী নাই। তাহাকে আবার লজ্জা কিসের?

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বছরায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় মধ্যে সিদ্ধ উপায়ে কোন ফল তথা খেজুর খোর্মা খাওয়া তাহার ভাগ্যে হয় নাই এবং এই অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। খোর্মার মওসুম শেষ হইলে তিনি লোকদিগকে বলিতেন, হে বছরাবাসী! খোর্মা না খাওয়ায় আমার পেট ছোট হইয়া যায় নাই, আর তোমরা খোর্মা খাইয়াছ বলিয়া তোমাদেরও পেট বড় হয় নাই।

ইব্রাহীম আদহামকে লোকগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি জমজমের পানি পান করেন না কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার কাছে পানি উঠাইবার পাত্র নাই। পাত্র থাকিলে অবশ্য পান করিতাম। বর্ণিত আছে, হারেস মুহাসেবী কোনরূপ সন্দেহজনক খাবার দ্রব্যের প্রতি হাত বাড়াইলে তাঁহার আঙ্গুলের রগে টান পড়িয়া যাইত এবং তাহার হাত অবশ হইয়া আসিত।

বর্ণিত আছে, বিশরে হাফীর হাত সন্দেহজনক খাদ্যের দিকে প্রসারিত হইত না। বর্ণিত আছে আবু ইয়াযিদ বুস্তামী মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁহার মা কোন প্রকার সন্দেহজনক খাবার দ্রব্যের প্রতি হাত বাড়াইলে সে খাদ্য অদৃশ্য হইয়া যাইত। তাঁহার বংশের কোন কোন লোক এমনও ছিলেন যে তাঁহাদের সামনে কোনরূপ সন্দেহজনক খাদ্য আনা হইলে উহা হইতে দুর্গন্ধ আসিত। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহারা সন্দেহজনক খাদ্য মুখে দিলে তাহা চিবাইতে পারিতেন না।

আল্লাহ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ছিলেন, যাহাতে তাহারা কোনরূপ মাকরূহ খাদ্য হইতে পরহেজ করিতেন। হালাল দ্রব্য খাওয়াই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, তাই আল্লাহ সে ব্যাপারে তাহাদেরকে সাহায্য করিয়াছেন। হালাল-হারাম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি আল্লাহ তাহাদেরকে দান করিয়াছিলেন। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরীকে হালাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর

বলিয়াছিলেন, যে বস্তু গ্রহণে আল্লাহর নাফরমানী না হয় উহাই হালাল। দ্বিতীয় বার বলিলেন, যে বস্তু গ্রহণে আল্লাহকে ভুলিয়া না যায়, উহাই প্রকৃত হালাল।

হাদীস শরীফে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এক ব্যক্তিকে দোয়া করিতে শুনিলেন, হে মাবুদ! আমাকে হালাল রিজিক দান কর। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, এই রিজিক একমাত্র নবী-রাসূলদের জন্য খাস। বরং তুমি এইরূপ প্রার্থনা কর যে, হে মাবুদ! তুমি আমাকে এমন জীবিকা দান কর, যাহাতে শাস্তি পাইতে না হয়।

খাদ্যের রকম হিসাবে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম পরহেজগার, দ্বিতীয় অলী এবং তৃতীয় আরেফ। পরহেজগার ব্যক্তি এমন খাদ্য গ্রহণ করে, যাহাতে মাখলুকের কোন হক (দাবী) নাই এবং শরীয়তেও সেই সম্বন্ধে কোনরূপ ওজরাপত্তি নাই।

আর অলীদের খাদ্য নফসে আম্মারার আকাঙক্ষা হইতে মুক্ত এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী হয়।

আর আরেফদের খাদ্য সম্বন্ধে শুধু তাহারাই জানে। পানাহারের ব্যাপারে তাহাদের নিজস্ব কোন মতামত নাই। তাঁহারা আল্লাহ যাহা খাওয়ান, শুধু তাহাই খান। আল্লাহতায়ালা সর্বদাই তাহাদের প্রতি অনুগ্রহশীল, তিনিই তাহাদের জীবিকা দাতা ও পথ প্রদর্শক। অবোধ শিশু যেমন জননীর স্তন অনায়াসে লাভ করে, আরেফগণও তেমনি আল্লাহর তরফ হইতে আহার্য দ্রব্য পাইয়া থাকেন।

পরহেজগারী অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। কাহশাম বলেন, একবার একটি পাপ করিয়া আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকি। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমার এক ভাই আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। আমি তাহার জন্য ছয় দিরহাম দিয়া একটি মাছ খরিদ করিয়া আনি। খাওয়ার পর প্রতিবেশীর দেয়াল হইতে তাহার বিনানুমতিতে একটুকরা মাটি আনিয়া আমার ভাইকে হাত মুছিতে দেই। তিনি ঐ মাটির টুকরা দ্বারা হাত মুছেন।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি ভাড়াটিয়া ঘরে বাস করিতেন। তিনি একখানি পত্র লিখিয়া ঐ ঘরের দেয়ালের সাথে পত্রের কালি শুকাইতে মনস্থ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ঘর তো ভাড়ায় লওয়া। তাঁহার আবার মনে হইল, তাহাতে কি হইবে! শেষ পর্যন্ত তিনি ঘরের দেয়ালের সাথে কালি শুকাইলেন। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ অদৃশ্য আওয়াজ হইল, তুমি মাটিকে সাধারণ জিনিস মনে করিলে! অতিশীঘ্রই হিসাবের ঝামেলা অনুভব করিতে পারিবে।

বর্ণিত আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একবার কোন ব্যবসায়ীর কাছে নিজের একখানা বরতন রাখিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ আনেন। অতঃপর যখন তিনি টাকা দিয়া নিজের বরতনখানা আনিতে গেলেন, দোকানদার তাঁহার সামনে দুইখানা বরতন রাখিয়া দিয়া বলিলেন, যেখানা আপনার হয় নিয়া যান। কিন্তু আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিলেন, আমার কোনখানা তাহাতো আমি চিনিতে পারিতেছি না, টাকা এবং বরতন উভয়ই তোমার নিকট থাকুক। তখন ব্যবসায়ী বলিল, হুযুর! আপনার বরতন এইখানা। আমি আপনাকে যাচাই করিয়া দেখিলাম মাত্র। শুনিয়া ইমাম সাহেব বলিলেন, এখন আর আমি বরতন নিতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি বরতন ও টাকা উভয়ই দোকানদারের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

একবার হযরত রাবেয়া বছরী (রহঃ) অদূরবর্তী শাহী মহলের প্রদীপের আলোতে নিজের ছিন্ন জামা সেলাই করিয়া পরিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁহার অন্তরে এক অজানিত অস্বস্তি এবং চাঞ্চল্যকর অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। যখন তাঁহার শাহী মহলের আলোতে জামা সেলাই করার কথাটি মনে হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে জামাটি তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সাথে সাথে তাহার মনের স্বস্তি ও স্থিরতা ফিরিয়া আসিল।

একবার এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি দুইখানা ডানার সাহায্যে বেহেশত মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। লোকটি তাহাকে এইরূপ মর্যাদা লাভের রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার পরহেজগারীর কারণে এই মর্যাদা লাভ হইয়াছে।

হাসান ইবনে আবু সিনান ষাট বৎসর পর্যন্ত রাত্রে নিদ্রা যান নাই। চর্বিযুক্ত খানা আহার করেন নাই এবং শীতল পানি পান করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিলেন, অত্যন্ত ভাল। তবে আমি একটি সুঁই ধার নেওয়ার পর ফেরত না দেওয়ায় এখনও বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাই নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) একটি কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া কবরস্থ মৃত ব্যক্তিকে আহবান করিলেন। আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া কবর হইতে উঠিয়া আসিল। হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি কুলিগিরি করিতাম। একদিন এক ব্যক্তির কাষ্ঠের বোঝা বহন করিবার সময় উহার এক টুকরা লাকড়ির দ্বারা দাঁত খেলাল করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত আমি উহার জিজ্ঞাসাবাদেই অতিষ্ঠ আছি।

পরহেজগারীর পূর্ণতার শর্তসমূহ

নিম্নোল্লিখিত দশটি শর্ত পুরা না করা পর্যন্ত কাহারও পরহেজগারী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। শর্তগুলি এইঃ
(১) পরনিন্দা হইতে রসনা সংযত রাখা। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা একে অন্যের নিন্দা করিও না।
(২) সন্দেহপ্রবণতা অর্থাৎ খারাপ ধারণা হইতে বিরত থাকা। কেননা কোন কোন সন্দেহ তথা কুধারণা করা পাপ। আল্লাহ বলেনঃ অনেক কুধারণা করা হইতে পরহেজ কর। কেননা কোন কোন বদ গুমানি (কুধারণা) গুনাহর কারণ বৈকি। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুধারণা করা হইতে দূরে থাক। কেননা কুধারণা এক প্রকার মিথ্যার শামিল।
(৩) ঠাট্টা-তামাশা না করা। আল্লাহ বলেনঃ 'এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-তামাশা করিও না।
(৪) হারাম হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা। আল্লাহ বলেনঃ ঈমানদারদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন চোখের দৃষ্টি নীচু রাখে।
(৫) সত্য কথা বলা। আল্লাহ বলেনঃ যখন কিছু বল, সত্য বল।
(৬) নিজের উপর আল্লাহর এহসান স্বীকার করা। আল্লাহ বলেনঃ বরং ইহা তো তোমাদের উপর আল্লাহতায়ালার এহসান যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখাইয়াছেন।
(৭) আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করা, নাহক পথে ব্যয় না করা। আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের প্রশংসায় বলেনঃ তাহারা খরচকারী, তবে অযথা অপাত্রে খরচ করে না এবং কৃপণতাও করে না।
(৮) নিজেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মনে না করা এবং গর্ব না করা। আল্লাহ বলেনঃ আমি পরকালের ঘর (বেহেশত) এমন লোকদেরকে দেই, যাহারা দুনিয়াতে উচ্চমর্যাদা লাভের চেষ্টা না করে বা ঝগড়া-কলহে লিপ্ত না হয়।
(৯) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সর্ব রকম রীতি-নীতির অনুবর্তিতা রক্ষা করা। আল্লাহ বলেনঃ সমস্ত নামাযের হেফাজত কর এবং উহার পায়বন্দ হও।
(১০) হুযুরে পাক (দঃ)-এর সুন্নত তরীকার অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয় ইহা আমার সোজা রাস্তা। তোমরা এই রাস্তার উপর চল। অন্য রাস্তা অবলম্বন করিও না।

তাওবাহ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) একদা ভাষণ দান কালে বলিলেন, হে লোক সকল! মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ কর। নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। সৎলোকে পরিণত হও। তোমার ও তোমার প্রভুর মধ্যকার সম্পর্ককে গ্রথিত কর। বেশী পরিমাণে দান-খয়রাত কর। তাহাতে আল্লাহ তোমাদের আয়-রোজগারে বরকত দান করিবেন। লোকদেরকে উপদেশ দান কর। আল্লাহর হেফাজতে থাকিবে। অসৎ কাজে বারণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন।
হুযুরে পাক (দঃ) প্রায়শঃ বলিতেন, আয় মাবুদ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার তাওবাহ কবুল কর। তুমিই তাওবাহ কবুলকারী, অনুগ্রহশীল ।
হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, অভিশপ্ত শয়তানকে যখন বেহেশত হইতে বাহির করিয়া যমিনের দিকে নিক্ষেপ করা হইল, তখন সে বলিল, হে মাবুদ! তোমার সম্মান এবং প্রতিপত্তির কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে থাকিব। আল্লাহ বলিলেন, আমার সম্মান ও প্রতিপত্তির কসম, বান্দা শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তাহাদের তাওবাহ কবুল করিব। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সালামী বলেন, সাহাবীদের একটি দলের সহিত আমি

উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, মৃত্যুর অর্দ্ধদিন পূর্বে তাওবাহ করিলেও আল্লাহ কবুল করিয়া থাকিবেন। আর একজন বলিলেন, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার পূর্বেও তাওবাহ করিলে আল্লাহ উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনে মাতরাফ হইতে বর্ণিত, হুযরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, বনি আদমের উপরে আমি বড়ই মেহেরবান। উহারা পাপ করিয়া ক্ষমা চাহিলে আমি ক্ষমা করি। আবার পাপ করিয়া ক্ষমা না চাহিলেও আমি ক্ষমা করি। তাহারা পাপ করা হইতেও বিরত থাকে না এবং আমার দয়া হইতেও নিরাশ হয় না। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'অ ইনিস্তাগফির রাব্বাকুম ছুম্মা তূবূ ইলাইহে' (তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ্ কর) এই আয়াত নাযিল হইলে তখন হইতে হুযুরে পাক (দঃ) প্রত্যহ একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন এবং বলিতেন, হে প্রভু! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবাহ করিতেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া বলিল, আমি পাপ করিয়াছি। হুযুর (দঃ) বলেন, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। লোকটি বলিল, তাওবাহ করার পরও পাপ করিয়া থাকি। হুযুর (দঃ) বলিলেন, যখনই পাপ কাজ কর, তখনই তাওবাহ কর। এইরূপ করিলে শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সেই ব্যক্তি আবার বলিল, আমি যে অনেক পাপ করিয়াছি। হুযুর (দঃ) বলিলেন, তোমার পাপের তুলনায় আল্লাহর রহমত অনেক বেশী।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যদি তুমি তাওবাহ্ না কর তবে আল্লাহর রহমত পাওয়ারও আশা রাখিও না। কেননা তুমি তাঁহার শাস্তির খেয়াল কর নাই এবং যে নেক কাজ করিলে তাঁহার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা পাওয়া যায় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ নফসের তাড়নায় মত্ত হইয়া রহিয়াছ, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করিয়াছ। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করে ও ঈমান আনে, পুণ্যের কাজ করে এবং স ৎপথে চলে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। আল্লাহ আরও বলেন, প্রত্যেকটি বস্তুকেই আমার রহমত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। যেই ব্যক্তি পরহেজগার তাহার নাম আমি লিখিয়া রাখি। যেই ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে, তাহাদের নামও আমি লিখিয়া রাখি। অতএব যে ব্যক্তি তাওবাহ্ না করে, পরহেজগার না হয়, অথচ বেহেশ্‌ত ও আল্লাহর রহমতের আশা রাখে, সে ব্যক্তি আহমক। এইরূপ আশাকারী ব্যক্তি অহংকারী। কেননা আল্লাহর রহমত ও বেহেশত পরহেজগারী ও তাওবাহর শর্তাধীন। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন ব্যক্তি পাপকে পাহাড় তুল্য মনে করে এবং চিন্তা করে, না জানি উহা কখনও আমার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর অসৎ ব্যক্তি পাপকে নাকের ডগার উপরের মাছির ন্যায় মনে করে যে, যখন ইচ্ছা তাড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, বান্দা পাপ করে, সেই পাপ তাহাকে বেহেশতে লইয়া যায়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! পাপ কিভাবে বেহেশতে লইয়া যায়? হুযুর (দঃ) বলিলেন, পাপ করিয়া লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। পরিশেষে এই পাপই তাহার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হইয়া পড়ে। হুযুর (দঃ) আরও বলেন, নূতন পুণ্য পুরানা পাপকে যত তাড়াতাড়ি দূর করে এমন আর কোন বস্তু আমি দেখি নাই। পুণ্য পাপকে বিদূরীত করে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। আর যখন সে তাওবাহ্ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং পাপ পরিত্যাগ করে, তখন সেই দাগ উঠিয়া যায় আর যদি পাপ পরিত্যাগ করিয়া তাওবাহ্ না করে, ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে উক্ত দাগের উপর দাগ পড়িতে পড়িতে অন্তর একেবারে কাল হইয়া সজীবতা হারাইয়া ফেলে। আল্লাহ বলেন, এমন নয় বরং সে যে কাজ করিত, সেই কাজের দরুনই তাহার অন্তরে রং (দাগ) লাগিয়াছে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অপেক্ষা পাপ পরিত্যাগ করা অনেক সহজ। সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বে যাহা কিছু নেক কাজ করিয়া লও। হাসান বলেন, আদম ইবনে যিয়াদ বলিতেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে, মৃত্যু আসিয়া সামনে উপস্থিত হইয়াছে এবং তোমরা আল্লাহর কাছে মাফী তলব করিতেছ, আল্লাহ্ও তোমাদেরকে মাফী প্রদান করিতেছেন। অতএব তোমাদের উচিত প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকা।

হযরত দাউদের (আঃ) নিকট অহী আসিয়াছিল, সর্বদা মনে ভয় রাখ, এমন না হওয়া চাই যে, তোমার উদাসীন থাকা অবস্থায় ধৃত হইয়া আমার সামনে আস।

একবার এক বোযর্গ ব্যক্তি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে আসিলেন। আবদুল মালেক বোযর্গকে কিছু নসীহত করিতে বলিলেন। বোযর্গ বলিলেন, যদি আপনার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য কোন সামান প্রস্তুত রাখিয়াছেন কি? আবদুল মালেক বলিলেন, না, তাহা তো রাখি নাই। বোযর্গ বলিলেন, আপনি কি এমন শক্তি রাখেন যে, আপনার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া গেলে আপনার পছন্দ মত অবস্থাকে বহাল রাখিতে পারেন? (অর্থাৎ মৃত্যুকে ফিরাইয়া দিতে কি আপনি সক্ষম?) আবদুল মালেক জবাব দিলেন, না, সে শক্তি আমার নাই। তখন বোযর্গ বলিলেন যে, আমি এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখি নাই যে, আপনার মত অবস্থা লইয়া সে মোটেও নিশ্চিন্ত এবং সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন যে, লজ্জিত হওয়ার নামই তাওবাহ। তিনি আরও বলেন যে, পাপ করার পর যদি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তবে উহাই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হাসান (রাঃ) বলেন, তাওবাহর চারিটি পর্যায়। যথা ঃ (১) মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা (২) আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া (৩) পাপ কার্য হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফিরাইয়া রাখা এবং (৪) এইরূপ পাপ ভবিষ্যতে না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যে পাপের জন্য তাওবাহ করা হয়, উহা পুনরায় না করাকেই খালেছ তাওবাহ্ বলে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পাপ করিয়া যদি কেহ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, অথচ সে সেই পাপের উপরই স্থির থাকে। (অর্থাৎ ঐ পাপ অনবরতই করিয়া যাইতে থাকে) তবে সে যেন আল্লাহ তায়ালার সাথে ঠাট্টা ও তামাশা করিল। যদি কেহ বলে, হে মাবুদ! তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি ও তাওবাহ করিতেছি। তারপর আবার যদি পাপ করে, আবারও করে, আবারও করে, তবে ইহা (ছগীরাহ গুনাহ হইলেও) কবীরাহ গুনায় পরিণত হয়।

হযরত ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, তুমি নিজে তোমার নফসেরই উপদেশদাতা হও, অন্যকে উপদেশ দিও না। কেননা লোকে তোমার উপদেশ পালন না করিলে তুমি তাহাদিগকে মন্দ বলিতে পারিবে না। যেহেতু তুমি জীবনে তোমার নফসকেই উপদেশ দাও নাই অন্যে তোমার কথা শুনিবে কেন?

আবু ইমামাহ বাহেলী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ডান কাঁধের ফিরেশতা বাম কাঁধের ফিরেশতার নেতা। কোন ব্যক্তি একটি পুণ্যের কাজ করিলে ডান দিকের ফিরেশতা দশটি নেকী লিখেন, আর কেহ কোন একটি পাপের কাজ করিলে বাম কাঁধের ফিরেশতা উহা লিখিতে উদ্যত হইলে ডান দিকের ফিরেশতা বলেন, একটু দেরী কর। সাত ঘন্টার মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আর সেই পাপ লিখা হয় না আর যদি ক্ষমা না চায়, তবে শুধু একটি মাত্র পাপই লিখা হয়।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, বান্দা কোন পাপ করিলে, সে আর একটি পাপ না করা পর্যন্ত উহা লিখিত হয় না। যখন পাঁচটি পাপ জমা হয় এবং তারপর একটি পুণ্যের কাজ করে, তখন একটি পুণ্য পাঁচটি পাপের সম্মুখে লিখা হয়। এ সময় মালউন শয়তান পরিতাপের সহিত বলে, আহা! আমি আদম সন্তানের উপর কি ভাবে জয়ী হইব? তাহার মাত্র একটি পুণ্যই যে, আমার সব পরিশ্রম পণ্ড করিয়া দেয়। ইউনুস হযরত হাসান (রাঃ) হইতে এবং হযরত হাসান (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের জন্যই দুইজন করিয়া ফিরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। ডান কাঁধের ফিরেশ্‌তা বাম কাঁধের ফিরেশ্‌তার নেতা। বান্দা কোন পাপ কাজ করিলে বাম দিকের ফিরেশতা উহা লিখিবার জন্য ডান দিকের ফিরেশতার কাছে অনুমতি চান। তখন ডান দিকের ফিরেশতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলেন। ঐ বান্দা পাঁচটি পাপ করার পর আবার লিখার অনুমতি চাহিলে ডান দিকের ফিরেশতা বলেন, একটি পুণ্যের কাজ করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর! তিনি আরও বলেন, আমাকে অবগত করানো হইতেছে যে, একটি পুণ্যের কাজে দশটি পুণ্য লাভ হয়। তবে যেহেতু পাঁচটি পাপ এখন দূর হইয়া গেল, এখন অবশিষ্ট পাঁচটি পুণ্য লিখিয়া রাখ। শয়তান তখন চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, হায়! আমি আদম সন্তানের সাথে কি ভাবে কুলাইয়া উঠিব?

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার চারি হাজার বৎসর পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ আরশের চারি পাশে লিখিত ছিল ঃ

* وانى لغفارلمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى *

উচ্চারণ ঃ অ ইন্নী লাগাফ্‌ফারুল্লিমান তাবা অ আমানা অ 'আমিলা ছালিহান ছুম্মাহতাদা।

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি তাওবাহ করে, ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, আমি অবশ্য তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি। কেননা সে ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা তাওবাহ করিলে আল্লাহ যদি উহা কবুল করেন, তবে তাওবাহর পূর্বে সে ব্যক্তি যত পাপ করিয়াছিল আল্লাহ তাহা হিসাবরক্ষক ফিরেশ্‌তাদের স্মরণ হইতে ভুলাইয়া দেন। এমনকি পাপের স্থানসমূহ এবং যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পাপ করিয়াছিল, তাহাও ভুলাইয়া দেন। রোজ কিয়ামতে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার মত আর কেহই থাকিবে না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, গুনাহ করিয়া তাওবাহ করিবার পর লোক এমন হইয়া যায় যে, সে গুনাহ-ই করে নাই। হুযুর (দঃ) আরও বলেন, কোন ব্যক্তি দিনে সত্তর বার গুনাহ করিয়াও যদি তাওবাহ করে, তবে সে এমন হইয়া যায় যে, সে যেন কোন পাপই করে নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার

* استغفرالله العظيم الذى لااله الاالله هوالحى القيوم واتوب اليه *

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লাহাল আজীমাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম অ আতূবু ইলাইহি দোয়াটি পাঠ করে, তবে সাগরের ফেনার ন্যায় অগণিত গুনাহ্ হইলেও আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রোজ কিয়ামতে লোক তাহার আমলনামার প্রথম ভাগে পাপ এবং শেষ ভাগে পুণ্য দেখিবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার যখন আমলনামার দিকে দৃষ্টি করিবে, দেখিবে, সকলই পুণ্য। প্রথম হইতে যাহাদের ভাগ্যে তাওবাহ লিখিত হইয়াছিল এবং উহা গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল, তাহারাই এইরূপ দেখিতে পাইবে।

কোন কোন বোযর্গ বলিয়াছেন, বান্দা যখন তাওবাহ করে, তখন তাহার পূর্ববর্তী পাপসমূহ পুণ্যে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইজন্যই আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে বহু লোক পরিতাপ করিবে যে, হায়! আমি যদি আরও পাপ করিতাম (তবে তাহাও তো এইরূপ পুণ্যে পরিণত হইত)। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার পাপ আমি পুণ্যে পরিবর্তন করিয়া দিব।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ যদি আসমান-যমিন পরিমাণ পাপ করিয়াও তাওবাহ্ করে, তবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাহা ক্ষমা করিয়া দেন। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে বনী আদম! তুমি পাপে পৃথিবী পূর্ণ করিয়াও যদি আমার সামনে আস, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

তাওবাহ্‌র কতিপয় দৃষ্টান্ত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা কুফা নগরীর একটি গলিপথ দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, একটি গৃহ মধ্যে কতিপয় ফাসেক ব্যক্তি একত্রে মদ্য পান করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যাবান নামক এক গায়ক ব্যক্তি সেতার বাজাইয়া গান করিতেছে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) লোকটির গান শুনিয়া বলিলেন, আহা কি মিষ্টি স্বর! লোকটি গান না গাহিয়া এই স্বরে যদি কোরআন পাঠ করিত, তবে কতই না ভাল হইত। এই কথা বলিয়াই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার কথার আওয়াজ যাবানের কানে গেল। সে তাহার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। যাবান আবার জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি বলিলেন? তাহারা বলিল, তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বলিলেন, আহা কি মিষ্টি স্বর! গান না গাহিয়া এই স্বর দিয়া যদি কোরআন পাঠ করিত, তবে কতই না ভাল হইত!

এই কথা শুনা মাত্রই যাবানের মনে সহসা এক ভাবান্তর সৃষ্টি হইল। সে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেতারটা যমিনে আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তখনি দৌড়াইয়া গিয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হইল। সে তাহার মাথার পাগড়ী গলায় জড়াইয়া অঝোরে ক্রন্দন শুরু করিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ যাহাকে ভালবাসেন, আমি তাহাকে কিভাবে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারি? সেই দিনই যাবান তাওবাহ্ করিয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট কোরআন এবং অন্যান্য দ্বীনি এলম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সংস্পর্শে থাকিয়া যাবান সমসাময়িক যুগের একজন খ্যাতনামা ইমাম হইলেন। উক্ত যাবান হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর বহু হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

বনী ইস্রাইলদের বহু রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক সুন্দরী বাইজী ছিল। সে তাহার গৃহ দরজায় আসন পাতিয়া বসিয়া অসংখ্য পথচারীকে বিভ্রান্ত করিয়া ছাড়িত। যে একবার তাহাকে দেখিত সে-ই তাহার রূপে হাবুডুবু খাইত। তবে তাহাকে অন্যূন দশ টাকা ফী না দেওয়া পর্যন্ত কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারিত না।

একদা বনি ইস্রাইলী এক দরবেশ ঐ পথ দিয়া যাইবার কালে ঐ সুন্দরী বাইজীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে বাইজীর রূপরাশি প্রণয়বাণ নিক্ষেপ করিল ও তাহাতে দরবেশ একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দরবেশ অবশ্য তাঁহার মনকে স্থির রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সফল হইলেন না ; বরং তাহার চঞ্চলতা আরও বাড়িয়া গেল। এমন কি তাঁহার নিকট যে সকল জিনিস-পত্র ছিল, সব কিছু বিক্রয় করিয়া নগদ মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা লইয়া তিনি উক্ত বাইজীর দরজায় উপস্থিত হইলেন। বাইজী বলিল, নির্দিষ্ট মুদ্রা আমার নিযুক্ত প্রতিনিধির কাছে অর্পণ করিয়া আমার নিকট আস। দরবেশ তাহার কথা মত কাজ করিয়া বাইজীর সম্মুখে পাতা আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার সহিত হাসি-তামাসায় মত্ত হইলেন। এক সময় দরবেশ বাইজীকে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করার খেয়ালে তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা দরবেশের পূর্ববর্তী ইবাদাত এবং স্বীয় অনুগ্রহের বদৌলতে তাঁহাকে অবাঞ্ছিত কর্ম হইতে বাঁচাইয়া রাখিলেন। সহসা দরবেশের মনে এই ভাব উদয়

কহিল যে, হায়, হায়! আমি এ কি করিতে যাইতেছি? আরশে আসীন আল্লাহু রাব্বুল আলামীন যে অথচ এই ঘোরতর অপকর্ম সকলই দেখিতেছেন, আমার পূর্বেকার সমস্ত ইবাদাত ও নেক কাজই তো আমি বরবাদ করিয়া দিতেছি। দরবেশের মনে ভীষণ ভয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বাইজী তাহার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়কর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইল আপনার? দরবেশ জবাব দিল, আমার অন্তরে আমার প্রতিপালকের ভয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে দাও। বাইজী বলিল, আপনি কেমন পুরুষ, বুঝিতে পারিতেছি না। কত অসংখ্য লোক আমাকে পাওয়ার জন্য পাগল প্রায় হইয়া আমার নিকট আসে ও আমার স্পর্শ লাভ করিয়া জীবন ধন্য মনে করে, আর আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন! এ কেমন কথা? দরবেশ বলিলেন, দেখ রমণী! আমার মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হইয়াছে। আমি তোমাকে যে মাল অর্পণ করিয়াছি, উহা তোমারই। আমি তাহা ফেরত লইতে চাহি না। তুমি শুধু আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে দাও। বাইজী বলিল, আমার মনে হইতেছে আপনি ইহার পূর্বে কখনও এই পথে আসেন নাই। দরবেশ বলিলেন, হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আমি আর কোনদিন এই পথে আসি নাই। তখন বাইজী তাঁহার নাম-পরিচয় এবং ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে যাইবার অনুমতি দিল, দরবেশ স্বীয় নাম ও ঠিকানা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

দরবেশ চলিয়া যাওয়ার পর উক্ত বাইজী রমণীর অন্তরেও আল্লাহর ভয়ের প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এই ব্যক্তি পাপ কাজ করে নাই, শুধু করিবার মনস্থ করিয়াছিল। তাহাতেই সে আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া চলিয়া গেল। আর আমি জীবনভর এই কঠিন পাপ কাজে ডুবিয়া আছি। আমার উচিত ছিল তাহার অপেক্ষা হাজারো গুণ বেশী আল্লাহকে ভয় করা। এই কথা মনে হইতেই সহসা তাহার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় প্রবলভাবে জাগ্রত হইল এবং সে তৎমুহূর্তে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অতঃপর সে যথাসাধ্য দিবারাত্র আল্লাহর ইবাদাতে কাটাইতে লাগিল।

এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সহসা উক্ত রমণীর মনে একটি খেয়াল জাগিল, আহা যদি আমি সেই দরবেশের স্ত্রী হওয়ার ভাগ্য লাভ করিতাম, তবে তাঁহার কাছে আমি দ্বীনি শরীয়তের সব কিছু শিখিতে পারিতাম। এইরূপ খেয়াল জাগিবার পরই সে রমণী উক্ত দরবেশের গ্রামে গিয়া একদিন উপস্থিত হইল। লোকগণ দরবেশকে সংবাদ দিল যে, জনৈকা মহিলা আপনার সাথে সাক্ষাত প্রার্থিনী। দরবেশ বাড়ীর বাহির হইয়া উক্ত মহিলার কাছে আসিলেন। মহিলা দরবেশকে চিনিতে পারিয়া মুখের পর্দা সরাইল। দরবেশ তাহাকে দেখিতেই পূর্বোক্ত ঘটনা সব মনে লাগিল। দরবেশ আল্লাহর ভয়ে এত জোরে একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, সাথে সাথে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

তখন উক্ত মহিলা বলিল, হায় আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার সাথে সাক্ষাত করিতে আসিলাম, আর আপনি আমাকে দেখা মাত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন!

অতঃপর রমণী স্থানীয় লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, এই দরবেশের পরিবারে এমন কোন লোক আছে কি যে, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে? তাহারা বলিল, দরবেশের এক নেককার ভ্রাতা আছে, কিন্তু সে খুবই দরিদ্র। রমণী বলিল, পরিবারের খরচ চালানোর জন্য আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে। অতঃপর উক্ত রমণীর দরবেশের সেই ভাইয়ের সাথেই বিবাহ হইল। উক্ত রমণীর

গর্ভে সাতটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পরিণত জীবনে তাহারা প্রত্যেকেই বনি ইস্রাইল বংশীয় এক একজন নবী হইয়াছিলেন।

এখন প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া দেখুন, সততা, ইবাদাত এবং সৎ নিয়তে কত বরকত। হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সৎ নিয়তে যাবানকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন এবং উল্লিখিত দরবেশের ইবাদাত এবং খোদাভীতি কিভাবে তাহাকে মহা পাপ হইতে রক্ষা করিল এবং তাঁহার উক্ত বস্তুগুলির প্রভাবে কিভাবে এক মহাপাপিনী পবিত্র ও পুণ্যময় জীবনে ফিরিয়া আসিল। যদি তোমরাও এইভাবে সৎ নিয়ত রাখ তবে তোমাদের সংস্পর্শেও লোক ঐরূপ পুণ্যবান হইয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর খাস ও বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে না। অতএব তোমরা সর্বদা আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস রাখিয়া ও ঈমানকে সুদৃঢ় করিয়া আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে আল্লাহ তোমাদেরকে সামর্থ্য দান করিবেন এবং সেই সামর্থ্যে তোমরাও তোমাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সুপথে আনিতে পারিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অযথা বেহুদা কার্য পরিত্যাগ করিবার মধ্যেই ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত। যে অসৎ কার্য হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চায় তাহার উচিত আত্মনিগ্রহ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ সম্পর্কে নিজেকে উপদেশ দান করা এবং উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকা। যখন দেখিবে, আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, তখন অন্যকে উপদেশ দান করিবে আর তখন সে উপদেশ সহজেই কার্যকরিও হইবে। যেমন বনি ইস্রাইলের উল্লিখিত আবেদের পুণ্যের ফলে অতি সহজেই এক বাইজী গণিকা তাওবাহ্ করিয়া সুপথে আসিয়াছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত সে সাতজন বনি ইস্রাইল নবীর জননী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিল।

সার কথা এই যে, সমস্ত ভালাই এবং মঙ্গল আল্লাহর আনুগত্য এবং নির্দেশ পালনের মধ্যে নিহিত এবং সমস্ত বুরায়ী এবং অমঙ্গল আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার ভিতরে রহিয়াছে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, আল্লাহর অনুগত ও নির্দেশ পালনকারী হওয়া। কেহ কখনই ইহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিও না।

তাওবাহ্র পরিচয়

তাওবাহ্র পরিচয় মিলে চারি বস্তু দ্বারা । যথাঃ (১) অযথা কথাবার্তা, পরনিন্দা এবং অশ্লীল গালাগালি করা হইতে রসনা সংযত রাখা।

(২) কাহারও প্রতি শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা।

(৩) কুলোকের সংগ হইতে দূরে থাকা।

(৪) সদা-সর্বদা মৃত্যু-চিন্তা করা ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

বোযর্গদের কথা এই যে, আল্লাহর দরবারে যাহাদের তাওবাহ কবুল হয়, তাহাদের নিদর্শন চারিটি। যথাঃ

(১) ফাসেক ও পাপীদের সংস্রব ত্যাগ করিবে। তাহাদেরকে ভয়ও করিবে না এবং সৎ লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করিবে।

(২) ছোট-বড় সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করতঃ ইবাদাত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করিবে।

(৩) পার্থিব সুখ-শান্তি, আনন্দ-আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে।

(৩) জীবিকার সন্ধান করিবে না, কেননা জীবিকার যিম্মাদার খোদ আল্লাহ তায়ালা। এই সকল লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ও তাওবাহকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন।

লোকগণ এই সমস্ত লোকের প্রতি চারিটি কাজ করিয়া থাকে। যথাঃ

(১) সকলে তাহাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

(২) সকলে তাহাদের জন্য শুভাশীর্বাদ করিয়া থাকে।

(৩) লোকেরা তাহাদেরকে তাহাদের পূর্বকৃত পাপের জন্য লজ্জা প্রদান করে না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায়কারী সাব্যস্ত করে, সে তাহার পাপ দূর করিয়া দেয়। অন্যায়ভাবে দোষারোপকারী সেই পাপের ভাগী হইয়া দুনিয়া পরিত্যাগ করে।

(৪) লোকগণ তাহার সংস্রবকে ভালবাসে। তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করে ও সম্মান প্রদর্শন করে।

এ ধরনের লোককে আল্লাহ চারিটি জিনিস দান করিয়া থাকেন। যথা ঃ

(১) আল্লাহ তায়ালা তাহার পাপকে এমনভাবে ক্ষমা করেন, যেন সে পূর্বে কোন পাপই করে নাই।

(২) আল্লাহ তায়ালা বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন।

(৩) শয়তান তাহার নিকটে আসিতে পারে না।

(৪) পরকালের ভয় হইতে আল্লাহ তাহাকে নির্ভয়, নিরাপত্তা ও শান্তি দেন।

এই সকল বস্তু ইহারা দুনিয়াতে লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা ইহাদের সম্বন্ধে বলেন, এইসব লোকের নিকট ফিরেশতাগণ আসিয়া বলেন, তোমরা চিন্তা করিও না, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ। কেননা তোমাদেরকে এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

তাওবাহ সম্পর্কে বোযর্গদের বাণী

আবু আলী দাক্কাক বলেন, তাওবাহ তিন প্রকার। প্রথমঃ পাপকার্য হইতে বিরত থাকা। দ্বিতীয় ইবাদাতে মনোযোগী হওয়া এবং তৃতীয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করিয়া পাপ না করে, সে তাওবাহকারী। আর যে ব্যক্তি ছওয়াবের জন্য ও শাস্তির ভয়ে তাওবাহ করে সে ছাহেবে আনাবাত। যে ব্যক্তি শাস্তির ভয়ে এবং পুণ্যের আশায় ও তিরস্কারের ভয়ে তাওবাহ না করিয়া শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে তাওবাহ করে সে ছাহেবে আদাবাত। বোযর্গ লোকগণ ইহাও বলেন যে, তাওবাহ করা সাধারণ মু'মিনের তরীকা। আল্লাহ বলেন, হে মু'মিন ব্যক্তিগণ! তোমরা সকলে তাওবাহ কর, মুক্তি পাইবে। রুজু বা প্রত্যাবর্তন করা তাঁহার প্রিয় আউলিয়াদের সিফাত বা গুণ সদৃশ। আদাবাতের সিফাত পয়গম্বরদের জন্য। জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, তাওবাহর অর্থ তিনটি। যথা ঃ

(১) কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া।

(২) যে পাপ না করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করিয়াছেন, উহা হইতে বিরত থাকার এবং উহা না করার নিয়ত করা।

(৩) যে অত্যাচার করা হইয়াছে, উহার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টায় থাকা।

সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতর বলেন, শীঘ্র পাপ পরিত্যাগ করার নামই তাওবাহ।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন যে, আমি কখনও বলি নাই যে, হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট তাওবাহর দরখাস্ত করিয়াছি; বরং বলিয়াছি যে, হে মাবুদ! তুমি আমার মধ্যে তাওবাহ করার

প্রেরণা জাগ্রত করিয়া দাও। হযরত জুনায়েদ (রহঃ) আরও বলেন, আমি একদিন হযরত সাররি সাকতী (রহঃ)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম, তাহার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশের বিবর্ণ। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এক যুবক আমাকে তাওবাহর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, তাওবাহর অর্থ কৃতপাপ ভুলিয়া না যাওয়া। যুবক বলিল, না, তাওবাহর অর্থ কৃত পাপ ভুলিয়া যাওয়া। আমি বলিলাম, তোমার কথাই ঠিক। সে বলিল, তাহার প্রমাণ? আমি বলিলাম, মানুষ যখন দুঃখের ভিতরে সুখের নাগাল পায়, তখন দুঃখের কথা স্মরণ করা অত্যাচারের শামিল। যুবক আমার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, তাওবাহর অর্থ পাপ ভুলিয়া না যাওয়া। জুনায়েদের (রহঃ) কাছে কেহ তাওবাহর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কৃতপাপ ভুলিয়া যাওয়া। হযরত যুননূন মিসরী (রহঃ) বলেন, আলেমদের তাওবাহ হইল পাপ হইতে এবং বিশিষ্ট লোকদের তাওবাহ হইল, আলস্য হইতে বিরত থাকা। আবুল হাসান নূরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ হইতে যাবতীয় কিছুর সম্পর্ক পরিত্যাগ করার নামই তাওবাহ। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, তাওবাহকারী তিন প্রকার। যথা ঃ (১) পাপ হইতে তাওবাহ করা (২) আলস্য হইতে তাওবাহ করা এবং (৩) পুণ্য দেখা হইতে তাওবাহ করা। এই তিন ধরনের তাওবাহর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

আবুবকর ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন প্রকার পাপের চিহ্ন না থাকাই খালেছ তাওবাহ। খালেছ তাওবাহকারী বলিতে পারে না যে, কিভাবে তাহার দিন-রাত্র অতিবাহিত হয়। হযরত যুননূন মিসরী (রহঃ) বলেন, অন্তর হইতে পাপের বীজ না উঠাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাওবাহকারী মিথ্যাবাদী। তিনি আরও বলেন যে, দুনিয়া বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিকট সংকীর্ণ মনে হইবে, মনে হইবে যে, কোথাও যেন আরামের স্থান নাই। তোমার নফসও তোমার জন্য সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। আল্লাহ বলেন, দুনিয়া বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাহার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কোনখানে গিয়াই আল্লাহর শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে না। শান্তি শুধু আল্লাহর নিকটে। এই জন্যই আল্লাহ তাহার প্রতি মেহেরবান এবং সে তাওবাহ করিয়াছে।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রাজী (রহঃ) বলেন, তাওবাহ করার পরে একটি পাপ করা তাওবাহ করার পূর্বের সত্তরটি পাপ করার সমতুল্য। আবু ওমর ইনতাকী (রহঃ) বলেন, উজীর আলী ইবনে ঈসা এক সৈন্যবাহিনীর সাথে কোথাও যাইতেছিলেন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? রাস্তায় একজন মহিলা ছিল, সে বলিল, ইহার সম্বন্ধে আর কত জিজ্ঞাসা করিবে? সে আল্লাহর জনৈক বান্দা, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। তোমরা তাহাকে যে অবস্থায় দেখিতেছ, আল্লাহ তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াছেন। আলী ইবনে ঈসা এই কথা শুনিতে পাইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন এবং ওজারতে ইস্তেফা দিয়া মক্কা শরীফ চলিয়া গেলেন এবং আল্লাহর ঘরের খাদেম নিযুক্ত হইলেন।

কতিপয় পাপ হইতে তাওবাহ করা

যদি কেহ মনে করে যে, সকল পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তবে কবীরাহ গুনাহ হইতেই তাওবাহ করিবে। কেননা, কবীরাহ গুনাহ আল্লাহর নিকট অতি গর্হিত। উহাতে আল্লাহর ক্রোধ বর্দ্ধিত হয় এবং শাস্তি অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে ছগীরাহ গুনাহ ততটা গর্হিত নহে। উহার জঘন্যতা অনেক কম। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই ছগীরাহ গুনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন।

অতএব শুধু কবীরাহ গুনাহ হইতে তাওবাহ করা ততটা অসুবিধাজনক নয়। কবীরাহ গুনাহ হইতে তাওবাহকারীর ঈমান, ইয়াকীন এবং অন্তর শক্তিশালী হয় এবং হেদায়েতের নূর তাহার অন্তরকে আলোকিত করিয়া তোলে। আল্লাহর যিকিরের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য তাহার বক্ষদেশ প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে ছগীরাহ গুনাহ ইচ্ছাকৃত ভাবেই চলিয়া যায়। পাপের সূক্ষ্মতা, অন্তরে পাপের অবস্থান এবং গুপ্ত শিরক সব কিছুই দূর হইয়া যায়। পরে সে এমন কাজ করে, যাহা তাহার জন্য উপযুক্ত ও শোভনীয় এবং অনুপযুক্ত ও অশোভনীয় কাজগুলিকে সে পরিত্যাগ করে। এই জন্যই কবীরাহ গুনাহসমূহ প্রথমে পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর নিকট তাওবাহ করিবে, ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অতঃপর যত শীঘ্র সম্ভব অন্যান্য ছগীরাহ গুনাহসমূহ হইতে তাওবাহ করিবে।

আল্লাহর পবিত্র বাণী

ان اكرمكم عندالله اتقاكم *

(ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম)

এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত (প্রিয়) ব্যক্তি।

পরহেজগার শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন ওলামা বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) কোরআনে পাকের একটি আয়াত দ্বারাই পরহেজগারীর অর্থ করিয়াছেন। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে ন্যায়পরায়ণ এবং পরোপকারী হওয়ার নির্দেশ দান করিয়াছেন।' আরও আদেশ করিয়াছেন, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে দান বখশিশ কর। লজ্জাহীনতা, অবাধ্যতা এবং কুকথা বলা হইতে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছেন, হয়ত তোমরা উপদেশ শুনিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শিরক, কবীরাহ গুনাহ এবং লজ্জাহীনতা হইতে বাঁচিয়া থাকে সে-ই পরহেজগার। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে না করাই পরহেজগারী। হাসান (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যকে দেখিয়া বলে, সে আমার চাইতে ভাল, সে-ই পরহেজগার। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার কা'আব ইবনে আহবারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখনও কি কন্টকপূর্ণ পথে চলিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ চলিয়াছি। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে চলিয়াছেন? কাপড় ছিঁড়িবার ভয়ে কাপড় খুব উপরে তুলিয়া চলিয়াছি। কা'আব ইবনে আহবার বলিলেন, পরহেজগারীর অবস্থাও তদ্রূপ। এক শায়ের বলিয়াছেন, ছোট-বড় পাপ হইতে দূরে থাকাই পরহেজগারী। যেমন কন্টকময় পথে চলাকালীন পথিক ভয় করে, তুমিও দুনিয়ার সব কিছুকে ভয় কর। ছোট পাপ (গুনাহ ছগীরাহ)-কে অবহেলা করিও না। কেননা, ছোট ছোট কঙ্করের সমষ্টিতেই পাহাড় সৃষ্টি হয়।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, দিনের রোযা ও রাতের নামাযই পরহেজগারী নয়; বরং আল্লাহকৃত হারামকে বর্জন করা ও ফরজকে যথাযথভাবে আদায় করাই পরহেজগারী।

তলব ইবনে হাবীবকে লোকগণ বলিল, পরহেজগারীর পূর্ণ ব্যাখ্যা কি? তিনি জবাবে বলিলেন, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করাই পরহেজগারী। সাথে সাথে আল্লাহর নিকট পুণ্যের আশা করিতে এবং অন্তরে লজ্জিত হইতে হইবে। বকর ইবনে ওবায়দুল্লাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের অন্তর পানাহারের হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু হইতে পবিত্র না হয় এবং অযথা ক্রোধান্বিত হওয়া হইতে বিরত থাকিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরহেজগার হইতে পারে না।

শহর ইবনে খোশাদ বলেন, যে কাজে কোন পাপ নাই অথচ করিলে কোন পাপ হইতে পারে, এই সন্দেহে সেই কাজ পরিত্যাগ করাই পরহেজগারী।

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) এবং হযরত ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে, অন্যের জন্য তাহা পছন্দ করাই পরহেজগারী। অন্যের জন্য বেশী পছন্দ করাকে পূর্ণ পরহেজগারী বলা হয়।

তাঁহারা আরও বলেন, শায়েখ হযরত সাররি সাকতী (রহঃ) কি করিয়াছিলেন জান কি? একবার তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি রাগতঃভাবে তাহার সালামের উত্তর দিলেন। রাগ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমি অবগত হইয়াছি সালামদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা একশত রহমত ভাগ করিয়া দেন। সালামদাতা যদি আগ্রহের সাথে সালাম দেয়, তবে তাহাকে নব্বইটি রহমত এবং গ্রহীতা যদি অসন্তুষ্টভাবে জবাব দেয়, তবে তাহাকে দশটি রহমত দান করা হয়। সালামদাতা নব্বই রহমতের ভাগী হউক, এই আশায়ই আমি বদমেজাজী হইয়া সালামের উত্তর দিয়াছি।

মুহাম্মদ ইবনে আবি তিরমিজী (রহঃ) বলেন, যাহার কোন শত্রু নাই, তিনি পরহেজগার। হযরত সাররি সাকতী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নফসের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে-ই পরহেজগার। হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকে ভয় করে না, সে-ই পরহেজগার। অন্য দরবেশ বলেন, হে লোক সকল! স্মরণ রাখিও, আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুই মিথ্যা। মুহাম্মদ ইবনে হানীফ (রহঃ) বলেন, যে বস্তু আল্লাহ হইতে দূরে রাখে, তাহা হইতে দূরে থাকাই পরহেজগারী। কাসেম ইবনে কাসেম (রহঃ) বলেন, শরীয়তের আদব রক্ষা করিয়া চলাই হইল পরহেজগারী। আবু ইয়াজিদ বলেন, বিশ্বাস এবং কথার সন্দেহ হইতে বাঁচিয়া থাকাই হইল পরহেজাগারী। যখন কথা বলিবে, আল্লাহর ওয়াস্তে বলিবে, চুপ থাকিলে আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকিবে এবং যিকির করিলে আল্লাহর ওয়াস্তেই করিবে।

ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রু তোমার নিকট বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার পাওয়ার আশা করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরহেজগার নও। সহল বলেন, পাপ হউক কিংবা পুণ্য আল্লাহর সাহায্য লইয়া করাই পরহেজগারী। তিনি আরও বলেন, যে স্থানে যাইতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে না যাওয়া এবং যেখানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, সেখান হইতে অনুপস্থিত না থাকার নামই পরহেজগারী। তিনি আরও বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করাই পরহেজগারী।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, পরহেজগারীর চিহ্ন তিনটি যথা ঃ (১) যে বস্তু না পাওয়া যায় উহার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা, (২) যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা (৩) আর যাহা হারাইয়া যায় তজ্জন্য ধৈর্যাবলম্বন করা।

মালেক (রহঃ) বলেন, ওয়াহাব ইবনে কীসান আমার নিকট বলিয়াছেন, মদীনার কতিপয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-কে বলিলেন, বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা, নিয়ামত লাভে শোকর আদায় করা এবং কোরআনের আদেশানুযায়ী চলা পরহেজগারীর লক্ষণ।

মুজাহিদ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তিনিই সকল নেকীর কেন্দ্রস্থল। জিহাদ কর। কেননা জিহাদ ইসলামের বৈরাগ্য। আল্লাহকে স্মরণ কর। কেননা উহা তোমার জন্য নূর সদৃশ।

হযরত কাত্তানী (রহঃ) বলেন, দুনিয়া পরীক্ষা এবং কষ্টের জন্য ভাগ করা হইয়াছে এবং বেহেশত পরহেজগারীর জন্য বন্টিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার নিজের এবং আল্লাহর মধ্যে পরহেজগারী ও সুচিন্তিতভাবে কাজ না করে, তাহার ভাগ্যে কাশফ ও মুজাহাদাহ হয় না।

আবু আবদুল্লাহ রুদবারী (রহঃ) বলেন, যে কাজ আল্লাহ হইতে দূরে রাখে, তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকার নামই পরহেজগারী। হযরত যুননূন মিসরী (রহঃ) বলেন, যাহারা পরহেজগারীর প্রত্যাশী এবং আল্লাহর যিকিরে সন্তুষ্ট, তাহাদের সাথে উঠা-বসা করাই কল্যাণকর।

ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন, নিজের পরহেজগারীর ধোকায় না পড়াই পরহেজগারী। অর্থাৎ নিজে পরহেজগার, এই কথা মনে ঠাঁই দিবে না। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ) চল্লিশ মটকা ঘি ক্রয় করিলেন। তাঁহার গোলাম একটি মটকা হইতে একটি মৃত ইঁদুর বাহির করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন মটকা হইতে ইহা বাহির করিয়াছ? গোলাম বলিল, তাহাতো ঠিক রাখি নাই। ইবনে সীরীন (রহঃ) সমস্ত ঘি ফেলিয়া দিতে নির্দেশ করিলেন। কোন কোন ইমাম বলেন, ইবনে সীরীন এমন কোন ব্যক্তির গাছের ছায়ার নীচে বসিতেন না, যাহারা তাহার নিকট হইতে টাকা ধার লইত। হাদীসে আছে, কর্জদারের নিকট হইতে কোন প্রকার উপকৃত হওয়া সুদ গ্রহণ করার তুল্য।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, আমি একদিন বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি পাথরের পাশে শয়ন করিয়াছিলাম। রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হইলে দুইজন ফিরেশতা আগমন করিলেন। তাঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? দ্বিতীয়জন উত্তর করিলেন, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম। আল্লাহ তাঁহার একটি মর্যাদা কমাইয়া দিয়াছেন। প্রথম ফিরেশতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? দ্বিতীয় ফিরেশতা বলিলেন, ইনি বছরা হইতে খেজুর খরিদ করার সময়ে দোকানদারের একটি খেজুর তাহার খেজুরের সাথে মিলিত হইয়া গিয়াছিল।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি বছরা গেলাম এবং দোকানদারের খেজুরটি তাহাকে ফেরত দিয়া আবার বাইতুল মুকাদ্দাস চলিয়া আসিলাম এবং উল্লিখিত পাথরের কাছে শয়ন করিলাম। রাত কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পর দুইজন ফিরেশতা আগমন করিলেন। তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? দ্বিতীয়জন বলিলেন, ইনি ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)। তিনি একটি খেজুর দোকানদারকে (উহার মালিককে) ফিরাইয়া দেওয়াতে আল্লাহ তাঁহাকে আবার মর্যাদাসম্পন্ন করিয়াছেন।

কোন কোন বোযর্গ বলেন, পরহেজগারী কয়েক প্রকার। আল্লাহর সাথে শরীক না করা সাধারণ লোকের পরহেজগারী। নফসের তাড়নায় যে পাপ করা হয়, উহা না করা এবং নফসের বিরোধিতা করা বিশেষ (খাস) লোকের পরহেজগারী। আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আসক্ত না হওয়া অতি বিশেষ লোকের পরহেজগারী। আর নবী-রাসূলদের পরহেজগারী এক গুপ্ত বা অদৃশ্য রহস্য এবং তাহা আল্লাহর তরফ হইতে হইয়া থাকে।

পরহেজগারী লাভের প্রাথমিক অবস্থা

পরহেজগারী হাসিলের প্রাথমিক অবস্থা হইল, যাহাদের উপর কোন রকমের জুলুম-উৎপীড়ন করা হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করা। তারপর যাহাদের হক-হুকুক নষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের সে সকল হক আদায় করিয়া দেওয়া। তারপর সমস্ত গুনাহ ছগীরাহ ও কবীরাহ হইতে পরহেজ করা। অতঃপর অন্তঃকরণের গুনাহসমূহ হইতে পবিত্র হওয়া। কেননা স্মরণ রাখিবে, অন্তঃকরণের পাপই হইল প্রকাশ্য সকল গুনাহর উৎসমূল এবং ভিত্তি। অন্তঃকরণের পাপগুলি এই, যেমন ঃ রিয়া, নেফাক, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, লোভ-লালসা, পার্থিব মোহ, মান-সম্মান লাভের স্পৃহা ইত্যাদি। এই সকল গুনাহ বর্জনের ক্ষমতা প্রবৃত্তির কামনার সাথে বিরোধিতার দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আর এক অবস্থা হইল, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বিপরীত যে কোন কিছুকে পছন্দ না করা এবং আল্লাহ পাকের ব্যবস্থার সাথে অন্য কোন ব্যবস্থার সংযোগ না করা এবং আল্লাহর ব্যবস্থার উপরে অন্য কোন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য না দেওয়া। নিজের রুজী রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উসিলা বা উপায়ের মুখাপেক্ষী না হওয়া। মাখলুকের এন্তেজামের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের উপরে কোনরূপ প্রতিবাদ, দ্বিমত প্রকাশ না করা। আর যে কোন বিষয়কে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগত ও হুকুমবরদার হইয়া যাওয়া। নিজেকে পুরাপুরিভাবে আল্লাহর হাওয়ালায় সমর্পণ করিয়া দেওয়া এবং আল্লাহর কুদরতের হাতে নিজেকে এইভাবে সোপর্দ করা, যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু তাহার মাতৃক্রোড়ে নিজেকে সোপর্দ করিয়া দেয়। বান্দার নাজাত অর্থাৎ মুক্তিলাভ শুধু এই উপায় অবলম্বনের মধ্যে নিহিত।

মুক্তি লাভের পন্থা

বান্দার নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্তি সম্পর্কে বোযর্গানে দ্বীন বিভিন্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; যথাঃ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, যতলোক নাজাত লাভ করিয়াছে, খাঁটি ও অকপট অন্তরে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাহারই নাজাত নছীব হয় নাই।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, যাহারাই নাজাত পাইয়াছে, সত্য ও পবিত্রতা এবং পরহেজগারী ছাড়া কাহারই নাজাত হাসিল হয় নাই। যেমন আল্লাহ বলেন, আল্লাহ পরহেজগারদিগকে সাফল্যের সহিত মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

হযরত হারীরী (রহঃ) বলেন, কেহই তাহার ওয়াদা পূরণ করা ব্যতিরেকে নাজাত পাইতে পারে না।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, লজ্জাশীল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই নাজাত পায় না।

কোন কোন মশহুর এবং প্রধান মাশায়েখ বলেন যে, আল্লাহর মর্জী এবং হুকুম ব্যতীত কাহারই নাজাত হাসিল হয় না।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বিষয়বস্তু হইতে বিমুখ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নাজাত লাভ করে না।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও ধমকীসুলভ বাণীসমূহ

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে একদিকে যেমন ছওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন আবার শাস্তি এবং কঠোরতার ধমকিও প্রদান করিয়াছেন। সাথে সাথে তিনি কোরআনে পাকে সেই সকল কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে বান্দা তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ ওজরাপত্তি পেশ করিতে না পারে। যেমন তিনি কোরআনে পাকের এক স্থানে বলিয়াছেন, 'আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করিয়াছি যাহারা বনি আদমকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়াছে এবং দোজখের ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। যাহাতে তাহারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ কিংবা ওজরাপত্তি পেশ করিতে না পারে।

আল্লাহ বলেন, যদি আমি পয়গম্বর পাঠাইবার পূর্বেই তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে উহারা রোজ কিয়ামতে এই অভিযোগ তুলিতে পারিত যে, হে পরোয়ারদেগার! তুমি আমাদের কাছে পয়গম্বর কেন পাঠাইলে না? তাহা হইলে তো আমরা এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্তির আগে তোমার আদেশ পালন করিতাম।

এক জায়গায় আল্লাহ বলেন, হে মানবগণ! নিশ্চয় তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের জন্য নসীহত এবং শেফা (আরোগ্য) ও মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত (অনুগ্রহ) আসিয়াছে।

অন্য স্থানে আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আযাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর বড়ই করুণাময়।

অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন, তোমরা জানিয়া রাখ, তোমাদের মনের ভিতরে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই আল্লাহ জানেন। অতএব তাঁহাকে ভয় করিয়া চল।

আল্লাহ পাক আরও বলেন, জানিয়া রাখ, আল্লাহ সব কিছুরই খবর রাখেন।

তিনি আরও বলেন, হে জ্ঞানবান লোকগণ! তোমরা আমাকে ডরাইয়া চল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, তোমরা সেই দিনটিকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিবে। সেদিন তোমাদের আত্মা যাহা কামাই করিয়াছে, তাহার বিনিময় দেওয়া হইবে। কিন্তু আত্মার উপরে জুলুম করা হইবে না। আর তোমরা সেই দিনটিকে ভয় কর, যেদিন কেহ কাহারো কোনরূপ উপকারে আসিবে না।

আর একস্থানে আল্লাহ বলেন, হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা পুত্রের মুক্তি সাধন করিতে পারিবে না, পুত্র পিতার মুক্তি সাধনে সক্ষম হইবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি খাঁটি ও সত্য। অতএব তোমরা পার্থিব জিন্দিগীর দ্বারা প্রতারিত হইও না এবং শয়তানও যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোকা দিতে না পারে।

আল্লাহ পাক আরও বলেন, হে মানব! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে দুই (আদি) ব্যক্তি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর ঐ দুই জন হইতে অসংখ্য পুরুষ ও রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ বলেন, তোমরা হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও সত্য কথা বল।

আল্লাহ বলেন, আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সর্ব কর্মের খবর রাখেন।

আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হইতে বাঁচাও যাহার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর।

আল্লাহ বলেন, তোমরা কি ধারণা করিতেছ আমি তোমাদের উদ্দেশ্য বিহীনভাবে পয়দা করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবৃত হইবে না?

হে অসহায় মানব! তোমরা উল্লিখিত আয়াতসমূহ তো দেখিলে ও শুনিলে। বলতো এই সম্পর্কে তোমাদের কি বলিবার আছে! বলতো আর এ ব্যাপারে তোমরা কি আমলই বা করিতেছ? এখনও কি তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তির লজ্জা হইতে ছুটিয়া আসিবে না? জানিও, তোমাদের কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপবিত্র এবং তোমাদের ধ্বংসের কারণ। উহা তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই সর্বনাশ করিবে। উহা তোমাদেরকে এমন স্থানে নিয়া পৌঁছাইয়া দিবে যথাকার ভীষণ আগুন তোমাদেরকে দগ্ধীভূত করিবে, সর্প ও বিচ্ছু তোমাদেরকে দংশন করিবে, বিভিন্ন কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ নানারূপ কষ্ট ও ক্লেশ প্রদান করিতে থাকিবে। যথাকার কীট-পতঙ্গ তোমাদেরকে কাটিতে থাকিবে। যথাকার ফিরেশতাগণ তোমাদেরকে নানা ভাবে শাস্তি প্রদান এবং প্রহার করিতে থাকিবে। যেখানে হামান, কারুন, ফিরআউন ও নমরূদ থাকিবে, তোমরাও সেখানে থাকিয়া তাহাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার কঠোর হইতে কঠোরতর আযাবসমূহ ভোগ করিতে থাকিবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسوك فعدلك *

উচ্চারণ ঃ মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীমিল্লাযী খালাক্বাকা ফা সাওয়্যাকা ফা আদালাক।

অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! সেই পরম করুণাময় আল্লাহর সম্পর্কে তোমাদের কিসে বিভ্রান্ত করিল, যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তোমরা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছ। তোমাদের জীবন দান করিয়াছেন। তোমাদের কিছুই ছিল না, তোমাদেরকে সম্পদ দান করিয়াছেন, ছিলে তোমরা দুর্বল ও অসহায়। তোমাদেরকে সামর্থ্যবান করিয়াছেন। তোমরা চক্ষুহীন ও জ্ঞানান্ধ ছিলে, তোমাদেরকে চক্ষু এবং জ্ঞান-বিচক্ষণতা দান করিয়াছেন। তোমরা মূর্খ ছিলে, তোমাদেরকে এলম শিক্ষাদান করিয়াছেন। তোমরা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিলে, তোমাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন। অতএব এই বিরাট অনুগ্রহ ও অবদান লাভের পর কি তোমাদের কোনরূপ সেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা সাজে? মূলে তো তাঁহার ইবাদাতই তোমাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানিত ও আখেরাতে মহাসৌভাগ্য দান করিবে এবং তোমাদের উচ্চ মর্যাদাকে উচ্চতর করিয়া দিবে। ইহার পরেও কি তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে পছন্দ করিবে, উত্তম

বদলে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে? দুনিয়া ও দুনিয়ার বিষয়বস্তু, উহার বাহ্যিক চাকচিক্য একেবারেই ক্ষণস্থায়ী, সেইসব বস্তুকে স্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতের অপূর্ব নিয়ামতরাজি এবং ম্বর, সিদ্দীক ও শোহাদাদের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের উপরে গুরুত্ব প্রদান করিবে? তোমরা আল্লাহ এই আয়াতটি কখনও শ্রবণ কর নাই? যথাঃ

بـل تـؤثـرون الـحيـوة الـدنـيـا - والاخرة خيـر وابـقـى *

চারণ ঃ বাল তু'ছিরূনাল হাইয়াতাদ্দুনইয়া অল আখিরাতু খাইরুও অ আবক্বা।

র্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করিতেছ। অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী।

লৌকিক জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য বান্দাকে ইহলৌকিক জীবনেই চেষ্টা ও সাধনায় নিয়োগ করিতে হইবে। আর তাহাতে যদি অবহেলা করা হয় তাহা হইলে কল্যাণ ও মঙ্গলের বর্তে চরম অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের বোঝা তাহার মাথায় চাপিয়া বসিবে।

বলা বাহুল্য যে, পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ এবং মঙ্গল লাভের অর্থ বেহেশ্ত নছীব এবং লৌকিক জীবনের অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের অর্থ দোজখ নছীব। স্মরণ রাখার কথা যে, সেই হেশ্ত এবং দোজখের জীবন হইবে চিরস্থায়ী। বেহেশত এবং দোজখে যাওয়ার পরে আর কাহারও নদিন মৃত্যু হইবে না। যাহারা বেহেশ্তী হইবে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া বেহেশ্তের সুখ-শান্তি এবং নিয়ামতরাজি ভোগ করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যাহারা দোজখী হইবে, তাহারা ন্তকালব্যাপী দোজখের ভীষণ আযাব ভোগ করিয়া যাইতে থাকিবে। এই দুঃখময় জীবনের নদিন আর অবসান হইবে না। এইবার আমরা এখানে সেই বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ লোচনা করিব।

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেহেশ্‌ত ও দোজখ

স্মরণ রাখিবে, দোজখে যাওয়ার কারণ হইল কুফরী। (অবশ্য ছোট-বড় গুনাহর কারণেও দোজখে যাইতে হইবে) তবে গুনাহ বা পাপের মাত্রা অনুসারে দোজখে প্রবেশ এবং উহার শাস্তি সাময়িক এবং কম-বেশী হইবে।

আর বেহেশত লাভের উপলক্ষ হইল ঈমান। ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান স্থান ও উহার অসংখ্য নিয়ামত লাভ করা পুণ্যের আধিক্য এবং সৎ স্বভাবের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদেরকে নিত্য দেওয়ার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দ্বারা বেহেশ্‌ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। একইভাবে পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দোজখ সৃষ্টি করতঃ উহাতে নানা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঠিক তেমনি ভাবেই আবার আল্লাহ নিজের বান্দাগণকে পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়া সৃষ্টি করিয়া ইহাকে নানাবিধ নিয়ামত এবং বিপদাপদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অবশ্য বেহেশত ও দোজখ এখনও পর্দার আড়ালে বা মানব চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। কোন মানবই ইহা চোখে দেখে নাই। দুনিয়ার ঐ কৃত্রিম নিয়ামত এবং বিপদাপদসমূহ পরকালের নিয়ামত এবং বিপদের সামান্য নমুনা মাত্র, যাহা এখানে মানুষ উপভোগ করিতেছে।

সবার উপরে শাহানশাহ আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বাদশাহ বানাইয়া দিয়াছেন। যে বাদশাহগণ অন্যান্য সাধারণ লোকদের উপরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের ভয়ে প্রজাদের অন্তর থর থর করিয়া কম্পিত। বাদশাহগণ প্রজাদের জান ও মালের উপর শাসন চালান। ইহা সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, তাঁহার হুকুমত এবং তাঁহার আদেশ ও নিষেধের নমুনা মাত্র। আল্লাহ তাঁহার হুকুমত, সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি পরিচালন ব্যবস্থা এবং তাঁহার গুণাবলী এই পার্থিব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ বলে ঐ জিনিসকে, যাহা তুমি দেখ নাই, তাহার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু তোমাকে এমন ভাবে দেখানো হয় যাহা উহার অনুরূপ। যাহা দেখিয়া তুমি তোমার না দেখা আসল বস্তুর দিকে তোমার জ্ঞানকে ধাবিত করিতে পার। একইরূপ দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত বেহেশতের নিয়ামতের নমুনা বা উদাহরণ মাত্র। অবশ্য ইহা ছাড়া বেহেশতে এমন বস্তুও আছে, দুনিয়ায় যাহার কোন নমুনা বা উদাহরণ নাই। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই বা কাহারও ধারণা নাই। সেই সব শ্রেষ্ঠতম নিয়ামতের নাম-পরিচয় বলিয়াও কোন লাভ নাই। কেননা তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। কারণ উহার কোন উদাহরণ নাই।

বেহেশতের স্তর একশতটি। উহার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নূর এই তিনটি স্তরের উল্লেখ দেখা যায়। বাকীগুলির উল্লেখ নাই এবং তদসম্বন্ধে মানুষ কোন ধারণাও করিতে পারে না। তবুও সত্যি যে, পার্থিব শান্তি পারলৌকিক শান্তির নমুনা বা উদাহরণ মাত্র। ইহা ছাড়া অন্য যে সব শান্তি আছে তাহা কল্পনাতীত। উহার তুলনায় বেহেশতের অন্যান্য নিয়ামত অতি সাধারণ। বেহেশতের আনন্দ, নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে হালাল দ্রব্য আহারকারীরা প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং হারাম দ্রব্য আহারকারী, বেহেশ্‌ত ও বেহেশতের নিয়ামতে অবিশ্বাসী তাহারা কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। বেহেশত তাহাদের জন্য হারাম। কখনও বেহেশতবাসীদের জন্য বৈবাহিক আমোদ-প্রমোদ, ভোজ এবং মেহমানদারী হইবে। আল্লাহ যে সকল মুসলমানকে বেহেশতে স্থান দান করিবেন, তাহাদিগকে চিরযৌবন এবং স্থায়ী আয়ু দান করিবেন। অর্থাৎ তাহাদের আর মৃত্যু হইবে না, যৌবনে কোন দিন ভাটা লাগিবে না। বেহেশতের রমণীদের সাথে তাহারা পানাহার এবং গল্পগুজব করিবে। তাহাদের জন্য বেহেশতে সেই সব শান্তি আনন্দ-উপভোগের স্থানসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। তুবা বৃক্ষের ছায়ায় সকলে সমবেত হইবে। কেননা এখানে তাহারা বেহেশতী নারীদের দর্শন লাভ করিয়া মনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। এখানে ফিরেশতাদেরও সম্মেলন হইবে। তাহাদের উপর আল্লাহর শান্তি অবতীর্ণ হউক।

বেহেশতীদের আনন্দ উপভোগের জন্য তথায় বাজার থাকিবে। নামাযের সময়সমূহে আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের নিকট আনন্দদায়ক এবং অনুপম উপঢৌকনসমূহ আসিতে থাকিবে। সর্বদা বিভিন্ন রকমের পানাহারের বস্তু এবং নানা প্রকার ফল-ফলাদি তাহাদের নিকট মৌজুদ থাকিবে। আল্লাহর রিযিক কখনও শেষ হইবে না; বরং ক্রমান্বয়ে উহার পরিমাণ এবং স্বাদ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। প্রথম বার আহারের সময়ের স্বাদ দ্বিতীয়বার আহারের সময় ভুলিয়া যাইবে এবং আবার অভিনব স্বাদ অনুভূত হইবে। বেহেশতীদের জন্য ভ্রমণ স্থান থাকিবে, উহাতে তাহারা কাওছার নামক ঝর্ণাতীরে ভ্রমণ করিবে। সেখানে তাঁবু থাকিবে। প্রত্যেকটি তাঁবুর প্রস্থ থাকিবে ষাট মাইল। সেই তাঁবুর তুলনা স্বরূপ মোতির সহিত দেওয়া যায় যাহার ভিতরে প্রবেশ-পথ নাই। উক্ত দরজাবিহীন তাঁবুর মধ্যে পরিচারিকা থাকিবে। কোন ফিরেশতা বা বেহেশতী খাদেমও তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। আল্লাহ বলেন, উহার ভিতরে সৌন্দর্যময়ী ও সচ্চরিত্রা রমণীগণ রহিয়াছে। আল্লাহ স্বয়ং তাহাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন। অন্যের সাধ্য কি যে, উহার চেয়ে বেশী তাহাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে। অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, এই সকল হুরকে তাঁবুতে ছুপাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা আল্লাহর মনোনীত। ইহাদের আকৃতি অতি লাবণ্যময় এবং পবিত্রতাময়। ইহাদিগকে রহমতের মেঘ হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যখন সেই মেঘমালা হইতে বারিধারা পতিত হয়, তখন পানির বদলে লাবণ্যময়ী পরিচারিকা ও হুর বর্ষিত হয়। উহারা আরশের নূর দ্বারা তৈরী এবং তাহাদিগকে রাখা হইয়াছে সকলের চোখের আড়ালে তাঁবুর মধ্যে। সৃষ্টির পর হইতে তাহারা কাহাকেও দেখে নাই। তাহারা ঐ সমস্ত মোতির তাঁবুতে আবদ্ধ। তাহাদের স্বামীগণই তাহাদিগকে প্রথম দেখিবে। বেহেশতীগণ বিরাট প্রাসাদে তাহাদের বিবিগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা বেহেশতের নিয়ামতে বেহেশতীরা বিভোর থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ যখন তদপেক্ষাও অধিক মর্যাদা দানের ইচ্ছা করিবেন, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে আবার নব নিয়ামত দান করিবেন। তাহারা শোকরিয়া আদায় করিবে। বেহেশতের দরজা হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, হে বেহেশতীগণ! আজ খুশী ও আনন্দের দিন। খুব আনন্দ কর, প্রাণ ভরিয়া ভোগ-উপভোগ কর। অতঃপর স্বীয় শান্তিনীড় হইতে বাহির হইয়া এই সবুজ ময়দানে বিচরণ কর। তাহারা তখন বাহির হইয়াই দেখিবে, ছঙ্গে মারওয়ারিদ ও ইয়াকুত দ্বারা সুসজ্জিত অশ্ব তাহাদের জন্য দরজায় অপেক্ষমান। তাহারা উক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া কাওছারের ফুলে-ফলে সজ্জিত বাগান এবং সবুজ শ্যামল প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে।

নানারূপ দৃশ্য ও উপভোগ্য বস্তুসমূহ দেখিবার পর আল্লাহ তাহাদিগকে ঐ সমস্ত তাঁবুর দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন যাহা তাহাদের উপঢৌকন এবং পুরস্কার হিসাবে তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা তাঁবুর পার্শ্বে গিয়া উহার ভিতরে প্রবেশ-পথ না পাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তখন আল্লাহ তাহাদের চোখের সামনে তাঁবুর দরজা খুলিয়া দিবেন। তাহাদের চোখের সামনে খোলার উদ্দেশ্য, এই সব মুমিনগণ যেন জানিতে পারে যে, এইসব তাঁবুর ভিতরের রমণীদের কথা কেহই জানে না। কাজেই তাহাদেরকে কাহারও পক্ষে দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহা ছাড়া মুমিনগণ ইহাও জানিতে পারিবে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ এই সুন্দরী হুরদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আজ আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলেন। আল্লাহ বলিয়াছেন যে, তোমাদের হুর স্ত্রীগণকে তাঁবুর মধ্যে রাখা হইয়াছে। ইহার পূর্বে কোন জ্বিন বা মানব ইহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

বেহেশতীগণ তাহাদের সৌন্দর্যময়ী স্ত্রীদিগকে সঙ্গে করিয়া সুসজ্জিত গৃহের তখতের উপর উপবেশন করিবে। তখন বিবাহ-ভোজের খাদ্য দ্রব্য তাহাদের সম্মুখে রাখা হইবে। তাহারা খুব আগ্রহ ও আনন্দময় পরিবেশে পানাহারে লিপ্ত হইবে। তাহারা শারাবান তাহুরা পান করিবে। বিভিন্ন প্রকারের ফল আহার করিবে। আল্লাহ তাহাদেরকে নূতন নূতন পুরস্কার দ্বারা মনোরঞ্জন করিবেন। তাহাদের দেহ নানা প্রকার মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করা হইবে। এইভাবে সুসজ্জিত সজ্জার পর তাহারা তাহাদের লাবণ্যময়ী স্ত্রীদের প্রতি মিলনাকাংখায় উদগ্রীব হইবে এবং বহুক্ষণ সুখ-সম্ভোগ করিবে।

তাহারা সহবাস-সুখ উপভোগ করিয়া ঝর্ণার তীরবর্তী বাগানে আয়োজিত জলসায় যাইবে। জলসায় নানা প্রকার কারুকার্য খচিত মূল্যবান রেশমী বস্ত্র বিছানো থাকিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সবুজ রংয়ের রফরফের উপর বালিশে হেলান দিয়া উপবেশন করিবে। তখন উহা উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে দোল খাইতে থাকিবে। বেহেশতী পুরুষ তাহাদের স্ত্রীদের সাথে এই দোলনায় দোল খাইবে এবং আনন্দ উপভোগ করিবে।

এই সময়ে হযরত ইস্রাফীল ফিরেশতা গান গাহিতে আরম্ভ করিবেন। হাদীসে আছে, আল্লাহ তাঁহার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে হযরত ইস্রাফীলকেই সর্বাধিক হৃদয়গ্রাহী এবং সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সপ্তাকাশের অধিবাসীগণ তাহাদের তাসবীহ-তাহলীল বন্ধ রাখিয়া সেই মনোমোহিনী গান শুনিতে মশগুল হইবে। আল্লাহর অলীগণ যখন রফরফে উপবেশন করিবেন, তখন হযরত ইস্রাফীল মহান প্রভুর স্তুতিগান আরও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী স্বরে গাহিতে থাকিবেন। বেহেশেতের যাবতীয় বৃক্ষও মনোযোগ সহকারে সে গান শ্রবণ করিবে এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে দুলিতে আরম্ভ করিবে। বেহেশেতের এমন কোন স্তর বা দ্বার বাকী থাকিবে না যাহা সে গানের ঝঙ্কার ও তালে তালে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না। প্রত্যেকটি স্তর হইতে নানা সুরের রাগ-রাগিনীর প্রতিধ্বনি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রত্যেক বাগান হইতে চিত্তহারিণী মিষ্টিস্বর ভাসিয়া আসিবে। বেহেশতের বাগ-বাগিচা হইতে বাঁশীর আওয়াজ বাতাসের সহিত চারিদিকে ভাসিয়া যাইবে। আবার এই রাগ-রাগিনীর মধ্যেই পৃথকভাবে শুনা যাইবে হুরদের প্রাণ চাঞ্চল্যকর সঙ্গীত লহরী। উপরন্তু পক্ষীকুল তাহাদের সুমিষ্ট সুরলহরী দ্বারা চারিদিক বিমোহিত করিবে।

এই সময়ে আল্লাহ ফিরেশতাদেরকে আদেশ করিবেন, আমার বান্দাদেরকে বলিয়া দাও যে, তোমরা দুনিয়াতে শয়তানের রাগ-রাগিনী শুনা হইতে নিজেদের কর্ণ পবিত্র রাখিয়াছিলে, এখন এই রাগ-রাগিনী উহারই পরিবর্তে শুনান হইতেছে। অতঃপর ফিরেশতাগণ মিষ্টিস্বরে ও আধ্যাত্মিক আওয়াজের সাথে সঙ্গীত শুরু করিবেন। তাহাদের সকলের কণ্ঠস্বর একত্রে মিলিত হইয়া বড় এক ধরনের সুরেলা আওয়াজে পরিণত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ)কে বলিবেন, ওহে দাউদ! আমার আরশের পায়ার নিকট দাঁড়াইয়া আমার মহত্ত্ব এবং গৌরবের সঙ্গীত গাহিতে থাক। হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আরশের পায়ার নিকট দাঁড়াইয়া আল্লাহর গৌরব-গাথা ও প্রশংসামূলক গান গাহিতে শুরু করিবেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর এত মিষ্টি হইবে যে, সেই স্বরের সামনে অন্যান্যদের সঙ্গীত লহরী নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

আল্লাহ বলেন ঃ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ফাহুম ফী রাওদ্বাতিই ইয়ুহ্‌বারূন।

'তাহারা সুসজ্জিত বাগিচায় থাকিবে।' ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর বলেন, যখন তাহারা বেহেশেতের বাগিচায় সুখ আস্বাদন করিতে থাকিবে তখন আল্লাহর আদেশে আদন নামক বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। সেই দ্বার দিয়া রূহানী লোকের আওয়াজ বাহির হইতে থাকিবে। বেহেশতীদের দরজা পর্যন্ত আদন বেহেশতের বাগিচার ফুলের গন্ধে বেহেশতীদের অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্ক সুবাসিত হইয়া যাইবে, মনোমুগ্ধকর মৃদুমলয়ে সকলের প্রাণ সতেজ এবং সজীব হইয়া উঠিবে।

তারপর একটি নূরের শিখা প্রকাশ পাইবে, উক্ত শিখার আলোকে সমস্ত বাগান ও স্রোতস্বিনী আলোময় হইয়া উঠিবে। সেই আলোর জ্যোতিতে আরশ হইতে ফরাশ পর্যন্ত সব কিছুই জ্যোতির্ময় হইয়া যাইবে। তখন এই প্রকার আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগকারীদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ বলিবেন, 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ হে খোদাপ্রেমিক অলী ও আল্লাহর দরবারে মনোনীত বেহেশতীগণ! তোমরা তোমাদের এই ক্রীড়াভূমিকে কেমনে পাইলে? তোমাদের ও আমার শত্রুগণ দুনিয়াতে যে অবৈধ আমোদ-প্রমোদ করিয়াছে, আর তোমরা উহাতে বিরত রহিয়াছ, সেই ধৈর্যের প্রতিদানই আজ তোমরা পাইতেছ। তাহারা তাহাদের দুর্ভাগ্যের দরুনই এই বিপদে জড়িত হইয়াছে

অদ্যকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।
আনন্দ এবং ব্যাবসায় বাণিজ্য তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। তাহাদের ধৈর্য ছিল না। যদি ধারণ করিত, তবে এই শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হইত না। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও -বাণিজ্যই তাহাদের এই ক্ষতির কারণ।
রা সত্যের অনুসারীদের বিরোধিতা ও বৈপরিত্যের ফলেই আজ এই শাস্তির কবলিত হইয়াছে। রা দুনিয়াবী নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছিল। দুনিয়াতে তাহারা যাহা কিছু য়াছিল, উহা হইতে আজ তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। উহার পরিবর্তে অসম্মান ও হীনতা জুটিয়াছে। ধৈর্য্যাবলম্বনকারী ও ইবাদাতকারীগণ বেহেশত লাভ করিয়াছে। বেহেশতের রেশমী াক এবং বেহেশতের ক্রীড়াভূমি পাইয়াছে। পরিশেষে আল্লাহ তাহাদেরকে সালাম জানাইয়া বেন, আজ তোমাদের জন্য মহা খুশী অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাতকারের দিন। আমার বেহেশত তোমাদের দর্শন এবং ক্রীড়ার স্থল। দুনিয়াতে বহুদিন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ রিয়াছি। কেননা, তোমরা সর্বদাই আমার ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিতে। আর অবাধ্য ও তগণ খেল-তামাশা ও পাপে নিমজ্জিত ছিল, তাই আজ তাহারা হয়রান ও দিশাহারা। ইহারা ন্যায় ও জুলুম অত্যাচার করিয়া আনন্দ লাভ করিত, আর তোমরা আমার সম্মানের প্রতি খেয়াল বিতে, আমার নির্দ্ধারিত সীমাকে তোমরা অতিক্রম করিতে না এবং আমার আদেশ-নিষেধ ারীতি পালন করিতে।
হেশতীদিগকে দেখানের উদ্দেশ্যে দোজখের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত দরজা দিয়া জ্বলিত অগ্নিশিখা এবং ধুম্র নির্গত হইতে থাকিবে। দোজখীদের কান্নাকাটি, অসহনীয় যন্ত্রণা হারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইবে। তাহারা নিজেদের বর্তমান অবস্থায় তো খুশী থাকিবেই, ধিকন্তু দোজখীদের ঘাড়ে বেরী ও তাহাদের বিভিন্ন আযাব দেখিয়অও খুশীর কারণ ঘটিবে, তখন হারা বলিবে, হায়! কত না ভাল হইয়াছে যে, আমরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানিয়া িয়াছিলাম। আবার যখন দোজখীগণ বেহেশতীদিগকে সবুজ রফরফের উপর আসীন দেখিবে, খন আর তাহাদের দুঃখ ও আফসুসের সীমা থাকিবে না। হিংসায় তাহাদের মর্মজ্বালা আরও ড়িয়া যাইবে। তাহার তখন তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতে বেহেশতীদিগকে অনুরোধ ও নুনয়-বিনয় করিতে থাকিবে।
ল্লাহ তায়ালা বলিবেন, বেহেশতীগণ আজ নিজেদের কর্মগুণে সুখী ও শান্তিলাভকারী। তাহারা এবং তাহাদের বিবিগণ বৃক্ষ ছায়ায় সুসজ্জিত বিছানায় অর্ধশায়িতাবস্থায় সমাসীন। বিভিন্ন ধরনের ফল ও বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামত তাহাদের সামনে হাজির। তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে হাদের উপর সালাম বা শান্তি। হে পাপীগণ! আজ তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া ও। হে বনি আদম! আমি কি তোমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি নাই যে তোমরা তানের পুজা করিবে না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরা শুধু আমার ইবাদাত কর। ইহাই তোমাদের জন্য একমাত্র পথ।
তঃপর হঠাৎ দোজখের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং কাফির মুশরেকদেরকে পৃথক করিয়া ফেলা হইবে। এ সময় তাহাদের কান্নাকাটি বন্ধ হইয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে জখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। তথায় খেজুর গাছের গুড়ির ন্যায় মোটামোটা বিচ্ছুর দ্বারা হাদিগকে দংশন করানো হইবে। তারপর আগুনের শিখাগুলি স্রোতের আকারে আসিতে শুরু রিবে এবং উহা পাপীদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া অগ্নিসাগরে নিক্ষেপ করিবে। এমন সময় একটি ওয়াজ শুনা যাইবে যে, এই দিনটি সম্পর্কে তোমরা আমার সাথে বহু রকমের বাকবিতণ্ডা রিতে, আমার নিয়ামতের বিরোধিতা করিতে আর তাহাতেই তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে। আমি মাদের জন্য যে নিয়ামত তৈয়ার করিয়াছি, তোমরা উহাতে অবিশ্বাসী ছিলে। আজ তোমরা সেই য়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তোমরা দুনিয়াতে যাহা পছন্দ করিতে, আজ উহার শাস্তি াগ কর। বেহেশতীদিগকে আজ তোমাদের হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে। তাহারা বিবাহের

ভোজানুষ্ঠানে আপ্যায়িত হইবে। নানা প্রকার সুস্বাদু ফল-ফলাদি আহার করিবে। কুমারী স্ত্রীদের সহিত রফরফে উপবেশন করিয়া নানা ধরনের চিত্তহারিনী সঙ্গীতলহরী শ্রবণ করিতেছে। তাহাদের উপর আমার সালাম বা শান্তি, আমি তাহাদের উপর আজ বড়ই মেহেরবান। প্রতিদিন আমি তাহাদের উপভোগ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিব।

যরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! মিষ্টি স্বর আমার খুবই পছন্দনীয়। বেহেশতে কি তেমন মিষ্টি হইবে? হুর (দঃ) উত্তর করিলেন, যে আল্লাহর আয়ত্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ আল্লাহ তায়ালা অহী দ্বারা বেহেশতের বৃক্ষসমূহকে নির্দেশ দিবেন তোমরা আমার বান্দাগণকে নানারূপ রাগ-রাগিনী সহকারে গান গাহিয়া শুনাও। কেননা তাহারা দুনিয়াতে আমার ইবাদাত ও যিকির আযকারে লিপ্ত ছিল। কোন প্রকার গান-বাজনার প্রতি তাহাদের আসক্তি ছিল না। তখন বৃক্ষগুলি সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর তাসবীহ ও পবিত্রতার গান গাহিতে আরম্ভ করিবে। যাহা কেহ আর কোন দিন শ্রবণ করে নাই।

আবু কেলাবাহ বলেন, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, হুযুর (দঃ) বেহেশতে রাত্র হইবে কি না? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তোমার মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইল কেন? প্রশ্নকারী বলিল, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদিগকে জীবিকা দেওয়া হইবে। আমি মনে করি যে, সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ই তো রাত্র। হুযুর (দঃ) বলিলেন, বেহেশতে রাত্র হইবে না। বরং এখন একটি নূর প্রকাশ পাইবে, যাহাতে সকাল-সন্ধ্যা বলিয়া মনে হইবে। দুনিয়াতে যেই যেই সময়ে নামায পড়া হইয়া থাকে ঐ সময়ে আল্লাহ বান্দাগণকে নুতন নুতন নিয়ামত দান করিবেন এবং ফিরেশতাগণ সালাম করিবেন।

অতএব যে ব্যক্তি এই অমর জীবনও অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক, তাহার উচিত পরহেজগারীর সীমা লঙ্ঘন না করা। পরহেজগারীর সীমা আল্লাহ তায়ায়া ক্বোরআন মজীদে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। শুধু ইহাই সৎকার্য নয় যে, তোমরা কেবল পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হও। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে, কিয়ামত, ফিরেশতা, কিতাব ও পয়গাম্বরগণকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, নিজের ধন-সম্পত্তি আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, গরীব, মিসকন, মুসাফির ভিক্ষুক এবং দাসদাসীদের জন্য খরচ করিয়াছে, নামায আদায় করিয়াছে, যাকাত দিয়াছে, প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছে এবং আল্লাহকে ভয় করিয়াছে। তাহারাই সত্যবাদী ও পরহেজগার।

আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً *

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, ইসলাম আটটি অংশে বিভক্ত। যথাঃ (১) ঈমান, (২) নামায (৩) রোযা (৪) হজ্ব, (৫) যাকাত, (৬) ওমরাহ, (৭) ন্যায়ের আদেশ এবং (৮) অন্যায়ের প্রতিরোধ।

যে ব্যক্তি উহার একটিও পরিত্যাগ করে, সে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত। আসেম হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম একটি শক্তিশালী বৃক্ষের ন্যায়। উহার মূল আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর উহার শাখা হইল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। রমজানের রোযা রাখা উহার দেহাবরণ স্বরূপ। হজ্ব এবং ওমরাহ উহার মনোনীত ফল স্বরূপ। অজু ও গোসলে-জানাবাত উহার পানি, পিতা-মাতার নির্দেশ পালন এবং আত্মীয়তা বজায় রাখা উহার প্রশাখা স্বরূপ। আল্লাহর নির্ধারিত হালাল হারামের জ্ঞানার্জন উহার পত্র-পল্লব, নেক কাজ উহার ফল, আল্লাহর যিকির ঐ বৃক্ষের শিরা-উপশিরা। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, সবুজ পাতা ছাড়া যেমন বৃক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, তেমনি পাপ হইতে বিরত ও পুণ্যের কাজে লিপ্ত থাকা ছাড়া ইসলামের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকে না।

দোজখ ও দোজখের শাস্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজ-কিয়ামতে যখন সমস্ত মাখলুক একটি ময়দানে সমবেত হইবে, তখন তাহাদের উপর ভীষণ অন্ধকার নামিয়া আসিবে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কেহই কাহাকে চিনিতে পারিবে না। বরং সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে সকলে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সে সময় তাহাদের ও আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে দূরত্ব হইবে সত্তর বৎসরের পথ। এই ভয়ানক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ আল্লাহ ফিরেশতাদের উপর বিজলির মত আলো দান করিবেন। হাশর ময়দান সে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। অন্ধকাররাশি দূর হইয়া যাইবে এবং সর্বস্থানে আল্লাহর নূর ছড়াইয়া পড়িবে। তখন ফিরেশতাগণ আল্লাহর আরশের চারি পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাসবীহ-তাহলীল পাঠে লিপ্ত থাকিবেন। কিন্তু অন্যান্য মাখলুক কাতার বাঁধিয়া এক জায়গায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

বিভিন্ন নবীর উম্মতগণ পৃথক পৃথকভাবে থাকিবে এবং সেখানেই তাহাদের আমলনামা দেওয়া হইবে। সেখানে নেকী-বদি ওজন করার জন্য মিযান বা দাড়িপাল্লাও স্থাপন করা হইবে। একজন ফিরেশতা কখনও-বা উপরের দিকে এবং কখনও-বা নীচের দিকে উঠা-নামা করিবেন। এমনি সময়ে হঠাৎ বেহেশতের পর্দা অপসারণ করা হইবে। বেহেশত হাশরের ময়দানের নিকটবর্তী হইয়া যাইবে। বেহেশতের বায়ু প্রবাহিত হইয়া মুসলমানদেরকে কস্তুরীর ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত করিবে। তবুও এ সময় বেহেশত ও বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে দূরত্ব থাকিবে পাঁচশত বৎসরের পথ। তারপর হঠাৎ আবার দোজখের পর্দা অপসারিত হইয়া যাইবে। দোজখ হইতে উহার বায়ু ও ধূম্র নির্গত হইয়া দোজখে যাওয়ার যোগ্য লোকদেরকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। অথচ তাহাদের ও দোজখের মধ্যে দূরত্ব হইবে পাঁচশত বৎসরের পথ।

অতঃপর মোটা মোটা শিকল দ্বারা দোজখকে বাঁধিয়া টানিয়া নিকটে আনা হইবে। দোজখের প্রহরী উনিশজন ফিরেশতা। উহাদের প্রত্যেক প্রহরীর সাহায্যকারী হিসাবে আছেন সত্তর হাজার ফিরেশতা। ইহারা সকলে মিলিয়া দোজখকে টানিয়া আনিয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত করিবেন। দোজখের ডাহিনে বামে আরও বহুত ফিরেশতা থাকিবেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া বেত্রদণ্ড থাকিবে। ফিরেশতাগণ দোজখকে চলিতে নির্দেশ করিতেই উহা উপর ও নীচের দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়িতে ও গ্রহণ করিতে করিতে চলিতে শুরু করিবে। উহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ গাধার আওয়াজের মত বিকট শুনা যাইবে। দোজখের পিঠ ভীষণ কাল বর্ণের হইবে এবং পিঠ হইতে ধূম্র ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে। এ সময় উহা দোজখীদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধের সাথে দৃষ্টিপাত করিবে। এই অবস্থায় হাশরের মাঠ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী স্থানে দোজখকে স্থাপন করা হইবে।

অতঃপর দোজখ চক্ষু তুলিয়া হাশরবাসীদের প্রতি তাকাইলে মনে হইবে যে, এখনই তাহাদের প্রতি ভীষণ হামলা করিবে। এ সময় প্রহরীগণ দোজখকে হামলা করা হইতে বিরত রাখার জন্য তাহার শিকল সুদৃঢ় ভাবে ধরিয়া রাখিবে। এই সময় দোজখকে ছাড়িয়া দিলে সে গায়রে মুমিন ও মুমিন নির্বিশেষে সকলকেই গিলিয়া ফেলিবে। দোজখ হামলা করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তখন ক্রোধে ফাটিয়া যাইতে থাকিবে এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া পুনরায় হামলা করিবার জন্য উদ্যত হইবে। দোজখের দন্ত ঘর্ষণের শব্দে হাশরবাসীগণ ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। এ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! দোজখের আকৃতি কিরূপ?

হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, উহা দুনিয়ার-মাটির আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু দুনিয়া হইতে সত্তর গুণ বৃহৎ। উহার বর্ণ কাল ও অন্ধকারময়। উহার মাথা সাতটি এবং প্রত্যেক মাথায় সত্তরটি দরজা প্রত্যেকটি দরজার দৈর্ঘ্য তিন রাত তিন দিনের পথের সমান। উহার উপরের ঠোঁট এত মোটা যে নাকের সহিত মিলিয়া গিয়াছে এবং নীচের ঠোঁট নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটি নাসিকা ছিদ্রে একটি করিয়া রশি এবং একটি করিয়া শিকল বাঁধা। সত্তর হাজার শক্তিশালী ফিরেশতা উহাকে আয়ত্তে রাখিয়াছেন।

দোজখরক্ষী ফিরেশতাদের দাঁত মুখের বাহিরে আসিয়া রহিয়াছে ও তাহাদের চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত ধক ধক করিতে থাকিবে। তাহাদের গায়ের রং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। নাকের ছিদ্র হইতে

অগ্নিশিখা ও ধুয়া নির্গত হইবে। ফিরেশতাগণ আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিবেন। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, দোজখ আরজ করিবে, হে প্রভু! আমাকে সিজদাহ্ করার আদেশ করুন। আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করা মাত্র দোজখ সিজদায় পতিত হইবে। তারপর সে আল্লাহর নির্দেশ মত সিজদাহ্ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিবে, যে আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্য কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই, আমি তাহার স্তুতি জ্ঞাপন করিতেছি। এই কথা বলিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার শুরু করিবে। তখন সেখানে যত সম্মানিত ফিরেশতা, পয়গাম্বর এবং অন্যান্য যাহারা থাকিবেন সকলেই অর্ধমৃত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবেন। অতঃপর দোজখ দ্বিতীয়বার এই একই কথা বলিবে। তখন সকলের চোখ হইতে এত বেশী পরিমাণ অশ্রু প্রবাহিত হইবে যে, সকলেরই চক্ষু শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহার পর আবার দোজখ এই কথা বলিবে। এ সময় কোন জিন বা মানব নেক কাজে বাহাত্তরজন সমতুল্য হইলেও সে মনে করিবে যে, হায়! আজ আর বুঝি দোজখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে না। তারপর আবার দোজখ চতুর্বারও ঐ কথা বলিলে সমস্ত প্রাণী ভয়ে ও আতঙ্কে নির্বাক হইয়া যাইবে। কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইবে না। আল্লাহর আরশবাহী ফিরেশতা, জিব্রাইল, ইস্রাফীল এবং নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভয়ে কম্পবান হইয়া বলিবেন, হে মাবুদ! আমাদিগকে রক্ষা কর।

অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, তখন দোজখ আকাশের তারকার ন্যায় অসংখ্য এবং আকাশের পূর্ব কোণের মেঘের ন্যায় বিরাট বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিবে। দোজখের উপর সাতটি পুল স্থাপন করা হইবে এবং একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ তুল্য হইবে। কেহ্ কেহ্ বলেন যে, পুলসিরাতের সাতটি স্তর হইবে। একটি স্তর হইতে অন্য একটি স্তরের দূরত্ব হইবে পাঁচশত বৎসরের পথ। সপ্তম স্তরের দূরত্ব ও গভীরতা হইবে আরও অনেক বেশী। যেখানে শাস্তির আর অভাব নাই। সেখানকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি হইবে অন্যান্য স্তরের অগ্নিস্পুলিঙ্গ হইতে আরও অনেক বড়। প্রত্যেকটি নিকটবর্তী স্তরের ডাহিন বামের উচ্চতা তিনক্রোশের উচ্চতার প্রায় সমান। একটি স্তর অপরটি হইতে উচ্চতায় এবং আযাবে অপরটি হইতে সত্তর গুণ বেশী। প্রত্যেকটি স্তরে রহিয়াছে প্রবাহিত সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষ-রাজি। ঐ সমস্ত পাহাড়ের প্রত্যেকটির উচ্চতা সত্তর হাজার বৎসরের দূরত্বের সমান।

প্রত্যেকটি স্তরে সত্তরটি পাহাড় এবং প্রত্যেকটি পাহাড়ের সত্তর হাজার শাখা। প্রত্যেক শাখায় সত্তর হাজার বৃক্ষ। প্রত্যেক বৃক্ষ সত্তর হাজার শাখা-প্রশাখার দ্বারা পরিপূর্ণ। পত্যেক শাখায় সত্তর হাজার সাপ ও বিচ্ছুর বাসা। প্রত্যেকটি সাপ দৈর্ঘ্যে তিন ক্রোশ এবং প্রত্যেকটি বিচ্ছু এককেটি উষ্ট্রের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। প্রত্যেকটি বৃক্ষ সত্তর হাজার করিয়া ফল। ফলের প্রত্যেকটি দানা বা কোষ শয়তানের মাথার ন্যায় বিরাট। প্রত্যেকটি ফল সত্তর হাজার কীটে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি কীট এককেটি বকরীর মত বড়। আবার কোন কোন ফলের অভ্যন্তর কন্টকে পরিপূর্ণ।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন, দোজখের সাতটি দরজা। প্রত্যেকটি দরজায় সত্তরটি জঙ্গল। এককেটি জঙ্গলের দৈর্ঘ্য সত্তর বৎসরের রাস্তার দূরত্বের সমতুল্য। প্রত্যেক জঙ্গলের সত্তর হাজার শাখা। প্রত্যেক শাখায় সত্তর হাজার গর্ত। প্রত্যেক গর্তে সত্তর হাজার ছিদ্র। প্রত্যেক ছিদ্রে সত্তর হাজার ফাটল এবং প্রত্যেক ফাটলে সত্তর হাজার করিয়া অজগর বা বৃহৎসর্পের বাস। প্রত্যেক অজগরের মুখে সত্তর হাজার বিচ্ছু। প্রত্যেক বিচ্ছুর পিঠে পাহাড় তুল্য সত্তর হাজার করিয়া বিষের মটকা। প্রত্যেক কাফির এবং মুনাফিককে ঐ বিষের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, হাশরবাসীরা যখন ভয়ে কুকরাইয়া থাকিবে, তখন দোজখ পাগলা উষ্ট্রের মত তাহাদের উপর হামলা করিতে উদ্যত হইবে। এমন সময় কাহারও আহ্বানে পয়গাম্বর, ছিদ্দিকীন, শোহাদা এবং বোযর্গানে দ্বীনগণ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবেন। অতঃপর সমস্ত মাখলুককে উপস্থিত করতঃ অত্যাচারের প্রতিফল দান করা হইবে। তাহাদেরকে দ্বিতীয়বার উপস্থিত করিলে তাহাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইবে। কলহে দেহ জয়লাভ করিবে।

তাহাদেরকে তৃতীয়বার উপস্থিত করিলে তাহাদের আমলনামা উড়িয়া আসিয়া তাহাদের হাতে পড়িবে। উহা কাহারও-বা ডান হাতে আবার কাহারও-বা বাম হাতে পড়িবে। আবার কাহারও-বা পিঠের দিক হইতে আমলনামা দেওয়া হইবে।

যাহারা ডান হাতে আমলনামা পাইবে, তাহাদেরকে আমলনামার সাথে আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নূরও দেওয়া হইবে। এই সৌভাগ্যের জন্য ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন। তাহারা আল্লাহর রহমতে প্রফুল্ল বদনে ও প্রসন্ন চিত্তে পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে। পুল পার হইয়া বেহেশতের দরজায় উপস্থিত হইতেই তথাকার দ্বার রক্ষকগণ তাহাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে আরামদায়ক দ্রুতগামী বাহন, বেহেশতী পোশাক এবং চোখ ঝলসানো অলঙ্কারাদি দান করিবেন। বেহেশতীগণ পৃথক পৃথক বাহনে আরোহণ করিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত মহলে প্রবেশ করতঃ বেহেশতী স্ত্রীদের সাথে মিলিত হইবে। বেহেশতে তাহারা এমন সব জিনিস দেখিবে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখে নাই বা উহার সম্বন্ধে ধারণা করাও তাহাদের জন্য সম্ভব হয় নাই। তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিয়া তৃপ্তি সহকারে পানাহার করিবে, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। অতঃপর স্ত্রীদের সাথে আনন্দ ও আমোদ প্রমোদ করিবে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত এইখানে তাহারা বিভোর হইয়া থাকিবে এবং বিপদ ত্রাণকারী আল্লাহ্ তায়ালার গুণগান করিবে। যে আল্লাহ তাহাদের হিসাব নিকাশ আসান করিয়া দিয়াছেন, যিনি নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে।

যাহারা পিঠের দিক দিয়া বাম হাতে আমলনামা পাইবে তাহাদের মুখ মলিন এবং চক্ষু নীল বর্ণ ধারণ করিবে এবং তাহাদের বক্ষদেশে নিশানা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের দেহ ফুলিয়া উঠিবে। তাহারা তাহাদের সমাগত ধ্বংস সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া পড়িবে। আমলনামায় তাহারা দেখিতে পাইবে যে, উহাতে সকল গুনাহ ছগীরাহ ও কবীরাহ লিপিবদ্ধ আছে। একটিও বাদ যায় নাই। তখন তাহাদের অন্তর অন্ধকার হইয়া যাইবে। ভয়ে মস্তক অবনত হইয়া পড়িবে। চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দোজখের আগুনের দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং চিন্তা করিতে থাকিবে, হায়! আমাদের জন্য কি কঠিন বিপদ অপেক্ষা করিতেছে। সেই সময় তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দা বলিয়া স্বীকার করিবে এবং নিজেদের পাপ স্বীকার করিয়া লইবে। তাহাদের তখনকার এই স্বীকৃতিতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাহাদের বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক অনর্থক ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া তাহাদের শাস্তি সাব্যস্ত ও অবধারিত হইয়া গিয়াছে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, এই পাপী লোকেরা তখন নতজানু ভাবে মহান প্রভুর দরবারে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং নিজেদের পাপ ও অন্যায় স্বীকার করিবে। তাহাদের চক্ষুগুলি তখন নীলবর্ণ ধারণ করিবে এবং হয়রান-পেরেশান হইয়া যাইবে। ভয়ে তাহাদের দেহ ও অন্তর থর থর করিতে থাকিবে। কাহারও মুখ হইতে কোনরূপ কথা বাহির হইবে না। এ সময় কেহ কোন আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে পারিবেনা এবং কেহই কাহারও উপর কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করিবে না। এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তাহাদের এই সময়কার ক্ষমা প্রার্থনা বা কাকুতি মিনতির কোনরূপ জবাব দান করা হইবে না। যে বিষয়কে তাহারা পার্থিব জীবনে মিথ্যা জানিত তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে, কিন্তু সেই স্বীকৃতি কোন কাজ দিবে না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িবে। কিন্তু তখন আহার্য বা পানীয় কিছুই জুটিবে না। কাপড়ের অভাবে সকলেই উলঙ্গ থাকিবে। কিন্তু সে কথা কাহারও মনেই জাগিবে না। তখনকার ভীষণ অবস্থার প্রভাবে কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, মানুষের যখন এই অবস্থা বিরাজ করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা দোজখের প্রহরী ও তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে আদেশ করিবেন, এখন তোমরা নিজেদের হাতিয়ার আদি লইয়া তৈয়ার হইয়া যাও। আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তাহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিবেন। তাহাদেরকে হাতিয়ার আদিসহ তৈরী হইয়া আসিতে দেখিয়াই পাপিষ্ঠ দুর্ভাগার দল দন্তে জিহ্বা কাটিতে থাকিবে এবং নিজেদের এই পরম দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া চীৎকার শুরু করিবে।

দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইবে এবং আতঙ্কে বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে। বাঁচিবার কোন পথই আর তাহারা সামনে দেখিবে না। এই সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা ফিরেশতাগণকে আদেশ করিবেন, এই দোজখীদেরকে ধরিয়া ইহাদের গলায় বেড়ী পরাইয়া শক্ত শিকলাবদ্ধ করতঃ দোজখে নিক্ষেপ কর।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যাহাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করিবেন ফিরেশতাগণকে আদেশ করিবেন, উহাদেরকে পাকড়াও কর। আদেশ পাওয়া মাত্র সত্তরজন ফিরেশতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ধরিবেন এবং মজবুত শিকল দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিবেন। তাহাদের গলায় ভারী বেড়ী পরিধান করাইবেন এবং নাকের ছিদ্রে শিকল লাগাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া তাহাদের মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ধরিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া তাহাদিগকে চিৎভাবে শোয়াইয়া পা ধরিয়া টানিয়া আনা হইবে। এভাবে টানা হেঁচড়ায় তাহাদের শির ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন, এই প্রকার সাজায় তাহাদের চক্ষুদ্বয় স্থির হইয়া যাইবে। ঘাড়ের মাংস ঝলসিয়া যাইবে। রগের উপরিভাগের মাংস খুলিয়া যাইবে। ঘাড়ে পরিধেয় লোহার বেড়ির গরমের তেজে মাথার মগজ ফুটিতে থাকিবে এবং সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘর্ম পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌঁছিবে। শরীরের চামড়া গলিয়া যাইবে। সারা শরীর নীলবর্ণ ধারণ করিবে। শরীরে ক্ষত ও ঘায়ের সৃষ্টি হইয়া পাকিয়া পুজ বাহিয়া পড়িতে থাকিবে। লোহার বেড়ী স্কন্ধ হইতে কান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। উহার তাপে কান ও ঠোঁট জ্বলিয়া যাইবে। চীৎকার করিবার কালে উহাদের দাঁত ও জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। উষ্ণ লৌহবেড়ী হইতে যে অগ্নি শিখা বাহির হইবে তাহার প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়িবে। এই লৌহ বেড়ী গহ্বর-বিশিষ্ট হইবে। উক্ত গহ্বর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থাকিবে। উহার তাপে শরীরের অভ্যন্তর ভাগও জ্বলিয়া যাইবে। গরমের চোটে দম বন্ধ হইয়া আসিবে। কণ্ঠের স্বর রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই অবস্থায় দোজখের ফিরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে তাহাদিগকে কালো বর্ণের মোটা খসখসে পুঁতি গন্ধময় শক্ত কাপড় পরাইয়া দিবেন। ঐ কাপড় এত গরম হইবে যে, উহা যদি দুনিয়ার কোন পাহাড়ের উপর রাখা হয়, তবে পাহাড় পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা দোজখের রক্ষককে আদেশ করিবেন, এই লোকগুলিকে নিজ নিজ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। এই সময় তাহাদের জন্য পূর্বাপেক্ষাও অনেক বড় ও মোটা শৃংখল আনা হইবে। একজন ফিরেশতা একটি শৃংখলে একটি দলকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া শৃংখলের অন্য মাথা নিজেদের ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া লইবেন। তারপর পাপীদের দিকে পিঠ এবং দোজখের দিকে মুখ করিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিবেন। দোজখীগণ হেঁচড়াইয়া ছেচড়াইয়া অন্যন্যোপায় ভাবে ফিরেশতাদের সাথে যাইতে থাকিবে। একেকটি দলের পিছনে লৌহমুগুর হাতে সত্তর হাজার ফিরেশতা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে দোজখের দরজায় নিয়া উপস্থিত করিবেন। তখন ফিরেশতাগণ বলিবেন, দুনিয়াতে তোমরা যাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিলে, ইহা সেই অগ্নি। এখন এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কর এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর। ধৈর্যধারণ করিতে পার কি না পার এই শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন, পাপীদিগকে দোজখের দরজায় উপস্থিত করিতেই দোজখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। দোজখ পূর্ণ দাপটে আগাইয়া আসিবে। আর অগ্নিশিখাগুলি ভীষণ ধূম্র নির্গত করিবে! শিখাগুলি হইতে আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত শিখা ঊর্দ্ধমুখে পাঁচ বৎসরের পথ পর্যন্ত উত্থিত হইবে। তথা হইতে আবার ফুলঝুড়ির ন্যায় উহা দোজখীদের মাথার উপরে পড়িতে থাকিবে। তাহাতে উহাদের মাথার খুপড়ি উড়িয়া যাইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, অতঃপর দোজখ উচ্চ আওয়াজে বলিবে, হে দোজখীগণ! তোমরা আমার মধ্যে প্রবেশ কর। আমি আমার প্রভু আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। যে আল্লাহ্ আমাকে ভয়ঙ্কর রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা ও গুণাবলী কীর্তন করিয়া বলিতেছি, হে প্রভু! তুমি আমার তেজ বাড়াইয়া দাও।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন, অতঃপর দোজখের ফিরেশতাগণ তাহাদের মাথা নীচু করিয়া

দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। মাথা নীচু অবস্থায়ই তাহারা গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে থাকিবে। সত্তর বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করার পর দোজখের পাহাড়ে তাহাদের মাথা স্পর্শিত হইবে। পুরাপুরিভাবে আযাব ভোগ করিবার জন্য এই সময়ের মধ্যে তাহাদের দেহের চামড়া সত্তরবার পরিবর্তন করা হইবে। এই পাহাড়ে সর্বপ্রথম তাহাদিগকে তিক্ত কন্টকময় ও গরম যাক্কুম ফল আহার্য্য হিসাবে দেওয়া হইবে। উহা মুখে তুলিতেই ফিরেশতাগণ তাহাদিগকে লৌহ মুগুর দ্বারা প্রহার করিতে শুরু করিবেন। তাহাতে তাহাদের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেখান হইতে আবার তাহাদেরকে অধোমুখী করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। সত্তর বৎসর চলার পর এবং আবার সত্তরবার চামড়া পরিবর্তন করার পর তাহারা পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিবে। ইতিপূর্বে যে যাক্কুম ফল তাহারা মুখে দিয়াছিল, উহা তখনও তাহাদের গলায় আটকাইয়া থাকিবে। যার ফলে তাহাদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। এই অবস্থায় তাহারা চীৎকার করিয়া পানি চাহিতে থাকিবে। পাহাড় হইতে প্রবাহিত নদী ও ঝর্ণাধারার পানি দোজখে পতিত দোজখীগণ তীব্র তৃষ্ণায় হাতে লইয়া মুখে দিবে। কিন্তু সেই পানির গরমে তাহাদের ঠোঁট গলিয়া গলিত ধাতুর ন্যায় উক্ত নদীতে পড়িতে থাকিবে। দোজখীরা তখন সেখান হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরেশতাগণ আসিয়া তাহাদেরকে প্রহার করিতে শুরু করিবেন। প্রহারের চোটে তাহাদের হাড্ডি মাংস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ও থেতলাইয়া যাইবে। তারপর তাহাদের পা ধরিয়া টানিয়া টানিয়া আবার তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। দোজখের অগ্নি ও ভীষণ ধুয়ার শাস্তি ভোগ করিতে করিতে তাহারা একশত চল্লিশ বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আবার তাহাদের দেহের চামড়া সত্তরবার পরিবর্তন করা হইবে। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, দোজখের এই নদীসমূহ ঝর্ণায় পৌঁছিয়া শেষ হইয়াছে। এখান হইতে দোজখীগণ পানি পান করিবে! ঐ পানি পান করিয়া উত্তাপে পেট জ্বলিয়া যাইবে। পানি পান করিয়া শান্তির বদলে শাস্তি পৌঁছাইতে থাকিবে। এ সময় আবার সাতবার তাহাদের দেহের চামড়া পরিবর্তন করা হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, উক্ত পানিতে পেটের আঁতুড়ি ছিন্নভিন্ন হইয়া গলিত ধাতুর ন্যায় মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। যে পানি পেটের ভিতরে থাকিবে, তাহা সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া দেহের হাড্ডি জ্বালাইয়া দিবে। এমন সময় দোজখের ফিরেশতাগণ আসিয়া তাহাদিগকে প্রহার শুরু করিবেন। তাহাতে উহাদের মাথার খুলি উড়িয়া যাইবে। পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া দুইভাগ হইয়া যাইবে। তারপর ফিরেশতাগণ উহাদেরকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিবেন। এ সময় তাহাদের সর্বশরীর এমন কি নাক কান মুখ দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতে থাকিবে। চক্ষুদ্বয় কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গণ্ডের উপর ঝুলিতে থাকিবে। তাহাদিগকে শয়তান এবং ঝুট উপাস্যদের সাথে সংকীর্ণস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। এই ভয়ানক শাস্তি শুরু হইয়া গেলে তাহারা আল্লাহর নিকট আরজ করিবে, হে মাবুদ! তুমি তাহাদের ধ্বংস করিয়া দাও। তখন নির্দেশ করা হইবে, ইহাদের ধন-সম্পত্তি আনিয়া দোজখে উত্তপ্ত কর। নির্দেশ মত সেইগুলি আনিয়া আগুনে গরম করতঃ তাহাদের ললাটে পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। তারপর উহা পিঠের উপর রাখিয়া দেওয়া হইবে। পিঠ হইতে পেট ভেদ করিয়া সেই ধন-সম্পদ বাহির হইয়া আসিবে। এইসব দোজখীরা শয়তানের নিকটস্থ স্থানে থাকিবে। ভীষণভাবে শাস্তি ভোগ করার জন্য তাহাদের পাপসমূহ পাহাড় সমতুল্য করিয়া তাহাদের উপর স্থাপন করা হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তি সহ্য করার জন্য তাহাদের দেহাকৃতিও বড় করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য একমাস এবং প্রস্থ পাঁচ দিন ও তিনদিনের রাস্তার সমান মোটা হইবে। মাথা 'কারা' পর্বতের সমতুল্য হইবে।

মুখে বত্রিশটি দাঁতই থাকিবে, কিন্তু উপরের পাটির দাঁত মাথা হইতে এবং নীচের পাটির দাঁত থুতনী হইতে বাহির হইবে। টিলার ন্যায় নাক এবং দেবদারু গাছের ন্যায় চুল হইবে। উপরের ঠোঁট বুকের উপর ঝুলিয়া থাকিবে। ইহার দৈর্ঘ্য দশদিন এবং স্থূলতা একদিনের রাস্তার সমান হইবে। তাহাদের উরু ও কান পাহাড়ের ন্যায় এবং গায়ের চামড়া চল্লিশ গুণ মোটা হইবে। পায়ের দৈর্ঘ্য

প্যাঁচরাত এবং স্থূলতা একদিনের রাস্তার সমান হইবে। তাহাদের মাথায় শিখাময় গলিত তত্ত্ব ঢালা হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ ঘাড়ে ও হাতে-পায়ে বেড়ীসহ শৃঙ্খল অবস্থায় যদি সে বাহিরে আসে তবে তাহাকে দেখামাত্র আলাহর সৃষ্ট জীব এমন স্থানে লুকাইয়া থাকিবে, যেখান হইতে আর তাহাকে দেখা যাইবে না।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলেন, দোজখের তাপ ও নানা প্রকার শাস্তিতে তাহাদের দেহ কালো ও হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। মাথার মগজ টগবগ করিয়া ফুটিয়া দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যেখান দিয়া যাইবে, সেইখানটিকে জ্বালাইয়া দিবে এবং দেহের প্রত্যেকটি জোড়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। দেহে পুঁজ ও পোকার সৃষ্টি হইবে। পোকাগুলি পুঁজ ও মাংস খাইয়া এক একটি গাধার ন্যায় বিরাটাকার হইবে। উহারা হুল এবং নখবিশিষ্ট হইবে। পোকাগুলি চোখের পলকে মাংসের মধ্যে ঢুকিয়া কাটিতে আরম্ভ করিবে। পাপীগণ যন্ত্রণায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করিয়া দিবে। পাপীদের দেহের রক্ত-মাংস ও পুঁজই পোকাগুলির একমাত্র খাদ্য। ইহার পর ফিরেশতাগণ তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত অঙ্গার এবং পাথরের উপর তাহাদের মুখ ঘষিতে ঘষিতে দোজখের অগ্নিসাগরের নিকট নিয়া উপস্থিত করিবেন। এই সাগরের দৈর্ঘ্য সত্তর বৎসরের পথ। এই সাগর পর্যন্ত পৌঁছিতে তাহাদের দেহের প্রত্যেকটি জোড়া পৃথক হইয়া যাইবে। শাস্তি ভালভাবে ভোগ করার জন্য প্রত্যহ তাহাদেরকে সত্তর হাজার বার করিয়া নূতনভাবে তৈয়ার করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে অগ্নি সাগরে নিক্ষেপ করা হইবে। এই সাগরের গভীরতা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। তাওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, দোজখের সাগরের সামনে দুনিয়ার সাগরের কোন তুলনাই হইতে পারে না। এখানে শাস্তি ভোগ করার সময়ে একে অন্যকে বলিবে—এই আযাবের তুলনায় প্রথমবারের আযাব তো কিছুই নয়।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, এই আগুনের সমুদ্রে একবার নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় উঠাইয়া সত্তর কেলাহ দূরে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রত্যেক কেলার দূরত্ব সূর্যোদয়ের স্থান হইতে সূর্যাস্তের স্থান পর্যন্ত। সেখান হইতে ফিরেশতাগণ লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আগুনের সাগরের ডানে বামে ডুবাইয়া দিবেন। তাহারা সত্তর বৎসরের পথের সমান গহ্বরে নিমজ্জিত হইবে। এই আগুনের সাগরেই তাহারা পানাহার করিবে। একশত চল্লিশ বৎসর পর তাহাদিগকে অগ্নিসাগর হইতে উঠানো হইবে। তীরে উঠিয়া একটু বিশ্রাম করিতে চাহিলেই ফিরেশতাগণ লৌহ মুগুর দ্বারা তাহাদেরকে প্রহার করিতে শুরু করিবেন। একটু মস্তকোত্তলন করিতেই তাহাদের মাথার উপর সত্তর হাজার লৌহদণ্ডের আঘাত পড়িবে এবং তাহারা অগ্নিসাগরের সত্তর গজ গহ্বরে তলাইয়া যাইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা হইবে, ততদিন তাহারা এই আগুনের সাগরে থাকিবে। একমাত্র প্রাণ ব্যতীত তাহাদের দেহ ও রক্ত মাংস সকল কিছুই অগ্নিসাগরের কুমীরে খাইয়া ফেলিবে। বহু বৎসর এখানে শাস্তি ভোগ করার পর আগুনের ঢেউ তাহাদিগকে সাগরের তীরে নিক্ষেপ করিবে। সাগরের তীরে রহিয়াছে সত্তর হাজার গর্ত, প্রত্যেক গর্তে সত্তর হাজার করিয়া ফাটল। প্রত্যেকটি ফাটলের দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ। প্রত্যেকটি ফাটলে রহিয়াছে সত্তর হাজার বিরাট বিরাট সর্প। প্রত্যেকটি সর্পের দৈর্ঘ্য সত্তর গজ। প্রত্যেকটি সর্পের মাথায় সত্তরটি করিয়া ভীমরুল। প্রত্যেকটি ভীমরুলের মধ্যে এক একটি বিষের টিলা। তাহাছাড়া প্রত্যেকটি সর্পের মুখে হাজারটি বিচ্ছু। প্রত্যেকটি বিচ্ছুর পিঠে বিষে পরিপূর্ণ সত্তরটি নর্দমা।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পাপীদের আত্মা আগুনের সাগরের কিনারায় পৌঁছিয়া যখন ঐ সমস্ত গর্তের দিকে রওয়ানা হইবে, তখন আবার তাহারা নূতন দেহ প্রাপ্ত হইবে। এখানে পৌঁছিতেই সর্প ও সত্তর হাজার বিচ্ছু তাহাদেরকে দংশন করিতে থাকিবে। তাহারা বিষের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া একে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবে। কিন্তু কেহই কাহাকে সাহায্য করিবে না। করিতে পারিবেও না। তখন নিরুপায় হইয়া আবার তাহারা দোজখের দিকে ধাবিত হইবে এবং কোন দিকে না চাহিয়া দোজখের মধ্যেই লাফাইয়া পড়িবে। এখানেও সর্প ও বিচ্ছু তাহাদিগকে

দংশন করিতে থাকিবে। তাহার বিষের জ্বালায় তাহাদের দেহের মাংস ও প্রত্যেকটি জোড়া খুলিয়া পড়িতে থাকিবে। সাপ ও বিচ্ছুর বিষের দরুন সত্তর বৎসর পর্যন্ত দোজখের আগুন তাহাদের উপর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া করিবে না। ইহার পর আবার তাহারা সত্তর বৎসর পর্যন্ত দোজখের আগুনে জ্বলিতে থাকিবে। তাহাদের দেহের চামড়া পুড়িয়া যাওয়ার পর আবার নূতন চামড়া লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

দোজখীগণ খাবার চাহিলে ফিরেশতাগণ লৌহ অপেক্ষা শুষ্ক ও শক্ত ওলিমা নামক এক প্রকার খাবার খাইতে দিবেন। তাহারা উহা মুখে দিবে। অথচ কোন মতেই চিবাইতে পারিবে না। তখন উহা মুখ হইতে ফেলিয়া ক্ষুধার জ্বালায় হাত দাঁত দিয়া কাটিয়া খাওয়া শুরু করিবে। মুখে যতটা নাগাল পাওয়া যায় দেহের ততটাই খাইয়া ফেলিবে। অতঃপর তাহাদেরকে লোহার ন্যায় শক্ত ও ধারালো যক্কুমের কাঁটার সাথে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, এই গাছের প্রত্যেকটি শাখার সাথে সত্তর হাজার দোজখীকে উপুড় করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। নীচ হইতে দোজখে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সত্তর বৎসর পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত সমস্ত দেহই জ্বলিয়া যাইবে। পরে আবার তাহাদের দেহ নূতন ভাবে সৃষ্টি করা হইবে। অতঃপর হাতের আঙ্গুলে বাঁধিয়া পুনরায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে। গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচণ্ড অগ্নিশিখা প্রবেশ করতঃ অন্তঃকরণ জ্বালাইয়া নাক ও কানের ছিদ্র দ্বারা সেই অগ্নিশিখা বাহির হইয়া আসিবে। তারপর চোখের পাতায় বাঁধিয়া লটকাইয়া দেওয়া হইবে। মোটকথা শরীর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাথার ও দেহের প্রত্যেকটি পশমের সাথে বাঁধিয়া এই ভাবে ভীষণ শাস্তি ভোগ করার পর ফিরেশতাগণ তাহাদের পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়া সেখান হইতে টানিয়া হেঁচড়াইয়া অন্যস্থানে লইয়া যাইবেন।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, পাপের মাত্রানুযায়ী পাপীদের জন্য দোজখের ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। কাহারও ঘরের দৈর্ঘ্য এক মাসের পথের সমান। প্রস্থ তাহার জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সমান। সেই ঘরে সে একাই অবস্থান করিবে। কেহই তাহার নিকটে যাইবে না। কাহারও ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উনিশ দিনের রাস্তার সমান। তাহাদের ঘরের প্রশস্ততার ন্যায়ই তাহাদের শাস্তি প্রদান করা হইবে। দোজখীদের জন্য যত ঘর হইবে, আযাবের কঠোরতার দিক হইতে এই সমস্ত ঘর খুবই সংকীর্ণ হইবে। তাহাদের মধ্যে কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও নাভী পর্যন্ত, কাহারও গলা পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থাকিবে। আবার কাহারও বা আপাদমস্তক পানিতে ডুবিয়া থাকিবে। এই আগুন যখন পূর্ণ তেজে তাহার শিখা বিস্তার করিবে, তখন তাহাদিগকে দোজখের ভিতরে এক মাসের দূরবর্তী স্থানে নিয়া যাইবে। তাহাতে তাহারা তাহাদের পার্শ্ববর্তী পাপীদের সাথে মিলিত হইবে এবং অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের পানি নিঃশেষ করিয়া চক্ষু রক্ত ঝড়াইতে থাকিবে। রক্ত স্রোতধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একদিন সমস্ত দোজখবাসী এক জায়গায় সমবেত হইবে। অতঃপর আর কোন দিন তাহারা একত্রিত হইবে না। ঐ দিন আল্লাহর নির্দেশ মত এক আহ্বানকারী উচ্চঃস্বরে বলিবেন, হে দোজখবাসী! তোমরা একস্থানে সমবেত হও। এই আহ্বানকারীর নাম হাশর। অতঃপর সমস্ত দোজখবাসী একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিবে। দুর্বল দোজখবাসী অহংকারী ও গর্বিত দোজখীদেরকে বলিবে, দুনিয়ায় আমরা তোমাদের আজ্ঞানুবর্তী ছিলাম। তোমরা কি এখন আল্লাহর নিকট হইতে আমাদের শাস্তি কিছুটা কমাইয়া দিতে পার? তাহারা বলিবে, আমরা তো নিজেদেরকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত আছি। আল্লাহ তাঁহার বান্দাদিগকে সঠিক নির্দেশই দিয়াছিলেন। তোমরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছ। তোমাদের বিনাশ হউক। দুর্বলগণ একথা শুনিয়া বলিবে, তোমাদের বিনাশ হউক। তোমাদের জন্যই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। হে মাবুদ! যাহাদের জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা তাহাদের উপর দ্বিগুণ শাস্তি অবতীর্ণ কর। তখন অহংকারীগণ বলিবে, আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাইলে আমরাও তোমাদেরকে সেই পথে পরিচালিত করিতাম। দুর্বলগণ বলিবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। তোমরা সর্বদাই গর্বিত ও অহংকারী ছিলে। আমাদিগকে অসৎ কাজ ও

আল্লাহর সাথে শরীক করার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে। আল্লাহ তোমাদের বিনাশ করুন।
হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর দোজখীগণ শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, তোমাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, তোমরাই আমাদিগকে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করিয়া শাস্তিতে নিপতিত করিয়াছ। শয়তান এ কথা শুনিয়া বুলন্দ আওয়াজে বলিবে, হে দোজখীগণ! আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন। তোমাদেরকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরাই তাঁহার ওয়াদাহকে মিথ্যা জানিয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দাও নাই। অথচ আমি করিয়াছিলাম মিথ্যা ওয়াদাহ। মিথ্যার প্রতি আহ্বান করা ছাড়া আর কোন সামর্থ্যই আমার ছিল না। আমরা কেহই কাহারও প্রতি নির্ভরশীলও নই। কিন্তু আজ আমি তোমাদিগকে কাফির বলিব। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার উপাসনা ও পায়রবী করিয়াছিলে।
এ সময় কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। এইভাবে দুর্বল দোজখীরা অহংকারীদেরকে এবং অহংকারীরা শয়তানকে অভিসম্পাত করিবে। পাপীগণ শয়তানকে বলিবে, হায়, তোমার ও আমাদের মধ্যে যদি আকাশ পাতালের ব্যবধান থাকিত, তবে আজ আমাদের এই দুরবস্থা হইত না। তুমিই তো আমাদের কুপথে নিয়াছিলে।
এইভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া পরস্পরে বাদানুবাদ করিয়া অবশেষে সকল দোজখী একত্রিত হইয়া বলিবে, চল আমরা দোজখের প্রধান রক্ষীর কাছে যাই। তিনি যদি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিয়া একটি দিনের জন্যও আমাদেরকে এই আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারেন, তবে তাহাও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করিব।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন অবস্থায়ই পাপীগণ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। সত্তর বৎসর পর দোজখরক্ষী জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট কি আল্লাহ কোন নবী প্রেরণ করেন নাই? তাহারা বলিবে, হাঁ, প্রেরণ করিয়াছিলেন। দোজখরক্ষী বলিবেন, আমি তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না। বরং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। তবে এ কথা সত্য যে, আজ তোমাদের প্রার্থনা কোন কাজে আসিবে না। অতঃপর দোজখীরা দোজখের সর্বাধিনায়ক মালেক ফিরেশতার নিকট গিয়া বলিবে, হে ফেরেশতা মালিক! আপনি আল্লাহর নিকট বলুন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। উহাদের এই অনুরোধের বহু বছর পর মালেক উত্তর করিবেন, এখানে তোমাদের জীবন চিরস্থায়ী। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। অতঃপর তাহারা খোদ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাইবে, হে মাবুদ! তুমি আমাদেরকে দোজখের এই কঠিন আযাব হইতে পরিত্রাণ দান কর। ইহার পর যদি আমরা আর কোন দিন অন্যায় করি তবে আমাদিগকে ইহা অপেক্ষাও কঠিন আযাব দিও। সত্তর বৎসর আল্লাহতায়ালা কুকুরকে তিরস্কার করার ন্যায় তিরস্কার করিয়া বলিবেন, দূর হইয়া যা এখান হইতে, তোরা আমার সহিত কোন কথা বলিস না। এইভাবে আল্লাহর করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা একে অন্যকে বলিবে, আমরা ধৈর্য ধারণ করি বা না করি, এই আযাব হইতে রেহাই নাই। কেহ সাহায্যকারী ও সুপারিশকারীও আমাদের নাই। এই শাস্তি হইতে একবার মুক্তি লাভ করিলে আর ঈমান নষ্ট হইত না। কিন্তু কি করিব, মুক্তির যে কোন পথই দেখিতেছি না।
ইহার পর ফিরেশতাগণ তাহাদেরকে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে লইয়া আসিবেন। এখানে শাস্তির অবস্থা দেখিয়া তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইবে। তখন তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে একেবারে নিরাশ হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর অসহনীয় আযাব চাপানো হইবে। তাহারা এ সময় নিজেদের অতীত সময়ের জন্য আফসুস করিবে। তাহারা তাহাদের অনুসারীদের পাপের বোঝাও বহন করিতে বাধ্য হইবে। দোজখের শাস্তির সংখ্যা দুনিয়ার বালুকা কণা ও পানির ফোঁটার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না। বরং অধিক হইবে। দোজখরক্ষীগণ প্রতি মুহূর্তেই দোজিখীদের সাথে রুক্ষ ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিবেন। ভীষণাকৃতির রক্ষীদের মুখ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় ভীতিপ্রদ আলো বাহির হইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষু ভাটার ন্যায় জ্বল জ্বল করিবে। তাহাদের গাত্র বর্ণ অগ্নির ন্যায় লাল হইবে। বড় বড় দাঁত মুখের বাহির হইয়া থাকিবে। হাতের নখগুলি গরুর শিং

... দীর্ঘ হইবে। তাহাদের হস্তে বৃহৎ জ্বলন্ত অগ্নি মুগুর থাকিবে। সেই মুগুর দ্বারা কোন বৃহৎ ...র উপর আঘাত করিলে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া জীর্ণ তুলার ন্যায় উড়িতে থাকিবে। ...দিককে সেই মুগুর দ্বারাই প্রহার করা হইবে। আঘাতের চোটে তাহাদের চক্ষু হইতে রক্তের ...ফিনকি দিয়া ছুটিতে থাকিবে।

...রেশতাদিগকে ডাকিয়া কিছু বলিলেও ইহারা কোন উত্তর দিবে না। কান্নাকাটি আর্তনাদেও ...র মন এতটুকু দয়ার্দ্র হইবে না। ইহাদের কাছে একটু ঠাণ্ডা পানি পান করিবার জন্য চাহিলে ... তপ্ত গলিত তাম্র আনিয়া মুখের ভিতর ঢালিয়া দিবে। তাহাতে উহাদের মুখমণ্ডল এবং মুখ ...লসিয়া ও বিগলিত হইয়া যাইবে।

...রে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, দোজখীদের উপর প্রত্যহ দারুণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ... আসিবে। ঐ মেঘের মধ্য হইতেই ঘন ঘন এমন ভাবে বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকিবে যে, ...তের আলোতে তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। মেঘের প্রবল ভীতিব্যঞ্জক গর্জনে দোজখীদের ...নাড়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ সময় ভয়ঙ্কর আওয়াজে একটি শব্দ হইবে যে, তোমরা কি বৃষ্টিপাত ...? দোজখীরা বলিবে যে, হাঁ, আমরা ঠাণ্ডা পানি বর্ষণ চাই। অতঃপর বর্ষণ শুরু হইবে ঠিকই, ... পানির পরিবর্তে পাথর বৃষ্টি শুরু হইবে। শূন্য হইতে পাথর বর্ষণের আঘাতে পাপীদের মস্তক ...বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পাথর বর্ষণ শেষ হইবার পর দ্বিতীয়বারের গরম পানি, জ্বলন্ত আঙ্গার, ...খণ্ড, কন্টক, সর্প-বিচ্ছু, পোকা-মাকড় বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিবে। এদিকে অগ্নি সমুদ্র উত্তাপ ...তে শুরু করিবে। তাহাতে তখন ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে। যাহাতে দোজখের পাহাড়-পর্বত, ...নালা পাপী দোজখীদিগের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় ... দোজখীগণ ইহাতেও মৃত্যুবরণ করিবে না।

হে মাবুদ! পাপ ও অন্যায় কাজ করা হইতে দোজখ ও দোজখের শাস্তি হইতে তোমার দরবারে ...য় প্রার্থনা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দোজখের গহ্বরের কাছে নিও না। দোজখের বেড়ী আমাদের গলায় পরাইও না। আমাদেরকে দোজখের কাপড় পরিধান করাইও না। যাক্কুম নামক দোজখের আহার্য খাওয়াইও না। দোজখের গরম পানি পান করাইও না। ...জখের রক্ষী প্রহরীদিগের আমাদের উপর নিযুক্ত করিও না। বরং তোমার করুণা ও মেহেরবানী ... আমাদিগকে দোজখের পুল পার করাইয়া নিও। দোজখের অগ্নিশিখা, অন্ধকার গহ্বর এবং উহার কঠোর শাস্তি হইতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখিও।

...রে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, দোজখের দরজাগুলির মধ্যে যদি একটি ছোট দরজাও ...নিয়ার পূর্বসীমায় খুলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার উত্তাপে পশ্চিম সীমার লোকদের মস্তিষ্ক টগবগ ...রিয়া ফুটিতে থাকিবে এবং উহা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে।

...জখীদের জন্য সর্বাপেক্ষা হালকা আযাব হইল, আগুনের জুতা পায়ে পরাইয়া দেওয়া। উক্ত জুতার ... কর্ণ ও নাসিকার ছিদ্র দিয়া বাহির হইবে এবং মস্তক টগবগ করিবে। তাহারা দোজখের ...কটবর্তী স্থানে থাকিবে ও তাহাদিগকে দোজখের পাথরের উপর নিক্ষেপ করা হইবে। তাহাতে ...র খাইয়া এক পাথর হইতে অন্য পাথরের উপর গিয়া পড়িবে। উক্ত পাথরের গরমে তাহারা ...ফট করিতে থাকিবে।

...রে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা নিজের লজ্জা স্থানের হেফাজত না করে অর্থাৎ ...ভিচার লিপ্ত হয়, তাহাদের লজ্জাস্থানে বাঁধিয়া তাহাদেরকে আগুনের উত্তাপ দ্বারা এমন কঠিন ভাবে ...স্তি দেওয়া হইবে যে, তাহাদের চর্ম মাংস আগুনে গলিয়া যাইবে। আবার নূতন চর্ম ও মাংস প্রদান করিয়া উহাতে আবার আযাব দেওয়া হইবে। এইভাবে যতদিন তাহারা দুনিয়াতে জীবিত ছিল, ...তদিন পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরেশতা একযোগে শাস্তি দান করিবে। ফিরেশতাদের প্রহারে শরীরের ... মাংস সব গুড়াইয়া গলিয়া যাইবে। ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কেই এইরূপ কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে।

...নিয়াতে যাহারা চুরি করিবে, তাহাদের শরীরের যতগুলি জোড়া আছে, প্রত্যেক জোড়া একটি একটি করিয়া কর্তন করা হইবে। সত্তর হাজার ফিরেশতা হাতে চাকু লইয়া এই কাজ করিবে। ...বার সব জোড়া এইভাবে কাটা হইলে কর্তিত স্থানগুলি নূতন করিয়া জোড়া লাগাইয়া আবার উহা

কাটিতে থাকিবে । ইহাছাড়া প্রত্যেক চোরের সর্বাঙ্গ চাকুর দ্বারা কেচিয়া কাটিয়া দেওয়া হইবে যাহার ফলে চোরগণ অস্থির হইয়া ছটফট করিতে থাকিবে ।

যাহারা দুনিয়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, দোজখে তাহাদের জিহ্বার সাথে বাঁধিয়া সত্তর হাজার ফিরেশতা তাহাদেরকে চাবুকের আঘাত করিতে থাকিবেন ।

যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহর সহিত কাহাকেও অংশীস্থাপন করে, তাহাদেরকে সাপ-বিচ্ছু অগ্নিশিখা ও স্ফুলিঙ্গে পরিপূর্ণ অন্ধকারময় ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। প্রত্যেক ঘন্টায় সত্তরবার তাহাদের দেহ নূতন ভাবে গঠন করা হইবে এবং পুনরায় নূতন করিয়া আযাব দেওয়া হইবে। অত্যাচারী ও অহংকারীকে বন্ধ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া দোজখের একেবারে নিম্নতমস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাদেরকে প্রত্যেক ঘন্টায় নিরানব্বই প্রকার নূতন নূতন শাস্তি প্রদান করা হইবে । যাহারা গনিমত (অর্থাৎ যুদ্ধ লব্ধ মাল) চুরি করে, সেই সমস্ত মাল দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দোজখীদেরকে বলা হইবে যে, তোমরা যে সমস্ত মাল চুরি করিয়াছিলে, এখন সেইগুলি উঠাইয়া আন। তখন চোরগণ দোজখে ডুব দিয়া বহু মাল লইয়া উপরে উঠিয়া আসিতেই হাজার হাজার ফিরেশতা লৌহ মুগুর দ্বারা তাহাদের মাথায় আঘাত করিবেন। সর্বক্ষণ তাহারা এইরূপ আযাব ভোগ করিবে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাপীগণ কয়েক হুক্কবা পর্যন্ত দোজখে থাকিবে, কিন্তু ইহা কেহ জানে না যে, কয়েক হুক্কবায় কত সময় হয়। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, আশি হাজার বৎসরে এক হুক্কবা হইয়া থাকে। এক বৎসর হয় তিনশত ষাট দিনে, আর উহার প্রত্যেকদিন বর্তমান দিনের হাজার দিনের সমান।

দোজখীদের সর্বনাশ ঘটিবে। যে মুখ সূর্যতাপ সহ্য করিতে পারে না, উহা দোজখের ভীষণ অনলে দগ্ধীভূত হইবে। সামান্য মাথার যন্ত্রণায় মলম লাগাইতে হয়, সেই মাথায় গরম পানি ঢালা হইবে। যে চোখ সামান্য ব্যথায় অস্থির হইয়া পড়ে, তাহা বিনাশ হইবে। শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা এতটুকু আঘাতে ব্যথায় কুকরাইয়া উঠে, তাহা দোজখের আগুনে পুড়িয়া ভস্মিভূত হইবে। ফিরেশতাদের গুর্জের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পাপীদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা অসংখ্য অগণিত ও সীমাহীন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

হে মাবুদ! তুমি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে তোমার দোজখের আযাব এবং শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখ।

আমীন—ছুম্মা আমীন।

বেহেশত ও বেহেশতের নিয়ামতসমূহ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)এরশাদ করিয়াছেন, দোজখের উপর সাতটি পুল অবস্থিত। ইহার একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথের সমান। পুলের প্রশস্ততা তরবারীর ধারের ন্যায় অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। এই পুল অতিক্রম করিবার কালে প্রথম দলটি চোখের পলকে চলিয়া যাইবে। দ্বিতীয় দলটি বিদ্যুতের ন্যায়, তৃতীয় দলটি ঝঞ্ঝা বায়ুর ন্যায়, চতুর্থ দলটি দ্রুতগামী পাখীর ন্যায়, পঞ্চম দলটি তড়িৎগতি অশ্বের ন্যায়, ষষ্ঠ দলটি দ্রুতগতি লোকের ন্যায় এবং সপ্তম দলটি ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটিয়া এই পুল অতিক্রম করিবে।

এই সব লোক পার হইয়া যাওয়ার পর এক ব্যক্তি পিছনে থাকিয়া যাইবে। তাহাকে বলা হইবে, তুমিও পুল পার হইয়া যাও। যখন সে পুলের উপর পদদ্বয় রাখিবে তখন তাহা কাঁপিতে থাকিবে। সে তখন হামাগুড়ি দিয়া চলিতে থাকিবে। তখন দোজখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার পা পর্যন্ত পৌছিবে। তারপর সে পেটের উপর ভর দিয়া সর্প বিচ্ছুর ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইভাবে চলিতে চলিতে সে দাঁড়াইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার পা কাঁপিতে থাকিবে। তখন সে দুই হাতে পুল জড়াইয়া ধরিবে। এই সময় আগুনও তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে। তখন আবার সে পেটে ভর দিয়া বহু কষ্টে পুল পার হইয়া যাইবে।

পার হইবার পর দণ্ডায়মান হইয়া দোজখের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সে বলিবে, আল্লাহ্তায়ালা
গ্রহ করিয়াই আমার প্রতি এই মেহেরবানী করিয়াছেন। হয়ত আজ পযন্ত আল্লাহ্ এত
নী দয়া আর কাহারও প্রতি করেন নাই। তিনিই আমাকে দোজখের ভীষণ শাস্তি হইতে
ক দান করিয়াছেন।

তঃপর একজন ফিরেশতা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বেহেশতের দরজার সম্মুখস্ত একটি কূপের
কট তাহাকে লইয়া যাইবেন। ফিরেশতা তাহাকে বলিবেন, এই কূপের পানির দ্বারা খুব ভালভাবে
সল কর এবং এই পানি পান কর। রাবী বলেন, ঐ ব্যক্তি সেই পানি পান করিবে এবং গোসল
রিবে। তারপর তাহার দেহে বেহেশতের বাতাস লাগিবে। অতঃপর ফিরেশতা তাহাকে দোজখের
জার পাশে আনিয়া দাঁড় করাইয়া বলিবেন, যতক্ষণ তোমার সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন আদেশ দান না
রিবেন, ততক্ষণ তুমি এখানেই দাঁড়াইয়া থাক।

রে পাক (দঃ) বলেন, এই ব্যক্তি দোজখীদের প্রতি তাকাইয়া দেখিবে এবং তাহাদের কান্নাকাটি
কুরের কান্নাকাটির ন্যায়, তাহার কানে প্রবেশ করিবে। এই অবস্থায় সে ক্রন্দন করিয়া বলিবে, হে
দ! তুমি আমার মুখ দোজখীদের দিক হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া দাও। ইহা ব্যতীত আর কিছুই
মি তোমার নিকট চাহি না। হুযূর (দঃ) বলেন, আল্লাহ্র আদেশে তখন পূর্বোক্ত ফিরেশতা আসিয়া
জখের দিক হইতে লোকটির মুখ ফিরাইয়া বেহেশতের দিকে করিয়া দিবেন।

রে পাক (দঃ) বলেন, সেই ব্যক্তির দণ্ডায়মান স্থল হইতে বেহেশতের দূরত্ব মাত্র একটি
ক্ষেপের জায়গা। সেখান হইতেই সে বেহেশ্তের প্রশস্ততা এবং বেহেশ্তবাসীদেরকে দেখিতে
ইবে। বেহেশ্তের দরজার প্রশস্ত একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন উড়ন্ত পাখীর চল্লিশ বৎসরের রাস্তার
ান। ঐ ব্যক্তি তখন আল্লাহ্র নিকট আরজ করিবে, হে মাবুদ! তুমি দোজখের দিক হইতে
হেশ্তের দিকে আমার মুখ করিয়া দিয়া এবং বেহেশ্ত হইতে মাত্র এক কদম দূরে দাঁড় করাইয়া
া আমার প্রতি অসীম মেহেরবানী করিয়াছ। এখন অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করার
ং দোজখবাসীদের হইতে আমার অন্তরায় সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দাও। ইহার বেশী আর কিছুই
মি তোমার নিকট চাহি না।

ন পূর্বোক্ত ফিরেশতা আসিয়া বলিবেন, তুমি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। ইহার পূর্বেও তুমি আর কিছু
ইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে। হুযূর (দঃ) বলেন, তখন সেই ব্যক্তি বেহেশ্তের চারিদিকে
পাত করিবে। ফলবান বৃক্ষ ব্যতীত আর কিছুই তাহার নজরে পড়িবে না। বৃক্ষ ও তাহার মধ্যকার
ধান মাত্র এক পদক্ষেপ সমান থাকিবে। সে ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যে, প্রত্যেকটি বৃক্ষের
কড় স্বর্ণের, শাখা-প্রশাখা রৌপ্যের এবং পত্র-পল্লবসমূহ সুন্দর অলঙ্কারের মত, যাহা কেহ কোন
 দেখে নাই। তাহার ফল মাখনের চেয়ে অধিক কোমল, মধু অপেক্ষা বেশী মিষ্টি এবং কস্তুরী
পক্ষা বেশী সুগন্ধিময়। হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, এইসব কিছু দেখিয়া সেই ব্যক্তি একেবারে
স্মিত হইয়া যাইবে এবং আরজ করিবে, হে মাবুদ! তুমি আমাকে দোজখ হইতে মুক্তি দিয়া
হেশ্তে প্রবেশ করাইয়াছ এবং আমাকে নানাভাবে অনুগ্রহ করিয়াছ। এই গাছ ও আমার মধ্যে
ান্য ব্যবধান। আমাকে এই গাছের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। ইহার পর আমি আর তোমার কাছে
ন কিছুর দাবী করিব না। তখন সেই পূর্বোক্ত ফিরেশতা আসিয়া বলিবেন যে, তুমি ভারী
্যাবাদী, তুমি ইহার পূর্বেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা ভঙ্গ করিয়াছ। এইভাবে
তিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে তোমার লজ্জা হয় না কি? অতঃপর ফিরেশতা তাহার হাত ধরিয়া একখানি ক্ষুদ্র
হর নিকট তাহাকে লইয়া যাইবেন। লোকটি উহার দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে, উহা মোতির
া নির্মিত।

রে পাক (দঃ) এরশাদ করেন যে, ঐ ব্যক্তি সেই ঘরখানা দেখিবার পর মনে করিবে যে, ইহার
র্বে যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা ইহার তুলনায় অতি নগণ্য অর্থাৎ কিছুই নহে। ঐ ঘরে প্রবেশ করার
্য সে অস্থির হইয়া যাইবে এবং বলিবে, হে মাবুদ! তুমি আমাকে শুধু এই ঘরে প্রবেশের অনুমতি
 কর। ইহার বেশী আর আমি তোমার নিকট কোন কিছুরই প্রার্থনা করিব না। হুযূর (দঃ) বলেন,
ন সেই পূর্বোক্ত ফিরেশতা আসিয়া বলিবেন, তুমি এইবারও তো তোমার ওয়াদা রক্ষা করিতে
রিলে না। তুমি কি বলিয়াছিলে না যে, আর কিছু চাহিবে না। ফিরেশতা এইবার লোকটিকে
িক কিছু বলিলেন না, কারণ তিনি জানেন যে, এই ব্যক্তির অন্তর তাহার আয়ত্তের বাহিরে। এই
র্ব ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখিয়া সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন যে, তখন ফিরেশতা বলিবেন যে, এই ঘরের মালিক তুমিই। অতঃপর লোকটি আরও অনেক কিছু দেখিবে এবং মনে করিবে যে, আমি কি এইসব স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে সে একবারে হতবাক হইয়া পড়িবে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, ফিরেশতা লোকটিকে বলিবেন, তোমার প্রভুর নিকট তোমার আরও কিছু চাহিবার আছে কি? তখন লোকটি বলিবে যে, হে আমার সর্দার! আমি আমার মহান প্রভুর নামে শপথ করিয়াছি। ইহার বেশী আরও কিছু চাহিতে আমার একাধারে লজ্জা ও ভয় হইতেছে। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে বান্দা! তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ কি? দুনিয়া সৃষ্টি করা হইতে উহা ধ্বংস করা পর্যন্ত আমি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি, উহার দশ গুণ তোমাকে দান করিব। লোকটি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ? তুমি রাব্বুল আলামীন মহান প্রভু। আল্লাহ বলিবেন, না ঠাট্টা তামাশা করিব কেন? আমি এইরূপ করিতে সমর্থ। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবার, চাহিয়া লও। তখন লোকটি বলিবে, হে মহান প্রভু! তবে আমাকে তুমি লোকজনের কাছে পৌঁছাইয়া দাও। হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, উল্লিখিত ফিরেশতা তাহাকে হাত ধরিয়া বেহেশতের মধ্যে লইয়া যাইবেন। সেখানে সে এমন সব বস্তু দেখিতে পাইবে, যাহা সে পূর্বে কখনও দেখে নাই বা সেইসব বস্তু সম্বন্ধে কোনদিন কাহারও কাছে কিছু শুনেও নাই। সেই সব বস্তু দেখিয়া সে সিজদায় পতিত হইয়া বলিবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে আলো দান করিয়াছ। ফিরেশতা বলিবেন, তুমি তোমার মাথা উঠাও, যাহা দেখিলে, তাহা তোমার থাকিবার স্থানসমূহের মধ্যে খুবই সামান্য। তখন লোকটি বলিবে, আল্লাহ্ যদি আমার চক্ষুর হেফাজত না করিতেন, তবে এই প্রাসাদের আলোকে আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। অতঃপর ফিরেশতা তাহাকে একটি প্রাসাদের মধ্যে লইয়া যাইবেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই লোকটির এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হইবে। ঐ ব্যক্তির আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সে চুপ হইয়া যাইবে এবং মনে করিবে যে, নিশ্চয় ইনি একজন ফিরেশতা। উক্ত ব্যক্তি লোকটির নিকট আসিয়া তাহাকে সালাম করিয়া বলিবে, এখন তুমি এই প্রাসাদেই থাকিতে পারিবে। লোকটি সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, তুমি কে? ঐ ব্যক্তি বলিবে যে, আমি তোমার গৃহ রক্ষক। আমার ন্যায় আরও এইরূপ হাজার গৃহ রক্ষক রহিয়াছে। তাহারা একেকস্থানে এক একটি ঘরের পাহারাদার। এইসব ঘর শুধু তোমারই জন্য। প্রত্যেকটি ঘরে এক হাজার করিয়া খাদেম রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহে একজন করিয়া অতুলনীয় সৌন্দর্যময়ী হুর-স্ত্রী তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এখন তোমার জন্য এক ঘরে প্রবেশের সময় হইয়াছে। ইহার পরই সে অন্য এক ঘরে উপস্থিত হইবে। গৃহটি শ্বেত মারওয়ারিদ পাথরে তৈরী। এই ঘরে সত্তরটি কোঠা থাকিবে। প্রত্যেকটি কোঠা সত্তরটি দরজা বিশিষ্ট হইবে। প্রত্যেক দরজায় মারওয়ারিদ পাথরের তৈরী একটি করিয়া গম্বুজ থাকিবে। লোকটি উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবে। তাহার পূর্বে এই গৃহে আর কেহ প্রবেশ করে নাই। যেখানে সে লাল জওহরের সত্তর গজ লম্বা এবং সত্তর দরজা বিশিষ্ট আর একটি ঘর দেখিতে পাইবে। উহার কক্ষসমূহ বাসর ঘরের ন্যায় সজ্জিত থাকিবে। এবং উহাতে সুন্দরী হুর উপবিষ্টা থাকিবে। একটি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র হুর তাহাকে সালাম করিবে। লোকটি সালামের জবাব দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তখন হুর বলিবে, আমার সঙ্গ লাভে তোমার সুখী হওয়ার সময় হইয়াছে। আমি আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত তোমারই স্ত্রী।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, আয়নার মধ্যে যেমন নিজের ছায়া দেখা যায়, তেমনি উক্ত হুরের দেহের স্বচ্ছতায় লোকটি নিজের আকৃতি অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। হুর সত্তর প্রকার পোশাক পরিহিতা অবস্থায় থাকিবে। প্রত্যেকটি পোশাকেরই রং ও ধরন ভিন্ন। এই পোশাকও এমনই সূক্ষ্ম, মিহিন ও স্বচ্ছ হইবে যে, উহার ভিতর দিয়া হুরের দেহস্থিত হাড়ের ভিতরকার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে। লোকটি এক দৃষ্টে হুরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কোন মতেই সে তাহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। প্রত্যেকটি হুরই এইরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, আর উহারা প্রত্যেকেই বেহেশতীদের জীবন সঙ্গিনীরূপ হইবে।

হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, বেহেশ্তের এই ধরনের প্রাসাদগুলির তিনশত ষাটটি করিয়া মহল। আর এই মহলগুলি মারওয়ারিদ, ইয়াকুত, জাওহার ও হীরকের দ্বারা নির্মিত। বেহেশতীগণ এই মহলসমূহে প্রমোদলিপ্ত থাকিবে। যখন মহল হইতে বাহির হইবে, দেখিবে,

যতদূর তাহার দৃষ্টি যায়, সকলই তাহার সম্পত্তি। মহলগুলির প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হইবে একশত বৎসরের রাস্তার সমান। প্রত্যেক মহলের দরজার নিকট পৌঁছিতেই তাহার নিকট ফিরেশতা আগমন করিয়া তাহাকে সালাম করিয়া আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রদত্ত তাহাকে উপঢৌকন পেশ করিবেন। এই হাদীসের উক্তির প্রমাণ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ *

প্রাসাদের প্রত্যেক দরজায় ফিরেশতাগণ বেহেশতীদের নিকট আসিয়া বলিবেন, তোমরা যে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলে, উহার প্রতিদানই শান্তি। অতএব আখেরাতের প্রতিদান কতইনা উত্তম। আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا *

ইহাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের জীবিকা প্রস্তুত থাকিবে।

অন্যান্য বেহেশতীগণ উল্লিখিত লোকটির নাম রাখিবে মিসকীন অর্থাৎ দরিদ্র। কেননা এই ব্যক্তির তুলনায় অন্যান্যদের প্রাসাদ সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। অথচ এই মিসকীন লোকটির খাদেমের সংখ্যা হইবে আশি হাজার। ইহারা তাহার আহারের সময়ে উপস্থিত থাকিবে। প্রত্যেক খাদেমের হাতেই একটি করিয়া খাবারের ও একটি করিয়া পানীয়ের পাত্র থাকিবে। প্রত্যেকটি পাত্রেরই আহার্য ও পানীয় দ্রব্য থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের। লোকটি প্রথম লোকমায় যে স্বাদ পাইবে দ্বিতীয় লোকমার স্বাদ তাহা অপেক্ষা কম হইবে না। উহা আকৃতি প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপের হইবে। খেদমতগারদিগকে সেই আহার্য্য ও পানীয়ের অংশ দান করা হইবে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, যাহারা এই ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বেহেশতী হইবে, সে তাহাদের সাথে সাক্ষাত করিতে যাইবে, কিন্তু তাহারা এই লোকটির সাথে দেখা করিতে আসিবে না। ঐ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বেহেশতীদের প্রত্যেকের আট লক্ষ করিয়া খেদমতগার থাকিবে। প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া পান পাত্র এবং আহার্যের বরতন থাকিবে। এই আহার্য ও পানীয় দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের থাকিবে। খেদমতগারগণও এই আহার্য ও পানীয় দ্রব্যের অংশ পাইবে। প্রত্যেক বেহেশতীকে সত্তরজন করিয়া হুর ও দুইজন করিয়া মনুষ্য জাতীয় স্ত্রী দেওয়া হইবে। প্রত্যেক স্ত্রীরই সবুজ ইয়াকুতের একটি করিয়া প্রাসাদ থাকিবে। প্রাসাদের গায়ে লাল ইয়াকুতের কারুকার্য থাকিবে। প্রত্যেক প্রাসাদে সত্তর হাজার দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় একটি করিয়া গম্বুজ থাকিবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর হাজার পোশাক পরিধান করিবে এবং প্রত্যেকটি পোশাকই সত্তর হাজার রং বিশিষ্ট হইবে। কিন্তু উহার একটি রংয়ের সহিত অন্যটির কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, যখন কোন বেহেশতীর মনে জাগিবে যে, আমার অমুক বন্ধু (যাহার সহিত দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব রাখা হইত) কি জানি কেমন আছে! তখন আল্লাহ্ তাহার মনের অবস্থা অবগত হইয়া ফিরেশতাগণকে আদেশ করিবেন, এই ব্যক্তিকে অমুক লোকের নিকট লইয়া যাও। তখন একজন ফিরেশতা একটি উটসহ্ তাহার নিকট আসিয় তাহাকে সালাম করিয়া বলিবেন, আপনি এই উটে আরোহণ করিয়া আপনার বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে চলুন। তখন সেই ব্যক্তি নূরের হাওদা স্থাপিত উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ বেহেশতের বাগান প্রান্তরের মধ্যে দিয়া হাজার বছরের রাস্তা কয়েক পলকের মধ্যে অতিক্রম করিয়া বন্ধুর নিকট উপনীত হইবে। তখন একে অন্যকে সালাম সম্ভাষণ করিবে। আগত বন্ধু বলিবে, বন্ধু কেমন আছ? অন্য বন্ধু বলিবে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ-যিনি আমাদের দুই বন্ধুকে মিলিত করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর তাহারা দুই বন্ধু পরস্পর আলাপালোচনা শেষ করতঃ আল্লাহ্ পাকের প্রশংসাস্তুতি করিতে শুরু করিবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলিবেন, হে আমার বান্দাদ্বয়! এখন ইবাদাতের সময় নয়। বরং প্রার্থনা কর। তোমরা যাহা কিছু চাহিবে, আমি তোমাদিগকে তাহাই দান করিব। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়কে একত্রে রাখ, আল্লাহ্ তাহাদের দোয়া কবুল করিবেন এবং তাহাদের বসবাস করিবার জন্য মারওয়ারিদ পাথরের তাঁবু প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তাহাদের

স্ত্রীদের থাকিবারও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। এখানে তাহারা আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতে থাকিবে।

হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি একটি লোকমা খাদ্য মুখে দিবে। তখন যদি অন্য খাদ্যের দিকে খেয়াল যায় তবে তাহার স্বাদও প্রথম লোকমা চিবাইবার সাথে অনুভব করিতে পারিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! বেহেশতের যমিন কিসের তৈরী? হুযুর (দঃ) বলিলেন, শ্বেতবর্ণের কোমল পাথরের উপর চাঁদির প্রলেপ। উহার উপরিভাগ কস্তুরীর এবং তাহার উপরি ভাগ জাফরানের তৈরী। বেহেশতের প্রাচীর ইয়াকুত, মারওয়ারিদ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী। প্রাচীরগুলি এমন স্ফটিকের মত যে, বাহির হইতে ভিতরের সব কিছু দেখা যায়। বেহেশতের সব প্রাসাদগুলিই এই প্রকার।

বেহেশ্‌তের সবলোকই সিলাই বিহীন পাজামা এবং চাদর পরিধান করিবে। প্রত্যেকের মাথায় ইয়াকুত ও যবরজদ পাথরের কারুকার্যময় ইয়াকুতের তাজ শোভা পাইবে। তা ছাড়া মাথায় স্বর্ণের দুইটি যুলফী ও তাজ এবং গলায় সবুজ ইয়াকুতের পাথর বসানো স্বর্ণের হার থাকিবে। প্রত্যেকের হাতে তিনটি বলয় থাকিবে। তাহার একটি হইবে পান্নার, দ্বিতীয়টি স্বর্ণের এবং তৃতীয়টি হইবে রৌপ্যের। মাথার তাজে ইয়াকুত ও মোতির ঝালর ঝুলানো থাকিবে।

তাহাদের পরিহিত বেহেশতী পোশাকের উপর ছোট একটি কোট এবং তাহার উপরে আর একটি রেশমের কোট থাকিবে। তাহাছাড়াও থাকিবে সুন্দর সুন্দর ছিদরিয়া। বসিবার আসন-তখতের উপর সোনালী কিংখাব ও ঝালর বিশিষ্ট বালিশে হেলান দিয়া বেহেশতীরা অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় উপবেশন করিবে। বেহেশতীদের এই আসন লাল ইয়াকুতের বিছানার উপর স্থাপিত থাকিবে। উক্ত আসনের পায়া থাকিবে মারওয়ারিদের। আসনের উপর বহুমূল্যবান শয্যা এবং প্রত্যেকটি শয্যা সত্তর প্রকার বিভিন্ন রং বিশিষ্ট হইবে। আসনের সম্মুখে সত্তর গজ প্রসারিত এক হাজার বিছানা থাকিবে। আসনের ডানে বামে চন্দন কাঠ নির্মিত সত্তর হাজার কুরসী থাকিবে।

হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বেহেশ্‌তীর পদমর্যাদা নির্বিশেষে হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যও তাঁহারই ন্যায় ষাট গজ লম্বা দেহের অধিকারী হইবে। তাহাদের কাহারই দাড়ি-মোচ থাকিবে না। প্রত্যেকেরই চোখের ও চুলের রং ঘোর কাল হইবে। বেহেশতের রমণীগণও এইরূপ হইবে।

প্রত্যেক বেহেশতী নিজ নিজ ঘরে পরম সুখে শান্তিতে বসবাস শুরু করিলে কোন এক ব্যক্তি সমস্ত বেহেশতীকে আওয়াজ দিয়া বলিবে, তোমরা কি তোমাদের আপনাপন ঘরে সুখে শান্তিতে আছ? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে খুবই আরামপ্রদ স্থানে রাখিয়াছ। আমরা এখান হইতে অন্য কোন স্থানে যাইব না। আর তুমি আমাদেরকে যে নিয়ামত দান করিয়াছ, ইহার বেশী কিছুই আমরা পাইতে চাহি না। এখন শুধু আমাদের একটি আকাঙ্খা তোমার পবিত্র দীদার লাভ করা। আহ্বান শুনা মাত্র কেহ উষ্ট্রে আবার কেহ বা অশ্বে চড়িয়া দারুস সালাম বেহেশতের দরজায় উপস্থিত হইবে এবং ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করিবে। অনুমতি পাপ্তি মাত্র তাহারা বেহেশতের দরজায় পা রাখিবে। এই মুহূর্তে আরশে মুআল্লার নীচ হইতে মুশীরাহ নামক এক প্রকার বাসন্তি হাওয়া বহিতে থাকিবে।

এই সময় সমস্ত লোকই আল্লাহ্‌র আরশ এবং কুরসীর দিকে তাকাইয়া থাকিবে। সেখানে তাহারা একটি উজ্জ্বল নূর দেখিতে পাইবে। এই নূর আল্লাহর তাজাল্লি ছাড়াই চমকিতে থাকিবে। অতঃপর বেহেশ্‌তীরা বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রভু! তুমি পবিত্র মহান। হে ফিরেশ্‌তা এবং আত্মাসমূহের প্রভু! প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান শুধু তোমারই জন্য সুনির্দিষ্ট। তোমাকে দর্শন করার শক্তি আমাদের চক্ষুকে দান কর। আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ করিবেন, নূরের পর্দা সরাইয়া দাও। তখন পর্দা তুলিয়া ফেলা হইবে। প্রত্যেকটি পর্দা অন্যটি হইতে সত্তর গুণ বেশী উজ্জ্বলতর হইবে। তাহার পর আল্লাহ্‌র জ্যোতি বান্দদের উপর প্রতিফলিত হইবে। আল্লাহ্‌র জ্যোতি প্রকাশ পাইতেই সকলে সিজদায় পতিত হইয়া বলিবে, হে প্রভু! তুমিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। তুমি আমাদেরকে দোজখের আগুন হইতে মুক্তি প্রদান করতঃ শান্তিময় স্থান দান করিয়াছ। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, বেহেশ্‌তে সাতটি স্তর হইবে। প্রতি দুইটি স্তরের মধ্যে একজন আমীর বা নেতা হইবেন। প্রত্যেক বেহেশ্‌তীই স্বীয় পদ মর্যাদা দেখিবে। বেহেশ্‌তের মধ্যে জর্দা, জাফরান এবং শ্বেত মেশকের অনেক পাহাড় থাকিবে। বেহেশ্‌তীরা পানাহার করিবে, কিন্তু তাহাদের পেশাব-পায়খানা বা থুথু ফেলিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহারা কখনও রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ হইবে না। হুযূর (দঃ) বলেন, বেহেশ্‌তের সর্বশ্রেণীর লোকেরাই পানাহার করিবার পূর্বে অন্ততঃ দুই ঘন্টা বালিশ হেলান দিয়া আরাম করিবে। তাহাছাড়া দুই ঘন্টা নির্জনে সর্বমোট চারি ঘন্টা আল্লাহর গুণকীর্তনে মশগুল থাকিবে। দুই ঘন্টা পরস্পরের মধ্যে আলাপালোচনায় অতিবাহিত করিবে। বেহেশতে দিবা-রাত্রি হইবে। তবে বেহেশতের রাত্র দুনিয়ার দিবা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশী উজ্জ্বল হইবে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তের সর্বনিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এমন হইবে যে, দুনিয়ার সমস্ত জ্বিন ও ইনসান তাহার গৃহের মেহমান হইবে তাহাদিগকে বসিতে দিবার জন্য কুরসী সংগ্রহে অন্যের কাছে যাইতে হইবে না, এবং মেহমানদের আদর যত্ন ও আপ্যায়নাদির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদেম ও পরিচারক আদি প্রত্যেকের নিজেরই থাকিবে। এ জন্য অন্য কাহারও নিকট ধর্ণা দিতে হইবে না।

বেহেশ্‌তের বাগিচার বৃক্ষসমূহের মধ্যে কোনটি যমরুদের, কোনটি রৌপ্যের, কোনটি ইয়াকুতের আবার কোনটি বা যবরজদের হইবে। শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবগুলিও তদ্রূপ হইবে। বৃক্ষসমূহের ফলগুলি মাখন অপেক্ষা নরম ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। প্রত্যেক বৃক্ষ দৈর্ঘ্যে পাঁচশত বৎসরের রাস্তার সমান। গুড়িগুলি সত্তর বৎসরের রাস্তার সমান মোটা। কেহ গাছের দিকে দৃষ্টি করিলে উহার সর্বোচ্চ শাখা ও ফলগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইবে। প্রত্যেক গাছের ফল সত্তর হাজার রকমের এবং প্রত্যেকটি ফল বিভিন্ন স্বাদযুক্ত হইবে। কোন ফল খাওয়ার ইচ্ছা মনে হওয়া মাত্র উক্ত ফলযুক্ত শাখাটি আপনা হইতে নীচু হইয়া তাহার নাগালের মধ্যে আসিয়া যাইবে। যে ফলটি পাঁচশত বৎসরের দূরত্বে থাকিবে, ইচ্ছা করিলে তাহা বসার স্থানে থাকিয়াই হাত দিয়া ছিঁড়িতে পারিবে। যদি হাত বাড়াইতেও মনে ইচ্ছা না হয়, তবে উহা আপনিই বোটা হইতে খসিয়া মুখের মধ্যে আসিয়া যাইবে। এইভাবে গাছের ফলটি শূন্য হইবার সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা উহার জায়গায় আর একটি ফল সৃষ্টি করিয়া দিবেন। বেহেশতের কোন কোন বৃক্ষে ফলের বদলে থাকিবে মোটা রেশমি বস্ত্র। আবার কোন কোন বৃক্ষে থাকিবে মেশক এবং কর্পূরের থলে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, শুক্রবার আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সাক্ষাত দান করিবেন। তিনি আরও বলেন, বেহেশ্‌তের একটি তাজ আসমানে ঝুলাইয়া দিলে তাহার আলোতে প্রখর সূর্যের তেজও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। হুযূরে (দঃ) আরও বলেন, বেহেশ্‌তের প্রাসাদনিম্নে মিঠা পানি, দুধ, শরবত এবং মধু এই চারিটি বস্তুর ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। উহা হইতে পান করিবার পর মুহূর্তেই উহাতে মেশকের সীল মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। যে ঝর্ণা হইতে পান করিবে উহা বেহেশ্‌তের মূল ঝর্ণা ধারার সহিত যুক্ত থাকিবে। উহার নাম "যানজাবীল, তাসনীম এবং কাফুর। আল্লাহ্ পাকের বিশিষ্ট বান্দাগণ বিশেষ বিশেষ ঝর্ণার পানি পান করিবেন।

হুযূরে পাক (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তীদের একজন অন্যজনের সহিত হাজার বা ততোধিক বৎসরের *রাস্তার পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করিয়াও সাক্ষাত করিতে যাইবে। সাক্ষাত করিয়া আসিয়া অতি* সহজেই সে আবার তাহার নিজের প্রাসাদ অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারিবে। হুযূরে পাক (দঃ) আরও বলেন যে, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করার পর সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে প্রত্যেককে একেকটি আনার উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হইবে। উক্ত আনারে সত্তর হাজার বিভিন্ন রং বিশিষ্ট সত্তরটি দানা থাকিবে।

আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের পর ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহারা বেহেশ্‌তের বাজারে বেড়াইবে। সেখানে কিছু বেচাকিনা হইবে না। বাজারে নানাবিধ কাপড়, অলঙ্কার ও নানা প্রকার কারু কার্য খচিত পোশাক-পরিচ্ছদ থাকিবে। উহা তাহারা সেখান হইতে যত ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিবে। সেই বাজারে মানুষের আকৃতির ছবিও পাওয়া যাইবে। ছবির গলায় এক টুকরা কাগজে লিখিত থাকিবে, কোন ব্যক্তি আমার আকৃতিতে পরিবর্তিত হইতে চাহিলে আল্লাহ্ তাহাকে আমার ন্যায় করিয়া দিবেন। অতএব কোন ছবির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইতে চাহিলে আল্লাহ্ তাহাকে তেমনই করিয়া

বেন। তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় খাদেমগণ কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাদেরকে আদবের সাথে সালাম করিবে। তাহাদের আগমনের খবর এক খাদেম অন্য খাদেমকে পৌঁছাইয়া দিবে। তাহাদের স্ত্রীগণও তাহাদের আগমনের খবর জানিতে পারিবে। স্বামীর আগমনবার্তা শুনিয়াই তাহারা দরজায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং স্বামীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। স্বামীকে সালাম করিয়াই স্বামীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইবে এবং এই অবস্থায়ই তাহারা শয়ন কক্ষে পৌঁছিবে। হুযুর (দঃ) বলেন, যদি বেহেশতের কোন নারী নজরে আসে, তবে আল্লাহ্‌র ফিরেশতা ও নবী-রসূলদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাহার প্রতি আসক্ত হইবেন না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতী আহার্য এবং তুহুরে দেহাক নামক শরবত তৃপ্তি সহকারে পান করার কিছুক্ষণ পরই আহার্য বস্তু হজম হইয়া যাইবে। ঢেকুর হইতে কস্তুরীর ঘ্রাণ নির্গত হইবে। যত বেশী আহার করুক না কেন পেটে কোনরূপ পীড়া দেখা দিবে না।

শরবত পান করার পরই আবার বেহেশতীদের খাইবার ইচ্ছা হইবে। তাহারা সর্বদাই এইরূপ আহার করিবে ও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে থাকিবে। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, জান্নাতে আদন ও দারুস সালাম নামক দুইটি বেহেশত আছে। এই বেহেশ্‌তের প্রাসাদসমূহের বহির্ভাগ স্বর্ণের এবং ভিতরের অংশ যবরজদ পাথরের দ্বারা তৈরী। উহার মিনারগুলি লাল ইয়াকুতের এবং উহার বালাখানাসমূহ মোতির মালা দ্বারা সজ্জিত।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতী লোকেরা যখন স্ত্রীসহবাস করিবে, উহাতে তাহাদের সাত বৎসর সময় লাগিবে। শেষ হইবা মাত্রই তাহাদের দ্বিতীয় মহল হইতে দ্বিতীয় স্ত্রী তাহাদিগকে আহ্বান জানাইবে। তাহারা তখন প্রশ্ন করিবে, তুমি কে? স্ত্রী উত্তর করিবে, আমার সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, 'কেহই জানে না, তাহার চোখের তৃপ্তির জন্য কোন বস্তু গোপনভাবে রাখা হইয়াছে।' এই কথা শুনিয়াই সে তাহার মহলে প্রবেশ করিবে এবং আবার তাহার সঙ্গে সাত বৎসর সঙ্গমসুখ লাভ করিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বেহেশ্‌ত মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, কোন অশ্বারোহী একাধারে সাতশত বৎসর পর্যন্ত উহার ছায়ায় চলিলেও সেই ছায়া শেষ হইবে না। উহার নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইতেছে। বৃক্ষের প্রত্যেকটি শাখার একটি শহর আছে। প্রত্যেকটি শহরের পরিধি দশ হাজার ক্রোশ। এক শহর হইতে অন্য শহরের দূরত্ব দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। এই শহরগুলির মধ্য দিয়া যানযাবীল নামক ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। বৃক্ষটির পাতাগুলি এতবড় যে, উহার একটি পাতা দ্বারা বিরাট জনপদকে ছায়া প্রদান করা যায়। হুযুর (দঃ) বলেন, বেহেশ্‌তীরা যখন স্ত্রীর নিকট গমন করিবে, তখন স্ত্রী বলিবে, যিনি আপনার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, বেহেশ্‌তে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আপনি অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়। পক্ষান্তরে স্বামীও স্ত্রীকে এইরূপ আদর-সোহাগের কথা বলিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় একে অন্যের সহিত ভালবাসা রাখে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে আদন নামক বেহেশ্‌তের একটি প্রাসাদে একত্রিত করিবেন। এই প্রাসাদ লাল ইয়াকুত পাথরের নির্মিত। উহার স্থূলতা সত্তর হাজার বৎসরের রাস্তার সমান। আদন বেহেশ্‌তের এই ঘরটি ইহার অন্যান্য ঘরগুলি অপেক্ষা উচ্চ থাকিবে। এই ঘরের দরজায় নূরের হরফে লিখিত থাকিবে, যাহারা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষের সাথে বন্ধুত্ব রাখিত। হঠাৎ তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত হইয়া উঠিবে। বেহেশ্‌তী হুরীগণ আহারাদির পর মিষ্টি এবং স্পষ্টসুরে নিম্নরূপ গান করিবে।

আমরা বেহেশ্‌তবাসিনী, আমাদের মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, আমরা সর্বাবস্থায় নিরাপদ, আমাদের ক্রোধ নাই, আমরা চিরযৌবনা, বার্ধক্য আমাদের জন্য নয়। আমাদিগকে সর্বক্ষণের জন্য পোশাক দান করা হইয়াছে। আমরা কখনও উলঙ্গ থাকিব না। আমরা সৌন্দর্যময়ী, আমরা মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের সহধর্মিণী।

হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশ্‌তের পাখীদের সত্তর হাজার করিয়া ডানা হইবে। প্রত্যেকটি ডানা ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের থাকিবে। প্রত্যেকটি পাখীর আকৃতি এক মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল প্রস্থ হইবে। কেহ পাখী খাওয়ার ইচ্ছা করিলে উহা আপনা হইতে উড়িয়া আসিয়া পাত্রে পড়িবে। উক্ত পাখী হইতে সত্তর প্রকার রান্না করা ও ভুনা করা ব্যঞ্জনে পরিণত হইবে। উহা যেমনই উপাদেয়, তেমনি সুস্বাদু হইবে। আহার করা শেষ হওয়া মাত্রই উক্ত পাখী আবার পালক ঝাড়িয়া উড়িয়া যাইবে। এই সমস্ত পাখী এবং চতুষ্পদ জন্তুসমূহ বেহেশতে বিচরণ করিবে।

হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, বেহেশ্‌তীরা যখন আল্লাহর দর্শন আশায় দারুস সালামে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে স্বর্ণের আংটি প্রদান করা হইবে। উহা তাহারা সর্বক্ষণ ব্যবহার করিবে। আল্লাহর দীদার এবং পানাহারের পর আল্লাহ্ তায়ালা হযরত দাউদ (আঃ)-কে বলিবেন, মিষ্টিস্বরে আমার প্রশংসা কর। হযরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে নানা ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। তারপর সকলেই আপনাপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। হুযূর (দঃ) বলেন, প্রত্যেকেরই তুবা নামক একটি বৃক্ষ থাকিবে। উত্তম কাপড় পরিধান করিবার ইচ্ছা হইলে সেই বৃক্ষের নিকট যাইবে। বৃক্ষের আবরণ খোলা হইবে। তাহাতে ছয়টি কোঠা থাকিবে। প্রত্যেক কোঠায় সত্তর প্রকার রংয়ের কাপড় থাকিবে। তথা হইতে ইচ্ছানুযায়ী কাপড় লইয়া পরিধান করিবে।

হুযূরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশ্‌তী রমণীদের গলার হারে লিখিত থাকিবেঃ ওহে বেহেশ্‌তী পুরুষ! আমি তোমার প্রিয়তমা আর তুমি আমার প্রিয়তম তোমার সেবা যত্ন অবশ্যই আমাকে করিতে হইবে। আমার অন্তঃকরণ কপটতাশূন্য। পুরুষ যখন স্ত্রীর বক্ষদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন সে তথায় নিজের অন্তর দেখিতে পাইবে। একইভাবে স্ত্রীও স্বামীর বক্ষদেশের ভিতরে নিজের অন্তর দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ একের দ্বারা অন্যের আয়নার কাজ দিবে। হুযূর (দঃ) বলেন, বেহেশ্‌তী লোকেরা উষ্ট্র বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিবে। বাহনগুলি খুবই দ্রুত গতিশীল হইবে। উক্ত উষ্ট্রের রশি ও ঘোড়ার লাগামগুলি মারওয়ারিদ ও যবরজদ নামক বেশ কিমতি পাথরের তৈরী হইবে।

আল্লাহর পবিত্র বাণী

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করিয়াছেনঃ

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا *

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের প্রতি ঐ দিনের অমঙ্গল হইতে দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং আনন্দ ও সজীবতা তাহাদের সামনে পেশ করিয়াছেন।

দৃষ্টি রাখার অর্থ হইল, রোজ কিয়ামতের হিসাবের কঠোরতা এবং দোজখের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদ রাখা। রোজ কিয়ামতে উনিশজন ফিরেশতা (ও তাহাদের সঙ্গীরা) দোজখকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া হাশরের মাঠে আনিবেন। ইহারা সকলেই যারপর নাই নির্মম এবং রুক্ষ স্বভাব সম্পন্ন। তাহাদের বড় বড় দাঁতগুলি মুখের বাহিরে আসিয়া থাকিবে এবং সেগুলি জ্বলন্ত ভাটার মত জ্বল জ্বল করিবে। তাহাদের গায়ের রং অগ্নি শিখার ন্যায় কড়া লাল হইবে। উহাদের নাকের ছিদ্র হইতে ধূম্র এবং অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিবে। এই ফিরেশতাগণ সর্বদাই আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে প্রস্তুত থাকিবেন। দোজখের ফিরেশতাগণ তাহাদের সাহায্যকারীদের সাথে দোজখকে সুদৃঢ় ভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া ডানে বামে টানিতে থাকিবেন। আবার কখনওবা লৌহ মুগুর হাতে লইয়া দোজখের পিঠের উপর দণ্ডায়মান হইবেন।

দোজখ লৌহ মুগুর দেখিয়া চলিতে শুরু করিবে এবং ভীষণ ক্রোধের সাথে লোকের দিকে চাহিয়া হুঙ্কার দিবে। এ সময় দোজখ হইতে ভীষণ কালোবর্ণের ধূম্র এবং অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে থাকিবে ও উহা সজোরে চীৎকার আরম্ভ করিবে। এমনি অবস্থায় বেহেশ্‌ত ও সৃষ্ট মাখলুকের মধ্যবর্তী স্থানে দোজখকে আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। এই সময় দোজখ হাশরবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে করিবে যে, তিনবার আক্রমণ করিয়া সকলকেই গিলিয়া ফেলিবে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ফিরেশতাগণ উহাকে কঠিন ভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, এসময়

যদি দোজখকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে যে কাফির মু'মিন নির্বিশেষে সকলকেই গিলিয়া ফেলিবে। দোজখকে এভাবে বাধা দান করায় সে তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবে। ইহার পর সে তখন প্রথমবার নিঃশ্বাস করিবে, দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিবে। সেই আওয়াজ শুনিয়া হাশর প্রান্তরের লোকগণ কাঁপিয়া উঠিবে এবং তাহাদের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইবে। তাহারা বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। দ্বিতীয়বার যখন সে নিঃশ্বাস ফেলিবে, তখন সমস্ত ফিরেশতা, নবী-রসূল এবং অন্যান্য হাশরবাসী ভয়ে, আতঙ্কে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। ইহার পর দোজখ আরও একবার নিঃশ্বাস ফেলিবে, তাহাতে সকলেরই চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে থাকিবে। অশ্রুপাতে সকলেরই চক্ষু একেবারে অশ্রুশূন্য হইয়া যাইবে। ইহার পর আবার যখন সে নিঃশ্বাস ফেলিবে তখন সমস্ত জ্বিন ও ইনসান যদিও তাহাদের সৎকর্মসমূহ কোন কোন নবীদের সত্তরজনের সৎকর্মের সমান তবুও তাহারা মনে করিবে যে, আজ আর নিস্তার নাই। ইহার পনের বারের নিঃশ্বাস ত্যাগে সকলেরই দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে। হযরত জিব্রাইল, মিকাইল এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরশের পায়ার সহিত ঝুলন্ত অবস্থায় কোনরূপে আত্মরক্ষা করিবেন এবং ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করিতে থাকিবেন। তারপর দোজখ আসমানের নক্ষত্রের ন্যায় অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ উদগীরণ করিতে থাকিবে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিরাটাকার মেঘের সমতুল্য হইবে এবং এগুলি উলকাপাতের মত পাপীদের মাথার উপর অনবরত বর্ষিত হইতে থাকিবে।

যাহারা আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করিবে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তাহাদেরকে এই সমস্ত আযাব হইতে রক্ষা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্‌র হক আদায়ে সজাগ থাকিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন। তাহাদের হিসাব-নিকাশ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে এবং চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তে স্থান দান করা হইবে। কাফির, মুশরিক ও মূর্তিপূজকদিগকে শাস্তির পর শাস্তি এবং ভীতির পর ভীতি প্রদান করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের মুখে আনন্দ এবং সজীবতা প্রকাশ পাইবে এবং অন্তরে প্রসন্নতা বিরাজ করিতে থাকিবে। মু'মিন ব্যক্তি কবর হইতে উঠিতেই তাহার সামনে এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিবে। সেই ব্যক্তির মুখমণ্ডল সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। মাথায় মুকুট এবং পরিধানে পাক-পবিত্র শ্বেত বসন শোভা পাইবে। মু'মিন ব্যক্তি এই সৌন্দর্যময় পুরুষের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। ঐ লোকটি নিকটে আসিয়া মু'মিন ব্যক্তিকে সালাম করিবে। এই ব্যক্তি সালামের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? তুমি কি আল্লাহ্‌র কোন ফিরেশ্‌তা? সে বলিবে, আমি কোন মানুষও নহি বা কোন ফিরেশতাও নহি। আবার প্রশ্ন হইবে, তবে তুমি কি আল্লাহ্‌র কোন নবী-রাসূল? না, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি সে সব কিছুই নহি। আমি তোমার কৃত সৎকাজ। তুমি দোজখের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছ, এই শুভ-সংবাদ তোমাকে পৌঁছাইবার জন্য এবং তোমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। মু'মিন ব্যক্তি বলিবে, তুমি কি জানিয়া শুনিয়াই আমাকে এই শুভ-সংবাদ দিতে আসিয়াছ? সে বলিবে, হাঁ, আমি এই সংবাদ ভালরূপে অবগত আছি। তুমি আমার উপর আরোহণ কর। মু'মিন ব্যক্তি বলিবে, সুবহানাল্লাহ! তোমার মত বোযর্গ ব্যক্তির উপর আমি কিভাবে সওয়ার হইব? সে বলিবে, দুনিয়াতে আমি বহুদিন তোমার উপর সওয়ার ছিলাম। এখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানার্থে তুমি আমার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া বস।

মু'মিন ব্যক্তি সওয়ার হইতেই সেই সৎকাজ বলিবে, তুমি ভয় করিও না। তোমাকে আমি বেহেশ্‌তে লইয়া যাইতেছি। এই কথায় মুমিন ব্যক্তির অন্তরে আনন্দের ঢেউ জাগিবে এবং খুশীতে মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এই খুশী ও আনন্দ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী-ই হইবে।

পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তি কবর হইতে উঠিয়াই সামনে এক ভীষণ কদাকার ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে। কদাকার ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় নীলবর্ণ এবং দেহ অন্ধকার রাত অপেক্ষাও বেশী অন্ধকার হইবে। উহার দেহের দুর্গন্ধে পেটের নাড়ি-ভুড়ি বাহির হইয়া আসিতে চাহিবে। কাফির ব্যক্তি মুখ ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তুই কে বল তো আমাকে! এই অবস্থা দেখিয়া কদাকার ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আমার নিকট হইতে কোথায় যাইতেছিস? তুই আমার এবং আমি তোর। কাফির ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহ তোকে বিনাশ করুক। তুই কি শয়তান? সে বলিবে, আল্লাহর শপথ, আমি শয়তান নই বরং তোর অসৎ কাজ। কাফির ব্যক্তি বলিবে, তুই নিপাত যা, এখানে তোর কি দরকার শুনি? সে বলিবে, আমি তোমার উপর সওয়ার হইব। কাফির বলিবে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি আমার নিকট

হইতে চলিয়া যাও। তুমি কি মানুষের সম্মুখে আমাকে লজ্জিত করিতে চাও? তখন কদাকার ব্যক্তি বলিবে, আমি অবশ্য সওয়ার হইব। দুনিয়াতে তুমি আমার উপর সওয়ার ছিলে। আর আজ আমার সওয়ার হওয়ার পালা।
হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, অবশেষে সেই ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির পিঠে আরোহণ করিবে। এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআন মজীদে এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلَاسَاءَ مَا يَزِرُوْنَ *

অর্থাৎ কাফির নিজের পিঠে পাপ বহন করিবে, হে লোকগণ! তোমরা সতর্ক হও। কাফিরগণ যাহা পিঠে বহন করিবে তাহা খুবই খারাপ বস্তু।
আল্লাহ্ স্বীয় প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে বলেন, তাহাদিগকে শুভ-সংবাদ দেওয়ার পর তাহাদিগকে বেহেশ্ত দান করিয়াছি এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়াছি। তাহারা বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়াছে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দ্ধারিত তাকদীদের উপর বিশ্বাস রাখিয়াছে? এই কারণেই এই প্রতিদান বেহেশ্তে প্রবেশ করার পর তাহারা বেহেশ্তের নিয়ামত প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ্ বলেন, ইহারা বেহেশ্তের মধ্যে কুরসীর উপর বালিশে হেলান দিয়া উপবেশন করিবে এবং তাহাদের মাথার উপরে চাঁদোয়া থাকিবে। বেহেশ্তের মধ্যে শীত বা গরম থাকিবে না। বেহেশ্তীরা যখন ফল খাওয়ার ইচ্ছা করিবে, তখন তাহারা উপবিষ্ট, দাঁড়ানো বা শায়িত যে কোন অবস্থায়ই থাকিবে না কেন, খাইতে পারিবে। কেননা, ফলবান বৃক্ষ তাহাদের ইচ্ছা মতই তাহাদের নিকট চলিয়া আসিবে। যার ফলে তাহারা ইচ্ছা মতই ফল খাইতে পারিবে। খাওয়ার পর আবার বৃক্ষ যথাস্থানে চলিয়া যাইবে।
আল্লাহ্ বলেন, বেহেশ্তে তাহাদেরকে শরবত পান করানো হইবে। গ্লাসে ভর্তি যে শরবত পান করিবে উহা পার্থিব শরবতের মত নয় এবং উক্ত গ্লাসও পার্থিক গ্লাসের মত নয়। আল্লাহ্ বলেন, বেহেশ্ত মধ্যে সালসাবীল নামক একটি প্রবাহিত ঝর্ণা রহিয়াছে। উহার মূল উৎস আদন নামক বেহেশ্ত এবং সব বেহেশ্তের মধ্য দিয়াই উহা প্রবাহিত। সব বেহেশ্তবাসীই উহা পান করিবে। আল্লাহ বলেন, এখানকার (বেহেশ্তের) গেলমান অর্থাৎ বালকেরা না বৃদ্ধ হইবে, না বয়স্ক হইবে! ইহারা অত্যন্ত সুশ্রী ও কম বয়সী খাদেম। সর্বদা সেবা-যত্নের জন্য চারি পাশে আনাগোনা করিবে। তাহাদেরকে অসংখ্য ছড়ানো সুন্দর মোতির মত মনে হইবে। আল্লাহ্ বলেন, যখন তোমার নজর বেহেশ্তের উপর পড়িবে, তখন মনে হইবে যে, উহা একটি অনন্ত প্রসারিত রাজ্য।
একটি বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক বেহেশ্তীর একটি করিয়া বিরাটাকার প্রাসাদ থাকিবে, উহার ভিতর সত্তরটি ঘর এবং প্রত্যেক ঘরে সত্তরটি করিয়া কক্ষ থাকিবে। প্রত্যেকটি কোঠা জোড় মারওয়ারিদ পাথর নির্মিত হইবে এবং প্রত্যেকটি ঘরের উচ্চতা এবক্রোশ এবং উহার প্রশস্ততা কয়েক ক্রোশ পরিমাণ। আর উহার চারি হাজার করিয়া স্বর্ণের দরজা থাকিবে এবং গৃহমধ্যে ইয়াকুতের একখানা সিংহাসন থাকিবে। উক্ত সিংহাসনের চারিপাশে চারি হাজার স্বর্ণ নির্মিত কুরসী থাকিবে। কুরসীর পায়াগুলি থাকিবে ইয়াকুত নির্মিত। সিংহাসনের উপর নানাবিধ রংয়ের সত্তর প্রকার বিছানা থাকিবেঃ বেহেশ্তীরা বামহাতে বালিশে হেলান দিয়া উহাতে উপবেশন করিবে। বেহেশ্তীদের গায়ে আটসাট সত্তরটি জামা থাকিবে। তাহাদের ললাটে একটি রাজকীয় সনদ লাগানো থাকিবে। উক্ত সনদ ইয়াকুত ও যমরূদ পাথর শোভিত থাকিবে। সত্তরটি মারওয়ারিদ পাথর লাগানো একটি তাজ বা মুকুট শোভা পাইবে। উহার একেকটি পাথরের মূল্য দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মূল্য অপেক্ষাও অধিক।
হস্তে স্বর্ণ, মারওয়ারিদ ও রৌপ্যের কঙ্কন এবং পায়ের আঙ্গুলে অতি মনোরম পাথর বসানো আংটি শোভা পাইবে। একেকজন বেহেশ্তীর জন্য দশ হাজার করিয়া কিশোর খাদেম খেদমতের জন্য মোতায়েন থাকিবে। সম্মুখে ইয়াকুতের খাঞ্চা রক্ষিত থাকিবে। দস্তরখানের দৈর্ঘ্য হইবে কয়েক ক্রোশ। প্রত্যেক দস্তরখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সত্তর হাজার বরতন থাকিবে। প্রত্যেক বরতনে সত্তর হাজার প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকিবে। যখন কোন বেহেশতী খাদ্যের লোকমা মুখে তুলিবে, তখন তাহার মনে অন্য কোন প্রকার খাদ্যের খেয়াল আসিলে ঐ লোকমায়ই সেই খেয়ালকৃত খাদ্যের স্বাদ অনুভব করিবে। সামনে দাঁড়ানো গেলমানদের হাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্লাস থাকিবে এবং বরতনসমূহ মিষ্টি পানি ভর্তি থাকিবে। পানি চল্লিশ ব্যক্তির পান করিবার উপযোগী হইবে। আহারের পর সেই পানি তৃপ্তি সহকারে পান করিবে।

হইবার পরে বেহেশ্তীরা ঢেকুর তুলিবে, সাথে সাথে আবার আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের অন্তরে খাইবার ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। অতএব পুনরায় তাহারা পানাহারে লিপ্ত হইবে। এ সময়ে একেকটি উটের সমান পাখীর দল তাহাদের সামনে আসিয়া মধুর স্বরে গান গাহিতে থাকিবে। বেহেশ্তীরা গভীর মনোযোগের সহিত ঐ পাখীর গান শ্রবণ করিবে। উহাদের মধ্যে যে পাখীর স্বর অতিশয় মিষ্টি তাহাকে তাহাদের খাওয়ার ইচ্ছা হইবে। আল্লাহ্ সে ইচ্ছা অবগত হইবেন। এতাবস্থায় পাখীটি স্বেচ্ছায় আসিয়া বরতনে পড়িবে। আপনা হইতে পাখীটি রান্না ও ভুনায় পরিণত হইবে। বেহেশ্তীরা তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরই পাখীটি জীবিত হইয়া আবার উড়িয়া উহার স্বস্থানে চলিয়া যাইবে।

বেহেশতীরা পানাহারের পর নিজেদের আসনে উপবেশন করিবে। উহাদের হুর-স্ত্রী তখন সামনে থাকিবে। তাহাদের মনে তখন সহবাস ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু লজ্জায় মুখে কিছু বলিবে না। কিন্তু হুর-স্ত্রী অতিশয় বুদ্ধিমতি। সে স্বামীর মনের অবস্থা আন্দাজ করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য সে তখন স্বামীর কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া সোহাগ ভরে বলিবে, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ হউক। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি যে তোমার এবং তুমিও আমার। তুমি লজ্জা করিতেছ কেন? স্ত্রীর মুখের উক্তি শনিয়া বেহেশতী পুরুষ তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিবে। এ সময় তাহার মধ্যে দুনিয়ার একশত এবং আখেরাতের চল্লিশজন পুরষের শক্তি সৃষ্টি হইবে। সে তাহার স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে কুমারী প্রাপ্ত হইবে। তাহারা স্বামী স্ত্রী একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সঙ্গমসুখ লাভে বিভোর থাকিবে। সহবাস শেষে তাহাদের কাহারও বীর্যপাত হইবে না। বরং বাতাসের একটি বস্তু নির্গত হইবে, তাহাতে কস্তুরীর মত সুঘ্রাণ থাকিবে। বেহেশ্তী পুরুষদের ঐ সমস্ত স্ত্রীদের প্রত্যেকের সত্তর জন করিয়া খাদেম ও খাদেমা থাকিবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশ্তের কোন খাদেম বা দাসী যদি দুনিয়াতে আগমন করে, তবে তাহাকে লাভ করার জন্য মানুষের মধ্যে খুনাখুনি শুরু হইয়া যাইবে। হুরদের কেশরাশি দুনিয়াতে খুলিয়া দিলে তাহার আলোর নিকট সূর্যের আলো ম্লান হইয়া যাইবে। হুযুর (দঃ) বলেন, বেহেশতী ব্যক্তি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা সত্তরটি জামাসহ একজন ফিরেশতা তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। জামাগুলি হইবে বিভিন্ন রংয়ের। উহা এত সূক্ষ্ম এবং মিহিন হইবে যে, সবগুলি জামা ফিরেশ্তার দুই আঙ্গুলের চাপায় ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ফিরেশ্তা দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখিবেন, দ্বাররক্ষক বাড়ী পাহারা দিতেছেন। এইরূপ সত্তরজন দ্বাররক্ষকের অনুমতি লইয়া ফিরেশ্তা গৃহস্বামীর নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাহাকে সালাম জানাইয়া বলিবেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে পাক শরবত পান করাইবেন। বেহেশ্তের দরজার সামনে একটি বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে দুইটি ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত আছে। মুমিন লোকগণ পুলসিরাত পার হইয়া উক্ত ঝর্ণা ধারার নিকট গিয়া গোসল করিবে। সেই পানি হইতে সুগন্ধ কস্তুরীর ঘ্রাণ আসিবে।

বেহেশ্তীদের দেহের উচ্চতা ষাট গজ হইবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান উচ্চ হইবে। পুরুষগণ সকলেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তঃকরণের ন্যায় পাক-পবিত্র হইবে। সকলের ভাষা আরবী হইবে। অতঃপর বেহেশতের দরজায় পা রাখিতেই ফিরেশতাগণ সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাহার জন্য নির্ধারিত প্রাসাদে তাহাকে লইয়া যাইবেন। সেখানে সে হুর ও খাদেম পরিবেষ্টিত হইয়া আল্লহ্র অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
মুবারক দিন ও মাসের ফজীলত

পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرَ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ *

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গ্রন্থে মাসের সংখ্যা বার। যে দিন হইতে আল্লাহ্ তায়ালা যমিন ও আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আল্লাহ্ চারিটি মাসকে হারাম অর্থাৎ অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। যাহার অর্থ উক্ত চারিটি মাসে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ।

অত্র আয়াতের শানে নুযুল হইল মক্কা বিজয়ের পূর্বে একবার মুসলমানগণ মদীনা হইতে মক্কা রওয়ানা হইলেন। তবে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এই অবৈধ মাসেই না জানি মক্কার কাফিরগণ তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন। অবৈধ মাস চারিটি রজব, যিলক্বদ, যিলহজ্জ এবং মুহাররাম।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَاتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ *

অর্থাৎ এই ধর্ম পাকা পোক্ত অর্থাৎ হিসাব কিতাব সহজ সরল। অতএব মাসসমূহের মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধাইও না। এই মাসগুলির বোযর্গী ও মর্যাদার কারণেই ইহাতে ঝগড়া-কলহ নিষেধ করা হইয়াছে। ঝগড়া-বিবাদ অবশ্য কোন মাসে হয়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, তোমরা তোমাদের নামাযের হেফাজত কর, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী (অর্থাৎ আছরের) নামায। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মধ্যবর্তী অর্থাৎ আছরের নামাযের উপরে বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। যদিও সব নামাযের প্রতিই খেয়াল রাখিতে হইবে, তথাপি আছরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। ঠিক এইভাবেই উল্লিখিত চারিটি মাসে আল্লাহ্ তায়ালা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। যাহার অর্থ আরবের মুশরিকদিগকে এই চারি মাসে হত্যা করিও না। হাঁ, তবে তাহারা যদি তোমাদের উপর হামলা চালায়, তবে তোমরাও তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিও।

নামকরণঃ রজব মাসের নাম রজব হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ মত রহিয়াছে। মূলতঃ রজব (رجب) শব্দটি তারজীব (ترجيب) শব্দ হইতে নির্গত। তারজীব শব্দটির অর্থ কোন জিনিস তৈরী করা বা অগ্রসর হওয়া। হুযূরে পাক (দঃ) বলেন, মাহে রজবে, মাহে শাওয়ালের জন্য বহু পুণ্য তৈয়ার করা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মাসে আল্লাহ্‌র ফিরেশ্‌তাগণ বহুসংখ্যক বার আল্লাহ্‌র তাসবীহ পড়েন, তাঁহার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করেন এই কারণে এই মাসকে রজব মাস বলা হয়।

এই মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাকে তিনটি বস্তু দান করিয়া থাকেন; যথাঃ (১) অনুগ্রহ (২) দান এবং (৩) বিপদে নিরাপত্তা।

রজব মাসের আরও কতগুলি নাম রহিয়াছে যথাঃ রজবে মুদ্বার, শাহ্‌রে মুতহার, শাহ্‌রে ছাবেক, শাহ্‌রে আছাম, শাহ্‌রে আছাব, শাহ্‌রুল ফারদ ও শাহ্‌রুল্লাহ্ ইত্যাদি।

রজব মাসের রজবে মুদ্বার নাম রাখার কারণ হইল, কবিলায় মুদ্বার এর লোকেরা এই মাসটিকে খুবই তাজীম এবং সম্মান করিত। এই কারণে মাসটিকে রজবে মুদ্বার বলা শুরু হইয়াছিল। এই ভাবে উল্লিখিত নামকরণসমূহের প্রত্যেকটির পিছনে একেকটি ভিন্ন ভিন্ন কারণ রহিয়াছে।

এই মাসটি আগমন করিলে হযরত ওসমান (রাঃ) জুমুয়া'র দিন মিম্বরে দাঁড়াইয়া এইভাবে ভাষণ দান করিতেন- হে মুসলিমগণ! তোমরা জানিয়া রাখ, এই মাসটি আল্লাহ্‌র মাস। যাকাত দানের যোগ্য লোকেরা, যাকাত আদায় কর। ঋণগ্রস্তরা ঋণ পরিশোধ, কর পাওনাদারেরা সম্ভব হইলে প্রাপ্য মাল মাফ করিয়া দাও। কেহ কেহ বলেন যে, রজব মাসে আল্লাহর শাস্তি নাজিল হয়না। অন্যান্য নবীর উম্মতগণের উপর একমাত্র রজব মাস ছাড়া অন্যান্য সকল মাসে আযাব নাজিল হইত।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত নূহ (আঃ)-কে এই মাসেই নৌকায় উঠিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এবং তাহার সঙ্গী-সাথী ও অনুবর্তীদেরকে লইয়া উক্ত নৌকা ছয় মাস পর্যন্ত পানির উপরে ভাসমান ছিল। ইব্রাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, রজব আল্লাহ্র মাস। আল্লাহ্ তায়ালা এই মাসেই হযরত নূহের (আঃ) নৌকা পানিতে ভাসাইয়াছিলেন। হযরত নূহ্ (আঃ) এই মাসে রোযা রাখিতেন এবং তাঁহার নৌকার লোকগণকে রোযা রাখার আদেশ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ মহা প্লাবন হইতে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া কাফির ও মুশরিকদিগকে ধ্বংস করিয়া দুনিয়া পবিত্র করিয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের ভিত্তিতেএই মাসটিকে শাহ্রে মুতহার বলা হয়। ইব্রাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনা হুযুরে পাক (দঃ)-এর মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী।

রজবের রোযাঃ হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, হে মুসলিমগণ! তোমরা জানিয়া রাখ, রজব আল্লাহ্ ঘোষণাকৃত অবৈধ বা হারাম মাসগুলির অন্যতম মাস এবং ইহা আল্লাহ্র মাস। শাবান আমার রমজান আমার উম্মতের মাস। রজব মাসে মুসলমান অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া যদি কেহ একটি রোযা রাখে, তবে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। দুইটি রোযা রাখিলে সে দ্বিগুণ নেকী লাভ করে। উহার প্রত্যেকটি নেকীর ওজন দুনিয়ার পর্বত তুল্য। যে ব্যক্তি এই মাসে তিনটি রোযা রাখে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তি ও দোজখের মধ্যে একটি পরিখা খনন করিয়া দেন। উক্ত পরিখার প্রশস্ততা এক বৎসরের পথের সমান। যে ব্যক্তি এই মাসে চারিটি রোযা রাখে, সে দুনিয়াবী যাবতীয় বিপদাপদ হইতে বিমুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি পাঁচটি রোযা রাখে, সে কবর আযাব হইতে নিরাপদ থাকে। যে ছয়টি রোযা রাখে, সে রোজকিয়ামতে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল মুখ বিশিষ্ট হইবে। যে সাতটি রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোজখের সাতটি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন। আর যে আটটি রোযা রাখে। তাহার জন্য বেহেশ্তের আটটি দরজাই খুলিয়া দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি এই মাসে নয়টি রোযা রাখিবে সে কবর হইতে উঠিবার কালে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালেমা পাঠ করিতে করিতে উঠিবে। আর যে ব্যক্তি রজব মাসে দশটি রোযা রাখে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার দোজখের পুল পার হইবার কালে তাহার জন্য প্রত্যেক ক্রোশে একটি করিয়া বিছানা বিছাইয়া দেওয়াইবেন। এই ব্যক্তি উক্ত বিছানায় শুইয়া আরাম করিতে করিতে পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি এগারটি রোযা রাখিবে, সে রোজকিয়ামতে অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। আর এই মাসে বারটি রোযা আদায়কারীকে রোজকিয়ামতে দুই ফর্দ বিশেষ পোশাক পরিধান করান হইবে। উহার প্রত্যেকটি পোশাকের মূল্য সমগ্র দুনিয়া অপেক্ষাও বেশী। এই মাসে তেরটি রোযা আদায়কারী রোজকিয়ামতে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় থাকিয়া পানাহার করিবে। অথচ অন্যান্য লোকেরা তখন ভীষণ বিপদে লিপ্ত থাকিবে। চৌদ্দ রোযা আদায়কারীকে আল্লাহ্ অদৃষ্টপূর্ব বস্তু দান করিবেন। পনের রোযা আদায়কারীগণ আল্লাহ্ পাকের নিরাপত্তাপ্রাপ্তগণের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরেশতা এবং পয়গম্বরগণ ঐ ব্যক্তির সৌভাগ্যের জন্য উহাকে ধন্যবাদ দান করিবেন। ষোল রোযা আদায়কারীকে দীদারে ইলাহী লাভকারীদের মধ্যে গণ্য করা হইবে এবং সে স্বয়ম আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করিবে। সতের রোযা আদায়কারীর জন্য পুলছিরাতের প্রতিটি মাইলের ব্যবধানে একটি করিয়া বিশ্রাম ঘর নির্দিষ্ট থাকিবে এবং তাহারা সেগুলিতে বিশ্রাম করিতে করিতেই পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। আঠার রোযা আদায়কারীকে আল্লাহ্ রোজকিয়ামতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর খীমার ভিতরে স্থান দান করিবেন। উনিশ রোযা আদায়কারীর প্রাসাদ হযরত আদম (আঃ)-এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রাসাদের সম্মুখেই হইবে। উক্ত নবীদ্বয়ের সাথে উহার সালাম কালাম চলিতে থাকিবে। যে ব্যক্তি রজব মাসের বিশ রোযা আদায় করিবে, আসমানের এক অদৃশ্য আওয়াজকারী তাহাকে আওয়াজ করিয়া বলিবে যে, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করা হইয়াছে। তুমি আর যতদিন বাঁচিয়া থাক নেককাজ করিয়া চল।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, রজব বোযর্গ মাস। এই মাসে এক রোযা আদায়কারী এক হাজার, দুই রোযা আদায়কারী দুই হাজার এবং তিন রোযা আদায়কারী তিন হাজার বৎসরের পুণ্যের অধিকারী হয়। যে সাত রোযা আদায় করে তাহার জন্য দোজখের সাত দরজা বন্ধ এবং আট রোযা আদায়কারীর জন্য বেহেশতের আট দরজা উন্মুক্ত করা হয় এবং উহার যে কোন দরজা দিয়াই সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। পনের রোযা আদায়কারীকে আকাশ

হইতে আওয়াজ দিয়া বলা হয় যে, তোমার পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি এখন হইতে সৎ কাজ করিয়া চল।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব মাসের একটি রোযা ত্রিশ বৎসরের রোযার সমান। হযরত আবুদারদা (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, রজব মাসে রোযা রাখার ফল কি? তিনি জবাবে বলিলেন, মূর্খতার যুগেও এই মাসটিকে লোকে সম্মান করিত। ইসলামও এই মাসকে বোযর্গ মনে করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই মাসে একটি রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার শাস্তি লাঘব করিবেন। তাহার জন্য দোজখের একটি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বেহেশতের একটি দরজা খুলিয়া দেন। দুনিয়ার সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্যও ঐ রোযার পুণ্যের সমতুল্য হইবে না। রোযাদার ব্যক্তি যদি রাত্রে দশটি দোয়াও করে, আল্লাহ্ তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। আর দোয়া না করিলে উহা আখেরাতের জন্য আমানত স্বরূপ থাকে।

রজবের রোযাদারের সুপারিশ ছিদ্দীকীনদের সুপারিশের মত কবুল হইয়া যায় এবং পরকালে সে ছিদ্দীকীনদের সাথেই বেহেশতে বসবাস করিবে। যে এই মাসে তিনটি রোযা রাখে, সে যখন ইফতার করিতে বসে, তখন আল্লাহ্ তাহাকে বলেন, এই বান্দার হক আদায় করা আমার উপর ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আর ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে, সে আমার বন্ধু। হে ফিরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহার পূর্বাপর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

এই মাসের চার রোযাকারীও ঐরূপ ফজীলতের অধিকারী হইবে। অধিকন্তু সে বহু তাওবাকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে এবং সকলের আগে আমলনামা হাতে পাইবে। পাঁচ রোযা আদায়কারী পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল মুখের অধিকারী হইয়া কিয়ামতে উঠিবে এবং আরেজ নামক মরুভূমির বালুকার পরিমাণের ন্যায় তাহার পুণ্য হইবে। বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন, তোমার যাহা কিছু চাহিবার আছে, চাহিয়া লও। যে ব্যক্তি এই মাসে ছয়টি রোযা রাখিবে, সে উপরোক্ত ফজীলত হাসিল তো করিবেই, অধিকন্তু সে রোজ কিয়ামতে এমন একটি নূর প্রাপ্ত হইবে যাহার আলোকে সে নিজে তো আলোকিত হইবে-ই, উহা দ্বারা অন্য লোকও আলোকিত হইবে। সে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তায় বিনা হিসাবে পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। আল্লাহ্ তায়ালা রোজকিয়ামতে তাহার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

যে ব্যক্তি এই মাসে সাতটি রোযা রাখিবে, উপরোক্ত ফজীলত হাসিলের পরও তাহার জন্য আল্লাহ দোজখের সাতটি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং দোজখ তাহার জন্য হারাম করিয়া দিবেন এবং বেহেশ্‌ত তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইবে। বেহেশ্‌তের যে কোন দরজা দিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

যে এই মাসে আটটি রোযা রাখে, সে উপরোক্ত ফজীলত লাভ করিবার পরও পরকালে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবে।

যে এই মাসে নয়টি রোযা রাখে, সে উপরোক্ত ফজীলত ছাড়াও রোজ হাশরে নিরাপদে থাকিবে এবং এমন একটি নূর লাভ করিবে, যাহা দ্বারা অন্য লোকেরও অন্ধকার দূর হইবে। তাহার আমলনামা ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে রাখা হইবে। সে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি এই মাসে দশটি রোযা রাখিবে, সে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইবে এবং অন্যান্যের চেয়ে দশগুণ বেশী পুণ্য লাভ করিবে। আল্লাহ্ তাহার পাপসমূহ পুণ্যে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সারা বৎসর সারারাত ইবাদাতকারী ও সারা বৎসর রোযা আদায়কারীর দশ বৎসরের দশ হাজার বৎসরের পুণ্য লাভ করিবে। যে ব্যক্তি এই মাসে বিশটি রোযা রাখে, সে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রথম ব্যক্তির বিশগুণ বেশী ফজীলত লাভ করিবে। রবিয়া ও মযর গোত্রের লোক সংখ্যার সম পরিমাণ কবীরাহ্ গুনাহ্‌কারী লোককে তাহার সুপারিশে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। আর যে এই মাসে ত্রিশটি রোযা রাখে, তাহাকে উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা ত্রিশগুণ বেশী ফজীলত দান করা হইবে এবং আসমান হইতে কেহ ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লাহ্‌র বন্ধু! তোমার জন্য সুসংবাদ যে, তোমাকে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন, উহা অমূল্য সম্পদ। ইহা আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ।

এই ত্রিশ রোযা আদায়কারীর মৃত্যু আসন্ন হইলে তাহার রূহ সহজে বাহির করার জন্য আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতের শরবত পান করাইবেন। সে কবরে ও হাশরে শান্তিতে থাকিবে। যখন সে কবর হইতে বাহির হইবে, তখন তাহাকে সত্তর হাজার ফিরেশ্‌তা আগাইয়া নিতে আসিবেন। তাহাদের

করিবে তখন ইট, ইয়াকুত, মারওয়ারিদ নামক মূল্যবান হীরা জহরত খচিত বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ থাকিবে। ফিরেশতাগণ তাহাকে বলিবেন, হে আল্লাহর বন্ধু! তুমি যাহার সন্তুষ্টির আশায় পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া ক্লেশ বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে চল। হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, দুনিয়ার সমস্ত লোকও যদি একত্রিত হইয়া তাঁহার পুণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, তবুও সেই পুণ্যের দশ ভাগের এক ভাগেরও অনুমান করিতে পারিবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, যদি কোন মুমিন ব্যক্তি রজব মাসকে আল্লাহ্‌র মাস মনে করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিপদ মুক্ত করে, তবে আল্লাহ্ তাহার সেই কাজের জন্য তাহাকে বেহেশ্‌তে এমন একটি গৃহ দান করিবেন, যাহার দৈর্ঘ্য হইবে চোখের দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। নিবা ইবনে সালাম ইবনে কায়েস বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাহে রজবে সদকা দান করে, আল্লাহ্ তাহাকে দোজখের আগুন হইতে এত বেশী দূরে রাখিবেন যেমন কোন কাক পাখীর শাবক মায়ের বাসা হইতে জীবনের প্রথম দিন হইতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া উড়িতে উড়িতে বৃদ্ধ হইয়া যায় এবং উড়া অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে। প্রবাদ আছে যে, এই কাক পাঁচশত বৎসর বয়স পাইয়া থাকে।

হারাম মাসসমূহের বৈশিষ্ট্য

হযরত আকরামা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব আল্লাহ্‌র মাস। শাবান আমার মাস এবং রমজান আমার উম্মতের মাস। মূসা ইবনে ইমরান বলেন, আমি ইবনে মালেক (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতে রজব নামক একটি ঝর্ণাধারা রহিয়াছে, উহার পানি দুধ অপেক্ষা সাদা, মধু অপেক্ষা মিষ্টি। কোন ব্যক্তি রজব মাসে অন্ততঃ একটি রোযা রাখিলেও আল্লাহ্ উক্ত ঝর্ণা ধারার পানি তাহাকে দান করিবেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, বেহেশ্‌তে এমন একটি প্রাসাদ আছে, যেখানে শুধু রজব মাসে রোযা আদায়কারীই প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তাহারা ছাড়া অন্য কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজানের পর তোমরা আর কোন মাসে রোযা আদায় করিও না। কিন্তু রজব ও শাবান মাসে রোযা আদায় কর। অর্থাৎ রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে রোযা না রাখিলেও রজব ও শাবান মাসে অবশ্যই নফল রোযা রাখিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মুহাররাম মাসের বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার যে ব্যক্তি রোযা রাখে আল্লাহ্ তাহার নাম নেককারদের দফতরে লিখিয়া রাখার নির্দেশ দেন এবং তৎসহ নয়শত বৎসরের পুণ্যও লিখিয়া রাখিতে বলা হয়।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, রজব মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার মাস। শাবান সৎকাজ, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা ও রমজান সদিচ্ছা সফল করা ও অন্তর পরিষ্কার করার মাস। রজব তাওবাহ করা, শাবান প্রেম করা এবং রমজান নিয়ামত লাভ করার মাস। রজব ইবাদাত, শাবান অধিক ইবাদাত এবং রমজান অধিকতর ইবাদাত করার মাস। রজবে নেকী দ্বিগুণ হয়, শাবান পাপ দূর করে এবং রমজানে কুদরতে ইলাহী প্রকাশ পায়। রজব অধিক পুণ্যবানদের মাস, শাবান মধ্যম পুণ্যবানদের মাস এবং রমজান পাপীদের ক্ষমার মাস।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, রজব বিপদাপদ দূর হওয়ার, শাবান ইবাদাত করার এবং রমজান কেয়ামত দেখার মাস। অতএব যে ব্যক্তি বিপদাপদ দূর না করে, ইবাদাতে মনোনিবেশ না করে এবং কিয়ামত দেখার ইচ্ছা না রাখে, তাহার জীবনই বৃথা। তিনি আরও বলেন, রজব বীজ বপন, শাবান মাস পানি সিঞ্চন এবং রমজান শস্য কাটিবার মাস। অতএব যে যাহা বপন করিবে, তাহাই পাইবে। আর যে ব্যক্তি বীজ বপন করার সময়ে অবহেলা অলসতা করে, সে পরকালে লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বোযর্গগণ বলেন, বৎসর একটি বৃক্ষ সদৃশ। রজব মাসে উহাতে পত্র-পল্লব আসে, শাবান মাসে ফল ধরে এবং রমজান মাস সেই ফল সংগ্রহের সময়। তাহারা আরও বলেন, আল্লাহ তায়ালা রজব মাস ক্ষমার জন্য, শাবান মাস সুপারিশের জন্য এবং রমজান মাস পুণ্য দ্বিগুণ করিয়া দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কদরের রাত রহমতের জন্য, আরফার দিন ধর্ম পূর্ণ হওয়ার জন্য, জুময়ার দিন

বিনয়ীদের দোয়া কবুল হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আর ঈদের দিন মুমিন ব্যক্তিগণ দোজখের আগুন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে।

মাযনী হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হইতে শুনিয়া বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করিয়াছেন, রজব মাসে তোমরা রোযা রাখ। এই মাসের রোযা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ্ স্বরূপ। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি রজব মাসে একটি রোযা রাখে তবে সে যেন এক হাজার দাস মুক্ত করিল। রজব মাসে এক দীনার সদকা দিলে সে যেন হাজার দীনার দান করিল। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে তাহার শরীরের পশমসমূহের পরিমাণ পুণ্য দান করেন। হাজার পাপ দূর করেন। তাহার প্রত্যেকটি রোযা এবং দান খয়রাতের জন্য সে হাজার হজ্জ্ব এবং হাজার ওমরার পুণ্য লাভ করে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌তে হাজার ঘর, প্রত্যেক ঘরে হাজার কোঠা, প্রত্যেক কোঠায় হাজার তাঁবু ও প্রত্যেক তাঁবুতে হাজার হুর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটি হুর হাজার চন্দ্র অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্যশালিনী।

রজব মাসের প্রথম দিন ও শেষ রাতের ফজীলত

ইমাম হুব্বাতুল্লাহ্ সাকতী সনদ পরম্পরায় হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রজব মাস সমাগত হইলে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিতেন যে, হে মাবুদ! রজব এবং শাবান মাসে আমাদেরকে বরকত দান কর এবং রমজান পর্যন্ত জীবিত রাখ। হুব্বাতুল্লাহ দীর্ঘ সনদ পরম্পরায় মেহরান ইবনে মায়মুন হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাহে রজবের প্রথম দিন রোযা রাখে, তাহার জন্য দোজখের সাতটি দরজা বন্ধ করা হয়, আর যে আটটি রোযা রাখে তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর যে এই মাসে দশটি রোযা রাখে, তাহার সমস্ত পাপ পুণ্যে পরিণত হয়। আর যে এই মাসে আঠারটি রোযা রাখে, তাহাকে আসমান হইতে কেহ ডাকিয়া বলেন, আল্লাহ্ তোমার যাবতীয় অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তুমি এখন হইতে নূতন করিয়া ইবাদাত এবং সৎ কাজ শুরু কর।

সালামাহ ইবেন কায়েস বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব মাসের প্রথম দিনে রোযা আদায়কারীর ষাট বৎসরের যাবতীয় পাপ মার্জনা করা হয়। পনেরটি রোযা আদায়কারীর হাশরের হিসাব নিকাশ সহজ হইয়া যায়। আর যে এই মাসে ত্রিশটি রোযা রাখে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন, আমি বান্দার উপর সন্তুষ্ট। তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব না।

বর্ণিত আছে, বছরার শাসনকর্তা হাজ্জাজ পুত্র ইরতাদকে পত্র লিখিলেন, বৎসরে চারিটি রাত্রের প্রতি তুমি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। কেননা সেই রাত্র চতুষ্টয়ে আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করিয়া থাকেন। উক্ত রাত চারিটি হইল, রজব মাসের শেষ রাত, শাবান মাসের পনের তারিখের রাত, রমজানের সাতাইশ তারিখের রাত এবং ঈদুল ফিতরের রাত। খালিদ ইবনে সাদান হইতে বর্ণিত আছে, বৎসরে এমন পাঁচটি রাত আছে, যদি কোন ব্যক্তি পুণ্যের আশায় সরলান্তঃকরণে ঐ রাত্রসমূহে ইবাদাত-বন্দেগী করে, আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌ত প্রদান করিবেন। ঐ রাত্রসমূহ হইল, রজব মাসের শেষ রাত, দুই ঈদের দুই রাত, শাবান মাসের পনের তারিখের রাত এবং আশুরার রাত।

মুবারক দিনসমূহের ফজীলত

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নিম্নোল্লিখিত চৌদ্দটি রাত্র জাগ্রত থাকিয়া ইবাদাত করা কর্তব্য। রাতগুলি হইল—মুহাররম মাসের প্রথম রাত, আশুরার রাত, রজব মাসের প্রথম, মধ্যবর্তী এবং সাতাইশ তারিখের রাত, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত, আরাফার রাত, দুই ঈদের দুই রাত এবং রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় সংখ্যক পাঁচটি রাত।

ওলামায় কেরামদের অভিমত এই যে, নিম্নলিখিত উনিশ দিনও ইবাদাত-বন্দেগী করা অত্যুত্তম। দিনগুলি হইল, আরাফার দিন, আশুরার দিন, শাবানের মধ্যবর্তী দিন, দুই ঈদের দুই দিন, যিলহজ্জের মা'লুমাহ্ দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন। তবে, জুমআর দিন এবং রমজান মাসের দিনগুলির ফজীলত ও সম্মান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে তাকীদ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জুমআর দিনটি নিরাপদে কাটিলে অন্যান্য দিনও নিরাপদে কাটিয়া যায়। আর রমজান মাস শান্তিতে অতিবাহিত হইলে

অন্যান্য মাসও শান্তিতে অতিবাহিত হয়। উহার পর সোমবার ও মঙ্গলবারও ভাল দিন। এই দুই দিনে বান্দার আমলনামা আল্লাহর নিকট পৌঁছান হইয়া থাকে।

রজব মাসে যে দোয়াগুলি পড়া ভাল

রজব মাসে প্রথম রাতে সকল নামায শেষ করিয়া এই দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اِلٰهِىْ تَعَرَّضَ لَكَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُتَعَرِّضُوْنَ وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُوْنَ
وَفَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ الطَّالِبُوْنَ وَلَكَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ نَفَحَاتٌ وَّجَوَائِزُ
وَعَطَايَا وَمَرَاهِبَ تَمُنُّ بِهَا عَلٰى مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا
مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْكَ وَهَا اَنَا عُبَيْدُكَ الْفَقِيْرُ اِلَيْكَ
الْمُؤْمِنُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ فَاِنْ كُنْتَ يَامَوْلَاىَ تَفَضَّلْتَ فِىْ هٰذِهِ
اللَّيْلَةِ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَجُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِّنْ عَطْفِكَ فَصَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَجُدْ عَلَىَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوْفِكَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইলাহী তাআররাজা লাকা ফী হাযিহিল্লাইলাতিল মুতাআর-রিজুনা অক্বাছাদা কাল ক্বাছিদূনা অ আমালা ফাছলাকা মা'রূফাকাত্তালিবূনা অ লাকা ফী হাযিহিল্লাইলাতি নাফাহাতুন অ জাওয়ায়িযু অ আ'ত্বাইয়া অ মারাহিবা তামুন্নু বিহা আলা মান নাশাউ মিন ইবাদিকা অ তামনাউ'হা মিম্মান লাম তাসবিক্বু লাহুল ইনাইয়াতু মিনকা অহা আবদুকাল ফাক্বীরু ইলাইকাল মু'মিনু ফাদ্বলাকা অ মা'রুফাকা ফাইন কুনতা ইয়া মাওলায়া তাফাদ্দ্বালতা ফী হাযিহিল্লাইলাতি আলা আহাদিম মিন খালক্বিকা অজাদ্‌তা আলাইহি বিআয়িদাতিম মিন আত্বফিকা ফাছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অআলিহী অজুদ আলাইয়্যা বিতাওলিকা ও মারূফিকা ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হযরত আলী (রাঃ) বৎসরে চারি রাত্র অর্থাৎ রজব মাসের প্রথম রাত, দুই ঈদের দুই রাত ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত জাগ্রত থাকিয়া ইবাদাত-বন্দেগী করিতেন এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ مَصَابِيْحِ الْحِكْمَةِ وَمَوَالِى النِّعْمَةِ
وَمَعَادِنِ الْعِصْمَةِ وَاعْصِمْنِىْ بِهِمْ مِّنْ كُلِّ سُوْءٍ وَلَاتَاْخُذْنِىْ عَلٰى غِرَّةٍ
وَلَاعَلٰى غَفْلَةٍ وَلَاتَجْعَلْ عَوَاقِبَ اَمْرِىْ حَسْرَةً وَّنَدَامَةً وَّارْضَ عَنِّىْ فَاِنَّ
مَغْفِرَتَكَ لِلظّٰلِمِيْنَ وَاَنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَالَايَضُرُّكَ
وَاَعْطِنِىْ مَالَايَنْفَعُكَ فَاِنَّكَ الْوَاسِعُ رَحْمَتُكَ الْبَدِيْعَةُ حِكْمَتُكَ فَاَعْطِنِىْ
السَّعَةَ وَالدَّعَةَ وَالْاَمْنَ وَالصِّحَّةَ وَالشُّكْرَ وَالْمُعَافَةَ وَالتَّقْوٰى وَالصَّبْرَ
وَالصِّدْقَ عَلَىَّ وَعَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَاعْطِنِى الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ وَالْاَمْنَ

بِذٰلِكَ اَهْلِىْ وَوَلَدَىَّ وَاِخْوَانِىْ فِيْكَ وَمَنْ لَدَىَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলিহী মাছাবীহিল হিকমাতি অ মাওয়ালিয়ান্নি'মাতি অ মাআদিনিল ই'ছমাতি ওয়াছিমনী বিহিম মিন কুল্লি সুয়িন অ লা তাখুযনী আলা গ৷ররাতিন অলা আ'লা গাফলাতিন অলা তাজআল আওয়াক্বিবা আমরী হা'সরাতাউ অ নাদামাতান অ আরদ্বা আ'ন্নী ফাইন্না মাগ্বফিরাতাকা লিজ্জোয়ালিমীনা অ আনা মিনাজ্জোয়ালিমীন। আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা লা ইয়াদুররুকা-অ আত্বিনী মা লা ইয়ানফাউকা ফাইন্না কাল ওয়াসিআ রাহ্‌মাতাকাল বাদীআ'তা হিকমাতুকা ফাত্বিনিস সাআতা অদ্দাআতা অল আমনা অছছিহ্‌তা অশ্‌শুকরা অল মুআফাতা অত্তাক্বওয়া অছছাবরা অছছিদক্বা আলাইয়্যা অ আলা আউলিয়ায়িকা অ আত্বিনীল ইউসরা মাআল উসরি অল আমনা বিয়া-লিকা আহ্‌লী অলি অলিদাইয়্যা অ ইখওয়ানী ফীকা অ মিল্লাদাইয়া মিনাল মুসলিমীনা অল মুসলিমাতি অল মু'মিনীনা অল মু'মিনাত।

রজব মাসের নামায

ইমাম হুব্বাতুল্লাহ্ সনদ পরম্পরায় সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) রজব মাসের চাঁদ দেখিয়া বলিতেন, ওহে সালমান। যদি কোন মুমিন পুরুষ বা রমণী রজব মাসে ত্রিশ রাকয়াত নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা আহাদ এবং তিনবার সূরা কাফিরূন পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেন এবং সমস্ত মাস রোযা রাখার ন্যায় পুণ্য দান করেন। আগামী বৎসরের নামাযীদের দফতরে তাহার নামভুক্ত করেন। তাহার আমলনামায় প্রত্যহ এত বেশী পুণ্য লিখিত হয় যতটা বদর যুদ্ধের একজন শহীদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে এক বৎসরের ইবাদাতের সমান পুণ্য দান করা হয়। তাহার মরতবা এক হাজার দরজায় উন্নীত করা হয়। আর যদি কেহ এই মাস ভরিয়া রোযা রাখে ও ইবাদাত করে, আল্লাহ তাহাকে দোজখের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জিব্রাইল (আপঃ) উক্ত পুণ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! রজব মাসের উক্ত নামায কখন আদায় করিব? হুযুর (দঃ) উত্তর করিলেন, মাসের প্রথমে, প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার সূরা আহাদ এবং তিনবার সূরা কাফিরূনসহ দশ রাকয়াত নামায আদায় করিবে। নামায শেষে সালাম ফিরাইয়া উঠাইয়া হাত নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতঃ মুখমণ্ডল মাসেহ্ করিবে। দোয়াটি এইঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىْ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু অহুয়া হাইয়্যুল্লা ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিউল্লিমা আত্বাইতা অলা মুত্বীউল্লিমা মানা'তা অলা ইয়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

মাসের মধ্যবর্তী তারিখে উপরোক্ত নিয়মে দশ রাকয়াত নামায আদায় করিয়া সালাম ফিরাইবে এবং হাত উঠাইয়া এই দোয়া পড়িবে।

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اِلٰهًا وَّاحِدًا

أَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وَّتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী অ ইউমীতু অ হুয়া হাইয়ুল্লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খাইর। অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ইলাহাউ অহিদান আহ্দান ছামাদান ফারদান, বিত্বরাল্ লাম ইয়াত্তাখিয ছাহিবাতাউ অ লা অলাদা।

এই দোয়ার পরে মুখ মুছিয়া আবার উপরোল্লিখিত নিয়মে মাসের শেষ দশ দিন দশ রাকয়াত নামায আদায় করিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতঃ মুখমন্ডল মুছিবে। দোয়াটি এই ঃ

لَآاِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লাশারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী অ ইউমীতু বিয়াদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। অছাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা, মুহাম্মাদিউ অ আলা আলিহিত্তাহিরীনা অলা হাওলা অলা ক্বওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

এই দোয়াটি পাঠ করার পর তোমার মনের আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ তাহা কবুল করিবেন। তোমার এবং দোজখের মধ্যে সত্তরটি খন্দক খনন করা হইবে। উহার প্রত্যেকটি খন্দকের প্রস্থ হইবে আসমান ও যমিনের দূরত্বের পরিমাণ। প্রত্যেক রাকয়াতের বিনিময়ে হাজার হাজার রাকাতের পুন্য মিলিবে। দোজখের অগ্নি হইতে নিরাপদ থাকিবে। অতি সহজে পুলছিরাত পার হইতে পারিবে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, হুযুর (দঃ) এর এই বর্ণনা শেষ হওয়ার পর আমি সিজদায় গিয়া ক্রন্দন করতঃ আল্লাহ্র শোকর আদায় করিলাম। এই বর্ণনাটি কিতাবুল আমাল বিসসুন্নাহতে লিখিত রহিয়াছে।

রজব মাসে বৃহস্পতিবারের রোযা ও মাসের প্রথম শুক্রবার রাতের নামাযের ফজীলত

হেবাতুল্লাহ্ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব আল্লাহ্র মাস। শাবান আমার মাস এবং রমজান আমার উম্মতের মাস। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আল্লাহ্র মাসের তাৎপর্য কি? হুযুর (দঃ) বলিলেন, এই মাসটি আল্লাহ্র রহমতের জন্য নির্দিষ্ট। আর এই মাসে ঝগড়া-বিবাদ করা নিষিদ্ধ। এই মাসে আল্লাহ্ নবীদের তাওবাহ্ কবুল করিয়াছেন এবং বন্ধুগণকে শত্রুদের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। এই মাসে কেহ রোযা রাখিলে আল্লাহ্ তাহার উপরে তিনটি বিষয় দৃষ্টি রাখেন। যথাঃ তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। অবশিষ্ট দিনগুলিতে পাপ করা হইতে বিরত রাখেন এবং রোজ কিয়ামতে তাহাকে পিপাসার কষ্ট দিবেন না।

এই কথা শুনিয়া জনৈক বৃদ্ধ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি দুর্বলতাবশতঃ পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে অপরাগ। হুযুর (দঃ) বলিলেন, তুমি মাসের প্রথম, মধ্যম এবং শেষ দিন রোযা রাখিও। তাহাতেই আল্লাহ্ তোমাকে পূর্ণ মাস রোযা রাখার ছওয়াব দিবেন। কেননা একটি পুণ্যের কাজে দশটি পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। তবে স্মরণ রাখিও, রজব মাসের প্রথম জুমুয়ার রাত নিদ্রায় কাটাইও না। যেহেতু ঐদিন আসমান ও যমিনের সকল ফিরেশতা কাবা ও কাবার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা ফিরেশ্তাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে ফিরেশ্তাগণ! তোমরা তোমাদের আকাঙ্খিত বস্তু আমার নিকট প্রার্থনা কর। ফিরেশ্তাগণ বলেন, হে আমাদের প্রভু! তুমি রোযাদার ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, হাঁ, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখিবে এবং মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকয়াত করিয়া বার রাকয়াত নফল নামায পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে তিনবার সূরা কদর ও বার বার সূরা আহাদ পাঠ করিবে। নামায শেষে সত্তর বার পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি অ আলা আলিহী অ সাল্লিম।

তারপর সিজদায় গিয়া সত্তর বার পড়িবে ঃ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি অররূহ।
সিজদাহ হইতে মাথা তুলিয়া সত্তর বার পড়িবে ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَا وَزْعَمَّا تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْاَعْظَمِ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্‌ফির অরহাম অ তাজাওয়াযু আম্মা তা'লামু ফাইন্নাকা আনতাল আযীযুল আ'জোয়ামি।

উপরোক্ত নিয়মে আরও একটি সিজাদায় গিয়া ও সিজদাহ্‌র পরে উল্লিখিত দোয়া কালাম পাঠ করিবে এবং সবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্যই তাহা পুরা করিবেন।

অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যাহার আয়ত্তে আমার জীবন সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যে কোন পুরুষ বা রমণী উপরোক্ত নিয়মে নামায পড়িবে, তাহার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনা, মরুর বালুকণা, বৃষ্টির ফোঁটা এই দুনিয়ার সমস্ত বৃক্ষ পত্রের সমান হয়, তবুও আল্লাহ্‌ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। রোজকিয়ামতে সে তাহার বংশধরের সাত শত লোকের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। প্রথম রাত্রেই তাহার এই নামায তাহার কবরে আসিয়া বলিবে, হে আমার বন্ধু! তুমি শুভ সংবাদ শুন, তোমার সমস্ত বিপদাপদ কাটিয়া গিয়াছে। তুমি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। এ কথা শুনিয়া ঐ নামাযী বলিবে, তুমি কে? তোমার ন্যায় এমন সৌন্দর্যময় ও মিষ্টভাষী লোক তো আমি আর কোনদিন দেখি নাই। সে বলিবে, তুমি অমুক বৎসর অমুক সময়ে যে নামায পড়িয়াছিলে, আমি তোমার সেই নামাযের ছওয়াব। আজ আমি তো তোমার এই নির্জনবাসের সঙ্গী ও সাহায্যকারী, রোজকিয়ামতে আমি তোমার মাথায় ছায়া দান করিয়া তোমার সঙ্গে উঠিব।

সাতাইশে রজবের রোযার ফজীলত

হুব্বাতুল্লাহ্‌ সনদ পরম্পরায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, রজবের সাতাইশে তারিখে রোযা আদায়কারী ষাট মাস রোযা রাখার পুণ্য লাভ করে। এই তারিখেই ফিরেশতা জিব্রাইল নবুয়তসহ হুযূরে পাক (দঃ)-এর সমীপে আগমন করেন। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সাতাইশে রজবের রাত ইতেকাফে কাটাইয়া দিতেন। তিনি ঐদিন সকাল হইতে জোহরের পর পর্যন্তও নফল নামায আদায় করিতেন। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা কদর এবং পঞ্চাশ বার সূরা আহাদ পাঠ করিতেন এবং আছর পর্যন্ত দোয়া-দরূদ পাঠ করিতেন আর বলিতেন যে, হুযুরে পাক (দঃ)-ও এইরূপ করিতেন।

হুব্বাতুল্লাহ্‌ সনদ পরম্পরায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব মাসে এমন একটি দিন এবং তিনটি রাত্রি রহিয়াছে যে, সেইদিন যদি কেহ রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদাত করে, তবে আল্লাহ্‌ তাহাকে শত শত বৎসরের রোযার এবং শত শত বৎসরের রাত জাগ্রত থাকার পুণ্য দান করিয়া থাকেন। এই রাত হইল রজব মাসের শেষ তিন রাত। আর দিন হইল যেইদিন হুযুরে পাক (দঃ) নবুয়ত লাভ করিয়াছিলেন, সেইদিন।

রজবের রোযার আদব এবং পাপ হইতে বিরত থাকা

রজব মাসে রোযাদারের জন্য পালনীয় প্রধান শর্ত হইল তাহাকে গুনাহর কাজ হইতে বাঁচিয়া থকিতে হইবে এবং পূর্ণ পরহেজগারীর সহিত রোযা আদায় করিতে হইবে।

হিবাতুল্লাহ্ সনদ পরম্পরায় হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব হারাম মাসসমূহের অন্যতম। উহার সমস্ত দিনগুলির ফজীলতের বিষয় ষষ্ঠ আসমানে লিপিবদ্ধ আছে। লিখিত আছে, যদি কেহ রজব মাসের কোনদিন রোযা রাখে এবং আল্লাহর ভয়ে সেই রোযাকে গুনাহ্ হইতে পবিত্র রাখে, তাহা হইলে ঐ রোযা এবং ঐদিন উভয়ে উক্ত রোযাদারের জন্য দোয়া করে যে, হে মাবুদ! তুমি এই রোযাদারের গুনাহ্ মার্জনা কর। কিন্তু যদি সেই রোযা পরহেজগারীর সঙ্গে আদায় না করা হয়, তবে উক্ত রোযা বা দিন কেহই তাহার জন্য দোয়া করে না; বরং লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলে যে, তোমার কুপ্রবৃত্তি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক মারফু' রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত রহিয়াছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযা রোযাদারের জন্য জাহান্নাম হইতে সুদৃঢ় ঢালের মত। যদি কেহ রোযা রাখে তবে সে যেন মূর্খের মত কোন কাজ না করে। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় বা তাহার সহিত ঝগড়া-কলহ করিতে আসে, তবে তাহার এইরূপ বলিয়া দেওয়া উচিত যে, ভাই! (তোমরা আমার বিরুদ্ধে এইরূপ করিও না) আমি রোযাদার। হুযুর (দঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখিয়া মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে না, তাহার অনর্থক পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নাই। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযা রোযাদারের জন্য জাহান্নামের বিরুদ্ধে ঢাল ঠিক ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন পর্যন্ত রোযাদার নিজেই উহাকে নষ্ট না করে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! উহাকে নষ্ট করে কিভাবে? হুযুর (দঃ) জবাব দিলেন, রোযাদারের গীবত করা ও মিথ্যা কথা বলায় উহা বিনষ্ট অর্থাৎ টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুধু পানাহার তরক করিলেই রোযা হয় না; বরং বেহুদা ও বাজে কথাবার্তা বলা হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচটি বস্তু রোযাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। উহা হইলঃ (১) মিথ্যা কথা বলা (২) চোগলখোরী করা (৩) গীবত করা (৪) যৌনাবেগ সহকারে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং মিথ্যা শপথ করা। উক্ত বর্ণনাকারী আরও বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাংস আহার করে, অর্থাৎ কাহারও গীবত করে তাহার রোযা মোটে রোযাই নহে। হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের পিছনের দিকে কাপড়ের উপর দিয়া দৃষ্টিপাত করে, তাহার রোযা নষ্ট হইয়া যায়।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা রোযা রাখিবে, তখন তোমরা স্মরণ রাখিবে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং মুখের রোযা হইল খারাপ কথা শ্রবণ না করা, নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন না করা এবং মিথ্যা ও অন্যান্য গর্হিত বাক্য উচ্চারণ না করা। আর তোমাদের প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না ও নিখুঁৎ নিষ্কলঙ্ক থাক আর তোমার রোযার দিনটিকে বেরোযার দিনের মত বানাইও না।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন যে, অনেক রোযাদার ব্যক্তিই এইরূপ যে, তাহার রোযা শুধু পানাহার বর্জন এবং অনেক রাত্র জাগরণকারীর রাত্র জাগরণই এইরূপ যে, উহা শুধু রাত্র জাগরণের ক্লেশবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের কার্যক্রমে আল্লাহ্র আরশ কম্পিত হয় এবং আল্লাহ্তায়ালা ক্রোধান্বিত হন। এই প্রকার মন্তব্য দ্বারা হুযুরে পাক (দঃ) শুধু এই কথা বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, ইবাদত-বন্দেগী যদি নিছক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে না হইয়া কেবলমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাহার ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি অংশীবাদিতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে তাহার ইবাদত এবং সৎকর্মসমূহে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে, তবে

তাহার সে ইবাদত ও সৎকাজ আমার জন্য হয় না; বরং উহা সেই শরীকদের জন্য হইয়া থাকে। আমি শুধু সেই কাজ কবুল করি, যাহা সম্পূর্ণতঃ আমার জন্য করা হইয়া থাকে। ওহে আদম সন্তান! আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম বন্টনকারী। তুমি তোমার নিজ কাজের দিকে লক্ষ্য কর। যে সকল কাজ তুমি অন্যের উদ্দেশ্যে করিয়াছ, তাহার বিনিময় দানের যিম্মাদার শুধু সেই ব্যক্তি, যাহার উদ্দেশ্যে তুমি উহা করিয়াছ।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে রোযাদারদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইল, রোযা আদায় কালে উল্লিখিত শর্ত এবং পালনীয় বিষয়গুলির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা। রোযা রাখিয়া তাহা লোককে দেখানো বা লোকের নিকট নিজের রোযার সংবাদ প্রচার করিয়া বেড়ানো ইত্যাদি হইতে অবশ্য বিরত থাকিবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, আমি নিজে হুযুরে পাক (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত নূহ (আঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ব্যতীত সারা জীবন রোযা রাখিতেন। হযরত দাউদ (আঃ) সারা জীবনের অর্দ্ধেক কাল রোযা রাখিয়াছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যেক মাসের তিন দিন অর্থাৎ তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ রোযা রাখিতেন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, এক জাযাবর হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আসিয়া রোযাদারদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আপনি আপনার রোযার সম্পর্কে কিছু বলুন। ইহা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) এত বেশী নাখোশ হইলেন যে, তাহার পবিত্র চেহারা লালবর্ণ ধারণ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জাযাবর লোকটিকে খুবই তিরস্কার করিলেন। ফলে উক্ত লোকটি চুপ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন হুযুরে পাক (দঃ)-এর অসন্তুষ্টি দূর হইয়া গেল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমার জীবন আপনার উপরে কোরবান হউক! আপনি সেই লোকের কথা বলুন, যে সমস্ত রোযা আদায় করিয়াছে। হুযুর (দঃ) বলিলেন, সে ব্যক্তি রোযাদার নয় আর বে-রোযাও নয়। হযরত ওমর (রাঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি কেবল তিনটি রোযা রাখিয়াছে? হুযুরে পাক (দঃ) জবাব দিলেন, সে সারা জীবনের রোযা রাখিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! যে ব্যক্তি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়াছে? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, বৃহস্পতিবার তো এমন দিন, যেদিন বান্দার আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে এবং সোমবার তো আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এইদিন আমার নিকট অহী নাযিল করা হইয়াছে।

রজব মাসের দোয়া

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব মাসে দোয়া পাঠ করিলে আল্লাহ্ তাহা কবুল করেন। দোয়া পাঠকারীকে বিপদাপদ হইতে মুক্ত রাখেন, পক্ষান্তরে রজব মাসে কেহ পাপ করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, একদা আমরা বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কে একজন বলিতেছে, হে মাবুদ!,অসহায়দের দোয়া কবুলকারী! চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-শোক ও বিপদাপদ দূরকারী! তোমার মেহমানগণ কাবা গৃহের চারিদিকে রাতজাগ্রত রহিয়াছে। আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছি, তুমি কখনও নিদ্রামগ্ন হও না, তুমি তোমার অসীম করুণাগুণে আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও। সারা মাখলুক তোমার করুণার প্রত্যাশী। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করিলে কে আর ক্ষমা করিবে?

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হাসান! তুমি কি পাপীর তাহার প্রভুর নিকট অনুনয়-বিনয়ের কথা শুনিতেছ? তুমি লোকটিকে তালাশ করিয়া বাহির কর তো দেখি। হাসান (রাঃ) বলেন, কিছুক্ষণ তালাশ করিয়াই আমি লোকটিকে দেখিতে পাইলাম। আমি লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সুন্দর সৌম্যদর্শন এক ব্যক্তি। তাহার পোশাক হইতে সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। কিন্তু দেখিলাম, লোকটার শরীরের একটি দিক আশ্চর্য রকম শুষ্ক। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আমীরুল মুমিনীন ডাকিতেছেন। লোকটি কোনরূপে পা টানিয়া টানিয়া আমার পিতা আমীরুল মুমিনীনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পিতা তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, এই অবস্থায় আছি যে, নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ যোগাড়ে অক্ষম, তাহার আবার অবস্থা কি? আমার পিতা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল,

আমার নাম মানাযেল ইবনে লাহেব। আমি আরবের মধ্যে বৃথা খরচকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। আমি উন্মুক্ত প্রান্তরের যেদিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই অশ্ব হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতাম এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতাম, তাওবাহ্ করিয়াও সেই তাওবায় স্থির থাকিতে পরিতাম না। তজ্জন্যই আল্লাহ্‌র দরবারে আমার দোয়া কবুল হইত না।

রজবান মাসে আমি সর্বদাই পাপের কাজ করিতাম। আমার দয়ালু পিতা আমাকে পাপের কাজ হইতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন, দেখ পুত্র! আল্লাহ্‌র শাস্তি খুবই কঠোর এবং ভয়ানক। তুমি আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করিও না। বহু লোক তোমার অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ফরিয়াদের হাত আল্লাহর দরবারে উত্তোলন করিতেছে যেই মাস এবং যেই দিনে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ এবং মারামারি করা নিষিদ্ধ, সেইসব দিন এবং মাসেও অন্যায় অপরাধমূলক কার্য হইতে বিরত হইতেছ না?

আমার পিতার এইসব নসীহত শুনা তো দূরের কথা, বরং তিনি আমার কাজে বাধা দিলে, আমি তাহাকে প্রহার করিতাম।

অবশেষে আমি একদিন আমার পিতার নিকট হইতে যাইবার কালে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি রোযা রাখিব কিন্তু ইফতার করিব না, সারারাত জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিব। তিনি সপ্তাহকাল রোযা রাখিয়া হজ্জে আকবারের দিন লাল-সাদা রংয়ের একটি উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মক্কা শরীফ রওয়ানা হইলেন। যাওয়ার সময়ে তিনি বলিলেন, আমি তোমার নামে আল্লাহ্‌র নিকট নালিশ করিব। তিনি সে নালিশ শেষ হইতে না হইতেই আমার দেহের এই দিকটা অবশ হইয়া একেবারে শুকাইয়া গেল এবং আমি হরম শরীফের এক পাশে পড়িয়া গেলাম। সকাল-বিকাল যত লোক আমার নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা সকলেই বলাবলি করিত, এই সেই ব্যক্তি, যাহার পিতা তাহার জন্য বদদোয়া করিয়াছিল।

হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ঘটনার পর তোমার পিতা তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করিলেন? লোকটি উত্তর করিল, অতঃপর আমি আমার পিতাকে আমার অসুখের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করিতে বলিলাম। তিনি তখন এই উদ্দেশ্যে একটি উটনীর উপর আরোহণ করিয়া পুনরায় কাবার দিকে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু হীরাক উপত্যকার নিকট পৌঁছিয়াই উটনীর পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট এমন একটি দোয়া শুনিয়াছি যাহা পাঠ করিলে যে কোন বিপদাপদই হউক না কেন, আল্লাহ্ তাহা হইতে মুক্তি প্রদান করেন। লোকটির অনুরোধে হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে উক্ত দোয়াটি শিখাইয়া দিলেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, এই লোকটি সেই দোয়া পাঠ করিল এবং পরদিন সকালে একেবারে সুস্থাবস্থায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করিতে আসিল। আমি তাহাকে দোয়া পাঠের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, দুইবার দোয়াটি পাঠ করিবার পর কে যেন আমাকে বলিল, আল্লাহ্-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি এসমে আজম পাঠ করিয়া দোয়া করিয়াছ। ইহা পাঠ করিয়া কোন প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তাহা কবুল হইয়া থাকে। ইহার পরই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম এবং হুযুরে পাক (দঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া তাহার সমীপে এই দোয়া পাঠ করিলাম। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, আমার পিতৃব্য পুত্র ঠিকই বলিয়াছে। এই দোয়ায় এসমে আজম রহিয়াছে। এই দোয়া পাঠ করিয়া কোন প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তাহা কবুল হইয়া থাকে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি আপনার পবিত্র যবান হইতে এই দোয়া শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন তিনি নিজ মুখে এরশাদ করিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّةِ وَيَامَنِ السَّمَاءُ بِقُدْرَتِهٖ مَبْنِيَّةٌ وَيَا مَنِ الْاَرْضُ بِعِزَّتِهٖ مَدْحِيَّةٌ وَّيَا مَنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ مُشْرِقَةٌ مُّضِيَّةٌ وَّيَا مَنْ نَجّٰى يُوْسُفَ مِنْ رِقِّ الْعُبُوْدِيَّةِ يَامَنْ

لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُّنَادِيْ وَلَاصَاحِبٌ يُّغْشٰى وَلَاوَزِيْرٌ يُّعْطِى وَلَاغَيْرُهُ رَبٌّ يُّدْعٰى وَلَايَزْدَادُ عَلٰى كَثْرَةِ الْحَوَائِجِ اِلَّاكَرَمًا وَّجُوْدًا وَّصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاعْطِنِىْ سُؤْلِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ইয়া আলিমাল খাফিয়্যাতি অ ইয়া'মানিস সামা-উ বিরুদুরাতিহী মাবনিয়্যাতু উঁঅ ইয়া'মানিল আরদ্বো বিইযযাতিহী মাদহিয়্যাতুউঁ অ ইয়া'মানিস শামসু অল ক্বামারু বিনূরি জামালিহী মাশরিক্বাতুম মুদ্বিয়্যাতুউঁ অ ইয়া'মান নাজা ইউসুফা মিররাকক্বিল উবুদিয়্যাতি, ইয়া'মান লাইসা লাহু বাওয়াবুইঁ ইউনাদী অলা ছাহিবুন ইয়ুগশী অলা অযীরুন ইউত্বী অলা গাইরুহু রাব্বু ইউদআ অলা ইয়াযদাদু আলা কাছরাতিল হাওয়ায়িজি ইল্লা কারামাউঁ অ জুদান অছাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ অ আলিহী অ আ'ত্বিনী সুলী ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

সেই ব্যক্তি বলিল, অতঃপর আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, আমি আর অসুস্থ নই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি সর্বদা এই দোয়া পাঠ করিও। কেননা ইহা আরশের সম্পদসমূহের অন্যতম।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিসমূহ

আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করিয়াছেনঃ * وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ

অর্থাৎ আর তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় সৃষ্টিকুলের মধ্যে চারিটি বস্তুকে পছন্দ করিয়াছেন। চারি বস্তুর মধ্যে আর একটিকে খুব বেশী মর্যাদা দান করিয়াছেন। সমগ্র ফিরেশতাদের মধ্যে হযরত জিব্রাইল, হযরত মিকাইল, হযরত ইস্রাফীল এবং হযরত আজাইল শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে হযরত জিব্রাইল অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। নবীদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী (রাঃ) শ্রেষ্ঠ। এই চারিজনের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মসজিদসমূহের মধ্যে মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্বছা, মসজিদে নববী এবং মসজিদে তুরে সীনা শ্রেষ্ঠ। আবার ইহাদের মধ্যে মসজিদে হারামই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। দিনের মধ্যে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ইয়াওমে আরাফাহ এবং ইয়াওমে আশুরাহ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে আবার আরাফার দিন অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। রাতের মধ্যে শবে বরাত, শবে কদর, শবে জুমআ এবং শবে ঈদ শ্রেষ্ঠ। শবে কদর আবার ইহাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মক্কা, মদীনা, বাইতুল মুকাদ্দাস এবং মাসাজিদুল আশায়ের এই চারিটি স্থান শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে আবার মক্কা শরীফ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

পাহাড়ের মধ্যে ওহোদ, সীনা, ওয়ালকাম এবং লেবাননের পাহাড় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তন্মধ্যে আবার সীনা পাহাড় সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। নদীর মধ্যে তাইহুন, সাইহুন, ফোরাত এবং নীল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তন্মধ্যে আবার ফোরাত নদী সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মাসের মধ্যে রজব, শা'বান, রমজান এবং মহররম শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার শাবান নবীর মাস হিসাবে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন। যেমন অন্যান্য নবীদের উপর নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মর্যাদা অধিক।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব এবং রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাস শাবান। মানুষ এই মাসের মর্যাদার কথা অবহিত নয়। এই মাসে লোকের আমল আল্লাহর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এইজন্য আমি ইহাই পছন্দ করি যে, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছানো হউক।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করিয়াছেন, যাবতীয় কালেমার মধ্যে ক্বোরআনের বাণী যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি সমস্ত মাসের মধ্যে রজব মাস শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আমি যেমন নবীদের মধ্যে নেতা, শাবান মাস তেমন সমস্ত মাসের সরদার। আল্লাহ্‌তায়ালা যেমন সকল কিছু অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী, রমজান তেমন সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবাগণ শাবান মাসের চাঁদ দেখার পরই ক্বোরআন পাঠে লিপ্ত হইয়া যাইতেন। ধনীগণ যাকাত দান করিতেন। যাহাতে দুঃস্থ লোকগণ রমজানের রোযা রাখার জন্য তৈরী হইতে পারে। শাসনকর্তাগণ কয়েদীগণকে আনাইয়া শাস্তির উপযুক্তদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেন আর অন্যান্যদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। সওদাগরগণও এই মাসেই আদান-প্রদান সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর রমজানের চাঁদ দেখিলেই গোসল করিয়া এতেকাফে বসিয়া যাইতেন।

শাবান মাসের ফজীলত

শায়খ আবু নাসের মুহাম্মদ সনদ পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) যখন রোযা রাখিতেন, মনে হইত তিনি আর বুঝি ইফতার করিবেন না। তিনি মাহে রমজান ব্যতীত আর কোন মাসেই পূর্ণ মাস রোযা রাখিতেন না। ইহা ছহীহ্ হাদীসের বর্ণনা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) শাবান মাসে রোযা রাখা খুব বেশী পছন্দ করিতেন। একবার আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আপনি শাবান মাসে রোযা রাখা এত বেশী পছন্দ করেন কেন? তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! যে ব্যক্তি এই বৎসর মৃত্যু বরণ করিবে, এই শাবান মাসেই ফিরেশতা আজরাইল তাহার নাম লিখিয়া রাখেন। অতএব আমি ইহাই পছন্দ করি যে, যদি মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আমার নামও লিপিবদ্ধ হয়, তবে যেন রোযাদার অবস্থায়ই তাহা লিখা হয়।

শায়খ আবু নাসের মুহাম্মদ সনদ পরম্পরায় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) রমজান মাস ছাড়া একমাত্র শাবান ব্যতীত আর কোন মাসে এত বেশী রোযা রাখিতেন না। যে ব্যক্তি এই বৎসর মৃত্যুবরণ করিবে, জীবিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা হইতে তাহার নামটি কাটিয়া এই শাবান মাসেই মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় লিখা হইয়া থাকে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, শেষ্ঠ রোযা কি? হুযূরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, রমজান মাসের সম্মানার্থে শাবান মাসে যে রোযা রাখা হয়। আবদুল্লাহ্ বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শাবান মাসের শেষ সোমবার রোযা রাখিলে আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শাবান মাসে বহুল পরিমাণে পুণ্য বন্টন করা হয় বলিয়া এই মাসের নাম শাবান রাখা হইয়াছে। রমজান মাসে অনেক পাপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া এই মাসের নাম রমজান মাস রাখা হইয়াছে।

শবে বরাতের ফজীলত

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী অর্থাৎ প্রথম আসমানে আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু মুশরিক, হিংসুটে, নিষ্ঠুর এবং ব্যভিচারীগণকে ক্ষমা করেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে হুযুরে পাক (দঃ) আমার বিছানা হইতে উঠিলেন। আল্লাহ্র শপথ, আমার বিছানা কোন উত্তম বিছানা ছিলনা। উক্ত চাদর-বিছানার তানা ছাগ পশমের ও বানা উটের পশমের ছিল। যখন হুযুর (দঃ) আমার বিছানা হইতে উঠিলেন, তখন আমার ধারণা হইল, হয়ত তিনি অন্য কোন উম্মুল মুমিনীনের গৃহে গমন করিতেছেন আমিও উঠিয়া বসিলাম। হঠাৎ আমার হাত তাঁহার পা মুবারকের উপর পড়িল। তিনি তখন সিজদাহ্র অবস্থায় এই দোয়া পড়িতেছিলেন। আমি দোয়াটি মুখস্ত করিলাম। দোয়াটি এইঃ

سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ اَبُوْءُ لَكَ بِالنِّعَمِ

وَاعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلاَّ أَنْتَ وَأَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِّعْمَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

উচ্চারণ ঃ সাজাদা লাকা সাওয়াদী অ খাইয়ালী অ আ-মানা বিকা ফুয়াদী আবূউ লাকা বিন না'মি অ' আরিফুলাকা বিযযামবি জালামতু নাফসী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা, অ আউযু বিআফ্‌কা মিন উক্কবাতিকা অ আউযু বিরাহমাতিকা মিন নি'মাতিকা অ আউযু বিরিদ্বাকা মিন সাখাতিকা অ আউযু বিকা মিনকা লা উহছী ছানায়ান আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর এইভাবে দোয়া দরূদ ও ইবাদত-বন্দেগী করিয়া রাত অতিবাহিত করিয়া দিলেন। দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার পদদ্বয়ে ফুঁদিতে দিতে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক। আল্লাহ্ কি আপনার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন নাই?

হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে গণ্য হইব না? আর অদ্যকার রাত সম্বন্ধে তুমি কি কিছু অবগত আছ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ রাতে কি? তিনি বলিলেন, আজ রাতে জন্ম-মৃত্যু নির্ধারণ, জীবিকা বন্টন ও মানুষের কার্যাবলী আকাশে উঠানো হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া কেহই কি বেহেশতে যাইতে পারিবে না? তিনি বলিলেন, না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনিও পারিবেন না? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি দুই হাত দ্বারা নিজের মাথা এবং মুখমণ্ডল মাসেহ্ করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! তুমি বলিতে পার কি আজ কোন রাত? আমি বলিলাম, তাহা আল্লাহ্‌র রাসূলই অধিক অবগত। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আজ শাবান মাসের মধ্যবর্তী তারিখের রাত। এই রাতেই মুমিনদের কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে নিয়া যাওয়া হয়। এই রাতে আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে দোজখের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদান করেন। আজ কি তুমি আমাকে ইবাদত করিবার অনুমতি দিবে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, জী হাঁ। অতঃপর হুযুর (দঃ) সূরা ফাতিহার পর ছোট একটি সূরা দিয়া এক রাকয়াত নামায পড়িয়া সিজদায় গিয়া অর্ধরাত অতিবাহিত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় রাকয়াতও সংক্ষেপে আদায় করিয়া বাকী অর্ধরাত সিজদায় কাটাইয়া দিলেন। তিনি সিজদায় এমন ভাবে পড়িয়া রহিলেন যে, আমার মনে হইল আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র আত্মা কবজ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের তলায় হাত দিলাম। তিনি একটু নড়িয়া উঠিলেন। তিনি তখন সিজদায় এই দোয়া পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضٰكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لاَ أَحْصٰى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *

উচ্চারণঃ আউযু বিআফ্‌কা মিন ইক্বাবিকা অ আউযু বিরিদ্বাকা মিন সাখাতিকা অ আউযু বিকা মিনকা জাল্লা ছানাউকা লা আহছা ছানাউ আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা।

আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি রাতে সিজদায় যে দোয়া পড়িয়াছেন আমি তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বে আর কখনও শুনি নাই। হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা পড়িয়াছি, তুমি উহা শিখিয়া রাখ এবং অন্যকেও উহা শিখাইয়া দাও। হযরত জিব্রাইল (আঃ) সিজদাহ অবস্থায় আমাকে এই দোয়া পড়িতে বলিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে হুযুরে পাক (দঃ) আমার বিছানা হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে তালাশ করিতে করিতে গিয়া জান্নাতুল বাকীতে দেখিতে পাইলাম। এই সময় তাঁহার

মুখ আসমানের দিকে উত্তোলিত ছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার মনে কি এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবে? আমি বলিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, হযরত আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করিয়াছেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে দুনিয়ার আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। বনি কালবের ছাগ পালের যত পশম আছে, আল্লাহ্ তাহার চেয়েও অধিক পাপীকে আজ রাতে ক্ষমা করিয়া থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, চারি রাতে আল্লাহ্ সকল বান্দার জন্য নেকীর দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেন। দুই ঈদের দুই রাত, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত এবং আরাফার রাতের ফজরের আযান পর্যন্ত। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, জুমআর রাতও ইহার মধ্যে শামিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শাবানের মধ্যবর্তী রাতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (দঃ)! আজ আপনার মাথা আকাশের দিকে উঠান। কেননা আজ বরকতের রাত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন বরকত? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, এই রাতে আল্লাহ্ তায়ালা রহমতের তিন শত দরজা খুলিয়া রাখেন। মুশরিক, যাদুকর, গণক, সর্বদা মদ্যপানকারী, ব্যভিচারী এবং সুদখোর ব্যতীত সকলকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ইহারা তাওবাহ্ করিলে অবশ্য আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া থাকেন।

রাতের চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর আবার জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (দঃ)! মস্তক উত্তোলন করুন। আমি আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া দেখিলাম, বেহেশতের সব দরজা উন্মুক্ত। প্রথম দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে যে রুকু করিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ। দ্বিতীয় দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে যে সিজদাহ করিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ। তৃতীয় দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে যে যিকির-আযকার করিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ। চতুর্থ দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ। পঞ্চম দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে যে তাসবীহ্-তাহ্‌লীল পাঠ করিয়াছে তাহার জন্য সুসংবাদ। ষষ্ঠ দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আজ রাতে সমস্ত মুমিন মুসলমানের জন্য সুসংবাদ। সপ্তম দরজায় একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, কোন প্রার্থনাকারী থাকিলে প্রার্থনা কর। আজ তাহা পূর্ণ করা হইবে। অষ্টম দরজায় দাঁড়াইয়া একজন ফিরেশতা বলিতেছেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী থাকিলে প্রার্থনা কর। আজ আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

আমি জিব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞসা করিলাম, কখন পর্যন্ত এইসব দরজা খোলা থাকিবে? জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, ছোবহে ছাদেক পর্যন্ত খোলা থাকিবে। আরও বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ (দঃ)! বনি কালবের ছাগ পালের পশমের ন্যায় অসংখ্য বান্দাকে আল্লাহ্ আজ নিষ্কৃতি দান করিবেন।

শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতের অর্থাৎ শবে বরাতের নামায

শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে এক শত রাকয়াত নামায আদায় করা সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে। এই নামাযে মোট এক হাজার বার সূরা আহাদ পড়া হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকয়াতে দশবার করিয়া সূরা আহাদ (ইখলাস) পাঠ করিবে। এই নামাযকে নামাযে খায়ের বলা হয়। প্রাচীনকালের বোযর্গগণ এই নামায আদায়ের জন্য একস্থানে সমবেত হইয়া জামাতের সাথে আদায় করিতেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) তিনজন সাহাবীর নিকট হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এই রাতে নামায আদায়কারীদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা সত্তরবার দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকবার দৃষ্টিতে তাহার সত্তরটি করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সর্বাপেক্ষা কম ফজীলতের কথা এই রাতে আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা লাভ করা। উল্লেখ্য যে, মাহে শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্রে এই নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

রমজান মাসের ফজীলত ও বরকত

ফজীলত ঃ আল্লাহতায়ালা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন রোযা ফরজ করা হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমাদের উপরও রোযা ফরজ করা হইয়াছে। যেন তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পার।

আনতারা তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি তাঁহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি তাঁহার হুজরা মুবারকে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়া বলিলেন, হে আলী! জিব্রাইল তোমাকে সালাম করিতেছেন। আমি বলিলাম, আপনার ও জিব্রাইলের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। হুযুরে পাক (দঃ) আমাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, এখন জিব্রাইল আমার নিকটে উপবিষ্ট। তিনি তোমাকে বলেন, যদি তুমি প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখ, তবে প্রথম রোযার জন্য দশ হাজার বৎসরের, দ্বিতীয় রোযার জন্য ত্রিশ হাজার বৎসরের এবং তৃতীয় রোজার জন্য এক লক্ষ রোযার পুণ্য তোমাকে দান করা হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! এইরূপ পুণ্য কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, না অন্য কেহ্ রাখিলে সেও এইরূপ পুণ্য লাভ করিবে? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, অন্য কেহ রাখিলে সেও এইরূপ পুণ্য লাভ করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রোযা তিনটি কোন কোন দিন? হুযুরে পাক জবাব দিলেন, আইয়্যামে বিজের তিন দিন। অর্থাৎ প্রত্যেক চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ।

আনতারা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞসা করিলেন, আইয়্যামে বীজ নাম কেন হইল? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে বেহেশ্ত হইতে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তখন সূর্যের তাপে হযরত আদম (আঃ)-এর দেহের রং জ্বলিয়া পুড়িয়া কাল হইয়া গেল। এ সময় হযরত জিব্রাইল হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে আদম (আঃ)! আপনি কি এ আশা পোষণ করেন যে, আপনার গাত্র চর্মের রং আবার পূর্বের মত সুন্দর হইয়া যাউক? হযরত আদম (আঃ) বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই। তখন হযরত জিব্রাইল বলিলেন, তাহা হইলে আপনি প্রত্যেক চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রোযা রাখুন।

হযরত আদম (আঃ) প্রথম দিন রোযা রাখিলে তাঁহার দেহের এক-তৃতীয়াংশ সুন্দর সাদাবর্ণ ধারণ করিল, দ্বিতীয় দিন রোযা রাখিলে তাঁহার দেহের দুই-তৃতীয়াংশ সুন্দর সাদা হইল এবং তিনি তৃতীয় দিন রোযা রাখিলে তাঁহার দেহের সম্পূর্ণাংশ সুন্দর সাদাবর্ণ দারণ করিল। এই জন্যই এই দিন তিনটিকে আইয়্যামে বীজ বলা হয়। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্ববর্তী যে সকল নবীর উপর রোযা ফরজ করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ)ও অন্যতম ছিলেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে,

اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এর দ্বারা এখানে হযরত মূসার (আঃ) অনুসারী ইয়াহুদী এবং হযরত ঈসার (আঃ) অনুসারী খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা তাহাদের উপরও রমজান মাসের রোযা রাখা ফরজ ছিল। কিন্তু রোযা রাখা তাহারা খুবই অসুবিধা মনে করিত। কারণ মাহে রমজান কখনও-বা ভীষণ শীতে আবার কখনও-বা ভীষণ গরমের মধ্যে আসিয়া পড়িত। এই কারণে খৃষ্টান

দায়ের আলেম এবং নেতৃস্থানীয় লোকগণ শীত এবং গরমের মধ্যবর্তী সময়ে রোযা রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। আর এই পরিবর্তন করার জন্য নির্দ্ধারিত রোযার পরে আরও দশটি রোযা কাফ্ফারা স্বরূপ অতিরিক্ত ধার্য করিয়া লইলেন। ফলে তাহাদের রোযার সংখ্যা হইল চল্লিশটি।

একবার তাহাদের বাদশাহ্র মুখে বেদনার সৃষ্টি হইল। বাদশাহ্ মানত করিলেন যদি তাহার ব্যথা ভাল হইয়া যায়, তবে তিনি আরও এক সপ্তাহ্ রোযা বাড়াইয়া দিবেন। আরোগ্য হইবার পর তিনি সত্যই রোযা আরও এক সপ্তাহ বাড়াইয়া দিলেন। ইহার পরবর্তী বাদশাহ্ রোযার সংখ্যা আরও এক সপ্তাহ বাড়াইয়া দিলেন। এই বাদশাহ্র শাসনামলে একবার রাজ্যে ভীষণ মহামারী রূপে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। বাদশাহ্ আদেশ করিলেন, যে রোযা নির্দ্ধারিত আছে, উহার সহিত আরও অতিরিক্ত বিশটি রোযা রাখিতে হইবে।

তফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং মুসলমানদের উপর আশুরার দিন ও আইয়্যামে বীজের রোযা ফরজ করিয়াছিলেন। হিজরতের পরও ঐ রোযা ফরজ হিসাবে ছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধর একমাস কয়েকদিন পূর্বে রমজানের ত্রিশ রোযা ফরজ করা হয়। আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) শাবান মাসে আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবাহ দান কালে বলিলেন, হে লোক সকল! বোযর্গ মুবারক মাস তোমাদের দ্বারে আগমন করিয়াছে। এই মাসের এক রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। আল্লাহ্ এই মাসে রোযা ফরজ করিয়াছেন এবং নফল ইবাদত করার জন্য এই মাসের রাতকে মুস্তাহাব করিয়াছেন। এই মাসে যদি কেহ একটি পুণ্যের কাজ করে, কিংবা কোন ফরজ আদায় করে, তবে সে যেন রমজান মাস ব্যতীত অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায় করিল।

রমজান ধৈর্যধারণ করার মাস। এই ধৈর্যধারণের প্রতিদান পবিত্র বেহেশত। এই মাসে মুসলমানদের জীবিকা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কেহ যদি কাহাকেও ইফতার করায়, তবে এই ইফতার তাহার পাপ বর্জনার কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দোজখ হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়া থাকে। এই প্রকার পুণ্যের কোনরূপ ঘাটতি হয় না।

কোন কোন সাহাবা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! কাহাকেও ইফতার করাইবার মত সামর্থ্য আমাদের নাই। হুযুর (দঃ) বলিলেন, এই পুণ্য শুধু সে ব্যক্তিই লাভ করিবে, যে অন্যকে ইফতার করাইবে। ইফতার একটি খেজুরের দ্বারাই হোকনা কেন।

এই মাসের প্রথম দিকে রহমত, মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষমা এবং শেষভাগে দোজখের আযাব হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা। যদি কোন ব্যক্তি এই মাসে তাহার দাসের বোঝা (মেহনত বা শ্রম) কমাইয়া দেয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দোজখের আগুন হইতে মুক্তি দান করেন।

এই মাসে চারটি কাজের প্রতি অবশ্য কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। তন্মধ্যে দুইটি আল্লাহ্কে রাজী এবং খুশী রাখা অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবাহ পাঠ করা এবং তাওবাহ্ ইস্তেগফার করা। বাকী দুইটি যাহা না করিয়া গত্যন্তর নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট বেহেশ্তের প্রার্থনা করা এবং দোজখের আগুন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করা। কোন ব্যক্তিকে এই মাসে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইলে আল্লাহ্ তায়ালা রোজকিয়ামতে তাহাকে আমার হাউজ হইতে এমন শরবত পান করাইবেন, যাহার পর আর সে কখনও পিপাসিত হইবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজানের প্রথম রাতে আসমান এবং বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বন্ধ করা হয় না। যদি কোন মুমিন পুরুষ বা মহিলা এই সব রাত্রে নামায পড়ে তবে উহার প্রত্যেক সিজদাহ্র পরিবর্তে এক হাজার সাত শত পুণ্য দান করা হয়, তাহার জন্য লাল ইয়াকুত দ্বারা বেহেশ্তের প্রাসাদ তৈরী করা হয় প্রত্যেক প্রাসাদে স্বর্ণের তৈরী সত্তর হাজার দরজা থাকিবে। দরজাগুলি ইয়াকুত দ্বারা সুসজ্জিত করা হইবে। যখন কোন বান্দা রমজানের প্রথম রোযা রাখে, আল্লাহ্তায়ালা রমজানের শেষ পর্যন্ত তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। প্রত্যেকটি রোযার বদলে সত্তর হাজার দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ তাহার জন্য নির্মাণ করা হয় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরেশতা তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রাত দিনে যত সিজদাহ্ করে উহার প্রত্যেক সিজদাহ্র বদলে এমন এক একটি গাছ দান করা হইবে, যাহার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বৎসর অশ্ব পরিচালনা করিলেও সেই ছায়ার প্রান্ত সীমায় পৌঁছিতে পারা যায় না।

১২—

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজান মাস আগমন করিলে, দোজখের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় আর বেহেশ্তের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করিয়া রাখা হয় এবং অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত আবু মাসউদ গিফারী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র রমজান মাসে একটি রোযা রাখে, তবে উহার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাহার সাথে একজন হুরের বিবাহ প্রদান করিবেন। এই হুর ঐ সমস্ত হুরের মধ্যে থাকিবে যাহাদিগকে মোতির তাঁবুতে সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত হুরগণ সত্তর প্রকার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত থাকিবে। উহার একটির রং অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিবে। উহা হইতে সত্তর প্রকার সুঘ্রাণ নির্গত হইবে। মারওয়ারিদ দ্বারা সেই পোশাকের হাসিয়া প্রান্ত প্রস্তুত করা হইবে। ইয়াকুতের দ্বারা তৈরী সত্তরটি সিংহাসন থাকিবে। প্রত্যেক সিংহাসনে বিভিন্ন প্রকারের সত্তরটি বিছানা থাকিবে। প্রত্যেক খাদেম খাদ্য ভর্তি একেকটি স্বর্ণপাত্র লইয়া তাহাদের আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। উক্ত পাত্রে রক্ষিত খাদ্যের প্রত্যেকটি লোকমায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বাদ থাকিবে। রমজান মাসে রোযা আদায়কারী এইরূপ পুণ্যে পুণ্যবান হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য পুণ্য কাজের জন্য অন্যান্য রূপ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হইবে।

বরকত ঃ আবুনসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এক বৎসর পূর্ব হইতে পরবর্তী রমজান মাসের জন্য বেহেশ্তকে ঝাড়া-মুছা এবং সুসজ্জিত করিতে থাকে। রমজান মাসের প্রথম রাতে আরশের নীচ হইতে "মুশীরাহ" নামক এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই বাতাসে বেহেশ্তের বৃক্ষসমূহের পত্র-পল্লব এবং দরজার কপাটগুলি হেলিতে দুলিতে আরম্ভ করে এবং সেই বন মর্মরে একটি মধুর সুরের সৃষ্টি হয়, যাহা কেহ কোনদিন শ্রবণ করে নাই। সেই রাতে হুরগণ নিজদিগকে নানা প্রকার অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া বেহেশতের বালাখানার সামনে দাঁড়াইয়া বলে, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে? অতঃপর তাহারা রেজওয়ান ফিরেশ্তার নিকট জিজ্ঞাসা করে, আজ কোন রাত?

ফিরেশতা রেজওয়ান বলেন, ইহা রমজান শরীফের রাত। এই রাতে হুযুরে পাক (দঃ)-এর রোযাদার উম্মতদের জন্য বেহেশ্তের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, এই রাতে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং আদেশ করেন, হে বেহেশ্তের দ্বাররক্ষীগণ! হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতদের জন্য বেহেশ্তের দরজা খুলিয়া দাও এবং দোজখের দরজা বন্ধ করিয়া দাও। ফিরেশ্তা জিব্রাইলকে আদেশ করেন, তুমি দুনিয়াতে গমন করিয়া যত অবাধ্য শয়তান আছে, তাহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া নদীর ঘূর্ণির মধ্যে নিক্ষেপ কর, যেন তাহারা আমার প্রিয় বন্ধুর রোযাদার উন্মতদিগকে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করিতে না পারে। প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্তায়ালা তিনবার বলেন, কোন প্রার্থনাকারী থাকিলে আমার নিকট প্রার্থনা কর। আমি প্রর্থনা কবুল করিব। তাওবাহ্কারী থাকিলে তাওবাহ্ কর। আমি গ্রহণ করিব, ক্ষমা প্রার্থনাকারী থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি ক্ষমা করিব। যাহার প্রয়োজন নাই, এমন ধনীকে আল্লাহকে ঋণ দিতে দাও, তিনি পূর্ণ ভাবে ঋণ পরিশোধ করিবেন। ঋণ পরিশোধে কোন প্রকার কার্পণ্য করিবেন না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, রমজান মাসে আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যহ ইফতার করার সময়ে এক কোটি লোককে ক্ষমা করেন, যাহারা দোজখের শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আরও হাজার ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা রমজান মাসের শেষদিন দোজখে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এত বেশী লোককে মুক্তিদান করেন, যত লোককে সারা রমজান মাস ভরিয়া মুক্তিদান করেন।

কদরের রাতে আল্লাহর আদেশে ফিরেশতা জিব্রাইল ফিরেশতাদের একটি দলসহ দুনিয়াতে আগমন করেন। তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই সবুজ রংয়ের একটি করিয়া পতাকা থাকে। দুনিয়াতে আগমন করিয়াই উক্ত পতাকাসমূহ কাবা গৃহের পিঠে গাড়িয়া রাখেন। ফিরেশতা জিব্রাইলের ছয়শত ডানা সে রাতে খুলিয়া দেন। ডানাগুলিতে দুনিয়ার পূর্ব হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলে। অতঃপর অন্যান্য ফিরেশতাগণ হযরত জিব্রাইল এর নির্দেশমত হুযুর (দঃ)-এর উম্মতদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়েন এবং প্রত্যেক ইবাদাতকারীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে সালাম করেন ও

...সাথে মুসাফাহা করেন। আর তাহারা দোয়া করার সাথে সাথে আমীন, আমীন, বলেন। এইভাবে ... প্রভাত হইয়া যায়।

অতঃপর হযরত জিব্রাইল বলেন, হে ফিরেশতাগণ! এখন তোমরা প্রত্যাবর্তন কর। ফিরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে জিব্রাইল! আল্লাহ তায়ালা শেষ নবীর উম্মতের কোন অভাব পূর্ণ করিলেন? তিনি উত্তর করেন, তাহাদের প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দান করিয়াছেন, কিন্তু চারি ব্যক্তি ক্ষমা ... নাই।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, এই চারি ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য যথা ঃ (১) সর্বদা মদ্যপানকারী (২) পিতা-মাতার আদেশ অমান্যকারী (৩) নির্দয় ব্যক্তি এবং (৪) মুসলমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারী।

ঈদুল ফিতরের রাতে আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতাগণকে আদেশ করেন, তোমরা সকলে প্রত্যেকটি শহরে ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়। তাহারা দুনিয়াতে আসিয়া প্রত্যেকটি রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকেন, হে মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও। কেননা তিনি তোমাদিগকে অফুরন্ত প্রতিদান দিয়া থাকেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। ফিরেশতাদের এই কথা মানব এবং জ্বীন ব্যতীত আর সকলেই শুনিয়া থাকে।

যখন বান্দাগণ নামাযে দাঁড়াইয়া যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, হে আমার ফিরেশতাগণ! যে শ্রমিক পূর্ণ ভাবে কাজ করে, তাহার পারিশ্রমিক কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? ফিরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের মহান প্রতিপালক! তাহাদিগকে পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে ফিরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, রমজান মাসে যাহারা রোযা রাখিয়াছে এবং রাত জাগিয়া ইবাদাত করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমি তাহাদের সমুদয় পাপ মার্জনা করিয়া দিয়াছি।

অতঃপর আরও বলেন, ওহে আমার বান্দাগণ! যাহা চাহিবার আমার নিকট চাহিয়া লও। আমি দান করিব। আমার সম্মান এবং প্রতিপত্তির শপথ, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যাহা চাহিবে, তাহাই আমি দান করিব, যতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাকে ভয় করিতে থাক, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের অন্যায়সমূহ আমি গোপন করিয়া রাখি। কাহারও নিকট তোমাদিগকে লজ্জিত ও অপদস্থ করি না, তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, এই কথা শুনিয়া ফিরেশতাগণ হুযুরে পাক (দঃ)এর উম্মতগণকে আল্লাহর এই দানের শুভ-সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

আবু নসর সনদ পরম্পরায় আবু মাসউদ গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজানের বোযর্গী সম্বন্ধে জনসাধারণ যদি অবগত থাকিত, তবে তাহারা এই প্রার্থনাই করিত যে, রমজান মাসের স্থায়ীত্ব এক বৎসর পর্যন্ত হউক।

বনি খাযাআ কবিলার এক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! রমজানের ফজীলত সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করুন। হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, রমজানকে সম্ভাষণ জানাইবার জন্য এক বৎসর পূর্ব হইতে বেহেশতকে সুসজ্জিত করা আরম্ভ হয়। রমজানের প্রথম রাতে আরশের নীচ হইতে এ প্রকার মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই বাতাসে বেহেশতের বৃক্ষের পল্লবসমূহ আন্দোলিত হয়। হুরগণ ইহা অবগত হইতে পারিয়া আল্লাহর নিকট আরজ করে, হে প্রভু! এই মাসে তোমার বান্দাদের মধ্য হইতে আমাদের জোড় নির্দ্ধারণ করিয়া দাও। তাহাদেরকে দেখিয়া আমাদের হৃদয় শীতল করি এবং তাহারাও আমাদেরকে দেখিয়া তাহাদের হৃদয় শীতল করুক। অতএব রমজানের এমন কোন রোযাদার ব্যক্তিই বাকী থাকে না যাহাদের বিবাহ কোন এক হুরের সাথে না হয়। এই সমস্ত হুরের চেহারা চাঁদ অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল। ইহারা মোতির তাঁবুর মধ্যে অপেক্ষমান।

আল্লাহতায়ালা উক্ত হুরদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বেহেশতের হুরগণকে তাঁবুর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক হুরই বেহেশতের সত্তরটি পোশাক পরিহিতা। প্রত্যেকটি পোশাক আবার বিভিন্ন বর্ণের। পোশাকগুলি হইতে মৃগণাভীর সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হয়। প্রত্যেক হুরের জন্য ইয়াকুত ও জবরওয়ারিদ দ্বারা সুসজ্জিত সিংহাসণ পাতা রহিয়াছে। এই সিংহাসনে ইস্তেবরাক নামক এক প্রকার রেশমী কাপড়ের সত্তরটি বিছানা থাকিবে। সিংহাসনের সম্মুখভাগও নানা প্রকার বিছানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হইবে। প্রত্যেক হুরের জন্য সত্তর হাজার খাদেম নিযুক্ত থাকিবে, খাদেমদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া পাত্র থাকিবে। পাত্রের খাদ্য দ্রব্যের প্রত্যেকটি লোকমার স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে। পুরুষদের ইয়াকুতের কারুকার্য মণ্ডিত দুইটি করিয়া স্বর্ণ কঙ্কন প্রদান করা হইবে। এইসব কিছুই রমজানের রোযাদারকে দেওয়া হইবে।

কাতাদাহ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজানের প্রথম রাতে আল্লাহতায়ালা বেহেশতের প্রহরী রেজওয়ানকে আহ্বান করিলে রেজওয়ান বিনীত ভাবে বলেন, প্রভু! আমি হাজির। তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, আমার প্রিয় বন্ধুর রোযাদার উম্মতদের জন্য বেহেশত পরিষ্কার কর। উহা উত্তমরূপে সজ্জিত কর এবং উহার দরজা খুলিয়া দাও। রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার দরজা বন্ধ করিও না।
অতঃপর দোজখের রক্ষী ফিরেশতাকে আদেশ করেন, আমার প্রিয় মুহাম্মদের রোযাদার উম্মতদের জন্য দোজখের দরজা বন্ধ করিয়া দাও এবং রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার দরজা খুলিও না। অতঃপর আল্লাহ ফিরেশতা জিব্রাইলকে বলেন, তুমি দুনিয়ায় গমন করিয়া শয়তানদিগকে বাঁধিয়া ফেল যেন তাহারা মুহাম্মদের রোযাদার উম্মতদিগকে রোযার অনিষ্ট এবং ইফতারের সময় কোন প্রকার ক্ষতি করিতে না পারে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা সূর্যোদয় হইতে ইফতার করার সময় পর্যন্ত তাহার দাসদাসীদেরকে ক্ষমা করিতে থাকেন।
প্রত্যেক আকাশে আল্লাহর আদেশানুযায়ী একজন প্রচারক ফিরেশতা থাকেন। এই ফিরেশতার মাথার তাজ আরশের নীচে এবং তাহার পা সপ্তস্তর যমিনের নীচে। তাহার দুইটি ডানা দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডানা দুইটি মারজান মারওয়ারিদ এবং ইয়াকুত পাথর দ্বারা সুসজ্জিত। এই ফিরেশতা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, পাপ হইতে বিরত থাকিতে এবং আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তনকারী কোন বান্দা আছ কি? যদি থাক তবে আস। তাওবাহ কর। আল্লাহ তাওবাহ কবুল করিবেন। কোন দোয়াকারী থাকিলে দোয়া কর, আল্লাহ দোয়া কবুল করিবেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারী থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহা কিছুই চাহ না কেন, আল্লাহ তাহা দান করিবেন।
সমস্ত রমজান মাস ভরিয়াই আল্লাহ বলিতে থাকেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা ধৈর্য্যে অটল থাক। শীঘ্রই তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদান দেওয়া হইবে। অচিরেই তোমরা আমার রহমত এবং সান্নিধ্য লাভ করিবে। শবে কদরে ফিরেশতা জিব্রাইল একদল ফিরেশতাসহ দুনিয়াতে আগমন করেন এবং তাহারা সকলেই রাতভর ইবাদাতকারীদের জন্য রহমত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যদি আসমান ও যমিনকে বাকশক্তি দান করিতেন তবে তাহারা রমজানের রোযা আদায়কারীদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করিত। আবদুল্লাহ ইবনে আওফী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযাদার ব্যক্তির শয়ন করা ইবাদাত এবং চুপ থাকা তাসবীহ পাঠ তুল্য। তাহার দোয়া কবুলিয়ত যোগ্য এবং পুণ্য কাজসমূহ দ্বিগুণ পুণ্য লাভের যোগ্য।
আ'মাস আবু খোযায়মা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সাহাবায় কেরামগণ বলিতেন, এক রোযা অন্য রোযা পর্যন্ত, এক হজ্জ্ব অন্য হজ্জ পর্যন্ত এক জুমআ অন্য জুমআ পর্যন্ত মানুষ কবীরাহ গুনাহ ব্যতীত যে পাপ করে, তাহা এই সময়ের মধ্যে মাফ হইয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, রমজান মাসের জন্য তোমাদিগকে সুসংবাদ। কেননা এই মাস শুধু পুণ্যে পরিপূর্ণ। ইহার দিনে রোযা এবং রাতে অন্য ইবাদাত। এই মাসে যাহা খরচ হয়, উহা আল্লাহর পথে খরচ হয়।
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানদার অবস্থায় এবং পুণ্যের আশায় যে ব্যক্তি এই মাসে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদাত করে, আল্লাহ তাহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মত হইতে কোন আদম সন্তান কোন একটি পুণ্যের কাজ করিলে দশ হইতে সাতশত পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। রোযা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, রোযা শুধু আমার জন্য। উহাতে বান্দা নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই পানাহার হইতে বিরত থাকে। সেহেতু আমার পদ-মর্যাদা অনুযায়ীই আমি তাহাকে পারিশ্রমিক দান করিব। রোযা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। রোযাদার ব্যক্তি দুইটি আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। একটি ইফতারের সময়ে এবং অন্যটি আল্লাহর দীদার লাভের সময়ে। ইহার সমতুল্য আর কোন আনন্দ নাই।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি রমজান মাসের কোন এক রাতের নফল নামাযে 'ইন্না ফাতাহনা লাকা' --- পাঠ করে তবে সেই বৎসর ঐ ব্যক্তি নিরাপদ থাকে।

শবে কদরের ফজীলত

আল্লাহতায়ালা শবে কদরের ফজীলত ও মরতবা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই কোরআনের সূরা কদর (ইন্না আনযালনা হু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি ---) নাযিল করিয়াছেন। এই সূরায় কোরআনে পাককে নাযিল করার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা লাওহে মাহফুজ হইতে কোরআনকে সুফরাহ

ফিরেশতাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। লিখাপড়ার কাজে নিয়োজিত ফিরেশতাদিগকে সুফরাহ বলা হয়। বৎসরে কোরআনের যতটা অবতীর্ণ করা হইত ঠিক ততটা লাওহে মাহফুজ হইতে দেওয়া হইত। পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত উক্ত পরিমাণ কোরআন হযরত জিব্রাইল হুযুরে পাক (দঃ) এর নিকট লইয়া আসিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য বোযর্গগণ বলেন, ‘ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদরি’ দ্বারা ফিরেশতা জিব্রাইলকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলেন, এই সূরা এবং অবশিষ্ট সমস্ত কোরআন আমি জিব্রাইল মারফত সুফরাহ ফিরেশতাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে দীর্ঘ (তেইশ বৎসর) সময়ে অল্প অল্প করিয়া মুহাম্মদ-এর উপরে উহা অবতীর্ণ শেষ করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা বলেন, হে মুহাম্মদ! শবে কদর কি? এই সম্বন্ধে যদি আমি তোমাকে অবগত না করাইতাম তবে তুমি উহার ফজীলত ও বোযর্গী সম্বন্ধে কিভাবে অবগত হইতে পারিতে? অতঃপর আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, কদরের মাস হাজার মাসের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই রাতে যাহা কিছু ইবাদাত-বন্দেগী করা হয়। উহা হাজার মাসের ইবাদাত-বন্দেগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

একদিন হুযুরে পাক (দঃ) সাহাবাদের সম্মুখে বনি ইস্রাইলের চারি ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন, তাহারা আশি বৎসর পর্যন্ত একাধারে ইবাদাত করে। এই সময়ের মধ্যে তাহারা একটি নাফরমানীর কাজও করেন নাই। তারপর হযরত আইউব, হযরত যাকারিয়া, হযরত খারকীল এবং হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ) এই চারিজন পয়গাম্বরের কথাও উল্লেখ করেন। এই হাদীস শুনিয়া সাহাবাগণ খুবই বিস্মিত হইলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাইল হুযুরে পাক (দঃ)এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর বস্তু আল্লাহ আপনার উম্মতদিগকে দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সূরা কদর পাঠ করিয়া বলিলেন, যে বিষয়ে আপনার সাহাবাগণ বিস্মিত হইয়াছেন ইহা তাহার চেয়েও বিস্ময়কর। এই কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) খুবই আনন্দিত হইলেন।

কদরের রাত রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিশেষভাবে সাতাইশে রমজান তারিখে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, রমজান মাসের শেষ দশ দিন একই সমতুল্য। একের উপর অন্যের বেশী ফজীলত নাই। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, রমজানের একুশে রাত শবে কদর। আবার কাহারও কাহারও মতে উনত্রিশে রাত শবে কদর। হযরত আয়েশার (রাঃ) মতেও এই তারিখটিতেই শবে কদর। আবু বুরিদাহ আসলামী বলেন, তেইশে রমজান শবে কদর। আবু জর গিফারী (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, পঁচিশে রমজান শবে কদর। হযরত বেলাল (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ) হইতে বলেন যে, শবে কদর চব্বিশে রমজান। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেন যে, শবে কদর সাতইশে রমজান। প্রমাণ স্বরূপ বলা হয় যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁহার সনদে ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, লোকের অভ্যাস ছিল, রমজান মাসের শেষ দশ দিন হুযুর (দঃ)এর নিকট তাহাদের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা। একবার তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা যে একটির পর একটি স্বপ্ন দেখিতেছ, ইহা সাতাইশে রাত সংঘটিত হইয়াছে। অতএব এই এরশাদ দ্বারা প্রামাণিত হইল যে, শবে কদর রমজান মাসের সাতাইশে তারিখে সংঘটিত হয়!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, শবে কদর সম্বন্ধে আমি বেজোড় সংখ্যার মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সাত সংখ্যাই অধিক প্রযোজ্য। কেননা আসমানের সংখ্যা সাত। শাফা মারওয়া সাতবার সায়ী করিতে হয়। কাবার তাওয়াফ সাতবার করিতে হয়। সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় মানুষের সৃষ্টি সাতটি অঙ্গে, মানুষের আহার সাতদানা। মানুষের মুখমণ্ডলে সাতটি ছিদ্র। সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত। কোরআন মজীদের সাতটি কিরাত। দোজখ সাতটি এবং তাহার দরজাও সাতটি এবং দোজখের স্তম্ভও সাতটি। আদ সম্প্রদায় সাত রাতের বাতাসে ধ্বংস হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) সাত বৎসর কারাগারে ছিলেন। সূরা ইউসুফে বর্ণিত গাভীর সংখ্যা সাত। এই সময়কার দুর্ভিক্ষও ছিল সাত বৎসর। আবার সাত বৎসরই বিপুল পরিমাণে শস্যের ফলন হইয়াছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ফরজ রাকাতের সংখ্যা সতের। কুকুর কোন মাটির পাত্রে মুখ দিলে হুযুরে পাক (দঃ) উহা সাতবার ধৌত করার আদেশ দিয়াছেন। সূরা কদরের সালাম শব্দ পর্যন্ত অক্ষরের সংখ্যা সাতাইশটি। হযরত আইউব (আঃ) সাত বৎসর পর্যন্ত নানারূপ বিপদাপদে জড়িত ছিলেন। হুযুরে পাক (দঃ) হযরত আয়েশা রাঃ)কে অধিকাংশের মতে সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করেন। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতদের শহীদ লোক সাত প্রকার । যথাঃ

(১) যাহারা ধর্মযুদ্ধে নিহত হয়। (২) যাহারা প্লেগ রোগে মারা যায়। (৩) যাহারা যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশে মারা যায়। (৪) যাহারা পানিতে ডুবিয়া মারা যায়। (৫) যাহারা আগুনে পুরিয়া মারা যায়। (৬) যাহারা পেটের রোগে মারা যায়। (৭) যে নারী নেফাসের অবস্থায় মারা যায়।
আল্লাহ্ তায়ালা সাতটি বস্তুর শপথ করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র, সূর্য, চাশতের সময়, দিন, রাত, আকাশ এবং যিনি আসমান যমিন সৃষ্টি করিয়াছেন।
অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালা বহু কিছুই সাতের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। আর শবে কদর যখন রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে, তখন সাতের সংখ্যায় অর্থাৎ সাতাইশে তারিখে হওয়াই অধিক স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়।

জুমআর রাত ও কদরের রাতের তুলনা

জুমআর রাত ও কদরের রাতের মধ্যে কোন রাত শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে বোযর্গদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে বাতহা, আবুল হাসান জাযরী, আবু হাফস্ ওমর বারমেকী প্রমুখ বলেন, জুমআর রাত শ্রেষ্ঠ। আবু হাসান তামীমী বলেন, শবে কদর শ্রেষ্ঠ। কেননা এই রাতে কোরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে। অবশ্য যে কদরের রাত্রে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই রাত্রটিই জুমআর রাত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যান্য কদরের রাত্র হইতে জুমআর রাত্র শ্রেষ্ঠ।
দেখা যায়, অধিকাংশ আলেমের মতে জুমআর রাত অপেক্ষা কদরের রাত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জুমআর রাতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়, কাজী ইমাম ইউলা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জুমআর দিন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। একমাত্র জুমআর রাত ব্যতীত অন্য কোন রাত সম্বন্ধে হুযুরে পাক (দঃ) এরূপ উক্তি করেন নাই। হুযুর (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, এই বোযর্গ রাত ও মহান দিনে আমার উপর অধিক সংখ্যায় দরূদ পাঠ কর।
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জুমআর দিন যে বোযর্গীর সাথে সূর্যোদিত হয়, অন্য কোন দিনই তেমন হয় না। অন্যান্য দিন অপেক্ষা জুমআর দিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনম হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার যে ভাবে সূর্যাস্ত হয়, তেমন আর কোনদিন হয় না। ঐদিন মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল জীব জন্তুই আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিয়া থাকে।
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজকিয়ামতে আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক দিনকেই উহার আমল আকৃতিতে (রূপে) প্রকাশ করিবেন। শুক্রবার দিনটি অধিক উজ্জ্বল এবং সৌন্দর্যময় রূপে প্রকাশ করিবেন। নব বধূ স্বামীর নিকট যাওয়ার সময়ে যেমন লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেদিন শুক্রবারও তেমনি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। শুক্রবার লোককে আলো দান করিবে এবং লোকগণ সেই আলোতে পথ চলিবে। জুমআর নামায আদায়কারী লোকের গাত্রবর্ণ ও চেহারা বরফ অপেক্ষা অধিক সাদা হইবে এবং তাহাদের দেহ হইতে কস্তুরীর সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইবে। উহারা মানুষ ও জ্বিনের সম্মুখ দিয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবে।
এখন যদি কেহ এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ বলিয়াছেন, কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই প্রশ্নের জবাব কি? জবাব এই যে, জুমআর রাত ঐ গণনার বাহিরে। তাফসীরকারগণ এই কথা বলিয়াছেন। বেহেশতেও জুমআর রাত থাকিবে। কেননা আল্লাহতায়ালা শুক্রবার দিন তাঁহার পবিত্র দীদার দান করিয়া তাঁহার বান্দাগণকে সৌভাগ্যবান করিবেন। দুনিয়াতে আমরা নিঃসন্দেহে জুমআর রাত দেখিতে পাই। কিন্তু শবে কদর যে নিশ্চিতরূপে কোন তারিখে, সেই সম্বন্ধে বহু মতভেদ রহিয়াছে।
যাহারা শবে কদরকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাহাদের মতে আল্লাহর বাণী কদরের রাত্র হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাজার মাসে ৮৩ বৎসর ৪ মাস হয়। বর্ণিত রহিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ)এর উম্মতদের বয়স হুযুর (দঃ)এর সম্মুখে পেশ করা হইলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার উম্মতদের বয়স কম। আর সেই স্বল্পতাকে পূর্ণ করার জন্যই কদরের রাত্র দান করা হইয়াছে।
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পূর্বেকার উম্মতদের আমল ও বয়সের সাথে তুলনা করিয়া দেখিলাম, আমার উম্মতদের বয়স কম। কাজেই তাহারা পূর্বেকার উম্মতদের ন্যায় বেশী পরিমাণে পুণ্যের কাজ করার সুযোগ পাইবে না। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কদরের রাত আমার উম্মতদিগকে দান করিয়াছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলিয়াছেন, কদরের রাতের এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করিলে কদরের রাতের পুণ্যের অংশ লাভ করা যায়। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে সে অবশ্য কদরের রাতের নিজস্ব অংশ লাভ করিয়া থাকে। সূরা কদর পাঠকারী যেন কোরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করিল। রমজান মাসের শেষ দশ দিনের এশার নামাযে সূরা কদর পাঠ করা মোস্তাহাব।

কদরের রাত অনির্দিষ্ট রাখার কারণ

একটি প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, আল্লাহতায়ালা যেমন শুক্রবারকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি কদরের রাত্রটিকে নির্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোন ব্যক্তি যেন কদরের রাত জাগিয়া ইবাদাত করতঃ এই ধারণা না করিতে পারে যে, আমার আজিকার রাত্রের ইবাদাত হাজার মাসের ইবাদাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আল্লাহ আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি আল্লাহর নিকট অত্যধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আমি নিশ্চয়ই বেহেশতের অধিকারী হইব। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া অলস এবং আরাম প্রিয় লোকেরা যাহাতে অন্যান্য দিনে ও রাতে ইবাদাত-বন্দেগী তরক না করে তজ্জন্যই আল্লাহতায়ালা কদরের রাতটিকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন।

এই ভাবে মানুষের আয়ুষ্কাল কখন পূর্ণ হইবে, তাহা আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও জ্ঞাত করান নাই। কারণ যদি তাহা অবগত করাইতেন, তবে কতক লোক মনে করিত যে, মৃত্যুর এখনও বহু বিলম্ব আছে, এই সময়ের মধ্যে ইচ্ছামত কিছু করিয়া লই। মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তাওবাহ করিয়া লইব। নেক কাজ করিব এবং নেককার নেকবখত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিব। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও তাহার বয়স সম্বন্ধে অবগত করান নাই যেন সে সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎকাজে লিপ্ত থাকে ও তাওবাহ করিতে থাকে। এইরূপ সৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়াতেও আনন্দ পায় এবং আখেরাতেও শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকে।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পাঁচটি বস্তু হইতে পাচটি বস্তুকে গোপন রাখা হইয়াছে। আর তাহা হইলঃ (১) মানুষের ইবাদাতের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি। (২) পাপ ও অপরাধের প্রতি আল্লাহর গজব ও ক্রোধ (৩) অন্যান্য নামায হইতে মধ্যবর্তী সময়ের নামায। (৪) জন সাধারণের নিকট হইতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন। (৫) জন সাধারণের নিকট হইতে কদরের রাত্রি।

পাঁচটি রাতের ইবাদাত

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে পাঁচটি রাত দান করিয়াছেন। প্রথমটিঃ কুদরত ও মোজেযাহর রাত, যে রাতে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হইয়াছিল। আল্লাহ বলেনঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ *

অর্থাৎ সময় নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চাঁদ দ্বিখন্ডিত হইয়া গেল। আর এই রাতেই হযরত মূসার (আঃ) লাঠির আঘাতে নীলনদ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। হুযুর (দঃ) যখন অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হইয়া গিয়াছিল। হুযুরে পাক (দঃ)এর যাবতীয় মোজেযাহর মধ্যে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোজেযাহ।

দ্বিতীয়টিঃ যে রাতে দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ বলেনঃ

وَاِذْ صَرَّفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ *

অর্থাৎ যখন আমি তোমার নিকট জ্বিনদের একটি দল ভ্রমণ করাইলাম, তখন তাহারা কোরআন পাক শুনিল।

তৃতীয়টি ঃ যে রাতে আদেশ ও ভাগ্য কার্যকরি করা হয়। আল্লাহ বলেনঃ মুবারক রাতে আমি কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করিয়াছি। আমি ভয় প্রদর্শনকারী এবং এই রাতেই প্রত্যেকটি মজবুত কাজ পৃথক করা হয়।

চতুর্থটি ঃ যে রাতে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করা হয়। ইহা মে'রাজের রাত।

পঞ্চমটিঃ যে রাত সালাম ও বরকতের রাত নামে পরিচিত। অর্থাৎ কদরের রাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কদরের রাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে বলেন, সিদরাতুল মুন্তাহায় যত ফিরেশতা আছে, তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া দুনিয়ায় গমন

কর। ফিরেশতাগণ আসিয়া কাবা গৃহের নিকট, হুযুরে পাক (দঃ)এর রওজার নিকট, বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকট এবং তুরে সীনার মসজিদের নিকট এই চারি জায়গায় তাহাদের হস্তস্থিত পতাকা প্রোথিত করেন।

তারপর তাঁহারা হযরত জিব্রাইলের আদেশ মত দুনিয়ার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়েন এবং প্রত্যেকটি মুমিন মুসলিম নরনারীর আবাসস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পাপ মার্জনার জন্য দোয়া পড়েন ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মশগুল হইয়া যান। কিন্তু যে গৃহে কুকুর, শূকর, মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী নর-নারীর ছবি রক্ষিত থাকে, সেই গৃহে উক্ত ফিরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। রাত অবসান হওয়ার সাথে সাথেই ফিরেশতাগণ আকাশে চলিয়া যান। প্রথম আসমানবাসী তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? বান্দার অভাব অভিযোগ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে কি আদেশ করিয়াছেন? ফিরেশতা জিব্রাইল উত্তর করেন,আল্লাহ তায়ালা রাহমানুর রাহীম (অত্যন্ত কৃপাময় ও দয়াশীল)। তিনি নেককার নেকবখত বান্দাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং অসৎ ও বদকার বান্দাদেরকে সৎ ও নেককার বান্দাদের সুপারিশ ক্রমে ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। প্রথম আসমানবাসীগণ একথা শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ তায়ালার গুণগান করিতে শুরু করেন। তাহারা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতদের ক্ষমার কথা শ্রবণ করিয়া আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন ।

অতঃপর ফিরেশতাগণ দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। তথাকার অধিবাসীগণ তাহাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া প্রথম আসমানবাসীদের ন্যায় জিজ্ঞাসা করে এবং হযরত জিব্রাইল (আঃ)ও প্রথম আসমানবাসীদের প্রশ্নোত্তরের ন্যায় উত্তর দান করেন। জবাব শুনা মাত্রই দ্বিতীয় আসমানবাসীগণ প্রথম আসমানবাসীর ন্যায় আনন্দ করেন এবং আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

এইভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত প্রশ্ন ও উত্তর প্রদান চলিতে থাকে। সপ্তম আসমানে পৌঁছার পর ফিরেশতা জিব্রাইল অন্যান্য ফিরেশতাদিগকে বলেন, তোমরা তোমাদের স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাও। তখন সিদরাতুল মুন্তাহার ফিরেশতাগণও তাহাদের স্থানে চলিয়া আসেন । তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবার সাথে সাথে অন্যান্য ফিরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথায় গমন করিয়াছিলে? তখন তাহারাও আসমানবাসী ফিরেশতাদের মত উত্তর দান করেন। একথা শুনিয়া তাহারা আনন্দোৎসব করেন এবং আল্লাহ পাকের মহানুভবতা ও গুণকীর্তন করিতে থাকেন।

তাহাদের আনন্দোৎসবের রেশ জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল আদন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস প্রভৃতি বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতগণকে ক্ষমা করা হইয়াছে, এবং গুনাহগারদেরকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, এই আনন্দ ও খুশীতে আল্লাহর আরশও আল্লাহর প্রশংসা, মহানুভবতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। আরশ আরজ করে যে, হে মাবুদ! আমি জানিতে পারিলাম যে, তুমি রোজ কিয়ামতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতগণকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এবং পাপীদের জন্যও সুপারিশ কবুল করিবে।

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন যে, আরশ! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আমার আখেরী নবীর উম্মতের জন্য আমার নিকট অসংখ্য নিয়ামত রহিয়াছে। যাহা কেহ কোনদিন দেখে নাই বা সেই সম্বন্ধে কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কদরের রাতে ফিরেশতা জিব্রাইল দুনিয়ায় আগমন করার পর প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করেন এবং প্রত্যেকের সাথে মুসাফাহা করেন। উহার বাহ্যিক প্রমাণ হইল, এই সময় তাহাদের শরীরের লোম খাড়া হয়। অন্তঃকরণ কোমল হয় এবং আপনা হইতে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া যায়।

বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় উম্মতদের জন্য খুবই ব্যাকুল এবং পেরেশান। এ কারণে আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতদিগকে অন্যান্য নবীদের পদমর্যাদা দান না করিব, আমি তাহাদেরকে মৃত্যু দান করিব না। ফিরেশতাগণ অবশ্য নবীদের নিকট অহী ও সংবাদ বহন করে, কিন্তু কদরের রাত্রে আমি তোমার উম্মতদের নিকট ফিরেশতা প্রেরণ করিয়া থাকি।

শবে কদর বা কদরের রাতের লক্ষণ

কদরের রাতের লক্ষণ হইল, এই রাত্রে যেমন অধিক ঠাণ্ডা অনুভব হয় না, তেমন খুব বেশী গরমও লাগে না। কোন কোন বোযর্গানে দীনের মতে এই রাতে কুকুরের ডাকের আওয়াজ শুনা যায় না। এই রাত্রির ভোরে সূর্যোদয় এমনি ভাবে ঘটিবে যে, মনে হইবে সূর্যের কোন আলো নাই। তাহাছাড়া এই রাতে বহু প্রকার বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যাহা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় শুধু আল্লাহর খাছ বান্দাগণই দেখিতে পান কিংবা অনুভব করিতে পারেন।

তারাবীহর নামায

তারাবীহর নামায অবশ্য সুন্নত। কিন্তু হুযুরে পাক (দঃ) এই নামায একেবারে লাগাতার ভাবে আদায় করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা হুযুরে পাক (দঃ) নিজ যবানে উল্লেখ করিয়াছেন।
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার মধ্য রমজানের কোন এক দিন হুযুরে পাক (দঃ) মসজিদে সাহাবীদেরকে সহ তারাবীহর নামায পড়িলেন, অনেক সাহাবী-ই সে জামাতে শরীক ছিলেন, কিন্তু তারপর রাত্রে এই নামায আদায়ের জন্য মসজিদে এত মুসল্লির ভীড় হইল যে, মসজিদে সংকুলান হইতেছিল না। সাহাবীগণ মসজিদে হুযুরে পাক (দঃ)এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কক্ষ হইতে মোটে বাহিরই হইলেন না। ভোরে ফজরের নামায আদায়ের পর সাহাবায় কেরাম হুযুরে পাক (দঃ)এর নিকট গত রাতে হুযুরে পাক (দঃ)এর মসজিদে তশরীফ না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, দেখ, তোমাদের গতরাতে মসজিদে হাজিরির ব্যাপার আমি অবগত ছিলাম, কিন্তু আমার মনে এই আশংকা দেখা দিয়াছিল যে, এইরূপ পাবন্দীর সাথে বাজামাতে তারাবীহ পড়িলে নাজানি উহা তোমাদের উপর ফরজ হইয়া যাইতে পারে। শেষে উহা যথারীতি আদায় করিতে তোমাদেরই কষ্ট হইবে।
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) রমজানের রাতকে যিন্দাহ রাখার জন্য রাতে নামায পড়ার উৎসাহ দিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাহা যে একেবারে বিরতিহীন ভাবে প্রত্যহ বাধ্য-বাধকতার সাথে আদায় করিতে হইবে এমন হুকুম তিনি প্রদান করেন নাই।
অতএব হুযুরে পাক (দঃ)এর যমানা এবং প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)এর যমানায় তারাবীহর নামায মোটামুটিভাবে সাধারণ অবস্থায় আদায় হইতেছিল। অর্থাৎ ইহার প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)এর যমানা হইতেই ইহা বা-কায়দা জামাত সহকারে আদায় করা শুরু হয়। মোটকথা, হযরত ওমর (রাঃ)ই মাহে রমাজানের প্রত্যেক রাত্রে নিয়মিত ভাবে তারাবীহর জামাতের প্রচলন করেন।
হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন আমার নিকট হুযুরে পাক (দঃ)এর তারাবীহর নামায সম্পর্কিত হাদীসটি শুনিলেন, তখন হইতেই তিনি সেই হাদীসের উপর আমল শুরু করিলেন। লোকগণ হযরত আলীর (রাঃ) নিকট আরজ করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে হাদীসটি কি ছিল? তখন তিনি জবাবে বলিলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর আরশের চতুষ্পার্শে একটি স্থান আছে, উহার নাম 'হাজীরাতুল কুদস'। স্থানটি শুধু নূর বা আলো বিমণ্ডিত স্থান। ঐ স্থানে এত অধিক সংখ্যক ফিরেশতা বিদ্যমান, যাহার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না। যাহারা দিবানিশি আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন, একটি পলকও তাহাদের ইবাদাত ছাড়া অতিবাহিত হয় না, যখন মাহে রমজান আগমন করে, তখন ঐ ফিরেশতাগণ তাহাদের নির্ধারিত স্থান হইতে দুনিয়াতে নামিয়া আসার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাহারা দুনিয়াতে আসিয়া হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর উম্মতদের সাথে এক সাথে রমজানের রাতে (তারাবীহর) নামায আদায় করে। এই সময় এই ফিরেশতাদের সাথে যে সকল বনি আদমের সংস্পর্শ হয় তাহারা এমন সৌভাগ্যবান ও পুণ্যবান বান্দারূপে পরিগণিত হয় যে, জীবনে আর সে কোনদিন কোনরূপ দুর্ভাগ্যের শিকার হয় না।' এই হাদীস শ্রবণ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই নামাযের মাহাত্ম্য ও ফজীলত যদি এই হয়, তবে ইহার হক আদায় করা আমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। ঐ সময় হইতেই তিনি জামাতের সাথে তারাবীহর নামায আদায়ের প্রচলন শুরু করিলেন।
হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) মাহে রমজানের রাতের প্রথম প্রহরে ঘরের বাহিরে আসিয়া যখন দেখিতেন, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে কোরআন তিলাওয়াতে মগ্ন আছেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে এইরূপ মুনাজাত করিতেন, হে মাবুদ! তোমার মসজিদকে যে ব্যক্তি আলোকোজ্জ্বল করিতেছে, তাহার কবরকে তুমি আলোকোজ্জ্বল করিয়া দিও।
তারাবীহর নামায জামাতের সাথে ও উচ্চ কিরাতে পড়া মুস্তাহাব। হুযুরে পাক (দঃ)ও এইভাবেই পড়িয়াছেন। যেইদিন রমজানের চাঁদ দেখা যায়, সেই রাত হইতেই তারাবীহর নামায আদায় শুরু করিতে হয়। হুযুরে পাক (দঃ) মাহে রমজানের রাতে এশার ফরজ আদায় করিয়া সুন্নত দুই রাকয়াত পড়িতেন। তারপর দুই দই রাকয়াতের নিয়তে তারাবীহর নামায আদায় করিতেন। ইহার

প্রতি দুই রাকয়াতের বাদে সালাম ফিরাইতে হয় এবং প্রতি চারি রাকয়াতের বাদে সালাম ফিরাইয়া কিছু সময় আরাম করিতে হয়। এই নামাযের প্রতি চারি রাকয়াতের বাদে কিছু সময় বসিয়া আরাম করার বিধান আছে বলিয়াই ইহাকে তারাবীহর নামায বলা হয়।

তারাবীহর নামাযে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করা মুস্তাহাব। ইহার ভিতরে অসীম ছওয়াব নিহিত। অবশ্য তারাবীহর নামাযে এক খতমের অধিক কোরআন পাঠ করা উচিত নহে। কেনতা উহাতে মুক্তাদিদের কষ্ট হইতে পারে। যাহার ফলে জামাতের অনিষ্ট এবং মুক্তাদীর মন খারাপ জনিত কারণে লোক ছওয়াব হইতে মাহরুম হইতে পারে। আর এই সকল ব্যাপার যেহেতু ইমামের অবিচক্ষণতা ও অসতর্কতার কারণে ঘটে, তাই উহার গুনাহ ইমামের মাথায়ই বর্তিবে।

তারাবীহর নামায কয়েক রাকায়াত পড়িয়া তারপর মাঝে কিছু নফল নামায পড়িয়া লইয়া পুনরায় তারাবীহ নামায শুরু করা মাকরূহ। এইরূপ ভাবে তারাবীহর কয়েক রাকায়াত এক মসজিদে এবং বাকী কয়েক রাকায়াত অন্য মসজিদে আদায় করাও মাকরূহ। কেননা ইহা দ্বারা একটি জামাতের পিছনে আর একটি জামাত করা হয়। অবশ্য তারাবীহর নামায শেষ করিয়া যদি নামাযের স্থান পরিত্যাগ করতঃ কোথাও চলিয়া যাওয়া হয় কিংবা নিদ্রাগমন করিয়া উঠিয়া তারপর জামাতে নফল আদায় করা হয়, তবে তাহা মাকরূহ হইবে না।

শবে কদর ও মাহে রমজান সম্পর্কিত উপসংহার

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, কদরের রাতে রূহ অর্থাৎ ফিরেশতা জিব্রাইল অন্যান্য অসংখ্য ফিরেশতা লইয়া দুনিয়াতে আগমন করেন। জিব্রাইল আসেন তাহাদের নেতারূপে। (এই রাতে) উপবেশনকারীগণকে জিব্রাইল, শয়নকারীগণকে ফিরেশতাগণ এবং ইবাদতকারীগণকে আল্লাহতায়ালা সালাম প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ *

অর্থাৎ অনুগ্রহশীল আল্লাহর তরফ হইতে সালাম। আল্লাহতায়ালা যখন বেহেশতবাসীদেরকে সালাম প্রদান করেন, তখন দুনিয়ার ঐ সমস্ত বান্দাদের প্রতিও তাহা প্রেরণ করেন, যাহারা পাক পবিত্র, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনকারী।

এই সালাম তাহাদের ভাগ্যে ঘটে, আল্লাহতায়ালা যাহাদের ভাগ্যে প্রথম দিনেই বেহেশত লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহতায়ালা নিজেই পরকালের জন্য সৌভাগ্যশালী করিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত লোক দুনিয়া বিমুখ হইয়া শুধু আল্লাহর সাথেই বাকী (অবশিষ্ট) রহিয়াছেন এবং আল্লাহতেই তাহারা তৃপ্তি লাভ করেন।

মোটকথা, কদর রাতে এমন কোন স্থান খালি থাকে না, যেখানে কোন না কোন ফিরেশতা উপস্থিত না থাকেন। কেহ নামায পড়েন, কেহ সিজদায় থাকেন। ফিরেশতা জিব্রাইল লোকদেরকে সালাম করেন ও তাহাদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং বলেন, যদি তুমি সৎপথে থাক তবে তোমাকে সালাম, তোমার ইবাদাত মাকবুল এবং তুমি অবশ্যই ধন্য হইয়াছ। আর যদি তুমি পাপে লিপ্ত থাক, তবে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে তোমাকে সালাম। আর যদি শায়িত থাক, তবে আল্লাহর সম্মতির সাথে সালাম। আর যদি মৃত অবস্থায় কবরে শায়িত থাক তবে আল্লাহর রহমত ও শান্তির সাথে সালাম। এই সব কিছুই আল্লাহর উক্তি মুতাবেক বর্ণিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ *

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর প্রতিই সালাম। কোন কোন বোযর্গানে দ্বীন বলেন, যাহারা সৎ, কেবল তাহাদিগকেই ফিরেশতাগণ সালাম করিয়া থাকেন। পাপীদিগকে সালাম করেন না। কেননা পাপীদের মধ্যে কেহ অত্যাচারী, কেহ হারামখোর, কেহ পরনিন্দাকারী কেহ-বা ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎকারী। এইরূপ পাপীদিগকে ফিরেশতাগণ কখনও সালাম করেন না। মানুষের জন্য ইহা অপেক্ষা চরম দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, এমন মাসে তাহারা কোন প্রকারেই লাভবান হইতে পারিল না। যেই মাসের প্রথম ভাগে রহমত, মধ্যভাগে ক্ষমা এবং শেষভাগে দোজখের আযাব হইতে পরিত্রাণ লাভ, যেই মাসে আল্লাহর ও ফিরেশতাগণের সালাম লাভ করা হইতে বঞ্চিত রহিল। তুমি আল্লাহর রহমত হইতে দূরে পড়িয়া রহিলে, অবাধ্য নাফরমানদের মধ্যে গণ্য হইলে, শয়তানের সঙ্গী হইলে এবং তাহাদের সাথে দোজখের পথ ধরিলে এবং বেহেশতের পথে চলা হইতে বিরত রহিলে।

রমজান মাস পবিত্রতার মাস, কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহকে স্মরণকারীদের মাস। এইমাস যদি তোমার অন্তরকে পবিত্র করিতে না পারে, পাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে না পারে, বেদয়াতী ও পাপীদের সংস্রব হইতে তোমাকে দূরে রাখিতে না পারে, তবে কোন মাস তোমাকে রক্ষা করিবে? এই অবস্থায় তোমার দ্বারা সৎ কাজ আর কি করিয়া হইতে পারে? তোমার দুর্ভাগ্য চরম সীমায় পৌঁছার আর কি বাকী রহিল? তোমার মুক্তির কোন পথই যে আর খোলা থাকিল না।

হে হতভাগা! অলস-নিদ্রা হইতে মস্তকোত্তলন কর। চক্ষু খুলিয়া দেখ, তোমার দুয়ারে যে নিয়ামত উপস্থিত, তাহা আঁকড়াইয়া ধর। পাপ হইতে তাওবাহ্ কর। আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। আল্লাহর আদেশ পালন কর। যাহাদের উপর আল্লাহর কৃপা ও রহমত অবতীর্ণ হইবে, হয়ত তুমিও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তোমার পরম সুহৃদ মাহে রমজানকে কাঁদিয়া বিদায় দাও কেননা পরবর্তী রমজান মাসের রোযা ও ইবাদাত তোমার ভাগ্যে নাও থাকিতে পারে। হায় পরিতাপ! আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, আমাদের রোযা ও ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হইল না বরং উহা আমাদের মুখের উপরই ছুড়িয়া মারা হইল!

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অনেক রোযাদার এমন যে, তাহার উপবাস করা ছাড়া আর কোন লাভই হয় না। আর এমন বহু রাত জাগা ইবাদাতকারী আছে, যাহাদের শুধু রাত জাগাই সার, ইহা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

ওহে মাহে রমজান! তুমি সালাম গ্রহণ কর। ওহে ইবাদাতের মাস! হে কোরআনের মাস! সালাম গ্রহণ কর। হে ক্ষমার মাস! সালাম গ্রহণ কর। হে মাবুদ! তুমি আমাদের রোযা ও ইবাদাত কবুল কর। তুমি আমাদেরকে তাহাদের মধ্যে গণ্য কর, যাহাদের পাপকে তুমি পুণ্যে পরিবর্তন কর। যাহাদের উপর তুমি পূর্ণ রহমত অবতীর্ণ কর, আমাদেরকেও তুমি তাহাদের মধ্যে শামিল কর। আমীন!!

ছদকায় ফিতর এবং ঈদুল ফিতর

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى *

অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে যে নিজ (বাত্বেন)কে পবিত্র করিয়াছে এবং স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করার মধ্য দিয়া আল্লাহর নামায আদায় করিয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাকারগণ ইহার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা শিরক হইতে পবিত্র হইয়াছে। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নেক আমল করিয়াছে, সেই সাফল্য অর্জন করিয়াছে। আবু আহওয়াস (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মালের যাকাত আদায় করিয়াছে। কাতাদাহ এবং আতা বলেন যে, অত্র আয়াতের মূল অর্থ ছদকায়ে ফিতর।

'অ যাকারসমা রাব্বিহী ফাছাল্লা'-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক জানিয়াছে ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করিয়াছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'যাকারাসমার' অর্থ হইল তাকবীর-সমূহ বলা এবং 'ছাল্লার' অর্থ ঈদগাহে গমন করতঃ ঈদের নামায আদায় করা। অকীহ্ ইবনে জাররাহ বলেন, রমজানের ক্ষেত্রে ছদকায় ফিতরের গুরুত্ব এতখানি, যতখানি সোহসিজদাহর গুরুত্ব নামাযের ক্ষেত্রে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে. রোযাদারের রোযাকে অনর্থক ও বাজে কথার দোষ হইতে মুক্ত করার জন্য ছদকায় ফিতরকে ওয়াজিব করা হইয়াছে। অর্থাৎ রোযাদারের রোযার ভিতরে বেহুদাহ কথা, চোগলখুরী, গীবত, চুরি, ডাকাতি, অপরিচিতা সুন্দরী নারীর প্রতি কুদৃষ্টি প্রভৃতি যে খারাবী ও অপবিত্রতার সৃষ্টি করে, ছদকায় ফিতর এইগুলির জন্য কাফফারার কাজ করে। যেমন ভাবে নামাযের মধ্যে ভুলে ওয়াজিব তরকের প্রতিকার স্বরূপ হইল সোহসিজদাহ এবং গুনাহখাতা হইতে মুক্তির উপায় তাওবাহ্ ইস্তেগফার। রোযার মধ্যেকার বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তিগুলি যেহেতু মূলতঃ শয়তানের ধোকা ও প্রতারণার দ্বারাই সংঘটিত হয়, তাই উক্ত গুনাহগুলি হইতে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ্ ইস্তেগফার এবং ছদকায়ে ফিতর প্রদান করার দ্বারা উক্ত গুনাহ ও ভুলত্রুটির কারণ শয়তানকে হেয় ও অপদস্থ করা হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই মহাশত্রু শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা হইতে রক্ষা করুন-আমীন।

ঈদ নামকরণ ঃ ঈদের দিন আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দাগণকে আনন্দ ও খুশী দান করেন বলিয়া এই দিনটির নাম ঈদ বা খুশী রাখা হইয়াছে। ঈদ শব্দের অর্থ খুশী। দিনটির এই ঈদ নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন রকম উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন ওলামা বলেন যে, এইদিন বান্দাগণ আল্লাহর নিকট কান্দাকাটি করে আর আল্লাহ তাহাদের উপর রহমত এবং ক্ষমা অবতীর্ণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, এইদিন মুমিন ব্যক্তিগণকে বলা হয়, তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হইয়াছে। এখন তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। এইজন্য এই দিনটির নাম ঈদ রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কতগুলি উক্তি এই ব্যাপারে বর্ণিত রহিয়াছে।

ওয়াহাব ইবনে মাসবাহ বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ঈদের দিন আল্লাহতায়ালা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই ঈদের দিনই তুবা নামক বৃক্ষ বেহেশতের মধ্যে রোপন করা হইয়াছে। ঈদের দিনই ফিরেশতা জিব্রাইল (আঃ)কে অহীবহন করার জন্য মনোনীত করা হইয়াছে এবং ঈদের দিনই ফিরআউনের পক্ষীয় যাদুকরগণ হেদায়াতের আলো প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, ঈদের দিন লোকগণ যখন নামায আদায় করিতে ঈদগাহে যায়, তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার উদ্দেশ্যে রোযা রাখিয়াছ এবং আমারই খুশীর জন্য নামায পড়িতে ঈদগাহে আসিয়াছ। এখন আমার পুরস্কার লইয়া গ্রহে প্রত্যাবর্তন কর।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সমগ্র রোযাদারদিগকে আল্লাহ ঈদের রাতে যাবতীয় নিয়ামত দান করিয়া থাকেন এবং উহার পূর্ণ প্রতিদান দিয়া থাকেন। ঈদের দিন প্রত্যুষে আল্লাহতায়ালা ফিরেশতাদিগকে আদেশ করেন, তোমরা দুনিয়াতে গমন কর। ফিরেশতাগণ আল্লাহর হুকমে দুনিয়াতে আগমন করিয়া রাস্তা-ঘাট, হাটে-বাজারে মানুষের সমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকেন, হে আখেরী নবীর (দঃ) উম্মতগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও। আজ তোমাদের স্বল্পমূল্যের সম্পদের বদলে অমূল্য বস্তু দান করা হইবে। তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হইবে। ফিরেশতাদের এই ঘোষণা জ্বিন ও মানব ব্যতীত অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবই শুনিতে পায়।

যখন লোকগণ নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং নামায পড়িতে দাঁড়ায় ও দোয়া পাঠ করে, তখন আল্লাহতায়ালা বান্দাদিগের সমস্ত আশা পূর্ণ করিয়া দেন। অতঃপর তাহারা যখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হয়, তখন তাহারা তাহাদের সকল গুনাহ মাফকৃত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

ঈদোৎসবের ইসলামী রীতি

ঈদোৎসবে মুমিন, গায়রে মুমিন, আবেদ, ফাসেক সকলেই শরীক হইয়া থাকে, সকলেই ইহাকে বাৎসরিক সেরা উৎসব বলিয়া মনে করে। অবশ্য খোদাভীরু আবেদ পরহেজগার লোকদের ঈদোৎসব উদযাপনের রীতি এক প্রকার এবং ফাসেক বদকারদের ঈদোৎসবের রীতি অন্য প্রকার। মুমিন ও খোদাভীরু লোকগণ ঈদোৎসব করে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার খুশী হাসিলের লক্ষ্যে। আর গায়রে মুমিন এবং ফাসেক গুনাহগারগণ ঈদ উদযাপন করে তাহাদের নফসে আম্মারা ও শয়তানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রথমোক্তগণ ঈদের ময়দানে যায় এমন অবস্থায় যে তাহাদের শিরে শোভা পায় হেদায়াতের তাজ এবং তাহাদের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠে দ্বীন ধর্মের নিশান এবং এতাআতে ইলাহীর নিদর্শনাবলী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের সর্বাঙ্গে পরিলক্ষিত হয় দ্বীন ধর্মের বিধান বহির্ভূত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ।

বদকার লোকগণ ঈদের দিনে বিবিধ উত্তম উপাদেয় আহার্য ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন, বহুমূল্যবান উত্তম ও জাঁকজমক পূর্ণ পোশাক পরিধান ও তাহাদের ধর্মবিমুখ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাত ও গল্পগুজব, স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীদের সাথে আনন্দ ঘন ভোগ সম্ভোগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন রকম শরীয়ত বিগর্হিত পার্থিব আমোদ প্রমোদ করাকেই কর্তব্য বলিয়া মনে করে। মূলতঃ এই আনন্দ তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন এবং একান্তই পার্থিব ও গতানুগতিক।

পক্ষান্তরে নেককারগণও ঈদের দিনে আনন্দোৎসবে মগ্ন হয়। তাহারাও এই দিন উপাদেয় উত্তম সুস্বাদু এবং মিষ্টি ও অনুপম আহার্য্যসমূহ আহার করে, উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং তাহারা একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া ঈদগাহে গিয়া নামায আদায় করে। আল্লাহর দরবারে সকলে মিলিয়া সমবেত ভাবে নিজেদের মনোবাঞ্ছাসমূহ পেশ করে।

ধনবান নেককারগণ মনে করে যে, এই আনন্দ শুধু তাহাদেরই নয়, ইহা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমগ্র

মুসলিম জাতির আনন্দ। এই বিশ্বাস ও ধারণা লইয়া এই দিন তাহারা নিঃস্ব ও গরীব মুসলিম ভাইদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-ছদকার দ্বারা মদদ করিয়া তাহাদেরকে নিমন্ত্রণ করতঃ তৃপ্তির সাথে পান ভোজন করাইয়া তাহাদেরও মনে মুখে আনন্দ এবং হাসি ফুটাইয়া তুলে। আর এইভাবেই তাহারা ঈদের উৎসব ও আনন্দকে যথার্থ এবং অর্থবহ করে। তাহাদের এই ঈদের আনন্দ পাপী বদকারদের ঈদের আনন্দ ও উৎসবের মত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন এবং গতানুগতিক নহে। বরং তাহাদের এই আনন্দ ও উৎসবের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাকের নির্দেশ-মাহে রমজানে রোযা পালনের পূর্ণ সফলতা ও এ ক্ষেত্রে শয়তান এবং কুরিপুকে জব্দ করার কৃতকার্যতায়ই নেককার মুসলমানগণ রমজানের শেষে পহেলা শাওয়াল উৎসবের এই দিনটি উদযাপন করে।

ঈদের আনন্দ ও উৎসবের উক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের সফলতায় নেককার বান্দার মনে যে অফুরন্ত খুশী ও আনন্দ ঈদের দিন আপনা হইতে উদয় হয়। মূলতঃ উহাই প্রকৃত আনন্দ। এখন সেই আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশ যাহার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ততটুকুই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ির কোন অবকাশ নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রসঙ্গতঃ হযরত আলীর (রাঃ) একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়।

একবার ঈদের দিন হযরত আলীর (রাঃ) গৃহে একটি লোক গিয়া দেখিল, তিনি ভুষীর তৈরী রুটি আহার করিতেছেন। লোকটি আরজ করিল, জনাব! আজ ঈদের দিন আপনি ভুষীর রুটি খাইতেছেন?

হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বলিলেন, দেখ! আজ ঈদতো শুধু সেই ব্যক্তির জন্য, যাহার রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়াছে, যাহার সাধনা ও শ্রম সফল হইয়াছে, যাহার গুনাহসমূহ মার্জিত হইয়াছে। আশা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য আজিকার দিনটি যেমন আনন্দের, কালকার দিনটিও তেমনই আনন্দের এবং যে দিনটিতে আমাদের দ্বারা আল্লাহর কোন নাফরমানীর কাজ না হইবে, সেই দিনটিই আমাদের জন্য খুশী ও আনন্দের দিন বৈ কি।

হযরত আলীর (রাঃ) উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ জবাবটি দ্বারা পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, যেই সকল নেককার যাহারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে সফলতা লাভ করিয়াছে, এই দিনটি কেবল তাহাদেরই জন্য ঈদ বা খুশী বহন করিয়া আনে, আর যাহারা উক্ত ব্যাপারে ব্যর্থ ও বিফল হইয়াছে, দিনটি তাহাদের জন্য কোনরূপ ঈদ বা খুশী নিয়া আসে না বরং তাহাদের জন্য নিয়া আসে না-খুশী ও আযাবের দুঃখজনক বার্তা। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, এই শ্রেণীর লোকদের এইদিন আনন্দ ও উৎসব করা একেবারেই বৃথা ও অবান্তর।

যিল–হজ্জ্ব মাসের দশ রাতের ফজীলত

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ - هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ الِّذِىْ حِجْرٍ *

অর্থাৎ প্রত্যুষের শপথ, দশ রাতের শপথ, জোড়া এবং বে-জোড় সংখ্যার শপথ এবং বিগত রাতের শপথ। আর এই শপথ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

আয়াতের মর্মে বুঝা যাইতেছে যে, সকাল ও রাত্রি কালের এবং জোড় ও বেজোড় সংখ্যার ফজীলত রহিয়াছে।

والفجر (অলফাজরি) শব্দের ব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফজর শব্দ দ্বারা প্রত্যুষের নামায বুঝানো হইয়াছে। দশ রাত্র দ্বারা যিলহজ্জ্ব মাসের দশরাত, জোড় শব্দ দ্বারা আল্লাহর সৃষ্ট জীব এবং বেজোড় শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহতায়ালাকে বুঝান হইয়াছে এবং বিগত রাত্র দ্বারা ঐ সকল জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা উপদেশ বুঝা যায়।

মুকাতিল হইতে বর্ণিত আছে, ফাজর শব্দ দ্বারা কোরবানীর দিনের মুযদালিফার ভোরকে বুঝানো হইয়াছে। দশরাত দ্বারা ঈদুল আজহার পূর্বের দশ রাতকে বুঝানো হইয়াছে। জোড় শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া এবং বেজোড় শব্দ দ্বারা এক আল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর বিগত রাত্র দ্বারা বুঝানো হইয়াছে ঈদুল আজহার রাতকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, যিলহজ্জ্ব মাসের দশই তারিখ হযরত আদম (আঃ) তাওবাহ করায় আল্লাহ তাঁহার তাওবাহ কবুল করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইয়াওমে আরফায় আল্লাহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও এই যিলহজ্জ্ব মাসের দশই তারিখে খালীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐদিনই মেহমানদের জন্য তাঁহার যাবতীয় ধন-সম্পদ খরচ করিয়াছিলেন, ঐ তারিখেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)কে কোরবানী করিতে নিয়াছিলেন। এই তারিখে তিনি পবিত্র কাবাগৃহের নির্মাণ কার্য শুরু করিয়াছিলেন। আল্লাহ বলেন, ইব্রাহীম কাবার ভিত্তি রচনা করেন এবং ইসমাঈল উহা তৈয়ার করেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মাহে রমজান সকল মাসের সর্দার। তাহাছাড়া যিলহজ্জ্ব মাস অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক সম্মানিত। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সমস্ত দিনের মধ্যে যিলহজ্জ্ব মাসের দশই তারিখ অধিক বোযর্গ। লোকগণ আরজ করিলেন, জিহাদের চেয়েও কি বেশী বোযর্গীর অধিকরী? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, হাঁ, তা-ই। তবে যে ব্যক্তি জিহাদ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করে, তাহার বোযর্গী ঐ দিনের সমান।

আতা ইবনে আবু বারাহ বলেন, আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট শুনিয়াছি, হুযুরে পাক (দঃ)-এর যামানায় এক ব্যক্তি গান-বাজনার প্রতি খুবই আসক্ত ছিল। কিন্তু সে যিলহজ্জ্ব মাসের প্রত্যেক দিন রোযা রাখিত। এই কথা কোন এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)এর কর্ণগোচর করিলে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে ব্যক্তি হাজির হইলে হুযুর (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রোযা রাখ?

লোকটি উত্তর করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ইহা হজ্জের মাস। হজ্জকারীদের দোয়া ও পুণ্যে আমিও যেন অংশীদার হই। এই আশায়ই আমি রোযা রাখি। হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ঐ দিনের সংখ্যা (আবজাদ) অনুযায়ী ছওয়াব হাসিল করিবে। তাহাছাড়া এক শত গোলাম আজাদ, একশত উট কোরবানী এবং জিহাদের জন্য একশত ঘোড়া প্রস্তুত করার পুণ্যও অর্জিত হইবে। তালবিয়াহর দিন রোযা রাখিলে দুই হাজার গোলাম আজাদ, দুই হাজার উট কোরবানী এবং জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া প্রস্তুত করার পুণ্য লাভ হয়। ইহাছাড়া এক বৎসর পূর্বের এবং এক বৎসর পরের রোযা রাখার নেকীও হাসিল হইয়া থাকে।

শায়খ আবুল বারাকাত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আইয়্যামে তাশরীকের ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ তায়ালা যতটা পছন্দ করেন, অন্য দিনের ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহতায়ালা ততটা পছন্দ করেন না। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, জিহাদও কি উহার সমতুল্য নয়? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, না। তবে কেহ যদি জিহাদে স্বীয় জান ও মাল উভয় উৎসর্গ করে, তবে উহার সমান হইয়া থাকে।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, চারিটি বিষয় হুযুর (দঃ) কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। যথাঃ (১) যিলহজ্জ্ব মাসের দশম দিনের রোযা। (২) আশুরার তারিখের রোযা (৩) আইয়্যামে বীজের রোযা এবং (৪) ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত নামায।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যিলহজ্জ্ব মাসের দশ দিনের ইবাদত-বন্দেগীতে আল্লাহ যত পুণ্য দান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আর কোন ইবাদতে করেন না। এই দশদিনের একদিন রোযা রাখিলেও সারা বৎসর রোযা রাখার সমান পুণ্য অর্জিত হয়। আর এক রাত জাগিয়া ইবাদত করিলে সারা বৎসরের রাতসমূহের ইবাদতের পুণ্য হাসিল হয়।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যিলহজ্জ্ব মাসের দশ তারিখে রোযা রাখিলে তাহার বদলে সারা বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব লাভ করা যায়। সাঈদ ইবনে জারির হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যিলহজ্জ মাসের রাতে তোমরা ঘরের

বাতি নিভাইও না। তিনি স্বীয় খাদেমদিগকে বলিতেন তোমরা রাতে জাগ্রত থাক। নিদ্রাভিভূত হইও না। যিলহজ্জ মাসের দশ দিন ইবাদত করিতে হুযুরে পাক (দঃ)কে খুবই উৎসাহিত দেখা যাইত।

যিলহজ্জ্ব মাসের দশ দিনের ফজীলত

শায়খ আবুল বারাকাত হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের কোন একদিন ইবাদত করে, তবে সে যেন পূর্ণ এক বৎসর হজ্জ্ব ও ওমরা আদায় করিল। আর যদি কোন ব্যক্তি ঐ দিনসমূহের মধ্যে কোন এক দিন রোযা রাখে, তবে সে যেন সারা বৎসরই আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করিল।

শায়খ আবুল বারাকাত হযরত আলী (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যিলহজ্জ মাস আসিলে বেশী করিয়া ইবাদত কর। আল্লাহতায়ালা এই মাসের দিবা ও রাত্রিকে যথেষ্ট ফজীলত দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসের প্রথম দশ তারিখের কোন এক রাতে এক প্রহর রাত থাকিতে চারি রাকয়াত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর একবার সূরা ফালাক, তিনবার সূরা ইখলাস এবং তিনবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে এবং নামায সমাপনান্তে এই দোয়া পাঠ করে এবং দোয়া পাঠের পরে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেন। তাহাছাড়া ঐ লোক এত পূণ্য লাভ করে যে, সে যেন কাবা গৃহের হজ্জ আদায় করিল, রাসূলে খোদার (দঃ) কবর যিয়ারত করিল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিল। এমন কোন বস্তু নাই যে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা আল্লাহ্ তাহাকে দান করিবেন না। দোয়াটি এইঃ

سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبُّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا رَبَّنَا جَلَّ جَلَالُهٗ وَقُدْرَتُهٗ بِكُلِّ مَكَانٍ *

উচ্চারণঃ সুবহানা যিল ইযযাতি অল জাবারূতি সুবহানা যিল কুদরাতি অল মালাকূতি, সুবহানাল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ামূতু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইউহয়ী অ ইউমীতু অ হুয়া হাইয়্যুল্লা ইয়ামূতু, সুবহানাল্লাহি রাব্বুল ইবাদি অল বিলাদি অলহামদু লিল্লহি কাছীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবারাকান আলা কুল্লি হালিন, আল্লাহু আকবারু কাবীরান রাব্বুনা জাল্লা জালালুহু অ কুদরাতুহু বিকুল্লি মাকানিন।

যদি কেহ দশ রাতের প্রত্যেক রাতেই উপরে বর্ণিত মতে নামায আদায় করে, তবে আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। তাহার সমস্ত অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে বলা হইবে, এখন তুমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিরপরাধ। সুতরাং এখন তুমি নূতন ভাবে পুণ্যের কাজ আরম্ভ কর। যদি কেহ আরফার দিনে রোযা রাখে, রাতে ইবাদত-বন্দেগী করে, এবং উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট রোনাজারী করে, তবে আল্লাহতায়ালা ফিরেশতাগণকে বলেন, হে আমার ফিরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমার এই বান্দাকে আমি ক্ষমা করিলাম এবং খানায় কাবার হজ্জকারীদের মধ্যে তাহাকে শামিল করিলাম। অতঃপর ফিরেশতাগণ উক্ত বান্দাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করেন।

যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের সম্মানকারীকে আল্লাহ্ দশটি বোযর্গী দান করেন। যেমনঃ (১) আহার আয়ু বৃদ্ধি পায় (২) ধন-দৌলত বর্দ্ধিত হয় (৩) আল্লাহ্ তাহার পরিবার-পরিজনকে দেখা শুনা করেন (৪) তাহার অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন (৫) পুণ্য দ্বিগুণ করেন। (৬) মৃত্যুকষ্ট লাঘব করেন (৭) অন্ধকারে আলো দান করেন (৮) পুণ্যের পাল্লা ভারী করিয়া দেন (৯) দোজখ হইতে মুক্তিদান করেন এবং (১০) বেহেশতের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেন।

এ সব দিনে কোন গরীবকে কোন কিছু দান করা যেন নবী রাসূলকে দান করা। কোন রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা যেন আল্লাহর অলী-আবদালদের তুল্য ইবাদত করা। কোন ব্যক্তি কাহারও জানাযায় শরীক হইলে সে যেন শহীদদের জানাযায় শরীক হইল।

অনুরূপ কোন বস্ত্রহীন উলঙ্গকে বস্ত্রদান করিলে তাহার বদলে আল্লাহ তাহাকে বেহেশতী পোশাক দান করিবেন। কোন ইয়াতিমকে সাহায্য করিলে আল্লাহ তাহাকে আরশের ছায়া দান করিবেন। কোন আলেমের মজলিসে যোগদান করিলে যোগদানকারী যেন নবী রাসূলদের মজলিসে যোগদান করিল। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ)কে দুনিয়াতে নামাইয়া দেওয়ার পর ছয়দিন পর্যন্ত তিনি রোদন করিয়া কাটান। সপ্তম দিনে দুঃখ-শোকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মস্তক অবনত করিয়া গভীর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। এমনি সময় তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল, হে আদম! আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই মুহূর্তে তুমি কেমন দুঃখ দুর্দশার ভিতরে আছ? হযরত আদম (আঃ) আরজ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বিপদ অসীম, অফুরন্ত। আমাকে ভয়ানক পাপ ঘিরিয়া রহিয়াছে। উচ্চ মর্যাদার আসন হইতে আমাকে এই হীনতায় পূর্ণ দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। চিরস্থায়ী অমর ধাম হইতে আমাকে এই নশ্বর মর্তধামে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অবস্থায় শুধু রোনাজারী করা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি? জবাব আসিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করি নাই? তুমি কি সৃষ্টির সেরা মাখলুক নও? আমার মমতা ও ভালবাসা দ্বারা কি তোমার অন্তরকে আমি সিক্ত করি নাই? আমি কি সমস্ত ফিরেশতাদের দ্বারা তোমাকে সিজদাহ করাই নাই? তবুও তুমি কেন আমার নির্দেশ অমান্য করিলে? আমার অনন্ত অসীম অনুগ্রহের কথা তুমি কিভাবে বিস্মৃত হইলে? আমার প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি এবং মহানুভবতার শপথ, এই দুনিয়া যদি তোমার ন্যায় ইবাদতকারী ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠকারী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পরে আবার তাহারা আমার নির্দেশ অমান্য করে, তবে আমি তাহাদেরকে পাপীদের সমপর্যায়ভুক্তই করিব।

আল্লাহর এই প্রত্যাদেশ বাণী শুনিয়া হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার হিন্দুস্তান এলাকার একটি পর্বতগর্তে বসিয়া একাধারে তিন বৎসর ধরিয়া এমন ভাবে ক্রন্দন করিলেন যে, তাঁহার চোখের অশ্রুতে উক্ত পাহাড়ে ঝর্ণা ধারার সৃষ্টি হইল। উক্ত ঝর্ণা ধারার দুই পার্শ্বে বৃক্ষের জন্ম হইল। এই বৃক্ষগুলি হইতে সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। এমনি সময় ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে আদম (আঃ)! আপনি আল্লাহর গৃহ প্রাঙ্গণে (অর্থাৎ খানায়ে কাবার সম্মুখে) গমন করুন এবং আশুরার দিন আগমনের অপেক্ষায় থাকুন। আশুরার দিনে তাওবাহ করিয়া আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাহাতে হয়ত আল্লাহ আপনার এই দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্র হইয়া আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

হযরত আদম (আঃ) ফিরেশতা জিব্রাইলের এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তখন কা'বা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যেখানেই তাঁহার কদম মুবারক পড়িত, সেই স্থানটিই আবাদ হইয়া যাইত এবং দুই কদমের মধ্যবর্তী স্থান জঙ্গলাকীর্ণই থাকিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দুই কদমের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ছিল তিনশত ক্রোশ।

মক্কায় পৌছিয়া তিনি পূর্ণ সাতদিন খানায়ে কাবার তাওয়াফ করেন এবং সেখানেও এত কান্নাকাটি করেন যে চোখের অশ্রুতে তথায় এক হাঁটু পরিমাণ পানি হইয়া স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এই সময় তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিতেছিলেন, হে মাবুদ! তুমি ছাড়া আমার আর কেহই আশ্রয় দাতা নাই। আমি পবিত্রতার সাথে তোমার নাম স্মরণ করিতেছি। আমি একান্ত অন্যায়ভাবে আমার উপরই অত্যাচার করিয়াছি। তুমি আমার এই অপরাধ মার্জনা কর। তুমি পরম ক্ষমাশীল ও করুণাময়। এইভাবে রোনাজারী করিতে করিতে এক সময়ে আল্লাহতায়ালা অহী নাযিল করিলেন, হে আদম! তোমার এই দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে ক্ষমা করা হইল এবং তোমার তাওবাহও কবুল করিলাম।

যিলহজ্জ্ব মাসের সেই আশুরার দশদিনের বরকতেই হযরত আদম (আঃ) তাওবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহা আল্লাহর দরবারে কবুলও হইল। যেই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়া বসে ও সে যদি পরে এই সময়ে তাওবাহ করিয়া আল্লাহর নির্দেশ মত কাজ করে, তবে সে ব্যক্তিও হযরত আদম (আঃ)এর মত ক্ষমা লাভ করিবে এবং তাহার পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করা হইবে।

পুলছিরাতের আটটি ঘাঁটি

দোজখের উপরস্থ পুলছিরাতে আটটি ঘাঁটি রহিয়াছে। রোজ কিয়ামতে যে কেহ পুলছিরাত পার হইবার কালে প্রথম ঘাঁটিতে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাহার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। বান্দা মুমিন হইলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। নতুবা সেখান হইতেই দোজখে পতিত হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় ঘাঁটিতে পৌঁছিলে তাহাকে তাহার অজু ও নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। যদি সে দুনিয়াতে যথাযথ ভাবে অজু ও নামায আদায় করিয়া থাকে, তবে সে এ ঘাঁটি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। নতুবা দোজখে পড়িয়া যাইবে। তৃতীয় ঘাঁটিতে পৌঁছিলে বান্দাকে যাকাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। যদি সে দুনিয়াতে রীতিমত যাকাত আদায় করিয়া থাকে, তবে সে এখান হইতে পরিত্রাণ পাইবে। নতুবা এইখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। বান্দা চতুর্থ ঘাঁটিতে পৌঁছিলে তাহাকে রোযার বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে। সে সঠিক ভাবে রোযা আদায় করিয়া থাকিলে মুক্তি লাভ করিবে। নতুবা এখানে আটক হইয়া পড়িবে। বান্দা পঞ্চম ঘাঁটিতে পৌঁছিলে ওমরাহ্ ও হজ্জ্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। হজ্জ্ব ও ওমরাহ্ যথাযথ ভাবে আদায় করিয়া থাকিলে সে সঠিকভাবে উহার উত্তর দিতে পারিবে। নতুবা এইখানেই সে দোজখে পতিত হইবে। অতঃপর ষষ্ঠ ঘাঁটিতে পৌঁছিলে তাহাকে আমানত ও খেয়ানতদারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। দুনিয়াতে যথাযথভাবে উহা রক্ষা করিয়া আসিলে সে সঠিকভাবে উহার জবাব দিতে পারিবে। নতুবা এই ঘাঁটিতেই সে আটকা পড়িয়া যাইবে।

সপ্তম ঘাঁটিতে পৌঁছার পর বান্দাকে পরনিন্দা, চোগলখুরী এবং মিথ্যা বলার ব্যাপারে পরীক্ষা করা হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তো ভাল, নতুবা এইখানেই সে দোজখের গহ্বরে পতিত হইবে।

অষ্টম ঘাঁটিতে উপনীত হইবার পর তাহাকে পরীক্ষা করা হইবে যে, সে হারাম বস্তু আহার করা হইতে বিরত ছিল কিনা। যদি সে বিরত থাকিয়া থাকে, তবে সে অবাধে এই ঘাঁটিও অতিক্রম করিয়া যাইবে আর যদি তাহা না হয়, তবে সে এই ঘাঁটিতেই দোজখের ভিতরে পতিত হইয়া স্বীয় সর্বনাশ ঘটাইয়া দিবে।

এহরাম এবং লাব্বায়েকের ফজীলত

যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ্ব করার নিয়তে খানায়ে কা'বার দিকে রওয়ানা হয়, তাহার ফজীলত সম্বন্ধে মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় ইয়ামন হইতে একদল লোক আসিয়া হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতার জীবন উৎসর্গ হউক। হজ্জ্বের ফজীলত সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু অবহিত করান।

তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যদি কোন ব্যক্তি গৃহ হইতে হজ্জ্ব বা ওমরাহ করার নিয়তে বহির্গত হয়, তবে তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপের সাথে সাথেই ঝড়ের বেগে বৃক্ষ হইতে শুকনা পাতা পতিত হওয়ার মত তাহার পাপরাশি ঝড়িয়া যায়। অতঃপর মদীনায় আসিয়া আমাকে সালাম করিয়া আমার সাথে মুসাফাহা করিলে ফিরেশতাগণ তাহাকে সালাম করেন এবং তাহাদের সাথে মুসাফাহা করেন। যুলহোলায়ফা পৌঁছিয়া গোসল করিলে আল্লাহ্ তাহাকে যাবতীয় পাপ হইতে পবিত্র করিয়া দেন। নূতন কাপড় পরিধান করিলে আল্লাহ্ তাহাকে নূতন ভাবে পুণ্য দান করেন। লাব্বায়েক উচ্চারণ করিলে আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি তোমার কথা শুনিয়াছি এবং তোমার প্রতি আমার দৃষ্টিও আছে। মক্কায় পৌঁছিয়া তাওয়াফ করিলে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়াইলে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য পুণ্য দান করেন।

আরাফাত ময়দানে পৌঁছিয়া উচ্চৈঃস্বরে যখন নিজেদের মনের বাসনা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়, তখন আল্লাহতায়ালা গর্বের সহিত সাত আসমানের ফিরেশতাদিগকে ডাকিয়া বলেন, হে আসমানবাসীগণ! তোমরা কি আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছ না? তাহারা কত দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছে। পথের কষ্টে চেহারা তাহাদের ধূলামলিন হইয়া গিয়াছে। অর্থ সম্পদ খরচ করিয়াছে এবং শরীরের উপর কত ক্লেশ-অত্যাচার বরণ করিয়া লইয়াছে। আমার মহত্ত্ব এবং

মেহেরবানীর শপথ, আমি তাহাদের পাপ পুণ্যে পরিবর্তন করিয়া দিব। তাহারা এমন পবিত্র হইবে. যেন অদ্যই তাহারা মাতৃ-উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

যখন তাহারা কঙ্কর নিক্ষেপ করে, মাথা মুণ্ডন করে এবং কাবা যিয়ারত শেষ করে, তখন আরশের নীচ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলেন, এখন তোমরা বাড়ী প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের পূর্বের পাপসমূহ মার্জনা করা হইয়াছে। এখন হইতে আবার নূতন ভাবে পুণ্যার্জনে আত্মনিয়োগ কর।

আর এক বর্ণনায় আছে, এক গ্রাম্য আরববাসী হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি হজ্জ্ব করার নিয়তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি পৌছিবার পূর্বেই হজ্জ্ব হইয়া গিয়াছে। এখন আমার কি হইবে? আমি কি হাজীদের মধ্যে গণ্য হইব? হজ্জের পুণ্যের অংশীদার কি আমাকে করা হইবে?

হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে এরশাদ করিলেন, আবি কুবাইস। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই পাহাড় যদি স্বর্ণে পরিণত হইয়া তোমার সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং পরে যদি এই পরিমাণ স্বর্ণ তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান কর তবুও তুমি হাজীদের ন্যায় পুণ্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হাজী লোকগণ যখন হজ্জ্ব গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেকটি বস্তু নাড়াচাড়া করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাহাকে দশটি করিয়া নেকী দান করিয়া থাকেন। দশটি করিয়া পাপ মোচন করেন এবং দশটি করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করেন।

যখন সে যানবাহনে আরোহণ করে, তখন ঐ যানবাহনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ও পা উঠানোর পরিবর্তে উল্লিখিত ভাবে পুণ্য দান করেন।

মক্কা পৌছিয়া তাওয়াফ করার পর সে গুনাহ হইতে পবিত্র হয়। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোর সময়ও তাহার পাপ মার্জনা করা হয়। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করিলেও মাশআরিল হারামে যাবতীয় পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সেই গ্রাম্য আরবকে বলিলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, হাজীদের ন্যায় পুণ্যবান হও। অর্থাৎ তাহাদের তুল্য পুণ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর সহিত (খানায়ে কাবার) তাওয়াফ করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক। এই কাবা কেমন ঘর?

হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, হে আলী! এই দুনিয়াতেই আমার উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ এই ঘর নির্মাণ করাইয়াছেন।

(আলী (রাঃ) বলেন) আমি পুনরায় বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই হাজরে আসওয়াদ কেমন পাথর?

হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইহা বেহেশত হইতে আনীত একটি জাওহার (অর্থাৎ একটি রত্ন)। ইহা স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু মুশরিকগণ স্পর্শ করিতে করিতে ইহা কাল হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আবী মালিকাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা প্রত্যহ কাবা গৃহের উপর একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। উহার মধ্যে তাওয়াফকারীগণ ষাট, কাবার আশে পাশে এতেকাফকারীগণ চল্লিশ এবং কাবার প্রতি দৃষ্টিপাতকারীগণ বিশটি রহমতের ভাগী হইয়া থাকে।

আমর ইবনে আবি সালমাহ হইতে বর্নিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তিকে আমি তিন বৎসর পর্যন্ত সুস্থ রাখিয়া তাহার আয়ু বর্দ্ধিত করি, আর এই সুব্যবস্থায় যদি সে এই ঘরের যিয়ারত করিতে না আসে, তবে সে মাহরুম বৈকি!

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালের প্রথম দিকে আমি তাঁহার সহিত হজ্জ্ব আদায় করিতে যাই। হযরত ওমর (রাঃ) কাবাগৃহে আসিয়া হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, যে কোন অবস্থায়ই তুমি পাথর। তুমি মানুষের কোন উপকারে বা অপকারে কোন কিছুতেই আসো না। আমি আল্লাহর রাসূল (দঃ)কে তোমাকে যদি চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করিতাম না।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই কথা বলিবেন না। আল্লাহর ইচ্ছা হইলে এই পাথর মানুষের উপকার বা অপকার করিতে পারে। আপনি কোরআন পাঠকালীন যদি উহা

ভালভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তবে আমাদের সামনে এইরূপ কথা বলিতে পারিতেন না।
হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান! বলুন, কোরআনে পাকে এই পাথর সম্বন্ধে কি বর্ণিত আছে?
হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার বংশধর সৃষ্টি করিয়া আল্লাহতায়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই?
তাহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন, হাঁ, তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু। ইহার পর আল্লাহতায়ালা তাহাদের স্বীকারোক্তিকে লিখিয়া এই পাথরকে ডাকিয়া উহার অভ্যন্তরে উক্ত লিখা রাখিয়া দিলেন। ঐ পাথরই এইস্থানে আল্লাহর আমানত স্বরূপ রহিয়াছে। রোজ কিয়ামতে এই পাথর সাক্ষ্য দান করিবে, আদমের বংশধর তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছে কি না!
হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে আবুল হাসান (রাঃ)! আপনার বক্ষকে আল্লাহ জ্ঞানের ভাণ্ডার করিয়া দিয়াছেন।
আবু ছালেহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জব্রত পালনকারী আল্লাহর নিকট যাহা চায়, তাহাই পায়। যদি পাপের মার্জনা চায়, আল্লাহ তাহা মঞ্জুর করেন। মুজাহিদ বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে মাবুদ! তুমি হাজীদেরকে ক্ষমা কর। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, হাদীস শরীফে আছে, ফিরেশতাগণ হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন। উষ্ট্রারোহীকে সালাম করেন। গাধা ও খচ্চর আরোহীদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং পায়দলে আগন্তুকদের সাথে আলিঙ্গন করেন। যেহাক বেলন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি জিহাদে রওয়ানা হইয়া ঘটনাক্রমে মৃত্যুবরণ করিলে সে শহীদরূপে গণ্য হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে মারা যায়, তবে আল্লাহ তাহাকে বেহেশত নছীব করেন।
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি হজ্জ করিয়া অন্যায় কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিলে সে এমন ভাবে পাপমুক্ত হয় যে, সে যেন অদ্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানায়ে কাবা যিয়ারত করে ও অন্যায় অপকাজ হইতে বিরত থাকে, সে পাপ হইতে এমন ভাবে পবিত্রতা অর্জন করে, যেন সে আজই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। হুযুর (দঃ) আরও বলিয়াছেন, একটি হজ্জের জন্য তিন ব্যক্তি বেহেশত লাভ করে। যথাঃ (ক) যে ব্যক্তি হজ্জের জন্য অসিয়ত করে, (খ) যে ঐ অসিয়ত প্রচার করে এবং (গ) যে ব্যক্তি অসিয়ত অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে।
আলী ইবনে আবদুল আযীয বলেন, আমি এক বৎসর পর্যন্ত আবু উবাইদা কাসেম ইবনে সালামের সাথে দেশ পর্যটনে রত ছিলাম। তখন একবার মাওকাফে পৌঁছিয়া জাবালুর রহমতের দিকে অগ্রসর হইলাম। মাওকাফে অজু গোসল করিবার সময় ভুল বশতঃ টাকা পয়সার থলিটি ফেলিয়া রাখিয়া গেলাম। মায নামক স্থানে পৌঁছিয়া আবু উবাইদা আমাকে কিছু খেজুর ও মাখন কিনিয়া আনিতে বলায় আমার টাকার থলিটির সন্ধান পড়িল। উহা না পাইয়া তখন কোথায় উহা ফেলিয়া আসিয়াছি সেই কথা মনে হইল। তাড়াতাড়ি আমি মাওকাফে চলিয়া গেলাম এবং থলিটি সেখানে পাওয়া গেল। যখন আমি মাওকাফ হইতে রওয়ানা হইলাম, দেখিলাম, সমস্ত মাওকাফ উপত্যকাটি শূকর এবং বানরে পরিপূর্ণ। আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। তবে উহারা আমার কোন ক্ষতি করিল না। পরদিন সকালে আবু উবাইদার নিকট পৌঁছিয়া এই ঘটনা তাহার নিকট বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, ঐসব শূকর ও বানর আদম সন্তানের পাপ। উহারা তাহাদেরকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে।
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান দেয় এবং লাব্বায়েক বলে, সেই ব্যক্তি রোজ হাশরে আযান দিতে দিতে এবং লাব্বায়েক বলিতে বলিতে কবর হইতে উঠিবে। মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। মুয়াযযিন যে মসজিদে আযান দেয়, সেই মসজিদের সমস্ত মুসলিমদের ছওয়াবের পরিমাণ ছওয়াব সে লাভ করিবে। আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে মুয়াযযিনের মনে যে সব বাসনা জাগিবে সে সমুদয় বাসনা আল্লাহ পূর্ণ করিয়া দিবেন। হয়ত দুনিয়াতেই আল্লাহ তাহাকে আযানের প্রতিদান দিবেন অথবা তাহার সমস্ত পাপ পুণ্যে পরিবর্তন

করিয়া দিবেন। এমনও হইতে পারে যে, আযানের প্রতিদান আল্লাহ তাহার পরকালের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন।

একদা এক ব্যক্তি হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমাকে এমন একটি কাজ শিখাইয়া দিন, যাহার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বেহেশত নছীব করেন। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে মুয়াযযিন হইয়া যাও। তোমার আযান শুনিয়া যেন সকলে নামায পড়িতে আসে। লোকটি আরজ করিল, যদি আযান দিবার শক্তি আমার না থাকে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে নামাযে ইমামতি কর। লোকটি বলিল, যদি সেই সামর্থ্যও আমার না থাকে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে নামাযে অবশ্যই প্রথম কাতারে শামিল হও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) একটি আয়াত পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজ করে, তাহার চেয়ে উত্তম লোক আর কে হইতে পারে। আয়াতটি এইঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا *

আয়াতটি মুয়ায্যিনের শানে নাযিল হইয়াছে।

আবু ইমামাহ বাহেলী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি আযান দেয় এবং সেই আযানের আওয়াজ যে পর্যন্ত যায়, ততখানি পর্যন্ত ছওয়াব তাহাকে দান করা হয়। যাহারা সেই মুয়ায্যিনের প্রদত্ত আযানে নামায পড়ে, তাহাদের সকলের ছওয়াবের পরিমাণ অথবা উহা অপেক্ষাও বেশী ছওয়াব সে লাভ করে। এই ছওয়াবের কোন প্রকারই ঘাটতি নাই।

হযরত আসাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, যতদিন পর্যন্ত কোন রোগী রোগ ভোগ করিতে থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে আল্লাহর মেহমান এবং প্রত্যহ সে তখন সত্তর হাজার শহীদের পুণ্য লাভ করিতে থাকে। যদি আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত হয়, তবে সে পূর্ববর্তী পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে। আর যদি সেই রোগে মারা যায়, তবে সে বিনা হিসাবেই বেহেশতে প্রবেশ করে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুয়াযযিনগণ আল্লাহর দ্বাররক্ষক স্বরূপ। একেকবার আযানের পরিবর্তে আল্লাহ মুয়ায্যিনকে হাজার নবীর পুণ্যদান করেন। ইমাম আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁহার প্রতিবারের নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁহাকে হাজার সিদ্দীকের পুণ্য দান করেন। আলিমগণ আল্লাহর উকীল স্বরূপ? তাঁহাদের একেকটি হাদীস বর্ণনার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদেরকে রোজ কিয়ামতে একেকটি করিয়া নূর দান করেন এবং তাহারা হাজার বৎসরের ইবাদাতের পুণ্য লাভ করেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে প্রত্যেক মুয়াযযিনই দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, আযান দাতা দোজখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, মুয়ায্যিনের আযান যতদূর যায় উহার মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু তাহার সততার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আরফার দিন ও রাতের ফজীলত

হুব্বাতুল্লাহ ইবনে মুবারক জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সবদিন অপেক্ষা আরফার দিনই শ্রেষ্ঠ। ঐ দিনে আসমানবাসীদেরকে লক্ষ্য করিয়া মর্তবাসীদের সম্পর্কে গর্ব করিয়া আল্লাহ পাক বলেন, আমার এই বান্দাদের অবস্থা লক্ষ্য কর। কত দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া ধূলি মলিন চেহারায় উহারা আমার রহমত লাভের উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে। আর উহারা আমার শাস্তিকে কত ভয় করিতেছে। আরফার দিন যত অধিক লোককে মুক্তি দেওয়া হয়, কোন দিনই আর তত লোককে মুক্তি দেওয়া হয় না।

হুব্বাতুল্লাহ মুবারক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আরফার দিন খুৎবাহ দান কালে বলিলেন, হে লোকগণ! উট দ্রুত চালনায় কোন পুণ্য নাই, ঘোড়া দৌড়ানেও কোন পুণ্য নাই। তোমার সৎভাবে চলার মধ্যেই সব পুণ্য নিহিত। দুর্বল লোকদের সাথে মেলামিশা রাখ। কোন মুসলমানকে অযথা কষ্ট দিও না।

হুব্বাতুল্লাহ মুবারক নাফে' ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বলেন, আমি হুযুর (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, আরফার দিন আল্লাহতায়ালা বান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কোন বান্দার অন্তরে সরিষা পরিমাণ

গুনাহ থাকিলেও আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা লাভ হইতে বঞ্চিত করেন না। নাফে' বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শুধু আরফার উপস্থিত লোকদেরকেই ক্ষমা করেন, না সমস্ত মুসলমানদেরকেও ক্ষমা করেন? তিনি বলিলেন, সমস্ত মুসলমানদেরকেই ক্ষমা করিয়া থাকেন।

হুব্বাতুল্লাহ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার দিন আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং হাজীদের সম্পর্কে গর্ব করিয়া ফিরেশতাদেরকে বলেন, হে আমার ফিরেশতাগণ! তোমরা চাহিয়া দেখ। কত দূর দূরান্ত হইতে এইসব লোক আমার রহমতের আশায় আগমন করিয়াছে এবং আমার শাস্তিকে কত ভয় করিতেছে। অতএব আমার কর্তব্য, যাহারা আমার দর্শনাশায় আসিয়াছে, তাহাদেরকে সম্মান এবং মর্যাদা দান করা। মেজবানের উচিত মেহমানকে আপ্যায়ন করা। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং বেহেশতে তাহাদের জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম। ফিরেশতাগণ আরজ করিবেন, হে মাবুদ! ইহাদের মধ্যে অমুক পুরুষ এবং অমুক রমণী অহংকারী। আল্লাহ বলিবেন, তথাপি আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতএব আরফার দিন যত লোককে ক্ষমা করা হয়, অন্য কোন দিন এত লোককে ক্ষমা করা হয় না।

হুব্বাতুল্লাহ হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার দিনে শয়তান যতটা নিস্তেজ, অপদস্থ এবং অসম্মানিত হয়, আর কোনদিন ততটা হয় না। শয়তান সেইদিন খুবই ভগ্ন হৃদয়, দুর্বল, ক্রোধান্বিত এবং সঙ্কুচিত ভাবে থাকে। কারণ সেইদিন আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। বান্দাদিগকে ক্ষমা প্রদান করা হয়। অবশ্য বদর যুদ্ধের দিন শয়তান এতদপেক্ষাও বেশী কিছু অবলোকন করিয়াছিল।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, বদর যুদ্ধের দিন শয়তান কি অবলোকন করিয়াছিল?

হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, শয়তান প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ফিরেশতা জিব্রাইল সমস্ত ফিরেশতাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

আকরামা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জে আকবার আরফার দিন। এইদিন গর্ব করার দিন। এইদিন আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরেশতাদিগকে বলেন, তোমরা দুনিয়াতে আমার ঐ বান্দাদের দিকে তাকাইয়া দেখ। তাহারা আমার প্রতি কত বিশ্বাসী।

আরফার দিনের ন্যায় এত লোক আর কোনদিন ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, 'রোজে মাওউদ' দ্বারা কিয়ামত, রোজে শাহেদ দ্বারা জুমআর দিন এবং রোজে মাশহুদ দ্বারা আরফার দিন বুঝানো হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকগণ! তোমরা হুঁশিয়ার থাক। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি আরাফাত হইতে ফিরিয়া যায়, তবে সে সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরাফার দিনের সন্ধ্যা বেলায় মুযদালিফায় অবস্থানকারী সকলকেই আল্লাহ মাফ করিয়া দেন। কিন্তু কবীরাহ গুনাহকারীগণ মার্জিত হয় না। কিন্তু সকাল বেলা মুযদালিফায় অবস্থানকারী কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত এবং অত্যাচারী সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

হুব্বাতুল্লাহ ইবনে মুবারক হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন, একবার হুযুরে পাক (দঃ) আরফার রাতে দাঁড়াইয়া আছেন। চলার সময় হইলে তিনি সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে বলায় সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আজকার দিন আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন। নেককার লোকদের কারণে তোমাদের মধ্যকার পাপীদেরকেও আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। নেককার লোকগণ আল্লাহর নিকট যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে! তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অত্যাচার ও উৎপীড়ন-কারীগণকে মার্জনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন তোমরা অগ্রসর হইতে থাক।

চলিতে চলিতে মুযদালিফায় উপস্থিত হইলেন। এখানে হুযুর (দঃ) সারারাত ইবাদত-বন্দেগী করেন। সকালে চলার সময় হইলে তিনি সকলকে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে সমবেত জনগণ! আজ আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। তোমাদের মধ্যকার পাপী ব্যক্তিও আজ তোমাদের নেককার ব্যক্তির উছিলায় ক্ষমা লাভ করিয়াছে। নেককার লোকগণ আল্লাহর নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে। তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছে। এখন তোমরা সামনে অগ্রসর হইতে থাক।

এমন সময় এক গ্রাম্য আরব ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর উটের লাগাম ধরিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যে আল্লাহ আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এমন জঘন্য কোন পাপকার্য নাই , যাহা আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এমন কি আমি মিথ্যা শপথও করিয়াছি। আপনি যাহাদের কথা বলিলেন, আমিও তাহাদের মধ্যে গণ্য হইব?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হাঁ, তোমার পূর্ববর্তী পাপরাশি আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমার উটের লাগাম ছাড়িয়া দাও এবং এখন হইতে সৎ কাজ শুরু কর।

আব্বাস ইবনে মারদাস বলেন, আরফার রাতে হুযুর পাক (দঃ) উম্মতের প্রতি রহমত ও ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তাঁহার দোয়া কবুল করিয়া এরশাদ করিলেন, আমার বান্দাদের পাপসমূহ আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। কিন্তু যাহারা অন্যের উপরে অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদেরকে ক্ষমা করা হইল না। তখন হুযুর (দঃ) ফরিয়াদ করিলেন, হে মাবুদ! যাহার উপর যতটা অত্যাচার হইয়াছে তুমি তাহাকে সেই অত্যাচারীর দ্বিগুণ পুণ্য দান করিয়া অত্যাচারী ব্যক্তিকেও ক্ষমা করার শক্তি রাখ। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, আজ সন্ধ্যায় তোমার এই দোয়া মঞ্জুর হইবে না। অতঃপর হুযুর (দঃ) মুযদালিফার পরবর্তী দিন সকালে আবার ঐরূপ দোয়া করিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে এরশাদ হইল, তোমার দোয়া কবুল করা হইল। হুযুরে পাক (দঃ) এই এরশাদ শুনিয়া হাস্য করিলেন।

সাহাবীদের কেহ একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এক্ষণে আপনি হাসিলেন কেন? ইহার পূর্বে তো কখনও আপনি এইরূপ হাসেন নাই।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর দুশমন শয়তানের উপর হাসিলাম। কেননা শয়তান যখন জানিতে পারিল যে, আমার উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট যে দোয়া করিয়াছি, আল্লাহ তাহা কবুল করিয়াছেন। তখন সে চীৎকার শুরু করিয়া দিল। দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল ও তাহাতে ধূলাবালি মাখিতে শুরু করিল।

সাঈদ ইবনে জারীর বলেন, আরাফাতের যে স্থানে লোক দাঁড়াইয়া দুই হাত তুলিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করে হুযুরে পাক (দঃ) সেইখানে ছিলেন। লোকগণও সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে দোয়া প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময় ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া বলিলেন-

হে মুহাম্মদ (দঃ)! যিনি সকল লোকের মাথার তাজ তিনি আপনাকে সালামা জানাইয়া এরশাদ করিতেছেন, যত লোক এইখানে সমবেত হইয়াছে এবং আমার ঘরের হজ্জ ও যিয়ারত করিতে আসিয়াছে, সকলেই আমার অতিথি এবং আমি তাহাদের দাওয়াত দানকারী। আমার কর্তব্য আমার অতিথিদেরকে সম্মান ও আপ্যায়ন করা। তুমি সাক্ষী থাক, আমি সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। ফিরেশতাদিগকেও সাক্ষী রাখিলাম যে, যাহারা জুমআর দিবসে যিয়ারত করিতে আসে, তাহাদের সাথেও আমি এই ব্যবহার করিব।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আরফার রাতে হুযুরে পাক (দঃ) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে জনগণ! তোমরা সুখে থাক। তোমরা সুখে থাক। তোমরা সুখে থাক। তিনবার এই কথাটি বলিয়া তারপর বলিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট যাহা চাহিয়াছ, আল্লাহ তাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যাহা খরচ করিয়াছ, রোজকিয়ামতে উহা তোমাদিগকে হাজার গুণ বাড়াইয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা শুন, তোমাদিগকে আমি শুভ সংবাদ দান করিতেছি। লোকগণ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন, সত্য বলিতেছেন, সত্য বলিতেছেন। আরফার রাতে আল্লাহ প্রথম আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরেশতাদিগকে দুনিয়াতে আগমন করিতে নির্দেশ দান করেন। দুনিয়াতে এত ফিরেশতা আসেন যে, উপর হইতে একটি সুই ফেলিলেও উহা যমিনে পড়িবার স্থান থাকে না; বরং উহা ফিরেশতাদের মাথায়

আল্লাহ বলেন, হে ফিরেশতাগণ! চাহিয়া দেখ, আমার বান্দাগণ কত ক্লেশ বরণ করিয়া চারিদিক হইতে আগমন করিতেছে। তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ, তাহারা আমার নিকট কি চাহিতেছে। ফিরেশতাগণ জবাব দান করেন যে, হে প্রভু! তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। তখন আল্লাহ্ বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক। আমি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিলাম। এই কথাটি তিনবার বলিয়া এরশাদ করিলেন, তোমরা এমন স্থান হইতে ফিরিয়া যাও, যেখান হইতে তোমরা সকলেই ক্ষমা প্রাপ্ত।

আরফার দিনে নামায-রোযা ও দোয়ার মাহাত্ম্য এবং ফজীলত

হাবাতুল্লাহ ইবনে মুবারক সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি আরফার দিনে রোযা রাখিলে আল্লাহ্ তাহার পূর্ববর্তী এক বৎসরের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। হুব্বাতুল্লাহ হযরত আবু কাতাদাহ হইতে বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আরফার দিনে রোযা রাখে, সেই রোযা তাহার দুই বৎসরের পাপের কাফফারা স্বরূপ হইয়া যায়। এক বৎসরের পিছনের এবং অন্য বৎসর সম্মুখের।

হাবাতুল্লাহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আরফার দিনে জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর পঞ্চাশ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করিয়া চারি রাকাত নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাহাকে হাজার নেকী দান করেন এবং কোরআনের প্রত্যেকটি হরফের বদলে বেহেশতে একটি করিয়া মর্যাদা দান করেন। উহার প্রত্যেক দরজার দৈর্ঘ্য হইবে পাঁচশত বৎসরের রাস্তার সম পরিমাণ। আরও কোরআনের প্রত্যেকটি হরফের বদলে সত্তর হাজার করিয়া হূরী-স্ত্রী পাইবে। প্রত্যেক হূরীর নিকট মোতি ও ইয়াকুতের সত্তর হাজার খাঞ্চা থাকে এবং প্রত্যেক খাঞ্চায় সত্তর হাজার রকম আহার্য্য ও সবুজ পাখির মাংস থাকিবে। ঐ মাংস বরফের মত ঠাণ্ডা, মধুর মত মিষ্টি এবং কস্তুরীর ন্যায় সুঘ্রাণ যুক্ত থাকিবে। ঐ মাংস ছুরি দ্বারা কর্তিত থাকিবে না। বরং উহা বিচিত্র অবস্থাযুক্ত ও অপূর্ব স্বাদ বিশিষ্ট হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন, লাল ইয়াকুতের ডানা এবং স্বর্ণের চক্ষু বিশিষ্ট পাখিগুলি ঝাঁকৃত ভাবে উড়িয়া আসিয়া তাহাদের পাত্রে পড়িবে। উহাদের ডানা থাকিবে সত্তর হাজার করিয়া। এমন মধুর স্বরে উহারা বাক্যোচ্চারণ করিবে যে, সেইরূপ মিষ্টি আওয়াজ কোন ব্যক্তি জীবনে কোনদিন শুনে নাই। উহারা মধুর কণ্ঠে বলিবে, যাহারা আরফাবাসী, তাহারা সন্তুষ্ট থাকুক। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ঐ পাখি কাহারও খাইতে ইচ্ছা হইবে, তখন উহারা আপনা হইতেই উড়িয়া আসিয়া আবার পাত্রে বসিবে। উহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে সত্তর প্রকার আহার্য বাহির হইয়া আসিবে। বেহেশতী লোকেরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উহা ভক্ষণ করিবে। খাইবার পর পাখিগুলি ডানা ঝাড়া দিয়া পূর্বের মত উড়িয়া যাইবে। আরফাবাসীকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন কোরআনের প্রত্যেকটি হরফের বদলে সে একটি করিয়া নূর প্রাপ্ত হইবে। উক্ত নূরের আলোতে কা'বা তাওয়াফকারীদেরকেও দেখা যাইবে। তাহার জন্য বেহেশতের একটি দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এই অবস্থা দেখিয়া যেই লোকটি মনে করিবে, আল্লাহ আমার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। তাই সে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার দিন যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকাতে বিসমিল্লাহ্ ও আমীনসহ্ সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া বিসমিল্লাহসহ্ তিনবার সূরা কাফিরূন ও ইখলাস দ্বারা দুই রাকাত নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেন।

আমর লাইসী তাঁহার পিতার নিকট হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল মারফত হযরত ঈসা (আঃ)কে পাঁচটি দোয়া শিক্ষা দিয়া এরশাদ করিয়াছেন—এই দোয়া পাঁচটি পাঠ কর। আল্লাহর দরবারে আশুরার দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইবাদাতের দিন আর নাই।

প্রথম দোয়া ঃ

لَآاِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ يُـحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু বিয়াদিহিল খাইর। অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اِلٰـهًا وَّاحِدًا صَمَدًا لَّـمْ يَتَّخِذْهُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَـدًا *

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ইলাহাউঁ ওয়াহিদান ছামাদান লাম ইয়াত্তাখিযুহু ছাহিবাতাউঁ অলা অলাদা।

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَىٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ*

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু অ হুয়া হাইয়ুল্লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু অ হুয়া আল্লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

চতুর্থ দোয়া ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَكَفٰى سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَالَيْسَ وَرَآءَ اللّٰهِ مُنْتَـهٰى*

উচ্চারণ ঃ হাসবিয়াল্লাহু অ কাফা সামিআল্লাহু লিমান দাআ লাইছা অরায়াল্লাহি মুন্তাহা।

পঞ্চম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَاتَقُوْلُ وَخَيْرًا كَمَا مِمَّا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَـكَ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَلَـكَ يَا رَبِّ تَرَانِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شِتَابِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَّا تَجْرِىْ بِـهِ الرِّيْحُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা তাকুলু অ খাইরান কামা মিম্মা তাকুলু আল্লাহুম্মা লাকা ছালাতী অ নুসুকী অ মাহইয়াইয়া অ মামাতী অলাকা ইয়া রাব্বি তারানী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা তাজরী বিহির রীহু।

হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া পাঠকারী কি ছওয়াব লাভ করিবে? নবী (আঃ) উত্তর করিলেন, প্রথম দোয়া যে একশত বার পাঠ করিবে রোজকিয়ামতে সে আবেদগণ অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবে। দ্বিতীয় দোয়া একশত বার পাঠ করিলে সে হাজার নেকী

পাঠ করিবে। হাজার গুনাহ মাফ হইবে এবং বেহেশত মধ্যে তাহার নিয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় দোয়া একশত বার পাঠ করিলে তাহার জন্য প্রথম আসমানের সত্তর হাজার ফেরেশতা দুনিয়ায় আগমন করিয়া রহমতের দোয়া করিবেন। চতুর্থ দোয়া একশতবার পাঠকারীর দোয়া ফিরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে নিয়া পেশ করিবেন। আল্লাহ যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সে কখন অসৎ লোক হইতে পারে না।

অতঃপর হাওয়ারীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চম দোয়া পাঠকারী কিরূপ ছওয়াব লাভ করিবে? হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, পঞ্চম দোয়া আমার জন্য খাস (নির্দিষ্ট)। উক্ত দোয়ার ফজীলত বর্ণনা করার নির্দেশ আমাকে দান করা হয় নাই। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আরফার দিন এই দোয়া বহু সংখ্যায় পাঠ করিতেন।

শায়খ হুব্বাতুল্লাহ ইবনে মুবারক মূসা ইবনে উবাইদা হইতে এবং তিনি হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার দিন আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের দোয়া এই ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا - اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَسَاوِسَ الصَّدْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشِتَاتِ الْاَمْرِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّمَا تَهِبُ بِهِ الرِّيَاحُ وَمِنْ شَرِّ بِوَائِقِ الدَّهْرِ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু অ হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মাজ আল ফী ক্বালবী নূরাউ অফী সাময়ী নূরাউ অফী বাছারী নূরান আল্লাহুম্মাশ রাহলী ছাদরী অ ইয়াচ্ছিরলী আমরী আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অসাবিসাছ ছাদরি অ ফিতনাতিল ক্বাবরি অ শিতাবি আমরি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি মা ইয়ালিজু ফিল্লাইলি অ মিন শাররি মা ইয়ালিজু ফিন্নাহারী অমিন শাররি মা তাহিব বিহিররিয়াহু অ মিন শাররি বাওয়ায়িক্বিদ্দাহর।

যেহাক (রাঃ) বলিয়াছেন, হুযুরে পাক (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেন, অদ্যকার দিন হজ্জে আকবরের দিন। অদ্যকার দিন অর্থাৎ আরফার দিন যে ব্যক্তি এইখানে না আসিবে, তাহার হজ্জ পূর্ণ হইবে না। অতএব ইহাই বুঝা গেল যে, এইদিন আল্লাহর নিকট দোয়া করার দিন, তাকবীর-তাহলীল এবং লাব্বায়েক পড়ার দিন। যদি কোন ব্যক্তি আজ এখানে আসে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া না করে তবে সে সমস্ত নেকী হইতে বঞ্চিত থাকিবে। যাহার নিকট তুমি প্রার্থনা করিতেছ তিনি খুবই দানশীল। বখীল নহেন। তিনি তাঁহার বান্দার প্রার্থনা ফিরাইয়া দেন না। আর যদি কোন মুকীম ব্যক্তি আরফার দিন রোযা রাখে তবে সে যেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী এক বৎসরের রোযা রাখিল।

আরফার রাতে হুযুরে পাক (দঃ)এর খাস দোয়া

শায়খ হুব্বাতুল্লাহ ইবনে মুবারক হযরত আলী (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার তারিখ সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা অপেক্ষা ভাল কাজ আর নাই। এই দোয়া পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। কিবলার দিকে ফিরিয়া হুযুরে পাক (দঃ) দুই হাত উঠাইয়া তিনবার লাব্বায়েক বলিয়া এই দোয়া একশত বার পাঠ করিতেন।

لَآاِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْـمُـلْـكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

উচারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু বিয়াদিহিল খাইর, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

এ দোয়াটিও একশত বার পাঠ করিতেন :

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَاللّٰهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا *

উচ্চারণ : লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমি আশহাদু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীরুন, আল্লাহু ক্বাদ আহাত্বা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা।

অতঃপর পড়িতেন :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

উচ্চারণ : আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

তারপর তিনবার পড়িতেন :

اِنَّ اللّٰهَ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ *

উচ্চারণ : ইন্নাল্লাহা হুয়াস সামীউল বাছীর।

অন্তঃপর বিসমিল্লাহ ও আমীনসহ তিনবার সূরা ফাতিহা, একশত বার সূরা ইখলাস এবং নিম্নোক্ত দোয়া একশত বার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মনের সমস্ত আকাঙক্ষা পেশ করিতেন। দোয়াটি এই :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ *

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমি, আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু।

আরফার দিন ফিরেশতা জিব্রাইল, মিকাইল এবং হযরত খিজির (আঃ)এর দোয়া

শায়খ হুব্বাতুল্লাহ সনদ পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বৎসর পানির ও কূলের সমস্ত আসিয়া মক্কায় সমবেত হয়। পানি ও কূলের লোক বলিতে এখানে হযরত ইলিয়াস (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ)কে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহারা একে অপরের মাথা মুড়াইয়া দেন এবং একে অপরকে বলেন, পাঠ কর :

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَايَاْتِىْ بِالْخَيْرِ اِلَّااللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَايَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّااللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَتِهٖ فَمِنَ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ *

لَايَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّااللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَمَا بِكُمْ مِّنْ
فَمِنَ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি মা-শাআল্লা-হু লা ইয়াতী বিল খাইরি ইল্লা-বিল্লা-হি বিসমিল্লাহি মা শাআল্লাহু অমা বিকুম মিম নি'মাতিহী ফামিনাল্লাহি বিসমিল্লাহি মা শাআল্লাহু লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ যদি এই দোয়া পাঠ করে, তবে সে পানি, আগুনের বিপদ হইতে, ধন-সম্পদ চুরি যাওয়া হইতে নিরাপদ থাকিবে। সকালে পড়িলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পড়িলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ তাহাকে ঐ সমস্ত বিপদ হইতে আমানে রাখেন।

শায়খ হুব্বাতুল্লাহ হযরত আলী (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আরফার দিন হযরত জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফীল এবং হযরত খিজির (আঃ) একস্থানে মিলিত হন। তখন ফিরেশতা জিব্রাইল এই দোয়া পাঠ করেন ঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ মা শাআল্লাহ অলা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

হযরত মিকাইল পাঠ করেন ঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ মা শাআল্লাহ কুল্লু নি'মাতিম মিনাল্লাহি।

হযরত ইস্রাফীল পাঠ করেন ঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ الْخَيْرَ كُلَّهٗ بِيَدِ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ মা মাআল্লাহুল খাইরা কুল্লাহু বিইয়াদিল্লাহি।

হযরত খিজির (আঃ) পাঠ করেন ঃ

لَايَدْفَعُ السُّوْءَ اِلَّااللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ লা ইয়াদফাউস সূয়া ইল্লাল্লাহ।

অতঃপর তাঁহারা একে অন্যের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যান এবং এই একদিন ব্যতীত সারা বৎসরে আর কখনও তাঁহারা একত্রিত হন না।

শ্রেষ্ঠ দোয়া ঃ

ইবনে জারীহ বর্ণনা করিয়াছেন, লোকগণ যখন মাওকাফে দণ্ডায়মান হইত, তখন প্রায়শঃ এই দোয়া পাঠ করিত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ অফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ অক্বিনা আযাবান্নার।

মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আসমান-যমিন সৃষ্টিকাল হইতে রোকনে ইয়ামীনীর নিকট একজন ফিরেশতা দাঁড়াইয়া আছেন এবং আমীন! আমীন!! বলিতেছেন। অতএব তোমরা সকলে এই দোয়াটি পাঠ কর।

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ অফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ অক্বিনা আযাবান্নার'।

হাম্মাদ ইবনে সাবেত বলেন, লোকগণ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি হাত উঠাইয়া উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিলেন। লোকগণ বলিল, আমাদের জন্য আরও দোয়া করুন। দ্বিতীয় বারও তিনি ঐ একই দোয়া পাঠ করিলেন। তাহারা আবার তাঁহাকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, ইহা অপেক্ষা

বেশী তোমরা আর কি চাও? ইহকাল পরকাল উভয়ের জন্যই তো দোয়া করিলাম, ইহার চাইতে উত্তম দোয়া আর কি হইতে পারে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) অধিকাংশ সময়ই এই দোয়া করিতেন। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিয়া আমাকে স্মরণ করে সে রহমত ও করুণার একটি বেশী অংশ লাভ করে।

কোন কোন লোক এই দোয়া করিয়া থাকে যে, হে মাবুদ ! তুমি আমাকে ধন-দৌলত,দাস-দাসী, গরু-বকরী, স্বর্ণ-রৌপ্য দান কর। ইহারা শুধু পার্থিব ধন-সম্পদ, লোভ-লিপ্সা এবং আরাম-আয়েশের প্রার্থনাই করিয়া থাকে, আখেরাতের কিছুই চাহে না এবং পায়ও না। কোন কোন লোক দোয়া করে, হে মাবুদ! দুনিয়াতে আমাদেরকে নেককাজ করার তাওফীক দাও। আখেরাতের পুণ্য দান কর এবং দোজখের অশেষ ক্লেশদায়ক আযাব হইতে নিরাপদ রাখ। এই প্রকার দোয়া নবী-রাসূল এবং মুমিন লোকদের মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার পুণ্য অর্থাৎ ফিদ্দুনইয়া হাসানাতান অর্থে দুনিয়ার নেককারিণী স্ত্রী এবং ফিল আখিরাতে হাসানাতান অর্থে পরকালের হুর স্ত্রীদেরকে বুঝানো হইয়াছে এবং 'অক্বিনা আযাবান্নার' দ্বারা বুঝানো হইয়াছে, দুনিয়ার অসতী ও বদকারিণী স্ত্রীদের অশান্তি ও দুর্যোগের কথা।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, উক্ত দোয়ার দুনিয়াবী হাসানাহর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে এলেম এবং ইবাদাতের কথা, আর পারলৌকিক হাসানাহর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে বেহেশতকে।

সাদীএবং ইবনে হাইয়ান বলেন, দুনিয়াবী হাসানাহর অর্থ জীবিকা, অর্থ-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নেক কাজ এবং আখিরাতের হাসানাহর অর্থ ক্ষমা এবং পুণ্য।

আতাবাহ বলেন, দুনিয়াবী হাসানাহর দ্বারা ইঙ্গিৎ করা হইয়াছে এলম এবং আমল-এর দিকে এবং পারলৌকিক হাসানাহর দ্বারা ইঙ্গিৎ করা হইয়াছে সহজ হিসাব এবং বেহেশতের দিকে।

কাতাদাহ (রা) বলেন, দনিয়াবী হাসানাহর অর্থ দুনিয়ার নিরাপত্তা। এই মতের প্রমাণ স্বরূপ বলেন, একবার হুযুরে পাক (দঃ) কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যান। রোগীর অবস্থা ছিল খুবই মারাত্মক। হুযুরে পাক (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রকার দোয়া করিতে? রুগ্ন ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) ! আমি সদাসর্বদা আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিতাম, হে খোদা ! তুমি পরকালের শাস্তি আমাকে ইহকালেই দান কর।

হুযুরে পাক (দঃ) লোকটির কথা শুনিয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কেন এইরূপ দোয়া করিলে? দুনিয়াতে পরকালের শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে কি? বরং তোমার উচিত ছিল এই দোয়া করা—

'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাউ অফিল আখিরাতি হাসানাতাউ অক্বিনা আযাবান্নার,

অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি এই দোয়া করিতে শুরু করিল এবং আল্লাহর রহমতে তাহাতে তাহার রোগ মুক্তি ঘটিল।

কোরবানী ও ঈদুল আযহার ফজীলত

আবদুল্লাহ ইবনে ফারত বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অন্যান্য দিনাপেক্ষা কোরবানীর দিন আল্লাহর নিকট অধিক ফজীলত বিশিষ্ট।

হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)কে এরশাদ করিয়াছিলেন, তুমি তোমার কোরবানীর জন্তু যবেহ করার সময়ে নিকটে থাকিবে এবং পড়িবেঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণঃ কুল ইন্না ছালাতী অ নুসুকী অ মাহইয়াইয়া অ মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! শেষ নবীর উম্মতদের মধ্যে যাহারা কোরবানী করিবে, তাহারা কিরূপ ছওয়াব লাভ করিবে? আল্লাহতায়ালা উত্তর করিলেন, কোরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে দশটি করিয়া ছওয়াব লাভ করিবে। দশটি করিয়া বদী মোচন করা হইবে এবং দশটি করিয়া মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত দাউদ (আঃ) আবার আরজ করিলেন, কোরবানীর জন্তুর পেট ফাড়িবার কারণে কিরূপ নেকী হাসিল হয়।

আল্লাহ জবাবে বলিলেন, উহার বিনিময় হইল, ঐ ব্যক্তি যখন রোজ কিয়ামতে কবর হইতে উঠিবে, তখন সে ক্ষুধা পিপাসা অনুভব করিবে না। সে কিয়ামতের ভয়-ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিবে। হে দাউদ! যে ব্যক্তি কোরবানী করে, তাহার কোরবানীর প্রত্যেকটি গোশতের টুকরার পরিবর্তে বেহেশতের উট পরিমাণ একটি করিয়া উট এবং বেহেশতের অশ্ব পরিমাণ একটি করিয়া অশ্ব বেহেশতের মধ্যে দান করা হইবে।

কোরবানীর জন্তুর দেহে যত পশম থাকিবে তাহাকে ততটি মহল প্রদান করা হইবে। প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে তাহার খেদমতের জন্য তাহাকে হুর দেওয়া হইবে। হে দাউদ! তুমি কি অবগত নও যে, কোরবানীর পশু কোরবানী দাতাদের যানবাহন। কোরবানী বিপদাপদ ও পাপকে দূর করিয়া দেয়। অতএব তুমি লোকগণকে কোরবানী করিতে আদেশ কর।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা উত্তমরূপে কোরবানী কর। কেননা উহা রোজ কিয়ামতে তোমাদের জন্য যানবাহন হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا *

অর্থাৎ সেইদিন রাহমানের দিকে খোদাভীরু লোকদের হাশর হইবে।

তখন তাহারা তাহাদের উষ্ট্রের উপর ভালভাবে আরোহণ করিবে। আর এই সমস্ত উষ্ট্র তাহাদের কোরবানীর উষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নহে। কোরবানীর পরিবর্তে তাহারা এমন ধরনের উষ্ট্র পাইবে, যাহা তাহারা জীবনে কোনদিন দেখে নাই। উষ্ট্রের পৃষ্টে স্বর্ণের হাওদা ও মুখে যবরজদের লাগাম থাকিবে। এই উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তাহারা বেহেশতের দরজায় গিয়া আঘাত করিতে থাকিবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে মুসলিমগণ! আনন্দ ও উৎফুল্লতার সাথে তোমরা কোরবানী কর। যে ব্যক্তি পশুকে কিবলামুখী করিয়া কোরবানী করে, সেই কোরবানীর সমস্ত রক্ত ও পশম রোজকিয়ামত পর্যন্ত সঞ্চিত রাখা হয়। পশুর যে রক্ত যমিনে পতিত হয় আল্লাহ উহা নিজের নিকট সঞ্চিত রাখেন। তোমরা অকপটতার সাথে খরচ কর, দ্বিগুণ ছওয়াব মিলিবে।

বর্ণিত আছে যে, কালো ও খাকী রংয়ের বড় শিংওয়ালা দুইটি দুম্বা আনয়ন করিয়া উহার একটি যবেহ করার সময়ে হুযুরে পাক (দঃ) পাঠ করিলেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। আরও বলিলেন, হে মাবুদ! ইহা মুহাম্মদ এবং তাহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে। হুযুরে পাক (দঃ) অন্যটি যবেহ করিবার সময় বলিলেনঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হে মাবুদ! ইহা মুহাম্মদ (দঃ) ও তাহার উম্মতদের পক্ষ হইতে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই আশায় কোরবানী করে যে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত প্রদান করিবেন, তাহা হইলে কোরবানীর পশুর প্রথম রক্ত ফোঁটা যমিনে পড়িতেই আল্লাহ তাহার যাবতীয় পাপ মার্জনা করিয়া দেন। হাশরের দিন সেই পশু তাহার বাহন হইবে। পশুর দেহে যত পশম থাকিবে, সেই পরিমাণ নেকী আল্লাহ তাহাকে দান করিবেন।

ঈদুল আজহার রাতের নামায

ঈদুল আজহার রাতে দুই রাকয়াত নামায পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকয়াতে নিম্নোক্ত সূরাসমূহ প্রত্যেকটি পনের বার করিয়া পাঠ করিবে। সূরা সমূহ হইল, সূরা ফাতিহা, সুরা ন্যস। নামাযান্তে সালাম করিয়া তিনবার আয়াতুল কুরসী এবং পনের বার আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করতঃ যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিবে।

তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলি

তাশরীকের দিনগুলিতে কি পরিমাণ তাকবীর পাঠ করিতে হইবে তাহা নিয়া ওলামায় কিরামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযের পর তাকবীর পাঠ করিতেন। তাহাছাড়া জনসমাবেশে, জনসমক্ষে, নির্জনে, শয়নে, উঠায়-বসায়ও

ইহা পাঠ করিতেন। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও এইভাবে তাকবীর পাঠ করিতেন। এই তাকবীর পাঠ করা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিমত নাই। মতভেদ শুধু কখন হইতে এবং কতবার পড়িতে হইবে তাহা লইয়া।

হযরত আলী (রাঃ) আরফার দিন ফজরের নামায আদায় করার পর হইতে তাশরীকের শেষ দিন আছরের নামাযের বাদ পর্যন্ত উহা পাঠ করিতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখও এই নিয়মের অনুসারী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আরাফার দিন ফজরের নামায আদায় করিবার পর কোরবানীর শেষ দিন আছর নামাযের বাদ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করিতেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)ও এই একই নিয়মে তাকবীর পাঠ করিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) কোরবানীর দিন জোহরের নামায হইতে তাকবীর পাঠ করিতেন এবং তাশরীকের শেষদিন আছর নামাযের পর পর্যন্ত পড়িয়া তাকবীর পাঠ শেষ করিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকবীরের শব্দসমূহ দুইবার পাঠ করিতেন। তাকবীরের শব্দগুলি এইঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰـهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ *

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবারু, আল্লাহু আকবারু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবারু অলিল্লাহিল হামদ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মিনার দিন এইজন্য যে, এইদিন লোক পানাহার করিবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করিবে।

ঈদুল আজহার ন্যায় ঈদুল ফিতরের দিনও তাকবীর পাঠ করিবে; বরং ঈদুল ফিতরের রাতে আরও ইহা বেশী সংখ্যায় পড়া উত্তম। আল্লাহ বলেনঃ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ *

অর্থাৎ তোমরা রমজান পূর্ণ কর এবং তাকবীর পাঠ কর, যেভাবে তোমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রমজানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর হইতে তাকবীর পাঠ শুরু করিবে এবং ইমাম ঈদুল ফিতরের খুৎবাহ পাঠ করার পর আর তাকবীর পাঠ করিবে না।

আশুরার দিনের মরতবা ও মাহাত্ম্য

আল্লাহতায়ালা বলেন যে, মাস বারটি। তন্মধ্যে চারি মাস হারাম। অর্থাৎ রজব, যিলকাদ, যিলহাজ্জ এবং মহররম। এই চারি মাসে ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-কোন্দল, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। মহররম উক্ত চারি মাসেরই অন্যতম মাস এবং আশুরা ঐ মাসেই নিহিত।

যে ব্যক্তি এই মহররম মাসে নফল ইবাদাত-বন্দেগী করে, আল্লাহ তাহাকে অফুরন্ত পুণ্য দান করেন। আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, মহররম মাসে যদি কেহ রোযা রাখে তবে প্রতিটি রোযার বদলে ত্রিশটি রোযার পুণ্য লাভ করে। মায়মুন ইবনে মেহরান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি মহররম মাসের আশুরার দশটি রোযা রাখে, তবে তাহাকে দশ হাজার ফিরেশতার ইবাদাতের পরিমাণ পুণ্য দান করা হয়। তাহা ছাড়া দশ হাজার হাজী এবং ওমরাকারীদের ন্যায় পুণ্যও দান করা হয়।

যদি কোন বক্তি আশুরার দিন কোন ইয়াতিম বালক-বালিকার মাথায় স্নেহের সাথে হাত রাখে, তবে উক্ত ইয়াতিমের মাথার চুলের পরিমাণ সংখ্যক বেহেশতী কক্ষ তাহাকে প্রদান করা হইবে। আশুরার রাতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইলে সে যেন হুযুরে পাক (দঃ)এর সমস্ত উম্মতকে তৃপ্তিসহকারে আহার করাইল। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)!

আল্লাহতায়ালা কি যে কোন রোযা অপেক্ষা আশুরার রোযাকেই অধিক মর্যাদা দান করিয়াছেন? লওহে, কলম, পাহাড়-পর্বতও এই আশুরার দিন সৃষ্টি করা হইয়াছে। হযরত আদম (আঃ) এইদিন সৃষ্টি হইয়াছেন। তাঁহাকে এইদিনই বেহেশতে স্থান দেওয়া হইয়াছে, আবার এই দিনই তাঁহাকে বেহেশত হইতে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন এবং এইদিনই তিনি তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈলকে কোরবানী করিতে নিয়াছেন। এই দিনটিতেই ফিরআউন নীল দরিয়ায় সদলবলে ডুবিয়া মরিয়াছে, হযরত আইউব (আঃ) এই দিনটিতে রোগমুক্ত হইয়াছেন। এইদিন হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হযরত দাউদ (আঃ) এইদিন ক্ষমা লাভ করিয়াছেন এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এইদিন রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ)এর তাওবাহ কবুলও হইয়াছিল এই দিনে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই আশুরার দিনই আরশে আসীন হইয়াছেন। এই বিশ্ব-জাহান ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এইদিন। সর্ব প্রথম বৃষ্টি ও আল্লাহর রহমত দুনিয়াতে অবতীর্ণ হইয়াছে এই দিন।

কোন লোক আশুরার দিন গোসল করিলে মৃত্যু রোগ ব্যতীত তাহার আর কোন রোগ শরীরে থাকে না। এই দিন চোখে সুরমা ব্যবহার করিলে সারা বৎসর তাহার চোখ ভাল থাকে। যে ব্যক্তি এই দিন কোন রোগীর সেবা করে, সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের সেবা করিল।

আশুরার তারিখে কোন ব্যক্তিকে এক গ্লাস শরবত পান করাইলে তাহার একদিন এক রাতের ইবাদতের পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি আশুরার দিন প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাহিতার পর পঞ্চাশ বার সূরা ইখলাস পড়িয়া চারি রাকয়াত নামায আদায় করে, আল্লাহ্ তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের এবং পঞ্চাশ বৎসর পরের গুনাহ মার্জনা করেন এবং ফিরেশতাদের এলাকাতে তাহার জন্য নূরের পঞ্চাশটি মহল তৈরী করাইয়া রাখেন।

অপর এক হাদীসে আছে, আশুরার দিন দুই রাকয়াত করিয়া চারি রাকয়াত নফল নামায পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা যিলযালাহ্, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস একবার করিয়া পাঠ করিবে এবং নামাযান্তে সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়িবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বনি ইস্রাইলদের উপর সারা বৎসরের মহররম মাসের দশ তারিখের আশুরার রোযা ফরজ ছিল। তাই মুসলমানদেরও উচিত আশুরার দিন রোযা রাখা এবং পরিবার-পরিজনদের জন্য তৃপ্তিজনক ইফতারী ও আহারের ব্যবস্থা করা। কেননা, এই দিনের বরকতে আল্লাহতায়ালা সারা বৎসর সুখ-শান্তিতে রাখেন। এই দিনের রোযার বরকতে আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়া থাকেন। আর এই তারিখ রাতভর ইবাদাত করিলে সে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর সময়ের খবর জানিতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে আশুরার সারারাত ইবাদাত করিয়া কাটায়, আল্লাহ্ তাহার বাসনানুরূপ তাহাকে জীবিত রাখেন।

সুফইয়ান ইবনে আইনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি অবগত হইতে পারিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন তাহার পরিবারবর্গকে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করায়, আল্লাহতায়ালা তাহাকে স্বচ্ছলতার সাথে রুজী দান করিয়া থাকেন।

সুফইয়ান (রহঃ) বলেন যে, আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং সুফল লাভ করিয়াছি। প্রাচীন কালের কোন কোন বোযর্গ বলেন, আশুরার দিন রোযা রাখিলে বা সদকা খয়রাত করিলে সারা বৎসর রোযা না রাখার এবং সদকা খয়রাত না করার কাফফারা আদায় হইয়া যায়।

আবু নসর (রহঃ) তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি আবু গালিব ইবনে উম্মিয়া ইবনে হলফ হাজমী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হুযুরে পাক (দঃ) আমার গৃহে একটি পাখী দেখিয়া বলিলেন, ইহারাই প্রথম প্রাণী যাহারা আশুরার রোযা রাখিয়াছে।

কায়েস ইবনে ইবাদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আশুরার দিন হিংস্র জীব-জন্তুগুলিতেও রোযা রাখিয়া থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রমজানের রোযার পর আশুরার রোযাই শ্রেষ্ঠ বটে। ফরজ নামায ব্যতীত মধ্য রাতের পর যে সমস্ত নামায পড়া হয়, তাহার মধ্যে আশুরার নামায সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মহররম আল্লাহর মাস। এই মাসে আল্লাহতায়ালা একটি সম্প্রদায়ের তাওবাহ্ কবুল করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ্তায়ালা অবশ্যই তাহার তাওবাহ্ কবুল করিয়া থাকেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিন এবং মহররম মাসের প্রথম দিন রোযা রাখে, সে যেন বিগত বৎসরের রোযা রাখা আরম্ভ করিল। ইহার ফলে আল্লাহ্তায়ালা তাহার পঞ্চাশ বৎসরের পাপ মার্জনা করিয়া দেন।

উরওয়াহ (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আইয়্যামে জাহেলিয়াতে কোরায়েশ সম্প্রদায়ের লোকেরা আশুরার দিন রোযা রাখিত।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) ও তাঁহার আসহাবগণও আশুরার দিন রোযা রাখিতেন।

হুযুরে পাক (দঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ আনার পর ইয়াহুদীদিগের কাছে আশুরার দিনটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা জবাবে বলিল যে, ঐদিন আল্লাহ্তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁহার কাউম বনি ইস্রাইলদিগকে ফিরআউনের হাত হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ঐ গৌরবময় দিনটির সম্মান জ্ঞাপনার্থে আমরা ঐদিনে রোযা রাখিয়া থাকি। তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ)এর যতখানি হকদার, আমরা তাঁহার সম্পর্কে তদপেক্ষাও অধিক হকদার। অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) তাঁহার উম্মতগণকে নির্দেশ করিলেন যে, তোমরাও আশুরার দিন রোযা রাখ।

আশুরা নামকরণ

আশুরার নামকরণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ ওলামা বলেন যে, এই দিনটি মহররম মাসের দশ তারিখ বলিয়াই ইহার নাম আশুরাহ্ হইয়াছে।

কোন কোন আলেম বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদিয়া (দঃ)কে যে দশটি বোযর্গ দিন উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে আশুরার দিনটি দশম স্থানীয়। এই কারণেই ইহার নাম আশুরাহ্ রাখা হইয়াছে।

আবার কাহারও মত এই যে, এই দিনটিতে যেহেতু আল্লাহ্ স্বীয় দশজন নবীকে দশটি ভিন্ন ভিন্ন রহমত এনায়েত করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম আশুরাহ্ হইয়াছে। যথাঃ (১) এইদিন হযরত আদম (আঃ)-এর দোয়া ও তাওবাহ্ কবুল হইয়াছে (২) এইদিন হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে সম্মানিত উচ্চস্থানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে (৩) এইদিন হযরত নূহ্ (আঃ)এর নৌকা জুদী পাহাড়ের সাথে গিয়া ঠেকিয়াছিল (৪) এইদিন হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জন্ম, খলীল উপাধি লাভ এবং নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল। (৫) এইদিন হযরত দাউদ (আঃ)এর তাওবাহ্ কবুল এবং তৎপুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ)এর হারানো রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল (৬) এই দিনে হযরত আইউব (আঃ)এর রোগ নিরাময় হইয়াছিল (৭) এইদিন আল্লাহ্তায়ালা ফিরআউনকে সদলবলে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন এবং হযরত মূসা (আঃ)কে সহজেই দরিয়া পার করাইয়া দিয়াছিলেন। (৮) এই দিনে হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন (৯) এইদিনে হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং (১০) এইদিনে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ)এর রূহ মুবারক সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

আশুরার দিন কোনটি

মহররম মাসে আশুরার দিনটি কোন তারিখে তাহা লইয়া ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যেমনঃ অধিকাংশ ওলামায় কিরাম মহররম মাসের দশ তারিখে আশুরার দিন বলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কিছু সংখ্যক ওলামা বলেন যে, আশুরাহ হইল এগার তারিখ। আবার ওলামাদের একটি দল হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসের মর্মানুযায়ী বলেন যে, আশুরাহর দিনটি মহররমের নবম তারিখ।

প্রথম পর্ব

সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

জুমআর দিন (শুক্রবার)-এর ফজীলত

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্য ধাবিত হও। আর তোমরা বেচা-কেনা (ও কাজ-কর্মসমূহ) বন্ধ করিয়া দাও। তোমাদের জ্ঞান থাকিলে ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, হে মুমিন মুসলিমগণ! তোমরা যাহারা তাউহীদে ইলাহীর উপরে আস্থা আনিয়াছ ও আল্লাহ্তায়ালাকে লা-শারীক বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ, জুমআর দিন যখন তোমাদেরকে জুমআর নামায আদায়ের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় বেচা-কেনা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ-কর্ম স্থগিত করিয়া নামায আদায়ের জন্য ধাবিত হও। যদি তোমরা সত্যিকারভাবে জ্ঞানী হইয়া থাক। তবে জানিয়া লও যে, তোমাদের ব্যবসায় ও অন্যান্য কাজ-কর্ম হইতে নামায অত্যুৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল অর্থাৎ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, ইয়াহুদীগণ তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের সাথে এইভাবে গর্ব করিত যে, (ক) আমরা আল্লাহ্ পাকের অধিক প্রিয় কিন্তু তোমরা তেমন নও। (খ) আমাদের আসমানী কিতাব আছে কিন্তু তোমাদের কোন কিতাব নাই এবং (গ) আল্লাহ্তায়ালা রবিবারকে আমাদের জন্য সাপ্তাহিক বোযর্গ দিনরূপে ধার্য করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তোমাদের জন্য এমন কোন দিনকে করা হয় নাই।

ইয়াহুদীদের এই গর্বকে খর্ব করিয়া দিতে আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

জুমআর ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

আলা ইবনে আবদুর রহ্মান তাহার পিতার নিকট হইতে, তাঁহার পিতা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার যে অপূর্বভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, সেইভাবে আর কোনদিন হয় না। কেবলমাত্র মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টিই শুক্রবারকে ভয় করিয়া থাকে।

প্রত্যেক মসজিদের প্রত্যেক দরজার সম্মুখে দুইজন করিয়া ফিরেশতা দাঁড়াইয়া থাকেন এবং তাহারা মসজিদে আগমনকারীদের পুণ্য বন্টন করেন। সর্বপ্রথম আগমনকারীকে উষ্ট্র কোরবানী করার, দ্বিতীয় আগমনকারীকে গরু কোরবানী করার, তৃতীয় আগমনকারীকে ছাগ কোরবানী করার, চতুর্থ আগমনকারীকে মুরগী কোরবানী করার এবং পঞ্চম আগমনকারীকে ডিম কোরবানী করার সমান পুণ্য বন্টন করেন। ইমাম যখন খুৎবাহ পাঠ আরম্ভ করেন, তখন ফিরেশতাগণ তাহাদের দফতর বন্ধ করিয়া রাখেন।

আবু সালমাহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সমস্ত দিন অপেক্ষা শুক্রবার দিন অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্তায়ালা এই দিন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার এই দিনই তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দান করিয়াছেন এবং

শুক্রবারই আবার তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছেন। শুক্রবারই আল্লাহ এই জাহানকে ধ্বংস করিবেন। শুক্রবার দিন এমন একটি সময় আছে যে, অনুসন্ধানকারী মু'মিন ব্যক্তি ঐ সময় আল্লাহর নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করে, তাহাই লাভ করে। আবু সালমাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালমাহ বলেন, ঐ সময়টিকে আমরা জানি, উহা হইল, শুক্রবারের শেষ প্রহর। এই সময়ই আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মানযার বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার অন্যান্য দিনের সর্দার। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এই দিন আল্লাহতায়ালার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এমন কি ঈদের দিন অপেক্ষাও ইহা বেশী বোযর্গ।

আল্লাহতায়ালা শুক্রবারকে পাঁচটি বোযর্গী দান করিয়াছেন। যথা ঃ

(১) এই দিনে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(২) এই দিনে তাঁহাকে দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে।

(৩) আবার এই দিনই তিনি নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(৪) এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন আল্লাহর নিকট মু'মিন বান্দা যাহা কিছু প্রার্থনা করে, তাহাই লাভ করে। অবশ্য কোন হারাম বস্তু চাহিলে আল্লাহ তাহা দান করেন না।

(৫) এই দিনেই এই বিশ্ব জাহান লয়প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহর মুকাররব (সান্নিধ্য প্রাপ্ত) ফিরেশতাগণ সকলেই এই দিন আল্লাহতায়ালাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন। এমন কোন কিছুই নাই যাহারা বিশ্বপালক আল্লাহকে এই দিন ভয় না করে। এমন কি এই দিন আসমান-যমিনও আল্লাহর ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

আবু নসর তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পিতা বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার শয়তান এবং তাহার দল-বল একত্রিত হইয়া ঝাণ্ডা হাতে লইয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া খুব শান-শওকতের সাথে বাজারের রাস্তায় লোকদিগকে ধোকা দিতে থাকে। ফিরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া আগন্তুক মুসল্লিদের নামে পুণ্য লিখিতে থাকেন। যাহারা নামাযের স্থানে যায়, তাহাদের নামেও পুণ্য লিখেন। যখন ইমাম খুৎবাহ পাঠ আরম্ভ করেন, তখন লোকগণও খুৎবাহ শুনিতে শুরু করে। যে ব্যক্তি ইমামের সামনে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খুৎবাহ শ্রবণ করে এবং কোনরূপ অযথা কথাবার্তা না বলে, সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হয়।

আর যে ব্যক্তি ইমামের নিকট হইতে দূরে বসিয়া নীরবে একাগ্রতার সাথে খুৎবাহ শ্রবণ করে, সে এক গুণ ছওয়াব লাভ করে। আর যেই ব্যক্তি ইমামের নিকট বসিয়াও বেহুদা কথা-বার্তা বলে, মনোযোগের সহিত খুৎবাহ শ্রবণ না করে, সে পুণ্যের পরিবর্তে দ্বিগুণ পাপের ভাগী হয়। আর যে ব্যক্তি ইমামের দূরে বসিয়া এইরূপ করে, সে এক গুণ পাপের ভাগী হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যকে বলে, চুপ থাক, কথা বলিও না, সেই ব্যক্তিও বাক্যোচ্চারণকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে এবং জুমআর পুণ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এই কথা হুযুর (দঃ)-এর মুখে বলিতে শুনিয়াছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জুমআর দিন ইমাম যখন খুৎবাহ পাঠ করেন, তখন কোন মুসল্লি যদি তাহার পার্শ্ববর্তী মুসল্লিকে চুপ থাকিতে বলে, তবে তাহাও অযথা বাক্যের মধ্যে গণ্য হইবে।

আমর ইবনে শোআএব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে. হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার দিন ফিরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুকদের নাম লিখিতে থাকেন। ইমাম সাহেব আগমন করার সাথে সাথেই তাহারা তাহাদের দফতর বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর ফিরেশতাগণ বলেন, অমুক ব্যক্তি আজ কেন আসিল না? তবে কি সে অসুস্থ? তারপর ফিরেশতাগণ

আল্লাহর দরবারে দোয়া করে, হে মাবুদ! অমুক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া থাকিলে তাহাকে আরোগ্য করিয়া দাও। আর সে অন্যায় পথ অবলম্বন করিলে তাহাকে সরল সঠিক পথে ফিরাইয়া দাও।

হযরত জাফর হযরত সাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, স্বর্ণের কলম এবং রৌপ্যের পাত সহকারে ফিরেশতাগণ আল্লাহর নিকট উপস্থিত আছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ও রাতে জামাতের সাথে নামায আদায় করে, ফিরেশতাগণ স্বর্ণের কলম দিয়া রৌপ্যের পাতে তাহাদের নাম লিখিয়া রাখেন।

আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি আবু জোবায়ের হইতে এবং তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার প্রতি জুমআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু অসুস্থ, মুসাফির, মহিলা, নাবালেগ ও গোলামের প্রতি ওয়াজিব নহে। আর যে ব্যক্তি খেল-তামাসা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জুমআর নামায আদায় করা হইতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাহার প্রতি বেপরওয়া থাকেন। কেননা আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসনীয়।

আবুল জাআদ জামীরী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া কিংবা অবজ্ঞা করিয়া জুমআর নামায আদায় না করে, আলাহ তাহার অন্তরে সীলমোহর করিয়া দেন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হুযুরে পাক (দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া এরশাদ করিতেছিলেন, হে লোক সকল! মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। বেশী সংখ্যায় যিকির কর, নেককারে পরিণত হও। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বেশী পরিমাণে ছদকা প্রদান কর। তাহাতে পুণ্যের অধিকারী হইতে পারিবে।

স্মরণ রাখিও, জুমআর নামায আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরজ করিয়াছেন, ইমাম ভাল হউক বা মন্দ হউক, সেজন্য কেহ জুমআর নামায পরিত্যাগ করিলে আল্লাহ তাহাকে হয়রান-পেরেশান করেন। তাহার কোন কাজেই বরকত দেখা যায় না। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি উপরোক্ত কারণে জুমআর নামায পরিত্যাগ করে, তাহার নামায দুরস্ত হইবে না, অজু ঠিক হইবে না এবং হজ্জ ও যাকাত আল্লাহ গ্রহণ করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি তাওবাহ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজেই সে বরকত পাইবে না। সরলান্তঃকরণে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহা কবুল করেন। মনে রাখিও কোন রমণী কোন পুরুষের, গ্রাম্য আরব মুহাজিরের এবং ফাসেক মুমিন ব্যক্তির ইমাম যেন না হয়। অবশ্য অত্যাচারী বাদশাহ ইমাম হইতে পারে।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা রোজ কিয়ামতে সমস্ত দিনকেই তাহাদের আপনাপন রূপে উঠাইবেন। কিন্তু শুক্রবার দিনটিকে অধিক উজ্জ্বলময় করিয়া উঠানো হইবে। সে মানুষকে আলো দান করিবে এবং নব বধূর মত সাজিয়া-গুজিয়া থাকিবে। উহার দেহ হইতে কস্তুরীর সুঘ্রাণ আসিবে। জ্বিন ও মানবগণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে শুক্রবারের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। এইরূপ শান শওকতের সহিত সে বেহেশতে চলিয়া যাইবে। যে সকল মুয়াযযিন শুধু ছওয়াবের আকাঙক্ষায় আযান দিয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই শুক্রবারের সঙ্গী হিসাবে বেহেশতে যাইতে পারিবে।

আবু নসর সাবেত বানানী হইতে, সাবেত বানানী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা প্রত্যহ ছয় ব্যক্তিকে দোজখের আগুন হইতে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। আর জুমআর দিনের চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেক ঘন্টায় ছয় লাখ করিয়া পাপীকে মুক্তি প্রদান করেন—যাহারা সকলেই দোজখে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা আবু দারদা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে জুমআর নামায আদায় করে, সে একটি মকবুল হজ্জের ছওয়াব লাভ করে, আর যদি শুক্রবার জামাতের সাথে একই মসজিদে আছরের নামায আদায় করে,

তবে এক ওমরার ছওয়াব লাভ করে। আর মাগরিবের নামাযও যদি সেই মসজিদে জামাদের সাথে আদায় করে, তবে সে আল্লাহর নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই লাভ করিবে।

আবু ইমামাহ্ বাহেলী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ্ শুক্রবার রোযা রাখিলে, জামাতের সাথে নামায আদায় করিলে, জানাযায় শরীক হইলে, দান খয়রাত করিলে, কোন রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে এবং কোন বিবাহ্ মজলিসে যোগদান করিলে সে অবশ্যই বেহেশতবাসী হইবে।

আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, পিতা আমর ইবনে শোআয়েব হইতে, তিনি তাঁহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার লোক জুমআর নামাযে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথম প্রকার শুধু লোক দেখানো নামাযী। তাহারা কোন প্রকার পুণ্য লাভের অধিকারী হয় না। দ্বিতীয় প্রকার লোক, যাহারা সরল প্রাণে দোয়া করিতে আসে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন। প্রার্থনা না করিলে কিছু পায় না। তৃতীয় প্রকার লোক, যাহারা চুপ করিয়া থাকে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া লাফাইয়া সামনে যায় না বা কাহাকেও ক্লেশ দান করে না। ইহাদের কাজ আগামী জুমআ পর্যন্ত গুনাহর কাফফারা রূপে পরিগণিত হয় এবং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের কাফফারা রূপেও গণ্য হইয়া থাকে।

আর এক হাদীসে রহিয়াছে, মানুষ এবং জ্বিন ব্যতীত এমন কোন জীব-জন্তু নাই যাহারা শুক্রবারে কিয়ামত হইবে বলিয়া উহাকে ভয় না করে। সেইদিন স্থলচর এবং শূন্যমণ্ডলবাসী সমস্ত জীব একত্রিত হইয়া পরস্পরকে সালাম করে ও বলাবলি করে যে, আজ পবিত্র দিন। এক বর্ণনায় আছে যে, শুক্রবার ব্যতিরেকে অন্য সব দিনই দোজখকে তপ্ত করা হয়। এই কারণেই শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিনে একবারে দ্বিপ্রহরে নামায না পড়িয়া একটু বিলম্ব করিয়া পড়িতে হয়। পক্ষান্তরে শুক্রবার সর্বসময়ই নামায পড়া যায়।

নামাযের জন্য প্রস্তুতি : আবু ছালেহ্ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন গোসল সমাধা করিয়া প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে হাজির হয়, সে একটি উট কোরবানী করার পুণ্যার্জন করে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ে মসজিদে প্রবেশকারী যথাক্রমে একটি গরু, একটি বকরী, একটি মুরগী এবং একটি ডিম কোরবানী করার পুণ্য অর্জন করে। ইমাম খুৎবাহ্ পাঠ আরম্ভ করিলে ফিরেশতাগণ হাজির হইয়া খুৎবাহ্ শ্রবণ করিতে থাকেন। যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে উহার মধ্যে প্রথম সময় (বা পর্যায়) ফজরের নামাযের পর। দ্বিতীয় সময় (বা পর্যায়) সূর্য উদিত হওয়ার কিছু সময় পর। তৃতীয় সময় (বা পর্যায়) সূর্যের তাপে যখন বালুকা গরম হইয়া উঠে তখন। চতুর্থ সময় (বা পর্যায়) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পূর্বে এবং পঞ্চম সময় (বা পর্যায়) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পর।

নাফে' হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবার গোসল করে, আল্লাহ্ তাহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়া তাহাকে বলেন, তুমি এখন হইতে আবার নূতন করিয়া পুণ্যের কাজ আরম্ভ কর। আর এক বর্ণনায় আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার গোসল করে, কিংবা অন্যকে গোসল করানোর পর কোন প্রকার বাজে কথা না বলিয়া মসজিদে ইমামের কাছে চলিয়া যায়। সে ব্যক্তি এক বৎসর রোযা এবং এক বৎসর নামাযের ছওয়াব লাভ করে।

অন্য হাদীসে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার স্ত্রীকে গোসল করায় সেও উল্লিখিত রূপ ছাওয়াব পাইয়া থাকে। এখানে গোসলের অর্থ হইল স্ত্রী সহবাস করা। কেননা বোযর্গ লোকগণ শুক্রবার দিন স্ত্রী সহবাস করাকে মুস্তাহাব বলিয়া থাকেন। উক্ত বোযর্গগণ অত্র

হাদীসের মর্মানুসারে ঐরূপ বলিয়াছেন এবং বিভিন্ন বোযর্গ ব্যক্তি উক্ত হাদীসের উপর আমলও করিতেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রার বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) আমাকে বলিলেন যে, আবু হোরায়রা! প্রত্যেক জুমআর দিন অবশ্যই গোসল করিবে। এমনকি পানির অভাবজনিত কারণে যদি তোমাকে জুমআর দিনের খোরাকের বিনিময়েও পানি সংগ্রহ করিতে হয়, তবুও গোসল করিবে। অধিকাংশ ফোকাহাই জুমআর দিনের গোসলকে মুস্তাহাব বলিয়া থাকেন।

দাউদ (রহঃ) বলেন যে, শুক্রবার দিন গোসল করা ওয়াজিব। জুমআর নামায আদায়কারী কখনও গোসল পরিত্যাগ করিবে না। গোসল করার সময় হইল ছোবহে ছাদেক শুরু হওয়ার পর। গোসলের পরই মসজিদে যাওয়া উত্তম। ঐ সময় হইতে জুমআর নামায পর্যন্ত পবিত্রতা বজায় রাখা চাই। গোসল করার সময়ে আল্লাহর আনুগত্যের নিয়ত করিবে। নাপাকী অবস্থায় ভোর হইয়া গেলে প্রথমে অজু করতঃ পরে গোসল করিবে। এই দিন ভোরে নখ কাটিবে, শরীরের দুর্গন্দ দূর করিবে। সাদা পোশাক পরিধান করিবে। মাথায় পাগড়ী বাঁধিবে। হাদীসে আসিয়াছে, মাথায় পাগড়ী বাঁধিলে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করেন। গোসল করিয়া পোশাকাদি পরিয়া শরীরে রংবিহীন সুঘ্রাণ লাগাইয়া খুব বিনয়-নম্রভাবে মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা করিবে। পথে ইস্তেগফার পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে।

গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ে এইরূপ নিয়ত করিবে যে, আমি আমার মহান প্রভুর সমীপে গমন করিতেছি। আল্লাহর ফরজ আদায়ের নিয়ত করিবে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশাও মনে পোষণ করিবে। মসজিদে অবস্থান করা পর্যন্ত কোন প্রকার দুনিয়াবী কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে লিপ্ত হইবে না। বহু সংখ্যায় দরূদ ও অজিফা কালাম পাঠ করিবে। জুমআর নামায শেষ হইবার পর আছর পর্যন্ত এলেম চর্চার মজলিসে যোগদান করিবে। আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত দোয়া, দরূদ, তসবীহ-তাহলীল পাঠ করিবে এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি দুইশত বার পড়িবে ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَىٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ী অইউমীতু ও হুয়া হাইয়্যু ল্লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু অ হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে একশত বার ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহিল আজীমি অবিহামদিহী।

নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে একশত বার ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ *

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন।

তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে একশত বার ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা অ রাসূলিকান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে একশত বার ঃ

وَاَسْتَغْفِرُاللّٰهُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْاَلُهُ التَّوْبَةَ *

উচ্চারণ ঃ অসতাগফিরুল্লাহুল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম অ আসয়ালুহুত তাওবাতা।

তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে একশত বার ঃ

وَمَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ অমাশায়াল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার দোয়া মোট সাতশত বার পাঠ করিবে। কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম এই দোয়াসমূহ প্রত্যহ বার হাজার বার পাঠ করিতেন এবং কোন কোন তাবেয়ী ইহা রোজ ত্রিশ হাজার বার করিয়া পাঠ করিতেন। তাহারা নামায ও তাসবীহ্ পাঠকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করিতেন বলিয়াই এইভাবে এত বেশী সংখ্যায় ইহা পাঠ করিতেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমাদেরও চেষ্টা করা উচিত, যেন তোমরাও ঐরূপ সৌভাগ্যবান হইতে পার এবং তোমাদের নাম বঞ্চিতদের মধ্যে লিপিবদ্ধ না হয়। তোমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ কর, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে স্মরণ করিবেন। মুমিনগণই প্রথম আল্লাহকে স্মরণ করে, পরে আল্লাহ তাহাদেরকে স্মরণ করেন। তোমরা কেহই লোক ডিঙ্গাইয়া কখনও নামাযের সামনের কাতারে যাইবার চেষ্টা করিবে না। অবশ্য ইমাম এবং মুয়াযযিনের কথা ভিন্ন।

হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি সকলকে ডিঙ্গাইয়া সামনের কাতারে যাইতেছে। হুযুর (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন আমাদের সহিত জুমআর নামায আদায় কর নাই? সেই ব্যক্তি বলিল, আপনি কি আমাকে নামায পড়িতে দেখেন নাই? হুযুর (দঃ) বলিলেন, আমি তো দেখিলাম, তুমি সকলের শেষে আসিয়া অন্যকে ক্লেশ দান করিলে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে (অর্থাৎ লোকের মাথার উপর দিয়া সামনে যাইবার চেষ্টা করিবে) সে রোজ কিয়ামতে দোজখের উপর একটি পুল স্বরূপ হইবে। তাহার উপর দিয়া লোকগণ গমন করিবে এবং সে লোকের পদতলে পিষ্ট হইবে। কোন নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়া অপেক্ষা চল্লিশ বৎসর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করা উত্তম।

কাহাকেও কখনও তাহার বসার স্থান হইতে উঠাইবে না বা অণ্যের বসিবার স্থানে নিজে বসিবে না। হুযুরে পাক (দঃ) এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সামনে অবশ্য খালি জায়গা থাকিলে সেখানে যাইবে। যদি অন্যের কোনরূপ কষ্ট না হয়, তবে সম্মুখস্থ খালি জায়গায় গিয়া বসিতে পারে। যথাসম্ভব ইমামের নিকট বসিতে চেষ্টা করিবে। ইমাম খুৎবাহ পাঠের সময়ে সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। কোন প্রকার কথা-বার্তা বলিলে গুনাহগার হইবে।

জুমআর দিনের মরতবা ও বোযর্গী

শায়খ আবু নসর হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একবার ফিরেশতা জিব্রাইল একটি সাদা পালক হাতে আমার নিকট আগমন করেন। উক্ত পালকের গায়ে একটি কাল দাগ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার হাতে এটা কি? তিনি জবাবে বলিলেন, ইহা শুক্রবার। এই দিনের মধ্যে আপনার জন্য বহু পুণ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল দাগ কেন? জিব্রাইল বলিলেন, ইহা কিয়ামত।

অর্থাৎ শুক্রবারই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। শুক্রবার অন্যান্য সমস্ত দিনের নেতা। আমাদের ভাষায় আমরা এই দ্বীনকে মজীদ বলিয়া থাকি।

আমি আরজ করিলাম, এই দিনের নাম, শুক্রবার কেন রাখা হইল? হুযুরে পাক (দঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহতায়ালা বেহেশতের মধ্যে একটি মরুদ্যান তৈয়ার করাইয়াছেন। ইহার রং বরফের মত শুভ্র এবং কস্তুরী অপেক্ষা সুঘ্রাণময়। শুক্রবার আল্লাহতায়ালা আরশে মুআল্লা হইতে সেখানে আগমন করেন এবং রক্ষিত কুরসীতে উপবেশন করিয়া মজলিশ করেন। সেই কুরসীর পার্শ্বে রক্ষিত কুরসী ও মিম্বরে আম্বিয়াগণ তাহাদের পদ-মর্যাদা অনুসারে উপবেশন করেন। জাওয়াহের দ্বারা সুসজ্জিত মিম্বারে সিদ্দীক ও শহীদগণ উপবেশন করেন। তারপর উপবেশন করেন বেহেশতের মহলবাসীগণ।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিবেন, আমি এমন পবিত্র সত্তা, যিনি তোমাদের উপর তাহার রহমত দান করিয়াছেন, তিনি তাহার রহমতের পাশে তোমাদিগকে স্থান দিয়াছেন। তোমাদের যাহা কিছু চাহিবার আছে, তাহা চাহিয়া লও। তাহারা বলিবেন, আমরা উপস্থিত সকলেই তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থী। ইহাছাড়া আর কিছুই চাহি না। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আমার সন্তুষ্টিই তোমাদিগকে এই সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। এখন তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। এই আদেশ পাওয়ার পর তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত আকাঙিক্ষত বস্তু আল্লাহর নিকট চাহিয়া লইবে।

মোট কথা জুমআর পরিবর্তে আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেন, সে সম্পর্কে কেহ ধারণাই করিতে পারিবে না।

এই অকল্পনীয় উপঢৌকন ও পুরস্কারসহ মহলবাসীগণ আপনাপন মহলে প্রত্যাবর্তন করিবে। তাহাদের মহলগুলি শ্বেত বর্ণের মোতি, লাল বর্ণের ইয়াকুত এবং সবুজ বর্ণের যমরুদ পাথরে তৈরী। উহার কোথাও কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা টুটা-ফাটা নাই। কখনও মেরামতের প্রয়োজন হইবে না। মহলগুলির মধ্য দিয়া ঝর্ণা-ধারা প্রবাহিত। স্থানে স্থানে তৃণ গুল্মের কুঞ্জ অবস্থিত। বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখাগুলি ফল ভারে নুজ। বেহেশতীদের স্ত্রীগণ কেদারায় বসিয়া তাহাদের যৌবন ও সৌন্দর্যালোকে চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া রাখে। নির্দেশ পালনার্থে সুন্দর খাদেমগণ সদা-সর্বদা নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে। জুমআর নামায আদায়কারীগণ এইসব নিয়ামতের অধিকারী হইবে।

শায়খ আবু নসর হযরত আলী (রাঃ) হইতে সনদ পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শক্রবার দিন ফিরেশতা জিব্রাইল কাবা গৃহে আগমন করিয়া নিজের পতাকা প্রোথিত করেন। তারপর স্বর্ণের কলম দ্বারা রৌপ্যের পাতে আগন্তুকদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথম লিখেন। তারপরে আগমনকারীর নাম লিখেন। এইভাবে সত্তর ব্যক্তির আগমনের পর দফতর গুটাইয়া রাখেন। সকাল হইতে যে সত্তর ব্যক্তি আগমন করে, তাহারা এমন মর্যাদা সম্পন্ন হইবে যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার সম্প্রদায়ের সত্তর ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়াছেন। আর এই সত্তর ব্যক্তি প্রত্যেকেই নবী ছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাগণ নামাযের কাতারে গিয়া মুসল্লিদেরকে খোঁজ করিতে থাকেন।

একজন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তাহাকে দেখিতেছি না কেন? অন্যজন বলেন, সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে রহমত করুন, যে জুমআর নামায পড়িত। একজন আবার জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তাহাকেও সে দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়জন বলেন, সে পীড়িত। তখন সকল ফিরেশতা বলেন, আল্লাহ তাহার রোগারোগ্য করুন। সে জুমআর নামায আদায়কারী। জুমআর নামায তাহার খুবই প্রিয়।

জুমআর দিনের দোয়া কবুলিয়তের সময়

জুমআর দিনে এমন একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন আল্লাহর নিকট কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাহা মঞ্জুর করেন।

শায়খ আবু নসর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একবার তুর পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, কাব আহবারও সেখানে উপস্থিত। আমি তাঁহাকে একটি হাদীস পড়িয়া শুনাইলাম। তিনিও আমাকে তাওরাতের কিছু অংশ পড়িয়া শুনাইলেন। উক্ত বিষয়বস্তুতে আমরা কেহই কোন মতানৈক্য করিলাম না। আমি তাঁহাকে এই হাদীস শুনাইয়াছিলাম, শুক্রবারে এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে কোন ব্যক্তি নামায পড়িয়া আল্লাহর নিকট কোন নেক প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাহা কবুল করেন। কাব ইবনে আহবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসরে একবার? আমি বলিলাম, না, প্রত্যেক শুক্রবার আমাদের নবী (দঃ) এইরূপই বলিয়াছেন। কাব অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা অবনত করিয়া রাখিয়া অবশেষে মস্তকোত্তোলন করতঃ বলিলেন, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন এই সময় সম্বন্ধে হুযুর (দঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। শুক্রবার সমস্ত দিনের সর্দার। উহা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় দিন।

শুক্রবার আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইদিনে তাঁহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়াছেন। আবার এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। শুক্রবার দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে। আল্লাহর সৃষ্টিকুল এই দিনে যাহা আবির্ভূত হইবে, তাহার অপেক্ষায় আছে। সকলেই ঐ ক্ষণটির আশায় কান পাতিয়া আছে। কেবলমাত্র মানব ও জ্বিন জাতি ছাড়া ঐ ব্যাপার সম্পর্কে অসতর্ক নয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তুর পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে ঘটনাটি সুবিস্তৃতভাবে বলায় তিনি বলিলেন, কাব মিথ্যাবাদী। হুযুরে পাক (দঃ) যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, উহা তাওরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে। আমি বলিলাম, কেন, তিনি তো এই হাদীসের বিরোধিতা করেন নাই? তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন, হাদীসে যেই সময়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমি জানি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কখন সেই সময় তিনি বলিলেন, শুক্রবারের শেষ সময়। আমি বলিলাম, শেষ সময় কিভাবে হইতে পারে? হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি, এই সময় যেন কোন মুমিন বান্দা নামায না পড়ে। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তুমি কি আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর এই বাণী শুন নাই যে, কোন ব্যক্তি যদি ফরজ নামায আদায়ের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষা করাই তাহার নামাযের মধ্যে পরিণত হয়। আমি তখন বলিলাম, হুযুর (দঃ) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সঠিক।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার এমন একটি সময় আছে, যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহর নিকট ন্যায়সঙ্গত কোন কিছু প্রার্থনা করিলে তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া থাকে।

শায়খ আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, তাহার পিতা বলেন যে, হযরত ফাতিমা জোহরা (রাঃ) মারজানার নিকট বলিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার এমন একটি সময় আছে, যখন কোন বান্দা আল্লাহর নিকট তাহার ভাল কোন কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহতায়ালা তাহা তাহাকে অবশ্যই প্রদান করেন। আমি তখন আরজ করিলাম, উহা কোন সময়? হুযুর (দঃ) জবাব দিলেন, যখন সূর্যের অর্ধাংশ ডুবিবার পথে।

মারজানা বলেন, হযরত ফাতিমা (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ)—এর উক্ত এরশাদ মুতাবেক জুমআর দিন স্বীয় খাদেম যায়েদকে এই নির্দেশ করিতেন যে, যেন একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করিয়া বিদায়মান সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকে, যখন দেখিবে সূর্যের অর্ধাংশ পরিমাণ অস্তমিত হওয়ার পথে তখন সে

...তাহা সাথে সাথে অবহিত করে। হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর এই নির্দেশ প্রত্যেক শুক্রবারই ...লাম যায়েদ যথাযথভাবে পালন করিতেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়টির কথা অবহিত করা মাত্র হযরত ...তিমা (রাঃ) তাড়াতাড়ি উঠিয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন। সূর্য অস্ত যাইবার পর তিনি নামায ...দায় করিতেন।

...ছীর ইবনে আবদুল্লাহ তাহার মাতার বর্ণনা এবং তিনি তাহার বর্ণনা নকল করিয়া বলেন যে, হুযুরে ...াক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার এমন একটি সময় আছে, যখন বান্দা আল্লাহর দরবারে ...হা কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহা মঞ্জুর করেন। হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! সে সময়টি কখন? হুযূরে পাক (দঃ) জবাব দিলেন, নামাযের শুরু হইতে ...হা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

...ছীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নামাযের অর্থ এখানে জুমআর নামায।

...খ আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবের ইবনে ...বদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে নিম্নোক্ত দোয়াটি হুযুরে পাক (দঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। ...রে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে জুমআর দিনের সেই নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত দোয়াটি পাঠ ...রিয়া মাশরেক হইতে মাগরেব পর্যন্ত অর্থাৎ দুনিয়ার যে কোন স্থানের যে কোন জিনিস আল্লাহর ...কট প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ তাহা প্রদান করেন। দোয়াটি এই ঃ

سُبْحَانَكَ لَاإِلٰـهَ إِلَّا أَنْتَ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ يَابَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ *

...চারণ ঃ সুবহানাকা লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া বাদীআস সামাওয়াতি ...ল আরদ্বি ইয়া যাল জালালি অল ইকরাম।

...কওয়ান ইবনে সালীম বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে শুক্রবার দিন ইমাম মিম্বরে আরোহণকালে যে ...ক্তি পাঠ করে ঃ

لَاإِلٰـهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

...চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শরীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ী ...ইউমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর—তাহাকে আল্লাহ মার্জনা করিয়া দেন।

...রত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিতেন, ...জান মাসের জুমআর দিনের ফজীলত রমজানের অন্যান্য দিন অপেক্ষা এইরূপ বেশী, যেমন ...জান মাসের ফজীলত অন্যান্য মাসের উপর।

শুক্রবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম

...বু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ...রে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার আমার উপর অধিক সংখ্যায় দরূদ পাঠ কর। কেননা এই দিন যে ব্যক্তি ছওয়াবের কাজ করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়। হুযুর (দঃ) আরও ...শাদ করিয়াছেন, আমার জন্য বেহেশতের উসিলার দরজার দোয়া কর। লোকগণ জিজ্ঞাসা ...রিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই উসিলার দরজা কি? হুযুর (দঃ) বলিলেন, বেহেশতের সমস্ত ...জা অপেক্ষা এই দরজা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এই দরজা নবী ছাড়া আর কেহই পাইবে না। আশা ...রি আল্লাহ আমাকে এই মর্যাদা দান করিবেন।

...ম্মদ ইবনে মুনকাদির হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি আযান ...তখন তাহার এই দোয়া পড়া কর্তব্য।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতি ত্তাম্মাতি আছ্ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদিনিল অসীলাতা অল ফাজীলাতা অদ্দারাজাতার রাফীআতা অব আছহু মাক্বামাম্ মাহমুদানিল্লাযী অ আদতাহ।

হুযুর (দঃ) বলেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য আমার সুপারিশ হালাল (নছীব) হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জুমআর দিন রাত্রে অধিক সংখ্যায় আমার জন্য দোয়া কর এবং দরূদ পাঠ কর। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার আমার উপর আশিবার দরূদ পাঠ করে; আল্লাহ তাহার আশি বৎসরের পাপ মাফ করিয়া দেন। আমি জিজ্ঞসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করিতে হইবে? হুযুরে পাক জবাবে বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা অ রাসূলিকা নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

মাকহুল শামী আবু ইমামাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার অধিক সংখ্যায় আমার জন্য দরূদ পাঠ কর। কেননা এই দিন আমার উম্মতের দরূদ আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। অতএব যে ব্যক্তি শুক্রবার অধিক সংখ্যায় দরূদ পাঠ করিবে সে কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটবর্তী থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা হুযুরে পাক (দঃ) আমার হাত ধরিয়া এরশাদ করিলেন, আল্লাহতায়ালা শনিবার মাটি, রবিবার পাহাড়, সোমবার বৃক্ষরাজি, মঙ্গলবার খারাপ বস্তুসমূহ, বুধবার ভাল বস্তুসমূহ, বৃহস্পতিবার চতুষ্পদ জন্তুসমূহ এবং শুক্রবার আছরের বাদে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শুক্রবারের প্রত্যুষের নামায এবং মসনুন সূরাসমূহ

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) শুক্রবার ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম সিজদাহ কিংবা সূরা হাল আতা পাঠ করিতেন। আর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে যে, শুক্রবার মাগরিবের নামাযে হুযুর (দঃ) সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন। তাহাছাড়া জুমআর ফরজ নামাযেও তিনি এই সূরা পাঠ করিতেন। আর ঐদিন এশার নামাযে তিনি সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফিকুন পাঠ করিতেন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার রাত্রে এশার নামাযে যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন, সূরা হামীম এবং সূরা দুখান পাঠ করে, সে পরদিন ভোরে এমনভাবে নিদ্রা হইতে উঠে যে, তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করে, সে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যে ব্যক্তি হাজার দীনার আল্লাহর পথে দান করে।

শুক্রবার দিনে ও রাতে এইভাবে চারি রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। উহার এক রাকাতে সূরা আনআম, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাহাফ, তৃতীয় রাকাতে সূরা ত্বোয়াহা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা মূলক পাঠ করিবে।

যদি তোমরা অতি উত্তমরূপে এ সূরাগুলি পড়িতে না পার; তবে যেভাবে পার সেইভাবেই পাঠ করিবে। বর্ণিত রহিয়াছে যাহারা হাফেজে কোরআন তাহাদের উচিত শুক্রবার সমগ্র কুরআন পাঠ খতম করিবে। আর দিবাভাগে সব পড়া না হইলে বাকী অংশ রাত্রিকালে পাঠ করিবে। আর শুক্রবার দশ বিশ রাকাত নফল নামায যদি হাজার বার সূরা ইখলাস দ্বারা পাঠ করা যায় তবে তাহা দ্বারা খতমে কোরআনের ফজীলত হাসিল হয়।

এক বর্ণনায় আছে, শুক্রবার এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। এইভাবে ঐ দিন এক হাজার বার তাসবীহ পাঠ করিলেও মুস্তাহাব ইবাদাতের ছওয়াব হাসিল হয়। উক্ত তাসবীহ এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

জুমআর নামকরণের কারণ

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সালমান! বলিতে পার কি জুমআর দিনটির নাম জুমআ কেন হইল? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহা তো বলিতে পারি না। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, ঐ দিন বাবা আদম (আঃ)-এর দেহ তৈরীর খামীর (চারি উপাদানের মিশ্রিত মণ্ড) জমা (একত্রিত) করা হইয়াছিল বলিয়া ঐদিনটির নাম জুমআ রাখা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি এই দিন উত্তমরূপে গোসল এবং অজু করিয়া জুমআর নামায আদায় করে; তাহার এক জুমআ হইতে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সকল ছগীরাহ গুনাহ মার্জনা করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন আলেম বলেন যে, উক্ত নামটি (জুমআ শব্দটি) এজতেমা শব্দ হইতে উদ্ভূত। হযরত আদম (আঃ)-এর দেহের উপাদানসমূহ দ্বারা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উহার খামীর তৈরী করা হয়, তারপর একদিন ঐ খামীরের তৈরী দেহের ভিতরে তাঁহার রূহ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দিনটির নামই জুমআ রাখা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর পাজরের হাড় দ্বারা হযরত হাওয়াকে পয়দা করার পর যে দিন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মিলন হইয়াছিল, সেই দিনটিরই নাম জুমআ রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়ার দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যে দিন তাঁহারা উভয়ে আবার পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, সেই দিনটিই জুমআর দিনরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, এই দিন শহর ও গ্রামের সব লোক নামায আদায়ের জন্য একত্রিত হয় বলিয়াই দিনটিকে জুমআর দিন বলা হয়। এ ব্যাপারে আরও একটি বর্ণনা এইরূপ আছে যে, এই দিনটিতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াই ইহার নাম ইয়াওমে জুমআ রাখা হইয়াছে। কেননা কিয়ামতের দিনটিকে একত্রিত হওয়ার দিন নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ *

অর্থাৎ—যে দিন তোমাদেরকে সমবেত করার জন্য একত্রিত করা হইবে।

তাওবাহ ও তাওবাহকারী

বরকতময় মাসগুলির রোযা, নামায, কোরবানী ইত্যাদি নেক কাজসমূহের বিবরণ যাহা দেওয়া হইল, তাহা বাদে আরও অন্যান্য মাস ও দিনের নেক কাজের বিবরণ আমরা সম্মুখে উল্লেখ করিব। কিন্তু এই কাজগুলি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য যেহেতু দিলের তাওবাহ, খুলুছিয়ত এবং রিয়া (লোক দেখানো) বিমুক্তির একান্ত প্রয়োজন, তাই এখানে উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা অগ্রে করিয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

তাওবাহর বর্ণনা এই কিতাবের প্রথম খণ্ডে অবশ্য প্রদান করা হইয়াছে। তবু তদসম্পর্কিত আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেছি।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাওবাহকারীকে ভালবাসেন এবং তিনি গুনাহ হইতে পবিত্র লোককেও ভালবাসিয়া থাকেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় অবশ্য ব্যাখ্যাকারগণ কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন, যেমন ঃ মুকাতিল এবং কালবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা গুনাহ হইতে তাওবাহকারীকে ভালবাসেন এবং নাজাসাত, জানাবত, হায়েজ-নেফাস এবং অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলিকে গোসল ও অজুর দ্বারা দূরকারীকেও ভালবাসিয়া থাকেন।

মুজাহিদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, গুনাহ হইতে অধিক পরিমাণে তাওবাহকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গুনাহ হইতে তাওবাহ করার অর্থ হইল শিরক হইতে বিমুক্ত থাকা।

আবুল মিনহাল (রহঃ) বলেন, আমি একদিন আবুল আলিয়্যার নিকট উপস্থিত থাকাকালে তিনি অজু করিতেছিলেন। তাঁহার উত্তমরূপে অজু করা দেখিয়া আমি বলিলাম ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত্তাওয়্যাবীনা অ ইউহিব্বুল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থাৎ—নিশ্চয় আল্লাহ গুনাহ হইতে তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনকারীকেও ভালবাসেন।

তিনি আমার মুখে এ আয়াত শরীফ শুনিয়া বলিলেন, কোন বস্তু হইতে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এই কথা বলা হইয়াছে। পবিত্রতা অবশ্যই উত্তমবস্তু। তবে এ আয়াতের লক্ষ্য শুধু সেই লোকগণ, যাহারা গুনাহ হইতে (তাওবাহর মাধ্যমে) উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বন করে।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের মর্ম হইল, আল্লাহতায়ালা শিরক হইতে তাওবাহকারী ও গুনাহ হইতে পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন। তিনি আরও বলেন যে, আয়াতে কুফর হইতে তাওবাহকারী ও ঈমান দ্বারা পবিত্রতা লাভকারীদের কথা বলা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, গুনাহ হইতে তাওবাহকারী সেই ব্যক্তি, যে একবার গুনাহ করিয়া তাওবাহ করিয়া দ্বিতীয়বার আর গুনাহর দিকে ধবিত হয় না। আর গুনাহ হইতে পবিত্র সেই ব্যক্তি, যাহার দ্বারা কোন গুনাহর কার্য অনুষ্ঠিত না হয়। কেহ বলেন যে, আয়াতের লক্ষ্য কবীরাহ গুনাহ হইতে তাওবাহকারী এবং ছগীরাহ গুনাহ হইতে পবিত্রতা অবলম্বনকারী। কেহ কেহ আবার এরূপও বলেন যে, আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল লোকের কথা, যাহারা কু-কাজসমূহ হইতে তাওবাহ করিয়াছে ও কুবাক্য হইতে পরহেজ করিয়াছে। আর একটি ব্যাখ্যা এইরূপও করা হইয়াছে যে, আয়াতে বলা হইয়াছে ঐ সকল লোকের কথা যাহারা গুনাহ হইতে তাওবাহ করিয়াছে ও জুলুম-অত্যাচার হইতে পাক-পবিত্র আছে।

একটি অভিমত এই সম্পর্কে এইরূপ রহিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি খালেছ তাওবাহকারী যে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তাওবাহ করিয়া ফেলে।

মুহাম্মদ ইবনে মুকতাদির হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের আগেকার যমানার এক ব্যক্তি একটি খোপরির নিকট দিয়া যাইবারকালে উহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, হে মাবুদ! আপনি শুধু আপনিই আর আমি শুধু আমিই । আপনি বার বার ক্ষমা প্রদান করেন আর আমি বার বার গুনাহে লিপ্ত হই। এই কথা বলিয়াই তিনি সিজদায় পতিত হইলেন তখন আল্লাহ বলিলেন, হে আমার বান্দা! তুমি মস্তক উত্তোলন কর। ঠিকই আমি বার বার

গুনাহ্ মার্জনাকারী (তাওবাহ্ কবুলকারী) আর তুমি বার বার গুনাহ্কারী। অতঃপর লোকটি যখন সিজদাহ্ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল তখন তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইল।

ইখলাছ

কাজের ইখলাছ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُاللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

অর্থাৎ—বান্দাগণকে শুধু এইজন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা খালেছভাবে শুধু আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে।

আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَدِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ *

অর্থাৎ—আল্লাহ্র নিকট কখনও কোরবানীর গোশত এবং রক্ত পৌঁছে না কিন্তু তাঁহার নিকট পৌঁছে কেবল তোমাদের ধর্মভীরুতা।

আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ *

অর্থাৎ—আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমরা তো তাঁহার কাজ খালেছভাবে করিতেছি।

ইখলাছের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইখলাছ কি বস্তু? তিনি জবাবে বলিলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিয়াছিলাম যে, ইখলাছের প্রকৃত পরিচয় কি? হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, আমি ইখলাছ সম্পর্কে ফিরেশতা জিব্রাঈলের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জিব্রাঈল তাহার উত্তরে বলিলেন, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, উহা আমার ভেদসমূহের মধ্যে একটি ভেদ মাত্র। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহার দিলে মনে লয় আমানত স্বরূপ উহা রাখিয়া দেই।

আবু ইদরীস খুলানী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক সত্যের একটি হাকীকত রহিয়াছে। কোন বান্দাই ইখলাছের হাকীকত (প্রকৃত পরিচয়) তখন পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পরিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র খালেছ আমল করিয়া নিজের প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করাকে পরিত্যাগ করে।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, ইখলাছ হইল স্বীয় আনুগত্য ও ইবাদত খালেছ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত করা এবং আনুগত্যে আল্লাহ্র সহিত আর কাহাকেও অংশী স্থাপন না করা। তাহাছাড়া তাহার ইবাদতে প্রদর্শনেচ্ছা অর্থাৎ লোক দেখানো মনোভাব না থাকা।

হযরত ফুজাইল (রহঃ) বলেন, মানুষের উদ্দেশ্যে বা খাতিরে আমল করা শিরক এবং মানুষের খাতিরে বা উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যাগ করা রিয়া। ইখলাছ হইল অন্তর মধ্যে ঐ উভয় বস্তুর ভীতি বজায় থাকা অর্থাৎ মনের ভিতরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা যে উল্লিখিত দুইটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ কঠিন আযাব দান করিবেন।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ (রহঃ) বলেন যে, গোবর এবং রক্তের সাথে সংমিশ্রণ এড়াইয়া যেমন খাঁটি দুগ্ধকে শোষণ করিয়া লওয়া হয় ঠিক তদ্রূপভাবে আমলকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও খুঁৎ হইতে পাক-পবিত্র রাখাকেই বলে ইখলাস।

আবুল হাসান মুশানজী (রহঃ) বলেন, ইখলাছ এমন বস্তু যে, যাহার বিষয় ফিরেশতারাও জানে না, শয়তানও নষ্ট করিতে পারে না এবং কোনও মানুষও যাহার বিষয় বলিতে পারে না।

শায়খ রুইয়াম (রহঃ) বলেন যে, আমল হইতে দৃষ্টি উর্দ্ধে চলিয়া যাওয়া অর্থাৎ কাজের প্রতি দৃষ্টি না থাকাই হইল ইখলাছ।

কোন কোন ওলামা বলেন যে, আমলের মধ্যে কেবল আল্লাহকে প্রাপ্তি এবং সততা রক্ষার দৃঢ় মনোভাবই ইখলাছ।

কাহারও কাহারও মতে কোনরূপ খারাবীর মিশ্রণ এবং সিদ্ধতার অন্বেষণ মুক্ত অবস্থাই ইখলাছ। কেহ কেহ বলেন, যে আমল মাখলুকের অগোচর এবং যাবতীয় ত্রুটি বিমুক্ত তাহাই ইখলাছযুক্ত আমল।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আমল একরূপ হওয়াকেই বলা হয় ইখলাছ।

শায়খ আবু ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, যেভাবে বদ আমলসমূহ ছুপাইয়া রাখা হয়, তদ্রূপ নেক আমলসমূহও ছুপাইয়া রাখাকে ইখলাছ বলে।

সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, স্বীয় নেক আমলকে নগণ্য এবং ক্ষুদ্র মনে করাই ইখলাছ।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি বিষয় আছে, যাহাতে মুসলমানের দিলের ভিতরে অন্যথা না হওয়া চাই। উহা হইল, (ক) আল্লাহর জন্য খালেছ আমল (খ) শাসক-প্রশাসকের ভালাই কামনা এবং (গ) মুসলমানদের জমাতভুক্ত থাকা।

কাহারও কাহারও মতে ইখলাছ হইল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতে মাখলুকের খুশী মিশ্রিত না করা।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যখন পর্যন্ত ইখলাছে সত্যতা এবং দৃঢ়তা না আসে, তখন পর্যন্ত ইখলাছে পূর্ণতা আসে না।

আবু ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ নিজের ইখলাছের ভিতরে ইখলাছ দেখিবে অর্থাৎ নিজেই নিজের আমলে ইখলাছের দাবী করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সে ইখলাছ প্রকৃত ইখলাছের মুখাপেক্ষী থাকিবে।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, প্রকৃত ইখলাছের তিনটি লক্ষণ রহিয়াছে। যথা ঃ (ক) জনসাধারণের প্রশংসা ও কুৎসা আমলকারীর নিকট এক বরাবর মনে হওয়া (খ) নিজের নেক আমলসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত না করা এবং (গ) নেক আমলের বিনিময়ে পরকালে ছওয়াবের আকাঙক্ষাকে ভুলিয়া যাওয়া।

প্রকৃত ইখলাছ ঃ হযরত আবুবকর দাক্কাক (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক মুখলেছ ব্যক্তিরই স্বীয় ইখলাছের প্রতি নজর করায় ক্ষতির কারণ হয়। আল্লাহ যখন কাহারও ইখলাছকে পছন্দ করিয়া লন, তখন আমলকারীর নজর হইতে উহা সরাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ মুখলেছ তখন নিজের ইখলাছের দিকে নজরই করে না। যাহার অর্থ হইল, যে নিজের ইখলাছকে মোটে ইখলাছ বলিয়া মনেই করে না। এইভাবে যে আল্লাহর দৃষ্টিতে পছন্দনীয় বান্দায় পরিণত হয়।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, প্রকৃত মুখলেছের পরিচয় হইল, শুধু সেই ব্যক্তিই রিয়াকে চিনিতে পারে।

হযরত সাররি সাকতী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে বস্তু তাহার ভিতরে নাই বাহিরে তাহারই নমুনা দেখায়, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে হেয়রূপে পরিচিত হয়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, ইখলাছ এমন একটি গুপ্ত ভেদ যে, উহা ফিরেশতারা দেখে না যে আমলনামায় লিখিবে এবং শয়তানও দেখে না যে সে বান্দাকে উহা হইতে ফিরাইয়া রাখিবে।

সহল ইবনে আবদুল্লাহর (রহঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সর্বাপেক্ষা কঠিন বস্তু কি? তিনি

জবাবে বলিলেন, উহা ইখলাছ। ইখলাছ এমন এক বস্তু যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই ইখলাছ সম্পর্কে কোন খবর রাখে না।

কোন এক বোযর্গ বলেন, আমি এক শুক্রবার আছরের পূর্বে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহর (রহঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি তাহার হুজরার দরজায় একটি সাপ দেখিতে পাইয়া এক পা আগাইয়া আবার এক পা পিছাইয়া আসিতেছিলাম। সাপটির ভয় আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হযরত সহল (রহঃ) ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, ভয় পাইতেছ কেন? ভিতরে চলিয়া আস। আল্লাহর প্রতি যাহার বিশ্বাস অটুট, তাহাকে সব কিছুতেই ভয় করে। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জুমআর নামায পড়িতে চাও? আমি বলিলাম, আমাদের এবং জামে মসজিদের মধ্যে দূরত্ব তো প্রায় একদিন এক রাতের পথ। তিনি তখন আমাকে হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চলিলেন। আমরা কিছু দূর চলিবার পরই জামে মসজিদ আমাদের সামনে দেখা গেল। আমরা মসজিদে জুমআর নামায আদায় করিলাম। নামাযান্তে বাহিরে আসিয়া হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন এবং মসজিদ হইতে নির্গত লোকদেরকে দেখিতে লাগিলেন। এমনি সময় হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, কালেমায় তাউহীদ পাঠকারী তো বহুতই দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুখলিছের সংখ্যা খুবই কম রহিয়াছে।

ইখলাছ ও তাওয়াক্কুল ঃ গ্রন্থকার হযরত গাউছুল আজম (রহঃ) বলেন যে, একবার আমি হযরত ইব্রাহীম (রহঃ)-এর সঙ্গী হিসাবে সফর করিতেছিলাম। এক সময়ে আমরা এমন একটি স্থানে গিয়া পৌছিলাম, যেখানে অত্যধিক পরিমাণে সাপের প্রাদুর্ভাব ছিল। হযরত ইব্রাহীম (রহঃ) ঐ জায়গাটিতেই গতিরোধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর ঐ স্থানেই রাত্রি যাপন করার মনস্থ করিলেন। রাত্র আসিবার পর দেখা গেল, চারিদিক হইতে সাপ বাহির হইয়া আসিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া আমি হযরত ইব্রাহীম (রহঃ)-কে জোরে আওয়াজ দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আল্লাহর যিকিরে রত হইয়া যাও। নির্দেশ মত আমি যিকিরে মগ্ন হইলাম। দেখিলাম, আগমনরত সাপগুলি পশ্চাদাপসরণ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, পুনরায় সাপগুলি আমাদের দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি আবার শায়খকে (রহঃ) আওয়াজ দিলাম। তিনিও আবার আমাকে বলিলেন, যিকিরে মগ্ন থাক। সারাটা রাত্রি আমার এইভাবেই কাটিয়ে গেল। ভোর বেলা শায়খ ইব্রাহীম (রহঃ) সেখান হইতে উঠিয়া আবার রওয়ানা হইলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। ভোরে যখন বিছানা-পত্র উঠাইয়া বাঁধা হইতেছিল শায়খের বিছানার ভিতর হইতে একটি বৃহৎ সাপ বাহির হইয়া যমিনে পড়িল। সাপটি বিছানার মধ্যে পাকাইয়া ছিল। আমি শায়খকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি হযরত! আপনি কি রাত্রে কিছু টের পান নাই? তিনি বলিলেন যে, না আমি তো রাত্রে কোন কিছুই টের পাই নাই, বরং বহুদিন পরে বিগত রাত্রটি আমার বেশ ভালই কাটিয়াছে।

অন্তরের পবিত্রতা

প্রত্যেক আবেদ এবং আরেফের সর্বাবস্থায় রিয়াকারী তথা অন্যকে প্রদর্শনেচ্ছা এবং আত্মস্বার্থ সিদ্ধির স্পৃহা হইতে বাঁচিয়া থাকা চাই। কেননা এই পাপিষ্ঠ নফস প্রত্যেক মানুষের সর্বনাশ সাধনের জন্য তাহাদের পিছনে লাগিয়া আছে। এই দুষ্ট নফস গোমরাহকারক প্রবৃত্তি ও ধ্বংসকারক লোভ-লালসার উৎস যাহা বান্দা এবং বান্দার প্রভুর মধ্যে একটি পর্দাস্বরূপ। মানুষের জীবনকাল পর্যন্তই খাহেশাতে নফসানী হইতে বাঁচিয়া থাকা খুব বেশী কষ্টকর। তাহাতে মানুষ অলী-আউলিয়া, গাওছ-কুতুব, পীর-মুর্শিদ যাহাই হউক না কেন। এই জন্যই নফসকে কঠোর শাসন দ্বারা কমজোর করিয়া রাখা চাই। যাহাতে অন্তঃকরণ যেন সদা-সর্বদাই পাক-পবিত্র থাকে।

রিয়া

আল্লাহতায়ালার ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকা ভয়ঙ্কর পাপের কার্য। ইহা শিরক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন তুল্য জঘন্য কাজ। দরবেশ বা সাধু লোকদের মনে সাধারণতঃ একমাত্র রিয়া ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধি দেখা দিতে পারে না। ইবাদাত-বন্দেগী করিবার কালে যদি মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, লোক আমার ইবাদত দেখুক। আমাকে সাধু বা দরবেশ বলুক। বোযর্গ হিসাবে আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করুক। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ধ্বংসাত্মক রিয়া তাহার হৃদয়ে আস্তানা গাড়িয়াছে। ইবাদাতের মধ্যে অপরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভের উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা আল্লাহর ইবাদাতরূপে গণ্য হইতে পারে না; বরং উহা মানুষের উপাসনারূপে পরিণত হয়। আর যদি ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের ভক্তি আকর্ষণ উভয় উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে, তবে উহা ভাগাভাগি হইয়া কিছুটা আল্লাহর জন্য আর কিছুটা মানুষের জন্য হইয়া উহা শিরকে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا *

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দীদার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তাহার প্রভুর ইবাদাতে শরীক না করে। আল্লাহতায়ালা আরও বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ *

অর্থ ঃ সেই নামাযীদের অবস্থা শোচনীয় যাহারা তাহাদের নামাযে মোটেই মনোযোগী নয় এবং সেই নামায তাহারা লোক দেখানো হিসাবে আদায় করে।

আল্লাহতায়ালা আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ *

অর্থ ঃ উহারা মুখে এমন সব কথা বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই। আল্লাহ্ তাহাদের গোপন কথা খুব ভালভাবে অবগত।

আরও এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ *

অর্থ ঃ উহারা যখন নামায পড়িতে দাঁড়ায় তো অত্যন্ত অনিচ্ছা ও আলস্যের সাথে। (এ নামায শুধু) মানুষকে দেখাইবার জন্য, আল্লাহর স্মরণ (ইহাতে) খুব কমই থাকে। ইহারা দুই দিকেই কেবল টানা হেঁচড়ার ভিতরে, (ইহাদের মন পুরাপুরিভাবে) না এ দিকে এবং না সে দিকে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতদের জন্য আমি ছোট শিরক দেখিয়া যত ভয় পাই, অন্য বিষয়ে তত ভয় পাই না।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ছোট শিরক কি? হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, উহা রিয়া। অর্থাৎ অপরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভের জন্য যে ইবাদত করা হয়। রোজ কিয়ামতে

আল্লাহ বলিবেন, হে রিয়াকারগণ! যাহাদের মন আকর্ষণ করিবার জন্য তোমরা ইবাদাত করিয়াছিলে, আজ তাহাদের নিকট তোমাদের প্রাপ্য চাহিয়া লও।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি ইবাদাতের মধ্যে বালু কণা পরিমাণ লোক দেখানো ইচ্ছা (বা রিয়া) থাকে, তাহাদের সেই ইবাদাত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে উছ বলেন, আমি একদিন আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ)-কে রোদন করিতে দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার উম্মতগণ অবশ্য মূর্তি পূজা করিবে না, তাহারা চন্দ্র, সূর্য অথবা কোন জড় পদার্থের পূজা করিবে না। সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাহারা ছোট শিরকে লিপ্ত হইতে পারে, এই চিন্তায়ই আমি রোদন করিতেছি।

হুযুরে পাক (দঃ) একদা উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা "জুব্বুল হুযন" হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। লোকগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! জুব্বুল হুযন জিনিসটা কি? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, রিয়াকার আলেমদের শাস্তির জন্য দোজখের মধ্যে একটি ভয়াবহ বিপদ সঙ্কুল ও যন্ত্রণাদায়ক কূপ রহিয়াছে। উহাই জুব্বুল হুযন নামে পরিচিত। একদা এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! কোন্ কাজ দ্বারা পরকালে মুক্তি নছীব হয়?

হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, ইবাদাত-বন্দেগীর দ্বারা। তবে ঐ ইবাদাত-বন্দেগী যেন লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে না হয়।

হযরত মুআম (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মানব সৃষ্টির বহু কাল পূর্বে আল্লাহতায়ালা সাতজন ফিরেশতা সৃষ্টি করিয়া উহাদের এককেজনকে এককেটি আকাশের দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করিয়া দেন। তাহাছাড়া দুনিয়া হইতে বান্দার ইবাদাত আল্লাহর দরবারে পৌছাইবার জন্যও একজন ফিরেশতা সৃষ্টি করেন। উক্ত ফিরেশতার নাম হাফেজা।

ফিরেশতা হাফেজা যখন মানুষের ইবাদাত লইয়া প্রথম আকাশের দরজায় উপস্থিত হন, তখন আকাশের দ্বাররক্ষী বলেন, তুমি দাঁড়াও। আল্লাহতায়ালা নিছক গীবাতকারীর ইবাদাত বাছিয়া ফেলিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের ইবাদাতগুলি সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় দেখিয়া হাফেজা দ্বাররক্ষী ফিরেশতাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিবেন। কিন্তু আকাশের দ্বাররক্ষী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিন্দুক ও গীবাতকারী ইবাদতকারীর ইবাদাত বাছিয়া ফেলিয়া নিন্দুকের মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। তখন ফিরেশতা হাফেজা সেই বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাত লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দরজায় গিয়া উপনীত হইবেন। তথাকার দ্বাররক্ষী ফিরেশতা তাহাকে বাধা দিয়া বলিবেন, যাহারা ধন-সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে বা সমাজে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ইবাদাত করিয়াছে তাহা আমাকে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি উহা বাছিয়া ফেলিয়া ঐ ধরনের ইবাদাতকারীদের মুখের উপর উহা ছুঁড়িয়া মারিবেন।

অতঃপর হাফেজা বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাতগুলি লইয়া তৃতীয় আকাশের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইবেন। তথাকার দ্বাররক্ষী ফিরেশতা তাহাকে বাধা দিয়া বলিবেন, অহংকারী লোকদের ইবাদাত লইয়া এই পথ দিয়া যাইবার অনুমতি নাই। এই বলিয়া তিনি ঐ সব ইবাদাত বাছিয়া ফেলিয়া উহা অহঙ্কারীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। তখন বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাতগুলি লইয়া ফিরেশতা হাফেজা চতুর্থ আসমানের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইবেন। তথাকার ফিরেশতা তাহাকে একইভাবে বাধা দিয়া তাহার হস্তস্থিত ইবাদাতসমূহ বাছিতে শুরু করিবেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত এবং যিকির-আযকার সমন্বিত এই ইবাদাতসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় ঝকমক করিতে থাকিবে। কিন্তু তবু উহা হইতে আত্মভিমানী লোকদের এই সমস্ত ইবাদাত বাছিয়া লইয়া বলিবেন, ইহা আল্লাহর দরবারে পৌছিবার উপযুক্ত নহে। এই বলিয়া তিনি উহা আত্মাভিমানী

ইবাদাতকারীদের মুখে নিক্ষেপ করিবেন। তখন বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাতসমূহ লইয়া ফিরেশতা হাফেজা পঞ্চম আকাশের দরজায় গিয়া উপনীত হইবেন। সেখানে উক্ত আকাশের দ্বাররক্ষী তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া ইবাদাতসমূহ বাছিয়া ফেলিতে শুরু করিবেন। এই দরজায় ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, কলহপ্রিয় এবং রুক্ষভাষী লোকদের ইবাদাত বাছিয়া বাহির করিয়া উহা ঐ শ্রেণীর ইবাদাতকারীদের মুখে নিক্ষেপ করিবেন এবং ফিরেশতা হাফেজাকে পথ ছাড়িয়া দিবেন। তিনি তখন বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাত লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইবেন। ষষ্ঠ আসমানের দরজায় নিযুক্ত প্রহরী ফিরেশতা তাহার পথ আগলাইয়া বলিবেন, এই পথ দিয়া নির্দয়, পর দুঃখে সুখী এই ধরনের লোকদের ইবাদাত লইয়া যাওয়ার অনুমতি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি উক্ত ইবাদাত যাচাই-বাছাই করিতে আরম্ভ করিবেন এবং উহা বাহির করিয়া লইয়া ইবাদাতকারীদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিবেন। অতঃপর ফিরেশতা হাফেজা বাছাই করা অবশিষ্ট ইবাদাত লইয়া সপ্তম আকাশের দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হইবেন। তাঁহার হস্তস্থিত ইবাদাতগুলি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রখর তেজবিশিষ্ট মনে হইতে থাকিবে। এ সময় বজ্র ধ্বনির মত হুহুঙ্কার নিনাদে আকাশমণ্ডল নিনাদিত ও প্রকম্পিত করিয়া তিন হাজার ফিরেশতাও হাফেজার সঙ্গে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

কিন্তু সপ্তম আকাশের প্রহরী ফিরেশতা সকলকেই বাধা দিয়া বলিবেন, যে ইবাদাত শুধু আল্লাহর খুশী হাসিল করার জন্য হয় নাই বরং কেবল সুধীমণ্ডলীর মধ্যে প্রাধান্য অর্জন এবং দেশ-বিদেশে নিজের গৌরব বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তেমন ইবাদাত লইয়া সপ্তম আসমান অতিক্রম করার কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আমার উহা বাছিয়া দেখিতে হইবে। কারণ যেই ইবাদাত শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, মানুষের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, উহা রিয়া ছাড়া আর কিছু নহে। যে ইহা করিয়াছে, সে রিয়াকার। রিয়াকারীর ইবাদাত কখনও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। এই কথা বলিয়া তিনি ঐ ধরনের ইবাদাতসমূহ বাছিয়া বাহির করতঃ উহা ইবাতদকারীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর ফিরেশতা হাফেজা এইভাবে যাচাই-বাছাই করা অবশিষ্ট সম্পূর্ণ নিখুঁত ও বিশুদ্ধ ইবাদাত লইয়া আল্লাহর দরবারে গিয়া উপনীত হইবেন।

উম্মত সম্পর্কে বড় আশংকা ঃ হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিজের উম্মত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় আশংকা হইল তাহাদের বেশী বাচালতার ব্যাপারে। শপথ সেই জাতে পাকের যাহার হস্ত মুঠায় আমার জান ও প্রাণ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী বাদশাহ, কুকর্মী উজীর, বিশ্বাসঘাতক প্রশাসক, অত্যাচারী আমলা, গুনাহগার ও বদকারকারী এবং মূর্খ আবেদ সমাজ ও দেশের উপরে প্রভাবশীল না হইয়া পড়িবে। যখন অবস্থা ঐরূপ হইবে তখন আল্লাহ দুনিয়ার বুকে ফেতনা ফাসাদ এবং তমসার দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। যাহার মধ্যে তখন মানুষ বিভ্রান্ত ও বেদিশা হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। সময়টি তখন এমনই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে যে, ইসলামের প্রভাবে ও প্রতিপত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতে থাকিবে। অচিরেই এমন অবস্থা দেখা দিবে যে তখন আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করিবার মত একটি লোকও পাওয়া যাইবে না। বাহ্যিকভাবে যাহারা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিবে তাহারাও ইসলাম হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইবে।

কঠিন আযাব ঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে কিছু সংখ্যক লোককে কঠিন আযাবে লিপ্ত করা হইবে। আল্লাহ পাক তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি গোপনে ও নির্জনে খুব বড় বড় ও মারাত্মক ধরনের গুনাহর কাজে রত ছিলে না? কিন্তু যখন তোমরা লোক সমাজে বাহির হইতে তখন তাহাদের সাথে খুব সদ্ব্যবহার, সদাচরণ এবং সৎকার্যাবলী প্রদর্শন করিতে। মনে হইতেছিল যে, তোমরা কেবল মানুষকেই ভয় করিতেছ, আমাকে কোনরূপ ভয় সঙ্কোচ করিতেছ না। তোমরা মানুষকে বড় ভাবিয়াছিলে, আমাকে বড় ভাব

নাই। আমার ইযযত ও সম্মানের কসম, আজ আমি তোমাদের ঐ ধরনের কাজের বিনিময়ে তোমাদেকে ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করিব।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহার নাড়ি-ভুড়ীগুলি বাহির হইয়া পড়িবে এবং সেগুলি একটি আকর্ষণকৃত চাকার মত ঘুরপাক খাইতে থাকিবে। সেই ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞসা করা হইবে, তুমি কি দুনিয়াতে লোকদিগেকে সৎকাজের জন্য নির্দেশ দান এবং বদ কাজ হইতে বারণ করিয়াছিলে না? সে তখন জবাব দিবে, আমি লোককে তো ভাল কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলাম এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নিজে আমি তদ্রূপ আমল করিতাম না।

লোক দেখানো রোযা ও তাহার বদলা ঃ হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অনেক সংখ্যক রোযাদারই এমন যে, শুধু উপবাস এবং পিপাসার কষ্ট বরণ করা ছাড়া তাহাদের রোযায় আর কোন উদ্দেশ্য নাই। একইভাবে অনেক সংখ্যক রাত জাগরণকারী ইবাদাতগুজার আছে, যাহাদেরও শুধু রাত্র জাগরণ করা ছাড়া তাহাদের নামাযের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই এবং উহাতে কোন ফলেরও আশা নাই। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, এই ধরনের বাহ্যিক আমলের ফলে আল্লাহর আরশ কম্পিত হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। হুযুর (দঃ) আরও বলেন যে, সেই লোক খুবই খারাপ, যাহার আমল এবং আল্লাহ-প্রদত্ত ছওয়াবের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে। মূলতঃ উক্ত শ্রেণীর লোকগণ ইবাদাত অর্থাৎ নামায, রোযা শুধু কোন পার্থিব বস্তু লাভের জন্য করে যাহা ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট আছে। তাহার খুশী অর্জনের জন্যই ঐ সমস্ত ইবাদাত-বন্দেগী করা হইয়া থাকে। আসলে ইহার ফল হইল, এই প্রকার আমল দ্বারা আমলকারী একদিকে যেমন দ্বীন হইতে বঞ্চিত হয়, অন্য দিকে তেমনি নিজের মূল্য ও মর্যাদাকে বিনাশ করিয়া ফেলে।

দান খয়রাত মধু আল্লাহর ওয়াস্তে করা চাই ঃ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তেই দান খয়রাত করিয়া থাকি। অবশ্য তাহার সাথে এই আশাও অন্তরে থাকে যে, ঐ কাজের কারণে যেন লোকগণও আমার প্রশংসা করে। লোকটির এই উক্তির উপরেই আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْالِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا *

অর্থাৎ– যে কেহ তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎ কর্মশীল হয় এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদাতে অন্য কাহাকেও অংশী স্থাপন না করে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, শেষ যমানায় কিছু লোক দুনিয়া হাসিল করার উদ্দেশ্যে দ্বীনকে উসিলা হিসাবে ব্যবহার করিবে। তাহারা বাহিরে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও বৈরাগ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে ভেড়ার চর্মের পোশাক পরিবে আর ভিতরে নেকড়ের মত ভেড়ার প্রাণ সংহার করিবে। অর্থাৎ মানুষের ক্ষতির জন্য সর্বরকম অপকার করিবে। উহাদের মুখের ভাষা মধুর তুল্য মিষ্টি হইবে, কিন্তু অন্তর থাকিবে হিংস্র ব্যঘ্র তুল্য। এই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন যে, কিহে ইহারা কি আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্তির মধ্যে আছে, না আমার সঙ্গে বাহাদুরী প্রদর্শন করিতেছে? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি উহাদের উপর আমি এমন কঠিন ফেতনা চাপাইয়া দিব যে, যাহার প্রভাবে বড় বড় সাহসী ও সহিষ্ণু লোকেরাও হয়রান হইয়া যায়।

রিয়াকার কারী, দাতা এবং মুজাহিদগণ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজকিয়ামতে আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিবেন। সকল বান্দা নিজ নিজ জানুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এমনি সময় আল্লাহতায়ালা ক্বারী, শহীদ এবং ধনবানদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। সর্বপ্রথম আল্লাহতায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি যত সব বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলে, তদনুযায়ী তুমি কতটা কি আমল করিয়াছিলে? ক্বারী জবাব দিবে, আমি তোমার উদ্দেশ্যে মাহে রমজানে রাতে নামাযে দাঁড়াইয়া তোমার কোরআন তেলাওয়াত করিয়াছিলাম। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। (ফিরেশতারাও সাথে সাথে বলিয়া উঠিবেন, এ লোক অসত্য কথা বলিয়াছে)। আল্লাহ্ বলিবেন তোমার কোরআন পাঠের মতলব তো শুধু এই ছিল যে, লোকগণ তোমাকে ক্বারী বলিবে। লোকগণ অবশ্য তাহা তোমাকেও বলিয়াছে। তারপর আল্লাহ্ ধনবান লোকদের ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তোমাকে দুনিয়াতে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম তুমি তাহা কোন্ কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? ধনী ব্যক্তি জবাবে বলিবে, আমি সে ধন-সম্পদ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে যথাযথভাবে সাহায্য করিয়াছি এবং গরীব দুঃখীদের দুঃখ মোচনের জন্য দান-খয়রাত করিয়াছি।

আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। (ফিরেশতারাও তাহাই বলিবেন।) আল্লাহ্ বলিবেন তুমি যাহা বলিলে সে কথা ঠিক নহে, বরং তোমার অর্থসম্পদ খরচ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লোকগণ তোমাকে খুব বড় দানশীল মনে করিবে ও তোমার যশঃ গৌরব প্রচার করিবে। তোমার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। লোকগণ তোমাকে বড় দানশীল মনে করিয়াছে ও তোমার গৌরবও প্রচার হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি দুনিয়াতে কোন্ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে? সে জবাবে বলিবে, হে মাবুদ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে তোমার পথে দ্বীনের জন্য লড়াই করিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি।

আল্লাহতায়ালা জবাবে বলিবেন, তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (সাথে সাথে ফিরেশতাগণও আল্লাহ্র বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন)। আল্লাহ বলিবেন, জিহাদের ময়দানে শরীক হওয়ায় তোমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, লোকগণ তোমাকে বীর-যোদ্ধা বলিবে। তোমার সে আশা সফলও হইয়াছে। লোকগণ তোমাকে নির্ভিক ও সাহসী যোদ্ধা বলিয়াছে ও তোমার সুখ্যাতি সুযশও ঘোষণা করিয়াছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া হুযুরে পাক (দঃ) পবিত্র হস্তদ্বয় স্বীয় জানুর উপর রাখিয়া পরম পরিতাপের সহিত বলিলেন, আবু হোরায়রা! রোজ কিয়ামতে সমস্ত লোকের মধ্যেই এই তিন শ্রেণীর লোকের উপর দোজখের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

এই পবিত্র হাদীস যখন হযরত মুআবিয়ার (রাঃ) কর্ণগোচর হইল, তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) সত্যই বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ *

অর্থাৎ–যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও উহার ভোগ উপভোগের প্রত্যাশী, আমি তাহাকে দুনিয়াতেই প্রতিদান দিয়া থাকি। দুনিয়াতে তাহার অংশ এতটুকু মাত্র কম করা হয় না, কিন্তু এই সমস্ত লোকের জন্য পরকালে দোজখ ব্যতীত আর কিছু মিলিবে না। দুনিয়াতে তাহার কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থতায় পযবসিত হইবে। যাহা কিছু সে সেখানে করিয়াছে সবই বৃথা যাইবে। উহাদের জন্য ভয়ঙ্কর আযাবের ব্যবস্থা করা হইবে। পরকালে ইহারা বড়ই লোকসান এবং ক্ষতির মধ্যে পড়িবে।

মুমিনদের কামিয়াবী ও রিযাকারদের দুর্ভাগ্য ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আদন বেহেশত তৈয়ার করিলেন তখন উহাতে এমন সব নিয়ামত পয়দা করিলেন যে, উহা কোন দিন কাহার চোখও দেখে নাই এবং উহার কথা কাহার কানও কোন দিন শুনে নাই। এমন কি কোন মানুষের অন্তরও ঐ সমস্ত নিয়ামতের কথা কোন দিন কল্পনাও করে নাই। আল্লাহতায়ালা জান্নাতুল আদন অর্থাৎ আদন বেহেশতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিছু বলিবার আছে কি? তাহা হইলে বল। তখন জান্নাতুল আদন পর পর তিনবার বলিল, 'ক্বাদ আফলাহাল মুমিনূন।' অর্থাৎ মুমিনদেরই সাফল্য বা কামিয়াবী। তারপর বলিল, নিঃসন্দেহে আমি প্রত্যেক কৃপণ এবং রিয়াকারদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ।

রিয়াকার আল্লাহকে ধোকা দিতে চাহে ঃ এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! রোজ কিয়ামতে আমার মুক্তির উছিলা কি হইবে? হুযুর (দঃ) উত্তর করিলেন, আল্লাহকে ধোকা দিবার চেষ্টা করিও না। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আলাহকে ধোকা দিব কি ভাবে? হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, তুমি কাজ তো আল্লাহরই নির্দেশ মত করিতেছ, কিন্ত উহা করিবার লক্ষ্য আল্লাহর আনুগত্য নয়, বরং অন্য কিছু।

আর তুমি রিয়া হইতে পরহেজ কর। রিয়া শিরক বৈকি! সমস্ত রিয়াকারকে রোজ কিয়ামতে সমগ্র মাখলুকের সামনে চার নামে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে। যেমনঃ (১) হে কাফির! (২) হে মহাগুনাহগার (৩) হে দাগাবাজ (৪) হে ক্ষতিগ্রস্ত! তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হইয়াছে। আজ আর সামান্য অংশও তোমার প্রাপ্য নাই। হে রিয়াকার! আরজ তুমি কাজের পুণ্য তাহার নিকট চাহ, যাহাকে খুশী করার জন্য তুমি আমল করিয়াছ।

মুনাফিকের পরিণাম ঃ আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) যশঃ, লিপ্সা এবং নিফাক হইতে স্বীয় আশ্রয়ে রাখুন। কেননা এইগুলি সবই দোযখীদের কাজ। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে পাকে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *

অর্থাৎ–নিশ্চয় মুনাফিকগণ দোজখের সর্বনিম্ন কুঠরিতে স্থান লাভ করিবে। অর্থাৎ ফিরাউন, হামান, নমরূদ, কারূন প্রমুখদের সাথে দোজখের সর্বাধিক ভয়ঙ্কর স্থানে জায়গা লাভ করিবে।

যদি কেহ এই প্রশ্ন করে যে, বিভিন্ন হাদীসের মর্মে তো এই কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন নেকআমল যদি মানুষ দেখিয়াও ফেলে তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। যেমন হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি অনেক উত্তম কার্য যদি গোপনে করি কিন্তু তাহা সত্বেও উহা লোকদের মধ্যে জানাজানি হইয়া যায়। যাহার ফলে আমার মনে এই সন্দেহ দেখা দেয়া যে, নাজানি আমি এই আমলের দ্বারা কোন ছওয়াব পাইব কিনা।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, তুমি বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে। একগুণ এইজন্য যে, তুমি নেক কাজ গোপনে করিয়াছ আর একগুণ এইজন্য যে, তোমার নেক কাজ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। অত্র হাদীসের মর্ম বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে, দ্বিগুণ হওয়ার লাভের কারণ এই যে, ঐ লোকটির

মনে এইরূপ বাসনাও ছিল যে, অন্যান্য লোকও যদি তাহার কৃত সৎ কাজের অনুসরণ করিত, তবে কতইনা ভাল হইত। অতএব ঐ লোকটি একগুণ ছওয়াব পাইবে তাহার নিজ আমলের কারণে এবং আর একগুণ পাইবে তাহার উক্ত আমল প্রকাশ পাওয়ায় অন্য লোকের ঐরূপ আমল করার সুযোগ হওয়ার কারণে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে আমি এমন কতিপয় লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, যাহাদের ওষ্ঠ আগুনের কাচিদ্বারা কর্তন করা হইতেছিল। আমি সঙ্গী ফিরেশতা জিব্রাইলকে জিজাসা করিলাম যে, এ কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা লোকদের মাঝে ওয়াজ নসীহত করিয়া বেড়াইত। মানুষকে তো ইহারা খুবই উপদেশ দিত, কিন্তু নিজেরা আমল করিত না। যে কাজ তাহারা ভাল জানিত বা ভাল বলিত তাহা লোককে করিতে বলিত, কিন্তু যাহা তাহারা নিজেরা মন্দ জানিত বা মন্দ বলিত নিজেরা তাহাই করিতে থাকিত। অর্থাৎ তাহারা অপরকে নেককাজ করিতে বলিলেও নিজেদের বেলায় তাহা ভুলিয়া যাইত। (মোটকথা তাহাদের এইরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, নিজেরা খুবই সদোপদেশদানকারী মহান ব্যক্তি, লোক সমাজে ইহা প্রকাশ করা। মূলে তাহাদের সদোপদেশ দানের ভিতরে কোন ইখলাছ বা সৎ উদ্দেশ্য ছিল না)। একদিন হযরত হাসান বছরী (রহঃ) মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বীয় খানকায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দরবারে তখন ফরকদ সানজীও উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরিধানে ছিল জীর্ণ খেরকাহ। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) ফরকদকে বলিলেন, দেখ! আমার পোশাক হইল বেহেশতী পরিচ্ছদ, কিন্তু তোমার লেবাস বেশক দোজখী পোশাক ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি প্রকাশ্যে অবশ্য তারেকে দুনিয়ার বাহানা করিয়াছ, কিন্তু অন্তর তোমার অহঙ্কার এবং দেমাগে পরিপূর্ণ। দেখা যাইতেছে, এ যুগে অনেকেই এইরূপ জীর্ণ পোশাক পরা অভ্যাসে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু আসলে উহাদের মনে দামী পোশাক পরিধানকারীদের অপেক্ষা অহঙ্কার বেশী। (অবস্থাটা এই যে, উহারা দুনিয়া বিরাগী বড় দরবেশ, লোকদের কাছে এই কথাটা প্রকাশ করা চাই) শুনিয়া রাখ, শাহী পোশাক পর, কোন দোষ নাই যদি তোমার মন আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নম্র-বিনয়ী থাকে। পক্ষান্তরে জীর্ণ গুদুরী অঙ্গে পরিয়া যদি অন্তরে এইভাব থাকে যে, লোকে আমাকে দেখিয়া মনে করুক যে, আমি একজন খুব বড় দরবেশ, ত্যাগী পুরুষ এবং আল্লাহওয়ালা হইয়া গিয়াছি। তবে ইহা অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর নাই।)

পোশাক তিন প্রকার

পোশাক-পরিচ্ছদকে সাধারণভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(১) জায়েয বা মোবাহ পোশাক, যেমন শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং বিধর্মীবেদ্বীনদের পোশাকের সাথে সামঞ্জস্য মূলকও নয় এবং উহা দ্বারা যথাযথভাবে সতর আবৃতও হয়।

(২) দ্বীনের দৃষ্টিতে আদর্শ এবং উত্তম পোশাক, যাহা অলী-আউলিয়া, বোযর্গানে দ্বীন, মুহাক্কেক ওলামা, পরহেজগার এবং মুর্শিদগণ পরিধান করেন।

(৩) আর এক রকমের পোশাক হইল, যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ অর্থাৎ বেদ্বীন-বিধর্মী ও মুশরিক-কাফিরগণ যে সকল পোশাক ব্যবহার করে অথচ দ্বীন ইসলামের অনুসারী পরহেজগার কোন আদর্শ মুসলমানই যাহা ব্যবহার কিংবা ব্যবহার করা পছন্দ করে না।

অনেক অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন দরবেশ ও আবেদ মনে করে যে, চলাফিরা ও লেবাস পোশাকে অত্যন্ত হেয়তা অবলম্বন করা আল্লাহকে খুশী রাখা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রধান অবলম্বন। আসলে কিন্তু মোটেই তাহা নয়। বরং শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক সব কিছু করিবার পরে যে ক্ষেত্রে শরীয়তের পরিষ্কার কোন নির্দেশ কিংবা ইঙ্গিৎ নাই, সে ক্ষেত্রে এমন অবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহা

মানুষের শালীনতা, মর্যাদা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত সামঞ্জস্যসুলভ হয়। এই সমস্তের বিপরীত এবং অস্বাভাবিক কোন কিছু করিতে যাওয়া ঠিক নয় এবং করিতে যাওয়াকে শরীয়তও সমর্থন করে নাই। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, তোমরা এমন পোশাক পরিধান কর যে, ওলামায় কেরামের দৃষ্টিতে তাহা বিসদৃশ ও উপহাসজনক না হয় এবং তোমরা অপরের চোখে একেবারে হেয়ও না হইয়া যাও। আর তোমাদের কাপড় চোপড় সাধারণ সূতির তৈরীই হউক না কেন, কোন আপত্তি নাই কিন্তু তাহা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনসমূহের বৈশিষ্ট্য ও ফজীলত

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) আমার হাত ধারণ করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহতায়ালা শনিবার দিন যমিন সৃষ্টি করিয়াছেন। রবিবার দিন যমিনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছেন। সোমবার দিন বৃক্ষলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। মঙ্গলবার দিন নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলি সৃজন করিয়াছেন। বুধবার দিন যাবতীয় সুন্দর বস্তু পয়দা করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার দিন আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার সমুদয় চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন। আর শুক্রবার দিন আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে পয়দা করিয়াছেন হযরত আদম (আঃ)কে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট (একদা) সপ্তাহের দিনগুলি সমন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শনিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন, শনিবার ফেরেব ও ধোকার দিন। কেননা এই দিনেই কোরায়েশগণ দারুন্নাদওয়ায় (শলা-পরামর্শ গৃহে) আমাকে হত্যা করার পরামর্শ করিয়াছিল।

রবিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এই দিন কৃষি বীজবপন এবং বাড়ী ঘর নির্মাণ করার দিন। কেননা এই দিনে দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

সোমবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন, এই দিন পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিন। কেননা হযরত শোআএব (আঃ) এইদিনই সফর এবং ব্যবসায় শুরু করিয়াছিলেন।

মঙ্গলবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এরশাদ করিলেন, এই দিন ঝগড়া-কলহ ও রক্তারক্তির দিন। কেননা এই দিনই হযরত হাওয়া ঋতুবতী হইয়াছিলেন এবং হযরত আদম (আঃ) তনয় কাবীল হাবীলকে হত্যা করিয়াছিল।

বুধবার দিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এরশাদ করিলেন, দিনটি অত্যন্ত খারাপ। কেননা এই দিনই ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা নীল নদে ডুবিয়া মরিয়াছিল। আদ-সামুদের সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই দিন ধ্বংস হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এরশাদ করিলেন, এই দিনটি বাসনা পূর্ণ হওয়ার দিন। বাদশাহর দরবারে গমন করার দিন। কেননা এই দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। নমরুদ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল এবং তিনি বিবি হাজেরাকে ফেরত পাইয়াছিলেন।

শুক্রবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এরশাদ করিলেন, এইদিন খুৎবাহর দিন এবং বিবাহ করার দিন। কেননা অধিকাংশ নবী রাসূলই শুক্রবার বিবাহ করিয়াছেন।

যুহরী (রহঃ) আবদুর রহমান ইবনে কা'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুযুরে পাক (দঃ) কেবল মাত্র বৃহস্পতিবার দিনই সফর করার উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন। বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা (আঃ) ও আরও পঞ্চাশজন নবীকে শনিবার, হযরত ঈসা (আঃ) ও আরও বিশ জন নবীকে

রবিবার, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও অন্য আরও তেষট্টি জন নবীকে সোমবার, হযরত সোলায়মান (আঃ) ও অন্য আরও পঞ্চাশজন নবীকে মঙ্গলবার, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও অন্য আরও পঞ্চাশজন নবীকে বুধবার, হযরত আদম (আঃ) ও আরও কতিপয় নবীকে বৃহস্পতিবার বোযর্গ দিন হিসাবে দান করিয়াছেন; বাকী শুক্রবার আল্লাহতায়ালা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

হুযুরে পাক (দঃ) আরজ করিলেন, হে মাবুদ! আমার উম্মতগণের জন্য কি রাখিলেন? আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, জুমআর দিন আমার জন্য এবং বেহেশতও আমার জন্য, উম্মতগণকে জুমআ (শুক্রবার দিন) দান করিলাম। উহার সহিত বেহেশতও দান করিলাম। শুক্রবার ও বেহেশতের সাথে সাথে আমিও তোমার উম্মতদের সাথে রহিলাম।

বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দিনের রোযার ফজীলত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দিন রোযা রাখে, আল্লাহতায়ালা বেহেশতে তাহাকে বিরাট একটি প্রাসাদ দান করিবেন। ইয়াকুত, মারওয়ারিদ এবং যমরুদ দ্বারা সেই প্রাসাদ নির্মিত হইবে। দোজখের আগুন হইতেও আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রজব, যিলকাদ, যিল-হাজ্জ্ব এবং মহররম মাসে যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দিন রোযা রাখে আল্লাহ তাহাকে শত বৎসর ইবাদাতের পুণ্য দান করেন।

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার ফজীলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই দুইদিন আল্লাহতায়ালা মুশরিক ব্যতীত অন্যান্য সকল বান্দাকে মার্জনা করিয়া দেন। মুসলমান ভাইয়ের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিলে এই দুই দিন পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অবকাশ দেওয়া হয়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) চাই গৃহে অবস্থান করুন কিংবা সফরে থাকুন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা কখনও তরক করিতেন না। অর্থাৎ যে কোন অবস্থায়ই হৌক প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারই তিনি রোযা রাখিতেন এবং এরশাদ করিতেন যে, এই দুইদিন বান্দার কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।

বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার দিনের রোযার ফজীলত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, চার হারাম মাসের বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার এই তিনদিন রোযা রাখিলে তাহার আমলনামায় নয় বৎসরের ইবাদাত-বন্দেগীর পুণ্য লিখা হয়। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা শনিবার এবং রবিবার দিন রোযা রাখ কিন্তু ইয়াহুদ ও নাছারাদিগের অনুসরণ করিও না বরং তাহাদের আমলের বিপরীত কর। (ইয়াহুদীগণ প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার দিন রোযা রাখে এবং খৃষ্টানগণ প্রত্যেক রবিবার দিন রোযা রাখে। অর্থাৎ তাহারা এক সাথে একটি করিয়া বোযা রাখে। কিন্তু হযরত রাসূলে করীম (দঃ) তাঁহার উম্মতগণকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা এক সাথে শনিবার ও রবিবার রোযা রাখিয়া ইয়াহুদ ও নাছারা উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতা কর। একটি একটি করিয়া রোযা রাখিয়া তোমরা তাহাদের অনুবর্তিতা অবলম্বন করিও না।)

আইয়্যামে বীজের রোযার ফজীলত

আইয়্যামে বীজের রোযার বহু ফজীলত হাদীস শরীফে আসিয়াছে। ইহা যারপরইনাই পুণ্যের কাজ।

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন ইবনে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইবনে হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আবু তালিব হইতে বর্ণনা করেন, চান্দ্র মাসের তের তারিখের রোযায় তিন হাজার বৎসর, চৌদ্দ তারিখের রোযায় দশ হাজার বৎসর এবং পনের তারিখের রোযায় এক লাখ তের হাজার বৎসরের রোযা রাখার সমান পুণ্য অর্জিত হয়।

আবু ইসহাক (রহঃ) জারীর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চান্দ্র মাসের তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ এবং পনের তারিখ রোযা রাখে, সে সারা জীবন ভর রোযা রাখার ছওয়াব হাসিল করিয়া থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) আইয়্যামে বীজের রোযা কখনও তরক করেন নাই। চাই তিনি গৃহে অবস্থান করুন কিংবা প্রবাসে থাকুন।

শা'বী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক চান্দ্র মাসে আইয়্যামে বীজের রোযা রাখে এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ও বেতের নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি একশত শহীদের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে।

সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল (দঃ) তিনটি বিষয় অসিয়ত করিয়া বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্যন্ত তুমি আমার সহিত আসিয়া মিলিত না হও (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) আইয়্যামে বীজের তিনটি রোযা, শয়ন করার পূর্বে বেতের নামায এবং ঈদুল আযহার নামায আদায় করিতে থাকিও।

আবদুল মালেক ইবনে হারুন উনাযাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, উনাযাহ (রহঃ) বলেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন স্বীয় হুজরাহ মুবারকে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি হুযুর (দঃ)-কে সালাম পেশ করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়া বলিলেন, হে আলী! ফিরেশতা জিব্রাইল তোমাকে সালাম জানাইতেছেন। আমি হুযুর (দঃ)কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার পক্ষ হইতে তাহার সালামের জবাব পৌছাইয়া দিন।

অতঃপর হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আলী! তুমি আমার নিকটে আসিয়া বস। নির্দেশানুযায়ী আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম।

তখন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আলী! ফিরেশতা জিব্রাঈল তোমাকে বলিতেছেন, তুমি প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখিবে। উহার প্রথম রোযার বদলে দশহাজার, দ্বিতীয় রোযার বদলে ত্রিশ হাজার এবং তৃতীয় রোযার বদলে এক লাখ বছরের রোযার ছওয়াব তোমার আমলনামায় লিখা হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই ছওয়াব কি বিশেষভাবে শুধু আমারই জন্য, না অন্যান্য লোকও ইহা লাভ করিবে? হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, এই ছওয়াব তুমি লাভ করিবে এবং তোমার মত অন্যান্য যাহারা এই রোযা রাখিবে তাহারাও লাভ করিবে।

হযরত আলী (রাঃ) রোযাত্রয়ের তারিখ জানিতে চাহিলে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইহা প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ।

আইয়্যামে বীজ নামকরণের কারণ

উনাযাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলীর (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আইয়্যামে বীজের নামকরণের কারণটি কি ছিল? হযরত আলী (রাঃ) জবাবে বলিলেন, আল্লাহতায়ালা হযরত আদম

(আঃ)কে যখন বেহেশত হইতে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন সূর্যের প্রখর তাপে তাঁহার পবিত্র শ্বেতবর্ণ দেহ কালবর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর ফিরেশতা জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আদম! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আপনার দেহের এই কালো বর্ণ তিরোহিত হইয়া আবার দেহ পূর্বানুরূপ শুভ্র হইয়া যাউক? হযরত আদম (আঃ) বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই তাহা কামনা করি।

তখন ফিরেশতা জিব্রাইল আঃ) বলিলেন, আপনি প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখে তিনটি রোযা রাখিবেন। ইহাতে আল্লাহ্ আপনার গাত্রবর্ণ পূর্বানুরূপে পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

ফিরেশতা জিব্রাইলের এই পরামর্শানুযায়ী হযরত আদম (আঃ) মাসের তের তারিখে রোযা রাখিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহের এক তৃতীয়াংশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। তারপর চৌদ্দ তারিখে রোযা রাখিলেন। ইহাতে দেহের দুই তৃতীয়াংশ শুভ্র রং ধারণ করিল। তারপর তিনি পনের তারিখে রোযা রাখিলেন। ইহাতে তাঁহার দেহের সম্পূর্ণাংশ পূর্বের মত উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ ধারণ করিল। (কালো বর্ণের আর কোন চিহ্নই থাকিল না)। এই কারণেই উক্ত দিন তিনটিকে আইয়্যামে বীজ এবং উহার রোযাকে আইয়্যামে বীজের রোযা বলা হয়।

আইয়্যামে বীজ নামকরণের কারণ সম্পর্কিত উপরোক্ত বর্ণনা ব্যতীত আরও একটি বর্ণনা রহিয়াছে। যথা ঃ

যর ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট আইয়্যামে বীজ নামকরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই কারণ জানিতে আমি হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর নিকট আরজ করিয়াছিলাম, তিনি এরশাদ করিয়াছেন যে, যখন হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করিয়া বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, হে আদম! এখন তুমি আমায় নৈকট্য ও নিজের মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়া বেহেশত হইতে দুনিয়ায় নামিয়া যাও। যে আমার হুকুম অমান্য করে, সে আমার নিকট থাকিতে পারে না। আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ায় নামিয়া গেলেন। সাথে সাথে হযরত আদম (আঃ)-এর দেহের রং কাল হইয়া গেল। ইহাতে ফিরেশতাগণ অত্যন্ত দুঃখ ও আফসুস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্র দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! তুমি যে আদম (আঃ)কে নিজের হাতে তৈরী করিলে ও সমস্ত ফিরেশতাদের দ্বারা সিজদাহ্ করাইলে, একটি মাত্র গুনাহ্র কারণেই তাহার দেহের শুভ্র উজ্জ্বল রং এইভাবে কালো করিয়া দিলে!

অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী অবতীর্ণ হইল, হে আদম! আমার উদ্দেশ্যে মাসের তের তারিখ রোযা রাখ। হযরত আদম (আঃ) এই নির্দেশ পালন করিলেন, তাহাতে তাঁহার দেহের এক তৃতীয়াংশ সাদা বর্ণ হইল। তারপর আবার অহী নাযিল হইল, হে আদম! তুমি আজ চৌদ্দ তারিখেও আর একটি রোযা রাখ। হযরত আদম (আঃ) নির্দেশ পালন করিলেন। তাহাতে তাঁহার দেহের দুই তৃতীয়াংশ সাদা রং ধারণ করিল। তারপর পুনরায় আল্লাহর তরফ হইতে আদম (আঃ)-এর নিকট অহী আসিল, হে আদম! তুমি আজ পনের তারিখেও আর একটি রোযা রাখ। হযরত আদম (আঃ) এই নির্দেশও পালন করিলেন। তাহাতে এবার তাঁহার দেহের বাকী অংশও শুভ্র রং ধারণ করিল। এই কারণেই এই দিন তিনটির নাম আইয়ামে বীজ এবং ইহার রোযাকে আইয়ামে বীজের রোযা বলা হইতেছে।

কোন এক বোযর্গ আদাবুল কাতিব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উক্ত দিন তিনটিকে আরব দেশে আইয়্যামে বীজ বলিবার কারণ হইল, ঐ তিন তারিখের রাতে কিছু সময়ের জন্যও অন্ধকার দেখা যায় না বরং সারা রাতই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল আলোকিত থাকে।

সারা বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযা সকল রোযা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি একদিন বাদে একদিন রোযা রাখিতেন।

যে ব্যক্তি জীবন ভর সদা-সর্বদা রোযা রাখে, নিশ্চয় সে তাহার জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করিয়াছে।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, সর্বদা রোযা আদায়কারীর জন্য দোজখ এমন সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তির জন্য দোজখে প্রবেশ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না।

শোআএব সাআদ ইবনে ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) সারা বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে রোযা রাখিতেন।

ইয়াকুব স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সাআদ (রাঃ) মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতেই সারা বৎসর ব্যাপী রোযা রাখিতেন।

আবু ইদ্রীস এক বর্ণনায় বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) রোযা রাখিতে রাখিতে দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় ক্ষীণ-কৃশ এবং দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে বলা হইল যে, নফসকে কিছুটা আরাম দিন। জবাবে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলিলেন, আরাম তো এই অবস্থায়ই লাভ করা যায়। ক্ষীণকায় অশ্বই দৌড়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়।

আবু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম বলেন, আমার রাহেব একবার আমাকে বলিলেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, সাকীনা যাকারিয়া বছরা হইতে উবলা শহরে ইসা ইবনে মা'যানের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈসা এমন কি গুরুত্বপূর্ণ নেককাজ করিয়াছে, যাহার জন্য তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছ? সে আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহাকে খুব মূল্যবান পোশাক পরিধান করানো হইয়াছে এবং খাদেমগণ তাহার চারিপাশে ঘুরাফিরা করিতেছে। অতঃপর তাহাকে বলা হইল যে, হে ঈসা! আনন্দিত হও। তোমার রোযার জন্য তোমাকে এইরূপ সম্মান দান করা হইয়াছে।

বর্ণিত আছে যে, ঈসা এত রোযা রাখিতেন যে, তাহাতে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহার উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর জীবদ্দশায় লোক জিহাদ করার জন্য নফল রোযা রাখতেন না। কিন্তু হুযুরে পাক (দঃ)এর ইন্তেকালের পর কেবল মাত্র পাঁচ দিন ছাড়া সারা বৎসরই রোযা রাখিতেন।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) একদিন পর একদিন রোযা রাখিতেন। কোন কোন আসমানী কিতাবে আল্লাহতায়ালার এরশাদ দেখা যায়, যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে রোযা আমার জন্যই রাখে। আমিই তাহার প্রতিদান দিব। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও সুঘ্রাণময়।

হযরত আলী (রাঃ) আরও বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোযা রাখার কারণে পানাহার করা হইতে বিরত থাকে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতের ফল-ফলাদি ও শরাবান তাহুরা পানাহার করাইবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যত রকমের সৎকাজ করে, উহার প্রত্যেকটি সৎকাজের জন্য বেহেশতের দরজা সমূহের মধ্যে

একটি করিয়া দরজা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। সেই দরজা দ্বারা তাহাকে আহ্বান করা হইবে। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখে তাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে বেহেশতের রাইয়ান নামক একটি বিশেষ দরজা।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যাহাকে প্রত্যেক দরজা দ্বারা আহ্বান করা হইবে! হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন,হাঁ আছে। আশা করি ঐ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তুমি একজন।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক কাজেরই একটা দরজা আছে ইবাদাতের দরজা রোযা।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন। হে মুসলিমগণ! রোযাদ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিয়া লও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষের জন্য রোযা ধৈর্যের অর্ধেক। প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত আছে। মানুষের দেহের যাকাত রোযা।

আবু আওফা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযাদার ব্যক্তির নিদ্রাও ইবাদত। চুপ করিয়া থাকা তাসবীহ, তাহার যাবতীয় কাজই মাকবুল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজকিয়ামতে রোযাদার ব্যক্তির সামনে স্বর্ণের পাত্রে একটি মৎস্য রাখা হইবে। সে ঐ মাছ ভক্ষণ করিবে আর লোকগণ তাহা দেখিবে।

আবু আলী হাশেম বলেন; হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযাদার ব্যক্তিগণ তাহাদের সম্মুখে রক্ষিত খাবার পাত্র হইতে আহার করিবে। আর অন্যান্য লোকগণ নিজেদের হিসাব-কিতাবে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। তখন তাহারা বলিবে, হে মাবুদ! আমরা হিসাব-কিতাবের কাজে ব্যতিব্যস্ত আর ইহারা পানাহারে মগ্ন, ইহার কারণ কি? তখন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিবেন, ইহারা রাত্রে ইবাদাত করিয়াছে আর তোমরা সুখের নিদ্রায় বিভোর হইয়া রহিয়াছিলে।

সাধারণভাবে রোযা রাখার ফজীলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রোযাদার ব্যক্তিগণ যখন কবর হইতে উঠিবে, তখন তাহাদের মুখ হইতে কস্তুরীর সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে। বেহেশত হইতে আনীত খাবারের পাত্র তাহাদের সম্মুখে রাখা হইবে। তাহারা আরশের ছায়ায় বসিয়া উক্ত পাত্র ইহতে আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে থাকিবে।

সুফইয়ান ইবনে আইনিয়া বলেন, যে বস্তু দ্বারা ইফতার করা হয়, তাহার কোন হিসাব গ্রহণ করা হইবে না।

আবু ছালেহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, রোযা আমার জন্য আমিই উহার প্রতিদান দিব। যে ব্যক্তি রোযা রাখার কারণে পানাহার এবং ভোগসম্ভোগ হইতে থাকে, রোযা তাহার জন্য ঢাল স্বরূপ হইবে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ—একটি রোযার ইফতার এবং অন্যটি আমার সাক্ষাত লাভ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার নিকট কস্তুরীর সুঘ্রাণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোযাদারের জন্য রোযা বর্ম স্বরূপ। আল্লাহতায়ালা রোযাদারগণকে রোযার কারণে দোজখের আগুন হইতে নিস্তার দান করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন মৃত্যুর সময়ে আমি যাহা কিছু রাখিয়া যাইব, উহার জন্য আমি

মোটেই দুঃখিত নই। তবে শুধু দুঃখ এই জন্য যে, আমি রোযা রাখিতে ও নামায পড়িতে পারিব না।

মুজাহিদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নফল রোযা রাখে তবে তাহাকে এই পরিমাণ ছওয়াব দান করা হয় যে, দুনিয়ার যমিন বরাবর স্বর্ণ দান করিলেও সেই পুণ্যের বরাবর হইবে না।

শায়খ আবু নসর তাহার মাতা হইতে সনদ পরম্পরায় বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর খুশী হাসিলের জন্য রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নাম হইতে এই পরিমাণ দূরবর্তী করেন যে, কাক উড়িতে শুরু করিয়া যদি সারা জীবন উড়িয়া বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করে তবু সে দূরত্ব অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একটি কাক কম-বেশী পাঁচশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনদিন রোযা রাখে, আল্লাহ্ তাহার মুখকে দোজখ হইতে সত্তর বৎসরের দূরত্বে রাখিয়া দিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি স্বয়ং হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে রোযাদার অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ আল্লাহতায়ালার তাসবীহ্ ও তারীফ পাঠে মোতায়েন থাকে। আর ঐ ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য প্রথম আসমানের ফিরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থনায় নিযুক্ত হইয়া যান এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা এই কাজে রত থাকেন। আর যদি রোযাদার ঐদিন দিবা ভাগে দুই চারি রাকাত নফল নামাযও আদায় করে তবে তাহার পুণ্যের আলোকে আসমান আলোকিত হইয়া যায় এবং বেহেশতে তাহাদের আয়ত নয়ন বিশিষ্ট হুরীবিবিগণ বলিতে থাকে, হে মাবুদ! তুমি আমার ঐ স্বামীর জান কবজ করিয়া তাহাকে বেহেশতে আমার নিকট পৌছাইয়া দাও। আমি তাহার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আর যদি ঐ রোযাদার রোযা অবস্থায় আল্লাহ পাকের তাসবীহ-তাহলীলেও নিমগ্ন হয়, তবে সত্তর হাজার ফিরেশতা তাহার সেই তাসবীহ ও তাহলীলসমূহ লিখিয়া রাখেন। সকাল হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফিরেশতাদের এই কাজ একইভাবে চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাযের মাহাত্ম্য

নামাযের মাহাত্ম্য যেমন অসীম তেমন উহার হুকুম-আহকামগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-কে নবুয়ত দান করেন। অতঃপর বহু আয়াতের মাধ্যমে নামাযকে ফরজ করিয়া দেন। যেমন—আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ *

অর্থাৎ— কোরআনে পাকে যে বস্তু আপনার নিকট অহীরূপে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, উহা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। আরও এরশাদ হইয়াছে।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ *

অর্থাৎ— নিশ্চয় নামায মানুষকে গর্হিত ও অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে।

আল্লাহতায়ালা আরও বলেন যে, তোমাদের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার জন্য আদেশ কর। আমি তোমাদেরকে জীবিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছি না। আমিই তোমাদেরকে জীবিকা দান করি। আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য এবং নামাযের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথী।

এক জায়গায় আল্লাহ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা সৎকাজ কর, নামায আদায় কর ও যাকাত দান কর। যত ইবাদত বন্দেগী, আনুগত্য, সবই সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। তবু পৃথকভাবে আল্লাহ নামাযের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই নামাযের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) জীবনের অন্তিম লগ্নে স্বীয় উম্মতদিগকে নামায পড়ার জন্য অসিয়ত করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহতায়লাকে ভয় কর এবং নিজেদের দাস-দাসী এবং আজ্ঞানুবর্তীদের হক আদায় কর। এক হাদীসে আসিয়াছে, যত নবী-রাসূল ছিলেন, প্রত্যেকেরই শেষ অসিয়ত ইহাই ছিল।

উম্মতের উপর যে সকল কার্য ফরজ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নামাযই হইল সর্বপ্রথম ফরজ। তাই হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় জীবনের শেষ মুহূর্তে এই নামাযের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল কাজে ইসলাম প্রকাশ পায়, তাহার প্রথম এবং প্রধান কাজ নামায। রোজ কিয়ামতে সর্বপ্রথম এই নামাযেরই হিসাব গ্রহণ করা হইবে। নামায একমাত্র ঈমানের পরেই ইসলামের স্তম্ভ। নামায না পড়িলে ইসলাম থাকে না। একজন ঈমানদার ও একজন বেঈমানের মধ্যকার প্রকাশ্য নিদর্শন হইল নামায। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে সব বস্তু উঠাইয়া লওয়া হইবে, উহার মধ্যে প্রথম বস্তু আমানত, দ্বিতীয় বস্তু নামায।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে যে ব্যক্তি নামায না পড়ে, সে নামায ফরজ বলিয়া মনে করে না। কাজেই নামায তরককারী কাফির। কাফিরকে হত্যা করা যায়। অবশ্য যে ব্যক্তি নামাযকে ফরজ বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু আলস্যবশতঃ নামায আদায় করে না, তাহাকে নামায পড়িতে আহ্বান করিবে। আহবান করা সত্ত্বেও যদি না আসে এবং সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তবে তখন সে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হইবে। তিনদিন পর্যন্ত তাওবাহ করিতে তাগিদ দিবে। তাহাতেও যদি তাওবাহ না করে, তবে তাহাকেও হত্যা করা যাইবে । যেহেতু এক অবস্থায়ও সে ধর্মভ্রষ্ট। তাহার

ধন-সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে জমা করিবে। তাহার জানাযাহ্ পড়িবে না। এবং মুসলমানদের কবরস্থানেও তাহাকে দাফন করিবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে যে ব্যক্তি তিন দিন পর্যন্ত নামায না পড়ে এবং চতুর্থ দিনেও নামাযের সময় চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে নামায না পড়ে, তবে সে ব্যক্তিকে শরীয়তের বিধান অনুসারে হত্যা করা যায়। এই ব্যক্তির ধন-সম্পদ তাহার মুসলমান ওয়ারিশ আত্মীয়দের প্রাপ্য।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এইরূপ নামায পরিত্যাগকারীকে হত্যা করিবে না বরং তাহার দ্বারা নামায পড়াইবার জন্য ও তাওবাহ্ করাইবার জন্য তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিবে। আর যদি সে বন্দী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, করুক।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন যে, এইরূপ নামায পরিত্যাগকারীকে অবশ্য হত্যা করা যায়, কিন্তু তাহার উপরে কাফেরী ফতওয়া দেওয়া যাইবে না।

নামায পরিত্যাগকারী কাফির কিনা সেই সম্পর্কে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস আছে যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নামায মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) তাঁহার পিতার নিকট বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাযের। নামায তরককারী কাফির।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি কাকের খাদ্য ঠোকরাইবার ন্যায় তাড়াতাড়ি মাথা উঠাইয়া নামাইয়া নামায পড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা গেলে দ্বীনে মুহাম্মদী হইতে খারিজ হইয়া মরিবে।

আতিয়া আওফী (রহঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানা-শুনা সত্ত্বেও নামায তরক করে, তাহার নাম দোজখীদের নামের সহিত জাহান্নামের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায আদায় না করিয়া শয়ন করে, ফিরেশতা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে, তোমার চোখে যেন নিদ্রা না আসে, তোমার চোখ যেন ঠাণ্ডা না হয়। তুমি যেমন আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকেও তদ্রূপ বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে বন্দী করিয়া রাখুন।

নামাযের মধ্যে অবাঞ্ছিত কার্য

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে জনৈক আলেম বলিয়াছেন, পঁয়তাল্লিশটি কার্য অপছন্দনীয় (মাকরূহ)। ফরজ নামাযের মধ্যে এই কাজগুলি করা নিষিদ্ধ। যেমন অযথা গলা খাকার দেওয়া, এদিকে ওদিকে তাকানো, প্রয়োজন ব্যতিরেকে হাঁচি প্রদান করা, আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া দৃষ্টিপাত করা।

একবার হুযুরে পাক (দঃ) নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে মস্তকোত্তল করিতেই আল্লাহর তরফ হইতে এই অহী অবতীর্ণ হইল। যথা ঃ যাহারা নামাযে বিনম্রতা প্রকাশ করে...এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় মস্তক নত করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিলে তাহার প্রতি কি হুকুম? হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইহা এক প্রকার শয়তানী ঝাপটা, যাহা মানুষকে নামাযের মধ্যে হইতে অন্যদিকে নিয়া যায়।

একবার তালহা ইবনে মাসরাফ আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েলের নিকট উপস্থিত হইলেন। আবদুল জাব্বার তখন স্বীয় গোত্রীয় লোকদের এক সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তালহা তাহার নিকট চুপে চুপে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পরে আবদুল জাব্বার উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা জান কি তালহা কি বলিয়া গেলেন? তিনি বলিয়া গেলেন, গতকাল তোমাকে নামায আদায় কালে অন্যমনস্ক দেখিয়াছি। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন নামায পড়িতে থাকে, তখন আল্লাহতায়ালা তাহার দিকে নজর করেন। নামাযের মধ্যে বান্দা এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিলে আল্লাহতায়ালাও তাঁহার দৃষ্টি ঐ বান্দার উপর হইতে ফিরাইয়া নেন না।

অন্য হাদীসে আছে, নামায পড়া অবস্থায় লোক তিনটি বস্তু পাইয়া থাকে। এক ঃ প্রথম আসমান হইতে মাথার উপর পুণ্য বৃষ্টি হইতে থাকে। দুই ঃ আসমান হইতে ফিরেশতা অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তাহার পায়ের নিকট হইতে আসমান পর্যন্ত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখেন। তিন ঃ ফিরেশতা উচ্চৈঃস্বরে তাহার নামায পড়ার সাক্ষ্যদান করেন। অতএব নামাযী যদি একথা বুঝিতে পারে যে, আমি কাহার নামায পড়িতেছি, তবে আর সে নামাযের মধ্যে এদিকে সেদিকে খেয়াল করিতে পারে না। কোন কোন বোযর্গের মতে নামাযের মধ্যে এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নামায নষ্ট হইয়া যায়। নামাযের মূল-মর্যাদা এবং আদব বিনষ্ট হয়।

নামাযের মধ্যে কুকুরের ন্যায় বসা, ইমামের কাজের বিপরীত করা, সিজদাহর সময় উভয় হাত মাটিতে বিছাইয়া দেওয়া, উরুদেশ বক্ষের সহিত মিলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলিও নামাযের মধ্যে অবাঞ্ছিত। সিজদাহর সময়ে আঙ্গুলসমূহ মিলাইয়া রাখিবে, কাপড় পায়ের গিড়া হইতে উঠাইয়া পড়িবে, যেন মাটিতে ঝুলিয়া না থাকে। এগুলিও নামাযের মধ্যে অবাঞ্ছিত কাজ। নামাযের মধ্যে দাঁত খেলাল করা, মুখের ভিতরে কোন খাদ্য বস্তু রাখা, সিজদাহর স্থান ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা, নামাযের মধ্যে পরিহিত কাপড় বা দাড়ির সহিত খেলাল করা ইত্যাদি কাজও নামাযের মধ্যে নীতির খেলাফ।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, একাগ্রতার সাথে নামায না পড়িলে আল্লাহ তাহা কবুল করেন না।

একবার হুযুরে পাক (দঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাড়ি নাড়াচাড়া করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, লোকটির মনে আল্লাহর ভয় থাকিলে সে এইরূপ করিত না। বরং ভয়ে তাহার শরীর কাঁপিত।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) একবার দেখিলেন, এক ব্যক্তি কঙ্কর দ্বারা খেলিতেছে আর বলিতেছে, হে খোদা! আমাকে জনৈকা হুর দান কর এবং তাহার সাথে আমার বিবাহ করাইয়া দাও। ইমাম হাসান (রাঃ) বলিলেন, তুমি তো বেশ লোক দেখিতেছি! আল্লাহর নিকট হুর চাহিতেছ, অথচ তুমি কঙ্কর দ্বারা খেলা করিতেছ। তোমার প্রার্থনার ভিতরে তো কাজের সহিত কোন মিলই নাই।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহার সে অভ্যাস বর্জন করা আবশ্যক। নতুবা তাহার চক্ষু ঐভাবে ঊর্দ্ধ দিকেই থাকিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে নামাযী যে প্রকার একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে, তাহার সেই একাগ্রতার পরিমাণ হইতে অর্দ্ধেকের এক দশমাংশ পর্যন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

আর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোন নামাযী চারিশত নামাযের, কেহ দেড়শত নামাযের, কেহ সত্তর নামাযের? আবার কেহ পঞ্চাশ, কেহ সাতাশ আবার কেহবা শুধু এক নামাযের জন্য শুধু একই নামাযের পুণ্য হাসিল করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সর্বদা প্রথম তাকবীরের সাথে কাবা গৃহে নামায আদায় করে, সে চারিশত নামাযের ছওয়াব পায়, দুইশত নামাযের ছওয়াব লাভ করেন জামাতের ইমাম সাহেব। কেননা নামাযের আহকাম অবগত বলিয়া লোক তাহাকে ইমাম বানাইয়াছে। দেড়শত নামাযের পুণ্য অর্জন করে মুয়াযযিন।

মেসওয়াক করতঃ ভালভাবে অজু করিয়া জামে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়কারী সত্তর নামাযের পুণ্য হাসিল করে। যে ব্যক্তি জামে মসজিদে ইমামের সাথে নামায আদায় করে, প্রথম তাকবীর না পাইলেও সে পঞ্চাশ নামাযের ছওয়াব হাসিল করে। মসজিদের জামাতের সাথে প্রথম তাকবীর যে পায় সে সাতাশ আর যে প্রথম তাকবীর পায় না, সে দশ নামাযের ছওয়াব হাসিল করে। একাকী নামায আদায়কারী গরীব বৈ কি। সে মাত্র একই নামাযের ছওয়াব হাসিল করে।

আর যে ব্যক্তি মোরগের ঠোকরের ন্যায় নামায আদায় করে, সে হতভাগ্য। কেননা সে এক নামাযের পুণ্য হইতেও মাহরুম থাকে। এই ব্যক্তির নামায পুরাতন কাপড়ের ন্যায় জড়াইয়া নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এই ব্যক্তি উহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলেন, তুমি যেমন নামাযের প্রতি উদাসীন, আল্লাহও তোমার প্রতি তেমনই উদাসীন।

নামাযের আরকান আহকাম এবং ওয়াজিব সম্পর্কিত নসিহত

তোমরা কাহাকেও নামাযের আরকান, আহকাম ও ওয়াজিবাদি ও আদব পরিত্যাগ করিতে দেখিলে উহা শোধরাইয়া দিবে। তাহাতে তাহার সারা জীবনের উপকার হইবে এবং সে ইতিপূর্বে যে ভুলসমূহ করিয়াছে, তাহার আর পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। বরং পূর্বকৃত ভুলের জন্য তওবাহ ইস্তেগফার করিবে। যদি কেহ নামাযের মধ্যে কাহাকে ভুল করিতে দেখিয়া কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে, তবে সে নিজেই গুনাহগার হইবে।

এক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন আলেম ব্যক্তি কোন মূর্খ ব্যক্তিকে বাতাইয়া না দিলে আলেম ব্যক্তি পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

অত্র হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হইল যে, মূর্খকে শিক্ষাদান করা আলেমের পক্ষে ওয়াজিব। ওয়াজিব না হইলে হুযুর পাক (দঃ) আলেমের চুপ করিয়া থাকাকে তাহার ক্ষতির কারণ বলিতেন না।

বেলাল ইবনে সাআদ বলেন, পাপ যতক্ষণ গোপন থাকে, ততক্ষণ পাপকারকেরই ক্ষতি করে। আর যখন উহা প্রকাশ পায় তখন উহা জনসাধারণেরও ক্ষতি করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি কেহ কাহাকে নামাযের আরকান এবং আদব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াও নীরব থাকে তবে যে ব্যক্তি গুনাহগার হয় এবং মালউন শয়তানের ন্যায় কাজ করে। কেননা সে খারাপ কাজের সংশোধন করা ও পরহেজগারীর সাহায্য করা হইতে বিরত রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা এই প্রসঙ্গে এরশাদ করিয়াছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা পরহেজগারী ও সৎকাজে সাহায্য কর।

প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে পরস্পরকে হেদায়াত এবং নসিহত করা ওয়াজিব। আর শয়তানের ইচ্ছা হইল, যেন এইরূপ কাজ করা না হয়, যেন ইসলাম ধ্বংস হয় এবং সমস্ত মুসলমানই যেন পাপী হয়। সুতরাং জ্ঞানীদের কর্তব্য শয়তানের ইচ্ছার বিপরীত করা।

আল্লাহ বলেন, হে বনি আদম! শয়তান তোমাদের আদি পিতামাতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছে। সে তোমাদেরকেও যেন বিপদাপন্ন না করে। আল্লাহ পাক আরও বলেন, শয়তান তোমাদের শত্রু, তোমরাও শয়তানকে শত্রু মনে কর। শয়তান সর্বদা তাহার সম্প্রদায়কে তাহার সহিত দোজখে থাকার পরামর্শ দান করে।

নামায, যাকাত এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাতের অসম্পূর্ণতা থাকার কারণ হইল আলেম, ফকীহ এবং জ্ঞানবানদের উপদেশ দান না করা ও লোককে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা। ইহার ফলে প্রথমতঃ জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে উহার প্রতিক্রিয়া তাহাদের নিজেদের উপরও পতিত হয়। যদি কোন মুসলমান বা ইয়াহুদীকে কাহারও নগণ্য বস্তু চুরি করিতে দেখে, তবে চোরকে সকলেই খারাপ-মন্দ বলে ও মারধর করে। অথচ কোন মুসলমান নামাযীকে নামাযের আহকাম, আরকান, ওয়াজিব, আদব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সকলেই নীরব থাকে। কেহই পরিত্যাগকারীকে সাবধান করে না বা ভুল শোধরাইয়া দেয় না এবং এই নামায চুরি করা হইতে তাহাকে বারণ করে না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে চুরি করে, সে-ই জঘন্যতম চোর। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! নামাযের মধ্যে চুরি করার অর্থ কি?

হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, নামাযে যথাযথভাবে রুকু সিজদাহ না করাই হইল নামাযের মধ্যে চুরি করা।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদেরকে বড় চোর সম্বন্ধে বলিব কি?

লোকগণ বলিলেন, জী হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)!

হযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি ঠিকমত নামাযে রুকু সিজদাহ আদায় করে না, সেই বড় চোর।

আবদুল্লাহ ইবনে আলী কিংবা আলী ইবনে শীবান বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রুকু সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তাহার নামাযের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টিপাত করেন না। অর্থাৎ ঐ নামায আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার যোগ্য নহে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা হুযুরে পাক (দঃ) মসজিদের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, এমনি সময়ে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামায আদায় করতঃ হুযুরে পাক (দঃ)-কে সালাম করিল। তিনি সালামের জবাব দিয়া বলিলেন, তুমি আবার নামায আদায় কর। তোমার নামায হয় নাই। তখন সে ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় নামায আদায় করিয়া হুযুরে পাক (দঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইল। হুযুরে পাক (দঃ) পুনরায় তাহাকে নামায পড়িতে বলিলেন। লোকটি এইভাবে তিনবার নামায আদায় করিয়া তারপর বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যে মাবুদ আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার শপথ, যে নামায উত্তম (নিখুঁৎ) তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিলেন, নামায পড়ার নিয়ত করিলে প্রথমে ভালভাবে অজু কর। তারপর কিবলামুখী হইয়া তাকবীর বল। তারপর তোমার পক্ষে সহজ সরল কোরআনে পাকের কোন সূরা পাঠ কর। সূরা কিরাত পাঠ করার পরে রুকুতে যাও আমার অনুরূপ রুকুতে থাকিয়া সোজা হইয়া যাও। তারপর আমার মত সিজদায় চলিয়া যাও। এই ভাবে তোমার নামায শেষ কর।

রাতের নামায সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস

হযরত শফীক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে, একদা হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে কতিপয় ব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! অমুক ব্যক্তি সারা রাত ঘুমাইয়া থাকে। এমনকি ভোরে উঠিয়া সে ফজরের নামায আদায় করে না। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, শয়তান উহার কানে পেশাব করিয়া দেয়।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, মানুষ রাতে নিদ্রা যাইবার পর শয়তান তাহার মাতার চুলে তিনটি গিরা দেয়। যে ভোরে উঠিয়া আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন সে অজু করে, তখন তাহার দ্বিতীয় গিরাটি খুলিয়া যায়। তারপর যখন সে দুই রাকাত নামায আদায় করে, তখন তাহার বাকী গিরাটিও খুলিয়া যায়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। শয়তান ঘুমন্ত মানুষের নাকের মধ্যে একটি বস্তু লাগাইয়া দেয়। আর একটি বস্তু সে মুখে লাগাইয়া দেয়। আর তৃতীয় বস্তুটি মানুষের দেহের উপরে ছিটাইয়া দেয়। মানুষ যখন নাকে প্রদত্ত সেই বস্তুটির ঘ্রাণ শুকিয়া লয়, তখন তাহার স্বভাব খারাপ হইয়া যায়। মুখে লাগানো বস্তুটি যদি সে চাটিয়া মুখের ভিতরে নেয় তবে তাহার মুখ হইতে কুকথা বাহির হইয়া থাকে। আর যে বস্তুটি শয়তান ছিটাইয়া দেয় তাহা দেহে লাগিয়া গেলে সে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত সারারাত মৃতের মত ঘুমাইয়া থাকে।

রাতের নামাযে কিয়াম দীর্ঘ করা সুন্নত। দিনের নামাযে রুকু সিজদাহ বেশী করা সুন্নত। অবশ্য দিবাভাগে এক সালামে চার রাকাত পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয।

সালেম (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বলেন, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর যমানায় যখন কেহ কোন স্বপ্ন দেখিতেন, তখন উহা খোদ হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে বয়ান করিতেন। আমিও মনে মনে এই আশা পোষণ করিতাম যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখিলে তাহা হুযুর (দঃ) এর কাছে বর্ণনা করিব। শেষ পর্যন্ত আমার এই মনোবাসনা আল্লাহ পুরা করিলেন। আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম যে, দুইজন ফিরেশতা আমাকে ধরিয়া দোজখের দিকে নিয়া চলিলেন। দোজখের নিকটে পৌঁছিয়া আমি কতিপয় লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমার পরিচিত লোক ছিল। এই সময় আমি পাঠ করিলাম, আউযুবিল্লাহি মিনান্নার (আমি দোজখ হইতে আল্লাহর নিকট নিষ্কৃতি কামনা করিতেছি) এই কলেমা পাঠ করা মাত্রই আর একজন ফিরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন, কোন চিন্তা করিও না। সাথে সাথে আমি জাগ্রত হইয়া গেলাম।

আমি আমার স্বপ্নটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রাঃ) কাছে বর্ণনা করিলাম। তিনি ইহা হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। হুযুর (দঃ) শুনিয়া এরশাদ করিলেন, আবদুল্লাহ উত্তম ব্যক্তি। সে রাতে নামায আদায় করে।

সালেম বলেন, এই ঘটনার পর হইতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাতে খুব অল্প সময়ই নিদ্রা যাইতেন। অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি নামায পড়িয়া কাটাইতেন।

আবু সালমা বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) আমাকে এরশাদ করিয়াছেন যে, তুমি ঐরূপ লোকের মত হইও না, যে আগে রাতে খুব বেশী নামায পড়িত কিন্তু পরে তাহা পরিত্যাগ করিল।

হযরত আবু ছালেহ সনদ পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) হইতে বলেন, তিনি এরশাদ কারয়াছেন যে, এক রাতে হুযুরে পাক (দঃ); আমি এবং তাঁহার কন্যা হযরত ফাতিমার (রাঃ) নিকট তাশরীফ আনিলেন। আমরা উভয়ে তখন শায়িত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা রাতের নামায আদায় করিবে না? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমাদের জানের মালিক আল্লাহতায়ালা। যদি তিনি আমাদেরকে রাতের নামাযের জন্য জাগাইয়া দিতে চাহেন, তবে তিনি আমাদেরকে জাগাইয়া দিবেন। আমার একথা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিজের জানু মুবারকের উপর হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া এরশাদ করিলেন, মানুষ বড় কথা কাটিতেছে।

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, লোকগণ যদি রাতে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে, তবে তাহার ফজীলত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে অধিক। যদি আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করিতাম, তবে উহা তাহাদের উপর আমি ফরয করিয়া দিতাম।

শায়খ আবু নসর পরম্পরায় আবু মুসলিমের কওল নকল করেন, তিনি বলেন যে, আমি হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন সময়ের নামায সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি বলেন যে, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট বিষয়টি আরজ করিলাম, তিনি এরশাদ করিলেন, মধ্য রাতের নামায রাতের অন্যান্য নামায হইতে উৎকৃষ্ট কিন্তু এই নামায আদায়কারীদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! আমি তোমার ইবাদাত করিতে চাই। তবে তাহার জন্য কোন সময়টি অত্যুত্তম? এই প্রসঙ্গে হযরত দাউদ (আঃ)এর উপর অহী অবতীর্ণ হইল ঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, হে দাউদ! রাতের প্রথম অংশে বা শেষ অংশে নামায পড়িও না। যে ব্যক্তি রাতের প্রথম অংশে নামায পড়িবে, সে শেষ অংশে ঘুমাইয়া পড়িবে, আর যে শেষ অংশে নামায পড়িবে, সে প্রথম অংশে ঘুমাইয়া থাকিবে। তাই তুমি রাতের মধ্যম অংশে নামায পড়িও। তখন কেবল তুমি আর আমিই থাকিব। তোমার ও আমার মধ্যে অন্য কেহই থাকিবে না। সেই সময় তুমি তোমার মনের বাসনাসমূহ অবাধে আমার নিকট প্রকাশ করিবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মুখতার (রহঃ) বলেন, হাসান বছরী (রহঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মধ্য রাতে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা অপেক্ষা মানুষের চোখ শীতল করা, পিঠকে পাপের বোঝা হইতে হালকা রাখা এবং মনকে খুশী ও আনন্দিত করিয়া তোলার জন্য উত্তম আর কোন আমল নাই।

কবরের সংকট মুক্তি ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকগণ! তোমরা কবরের সঙ্কট দূর করার জন্য রাতের অন্ধকারে নামায পড়। রোজকিয়ামতের ভীষণ উত্তাপ হইতে বাঁচার জন্য রোযা রাখ। কঠিন দিনের ভীতিমুক্তির জন্য দান ছদকা কর। হে লোকগণ! আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষী।

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে তাশরীফ আনিয়া বলিতে থাকেন, কে আছে, যে আমার নিকট প্রার্থনা করিবে? আমি তাহা কবুল করিব। কে আছে, যে আমার নিকট ক্ষমার আবেদন করিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা প্রদান করিব। কে আছে, যে আমার নিকট রুজীর জন্য নিবেদন করিবে? আমি তাহাকে রুজী দান করিব। কে আছে, যে আমার নিকট দুঃখ দুর্দশা মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানাইবে, আমি তাহার দুঃখ দুর্দশা মোচন করিয়া দিব। আল্লাহতায়ালা রাত অবসান হওয়া পর্যন্ত এইরূপ ঘোষণা করিতে থাকেন।

হযরত আবু ইমামাহ বাহেলী বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করা হইল যে, রাতের কোন্ অংশে দোয়া প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে অধিক কবুল হইয়া থাকে? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, শেষ রাতে ও ফরজ নামাযসমূহের পরে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট রোযা হইল হযরত দাউদ (আঃ) এর রোযা। তিনি একদিন বাদে একদিন রোযা রাখিতেন, আর একদিন বে-রোজা থাকিতেন। এইভাবে বৎসরে তাঁহার ছয় মাস রোযা রাখা হইত। আর সর্বোৎকৃষ্ট নামাযও হইল হযরত দাউদ (আঃ)এর নামায। তিনি রাতের প্রথমার্ধ নিদ্রা যাইতেন এবং শেষার্দ্ধ নামায পড়িয়া কাটাইতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও বলেন যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামায আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল। তিনি অর্দ্ধেক রাত্র শয়ন করিতেন এবং বাকী অর্দ্ধেক নামায পড়িতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাতকে তিন ভাগ করিয়া উহার একভাগে নামায আদায় করি, একভাগে নিদ্রা যাই আর একভাগে হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাদীসসমূহ স্মরণ এবং আলোচনা করি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাতের নামাযের ফজীলত দিনের নামায অপেক্ষা এইরূপ বেশী যেমন ভাবে অপ্রকাশ্য দান ছদকার ফজীলত প্রকাশ্য দান ছদকা অপেক্ষা বেশী।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন যে, রাতের এক রাকাত নামাযের ফজীলত দিনের দশ রাকাত নামায অপেক্ষা অধিক। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) ফিরেশতা জিব্রাইলের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাতের কোন সময়টিতে দোয়া আল্লাহর নিকট অধিক কবুল হইয়া থাকে?

ফিরেশতা জিব্রাইল জবাবে বলিলেন, সেহেরীর সময় তথা শেষ রাতে আরশে মুআল্লায় কম্পন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তখন আল্লাহতায়ালা তাহার আসন হইতে প্রথম আসমানে নামিয়া আসেন।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা রাতে নামায আদায় করাকে নিজেদের উপর লাযেম করিয়া লও। কেননা ইহা তোমাদের অতীত যুগের নেককার বান্দাদের অভ্যাস এবং আদব ছিল। (স্মরণ রাখিবে) রাত্রি জাগরণ আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের উসিলা এবং পাপ বিলুপ্তি, পাপ প্রতিরোধ ও শারীরিক মানসিক রোগ-ব্যাধি দূর করার লক্ষ্যে প্রধান অবলম্বন।

শায়খ আবু নসর (রহঃ) সনদ পরম্পরায় বলেন, হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রাতে এমন একটি নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, যে সময়টিতে বান্দা আল্লাহর দরবারে কোন কিছু প্রার্থনা করিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাহা অবশ্যই পুরা করিয়া দেন। এই নির্দিষ্ট সময়টি প্রত্যেক রাতের মধ্যেই রহিয়াছে। মোটকথা, প্রত্যেক রমজানের শেষ দশদিনের মধ্যে শবে কদর এবং প্রত্যেক শুক্রবার দোয়া কবুলিয়তের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, ঠিক সেইভাবেই প্রত্যেক রাতের ভিতরে দোয়া কবুলিয়তের একটা নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

হযরত আমর ইবনে উকবাহ বলেন, হাদীস শরীফে আছে, তোমরা শেষ রাতের নামাযকে নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করিয়া লও। কেননা, এই নামায নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে মকবুল ও পছন্দনীয়। দিবা-রাতের সমস্ত ফিরেশতা ঐ সময়টিতে হাজির এবং সমবেত হইয়া থাকেন।

বিশিষ্ট লোকের নামায

আল্লাহর কতিপয় প্রিয় বান্দার নামাযের ধরন নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

বর্ণিত রহিয়াছে, ইউসুফ ইবনে এসাম খোরসানের জামে মসজিদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বেশ কিছু সংখ্যক লোক খোদাভীতি, বৈরাগ্য এবং তাছাওফ সম্পর্কিত আলাপালোচনায় রত রহিয়াছেন। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার অনুসরণ করিতেছ? তাহারা বলিলেন, আমরা হাতেম আসেমের অনুসারী।

ইউসুফ তখন তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি ইহাদিগকে নামায সম্পর্কিত কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। খাঁটি উত্তর পাইলে এইখানেই থাকিয়া যাইব।

অতঃপর ইউসুফ (রহঃ) হাতেম (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ জিজাসা করিলেন, আচ্ছা, বলুন তো নামায কি? হাতেম (রহঃ) বলিলেন, নামাযের মারেফাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, না উহার আদব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে?

ইউসুফ (রহঃ) বলিলেন, আদব সম্বন্ধেই বলুন।

হাতেম (রহঃ) বলিলেন, নামাযের আদব হইল, নামাযে দাঁড়াইবার কালে আল্লাহর নির্দেশে দাঁড়াইবে। যখন নামায আদায় করিতে যাইবে, পুণ্যার্জনের নিয়তে যাইবে। পাক-পবিত্রতার সাথে নামাযে দাঁড়াইবে। যখন নামাযের তাকবীর বলিবে, সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে বলিবে। খুব ধীরে-সুস্থে

বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করিবে। রুকুতে যাইতে বিনম্রতার সাথে যাইবে। সিজদায় একাগ্রতা রক্ষা করিবে। আন্তরিকতার সাথে তাশাহুদ পাঠ করিবে এবং কোমলান্তঃকরণে সালাম ফিরাইয়া নামায সমাধা করিবে।

অতঃপর ইউসুফ (রহঃ) তাঁহার সঙ্গীদের অনুরোধে হাতেমের (রহঃ) নিকট নামাযের মারেফাত সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিলেন।

জবাবে হাতেম (রহঃ) বলিলেন, নামাযী ব্যক্তি মনে করিবে যে, বেহেশত তাহার ডান দিকে, দোজখ বাম দিকে, পুলসিরাত পায়ের নীচে, মিযান চোখের সামনে। আর অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা রাখিবে যে, আমি আল্লাহ্ তায়ালাকে সামনে দেখিতেছি। যদি এতটা না পার তবে, মনে করিবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখিতেছেন।

ইউসুফ (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কতদিন পর্যন্ত এইভাবে নামায আদায় করিতেছেন?

হাতেম (রহঃ) জবাব দিলেন, বিশ বৎসর পর্যন্ত। তাঁহার কথা শুনিয়া ইউসুফ (রহঃ) তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমাদের বিগত পঞ্চাশ বছরের নামায কাজা আদায় করা উচিত। তারপর আবার হাতেম (রহঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই অবস্থা কিভাবে অর্জন করিলেন?

হাতেম (রহঃ) বলিলেন, তোমাদের কিতাব হইতে। যাহা তোমরা আমাদের সামনে অধ্যয়ন করিয়া থাক।

আবু হাযেম হারেস বর্ণিত একটি হাদীসও ঠিক এই প্রকার। তিনি বলেন যে, নদীর তীরে একজন সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হাযেম! তুমি কি তোমার জানা মতে উত্তমরূপে নামায আদায় কর?

আবু হাযেম বলেন যে, আমি বলিলাম, হাঁ, আমি নামাযের ফরজ ও সুন্নতসমূহ ভালভাবেই অবগত আছি।

সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে বল তো নামাযের পূর্বে ফরজ কি কি? আমি বলিলাম, শরীর পবিত্র থাকা, সতরে আওরাত ঢাকা, নামাযের জায়গা পবিত্র থাকা, দাঁড়াইয়া নামায পড়া, নামাযের নিয়ত করা ও কিবলামুখী হওয়া।

সাহাবী ঃ তুমি মসজিদে কেন যাও?

আবু হাযেম ঃ আল্লাহর দীদার লাভোদ্দেশ্যে।

সাহাবী ঃ মসজিদে প্রবেশ কর কোন্ নিয়তে?

আবু হাযেম ঃ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে।

সাহাবী ঃ নামাযে এমন কি রহিয়াছে, যাহা করিলে নামায ছাড়া আর সব কিছু হারাম হইয়া যায়?

আবু হাযেম ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলিলে অন্য সবকিছু করা হারাম হইয়া যায়।

সাহাবী ঃ কোন কাজ করিলে আবার সবকিছু হালাল হইয়া যায়?

আবু হাযেম ঃ দুই দিকে সালাম ফিরাইলে।

সাহাবী ঃ নামাযের কুঞ্জী বা চাবি কোন বস্তু?

আবু হাযেম ঃ নামাযের কুঞ্জী অজু। অজু করিবার পর নামাযের দরজা খুলিয়া যায়।

এইভাবে আরও প্রশ্নোত্তর হইতে থাকে যে, নিয়তের চাবি ইয়াকীন। ইয়াকীনের চাবি তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের চাবি ভয়। ভয়ের চাবি আশা। আশার চাবি সন্তুষ্টি। সন্তুষ্টির চাবি আনুগত্য।

এইভাবে বহু প্রশ্নোত্তরের পর সাহাবী বলিলেন, আবু হাযেম! তুমি বেহেশতের সর্বোত্তম স্তরের চাবি লাভ করিয়াছ।

আবু হাযেম বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পানাহারের ভিতরেও কি ফরজ ও সুন্নত আছে?

সাহাবী বলিলেন, হ্যাঁ, পানাহারের মধ্যেও ফরজ, সুন্নত এবং মুস্তাহাব আছে। যেমন ফরজ চারিটি।

যথা ঃ (ক) বিসমিল্লাহ্ বলা, (খ) আল্লাহর শোকর করা, (গ) আল্লাহর প্রশংসা করা (ঘ) আহার্য দ্রব্যের পরিচয় জানা।
সুন্নতও চারিটি। যথা ঃ (ক) বাম পাশে ভর করিয়া বসা, (খ) তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করা, (গ) উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া (ঘ) সর্বশেষে আঙ্গুল চাটিয়া খাওয়া।
মুস্তাহাবও চারিটি। যথা ঃ (ক) খাওয়ার পূর্বে উভয় হাত উত্তমরূপে ধৌত করা (খ) ছোট ছোট লোকমা মুখে দেওয়া (গ) নিজ নিজ সম্মুখের খানা খাইতে শুরু করা (ঘ) অন্যের খাওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত না করা। হুযুরে পাক (দঃ)-এর পানাহারের রীতি এইরূপ ছিল।

রাতের নামায

রাতে ইবাদাতকারীদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ*

অর্থাৎ—রাতে তাহারা খুবই কম নিদ্রা যাইত এবং সকালে তাহারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।
আল্লাহতায়ালা আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا *

অর্থাৎ—এবং রাতে তাহাজ্জুদ আদায় কর। ইহা তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত করিবেন।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন রোজকিয়ামতে লোকদিগকে সমবেত করা হইবে, তখন এক ব্যক্তি আওয়াজ দিয়া বলিবেন যাহারা রাতে শয়ন করিত না, আল্লাহর ভয়ে এবং বেহেশতের আশায় রাত ইবাদাতে অতিবাহিত করিত, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াও। এই আহ্বানে অতি অল্প সংখ্যক লোকই উঠিয়া দাঁড়াইবে। সাথে সাথেই আবার বসিয়া পড়িবে। একটু পরেই আবার বলা হইবে, যাহারা সুখে-শান্তিতে, বিপদ-আপদে আল্লাহর উপরে ধৈর্যশীল ছিলে, তাহারাও উঠিয়া দাঁড়াও। এই শ্রেণীর লোকও খুব কম হইবে। তারপর হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দিনে রোযা রাখিবার ইচ্ছা করিলে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য রাত্রে সেহরী খাও। যে ব্যক্তি রাতভর নিদ্রা যায়, সে ভোরবেলা দারিদ্র্যের ন্যায় ঘুম হইতে উঠে। যে ব্যক্তি রাতভর নিদ্রা যায়, শয়তান তাহার কানে পেশাব করিয়া দেয়।
হুযুরে পাক (দঃ) কখনও কখনও একটি মাত্র আয়াত বার বার পাঠ করিয়াই রাত অতিবাহিত করিতেন।
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার শয্যায় শয়ন করেন। আমার দেহ তাঁহার পবিত্র দেহের সহিত সংস্পর্শিত হইতেই তিনি এরশাদ করিলেন, আয়েশা! তুমি অনুমতি দিলে আমি আজ রাতে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হইতাম। আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ, আপনার সান্নিধ্য আমার একান্ত ও পরম কাম্য। তবু আপনার অভিরুচি অনুসারে কাজ করাই আমার উচিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমার এই কথা শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া কোরআন পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চোখ হইতে অশ্রুর ধরা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাহার উভয় স্কন্ধ ভিজিয়া গেল। তারপর আবার বসিয়া পড়িলেন এবং তদবস্থায় কোরআন পড়িতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র চোখের পানিতে তাঁহার কোমর পর্যন্ত সিক্ত হইয়া গেল।

তারপর তিনি এক পাশে ভর দিয়া শয়ন করতঃ কোরআন তেলাওয়াত করিতে শুরু করিলেন। এ সময় তিনি এত বেশী ক্রন্দন করিলেন যে, অশ্রু ধারায় যমিন পর্যন্ত ভিজিয়া গেল।

ঠিক এমনি সময় সেখানে হযরত বেলাল (রাঃ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার জন্য আমার জনক জননী কোরবান। আল্লাহ তো আপনাকে পূর্বাহ্নেই মাফ করিয়াছেন। তথাপি আল্লাহর ভয়ে আপনি এত বেশী কাঁদিতেছেন কেন?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ওহে! আমি কি আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? আজ রাতে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত শরীফ নাযিল করিয়াছেন। (যাহার অর্থ এই) নিঃসন্দেহে আসমান যমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের বিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। যাহারা দাঁড়ানো, উপবিষ্ট এবং শায়িতাবস্থায় আল্লাহতায়ালার যিকির করে, আসমান যমিনের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে, তাহারা নিবেদন করে যে, হে প্রভু! তুমি এই সমস্ত নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই। তুমি মহা পবিত্র, (তুমি) আমাদিগকে (দোজখের) আগুন হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-কে কখনও বসিয়া নামায আদায় করিতে দেখি নাই। তবে শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে (কখনও) বসিয়া নামায পড়িতেন। সূরার ত্রিশ, চল্লিশ আয়াত বাকী থাকিতে দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং তাহা পাঠ শেষ করিয়া রুকু করিতেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শীতের মৌসুম মানুষের জন্য খুবই উত্তম। কেননা সে সময় দিন ছোট এবং রাত বড়। এই সময়ে দিনে রোযা এবং রাতে ইবাদাত করা উচিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাতে মানুষের চোখে নিদ্রা ছাপাইয়া আসিলে তখনই কোরআন পাঠের প্রশস্ত সময়। মানুষের পানাহারের সময়ে রোযার কথা, হাসি-তামাসার সময়ে দুঃখ-দুর্যোগের কথা স্মরণ করা চাই। মানুষ যখন হালাল হারামে পার্থক্য না করে, তখন পরহেজগারী, মানুষের সুখ-শান্তির পরিবেশে দুঃখ-দুর্দশা, আমোদ-প্রমোদের কালে চিন্তা-ভাবনা এবং বেশী কথাবার্তার কালে নীরবতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাজের বিপরীত কাজ বা অবস্থার স্মরণ বা উহা অবলম্বন করাই উত্তম পথ।

হুযুরে পাক (দঃ)-এর রাতের নামায

আবু ইসহাক বলেন, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ আমার ভাই এবং বন্ধু ছিলেন। আমি একবার তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, আসওয়াদ! হুযুরে পাক (দঃ)-এর নামায আদায় সম্পর্কে তুমি হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট যাহা শুনিয়াছ, তাহা আমাকেও শুনাইয়া দাও।

তখন আসওয়াদ বলিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) আমার নিকট এরশাদ করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) রাতের প্রথম ভাগে নিদ্রা যাইতেন এবং শেষ ভাগে ইবাদাত করিতেন। আর যদি তাঁহার বিবিদের কাছে হাজত থাকিত তবে হাজত পুরা করিতেন এবং পানি ব্যবহার (গোসল) ব্যতিরেকেই শয়ন করিতেন। তারপর (মধ্য রাতের পরে) যখন পহেলা আযান শ্রবণ করিতেন, তখন খুবই ত্রস্ততার সাথে উঠিয়া পড়িতেন। অতঃপর তিনি গোসল করিতেন। আর গোসলের প্রয়োজন না হইলে শুধু অজু করিতেন। তারপর নামাযে মশগুল হইতেন।

কুরাইব (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, আমি এক রাতে আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করিলাম। আমি এক বিছানায় শয়ন করিলাম, আর হুযুরে পাক (দঃ) ও আমার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা অন্য শয্যায় শয়ন করিলেন। যখন রাতের অর্ধেক কিংবা তাহার সামান্য রাত অতিক্রান্ত হইল, তখন হুযুরে পাক (দঃ) জাগ্রত হইয়া প্রথমে নিদ্রার ভাব কাটাইয়া দিয়া সূরা আলে ইমরানের শেষের দশটি আয়াত পাঠ করিলেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া

গেলেন এবং তাঁহার লটকানো মোশকের পানি দ্বারা উত্তমরূপে অজু করিলেন। তারপর নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। এসময় আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং হুযুরে পাক (দঃ)-এর অনুরূপ আমল করতঃ তাঁহার-ই এক পার্শ্বে নামাযে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তাঁহার সাথে দুই দুই রাকাত করিয়া মোট দশ রাকাত নামায আদায় করিলাম। তারপর বেতের নামায পড়িলাম। ইহার পরে আরাম লওয়ার জন্য হুযুরে পাক (দঃ) একটু বিশ্রাম নিলেন।

অতঃপর ফজরের নামায নিকটবর্তী হইলে মুয়াযযিন আসিয়া যখন সংকেত দিলেন, তখন হুযুর (দঃ) উঠিয়া সংক্ষিপ্তাকারে দুই রাকাত নামায পড়িলেন, তারপর হুজরার বাহিরে মসজিদে গিয়া জামাতের সাথে ফরজ নামায আদায় করিলেন।

আবু সালমাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-কে শেষ রাতে আমার পার্শ্বে আরাম রত অবস্থায় পাইয়াছি। অর্থাৎ তিনি বেতের নামায পড়িয়া অবসর হইয়া আমার শয্যায় আসিয়া আরাম করিতেন।

মাসরুক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) যে কোন নেক অভ্যাসের পায়বন্দীকে খুবই পছন্দ করিতেন। মাসরুক বলেন, আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযুরে পাক (দঃ) রাতের নিদ্রা কখন ত্যাগ করিতেন? তিনি বলিলেন, যখন মুরগায় শেষ বাগ দিত, তাহা শুনিয়াই তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাতে অবশ্যই কিছু ইবাদাত করিও, তাহা চার রাকাত কিংবা দুই রাকাত নামাযই হোক না কেন। কারণ এই যে, যে গৃহে নামায পড়া হয়, সেই গৃহে রাতে জনৈক আওয়াজ দাতা আসিয়া এইরূপ আওয়াজ দিতে থাকেন যে, হে গৃহবাসী! তোমরা ওঠ, উঠিয়া নামায পড়িয়া লও।

আবু সালমাহ (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবীর খোশ এলহানে কোরআন তেলাওয়াত যেমনভাবে শ্রবণ করেন, তেমনভাবে অন্য কিছুই শ্রবণ করেন না।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) একদা রাতের নামাযে এক ব্যক্তির কিরাত পাঠ শ্রবণ করিয়া এরশাদ করিলেন, আল্লাহ উহার উপর রহমত নাযিল করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিল, যাহা আমি অমুক সূরা হইতে বাদ দিয়াছিলাম।

শায়খ আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) রাতে তের রাকাত নামায এবং দুই রাকাত ফজরের সুন্নত নামায আদায় করিতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (দঃ) রাতে বার রাকাত নামায পড়িতেন। কোন এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, তিনি রাতে দশ রাকাত নামায আদায় করিতেন।

মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নফল

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি ইহা পড়ি না, তবে যদি কেহ ইহা পড়ে, তবে তাহাতে কোন দোষেরও কিছু নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নফল আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এরশাদ করিলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর যমানায় আমি ইহা কাহাকেও পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কাহাকেও ইহা পড়িতে নিষেধও করেন নাই।

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এর যমানায় সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামাযের পূর্বে আমরা দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিতাম। আমি হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি নিজেও কি পড়িতেন? তিনি উত্তর করিলেন, আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-কে পড়িতে দেখিতাম, কিন্তু হুযুর (দঃ) কাহাকেও ইহা পড়িতে নির্দেশ করেন নাই আবার কাহাকেও নিষেধও করেন নাই।

ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন যে, এক সময়ে কুফা নগরীতে বড় বড় বোযর্গ সাহাবীগণ অবস্থান করিতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাঃ), হযরত হোজায়ফা (রাঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) এবং হযরত আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়িতে দেখি নাই। তাহা ছাড়া হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও কখনও সূর্যাস্তের পর মাগরিবের পূর্বে নফল নামায পড়েন নাই।

মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামায ও তাহার ছওয়াব

আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মাগরিবের নামাযের পর কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া যে ব্যক্তি ছয় রাকাত নফল নামায পড়ে, সে বার বৎসর ইবাদাত করার ছওয়াব হাসিল করিয়া থাকে। যায়েদ ইবনে হাবীব বলেন, এই নামায আদায় করার সময়ে কোনরূপ কথাবার্তা বলিবে না। তিনি আরও বলেন যে, প্রথম দুই রাকাতের পহেলা রাকাতে সূরা ফতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিবে।

এই দুই রাকাত খুব তাড়াতাড়ি আদায় করিবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, মাগরিবের নামাযের সাথে সাথে এই দুই রাকাত নামায আল্লাহর দরবারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। বাকী চারি রাকাত নামায তাড়াতাড়ি কিংবা ধীরে ধীরে যেভাবে পড়া হউক কোন বাধা নাই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া মাগরিবের পর চারি রাকাত নামায আদায় করে, তবে তাহার সেই নামায ইল্লীয়্যীনে লইয়া যাওয়া হয়। মসজিদে আকছায় ক্বদর নামায পড়িলে যে ছওয়াব হাসিল হয়, এই নামাযে সেইরূপ ছওয়াব অর্জিত হয় এবং মধ্য রাতের নামায অপেক্ষা ইহা অধিক পুণ্যময়।

আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি তারেক ইবনে শেহাব হইতে, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মাগরিবের নামাযের পর কেহ চারি রাকাত নামায আদায় করিলে সে দ্বিতীয়বার হজ্জ্ব আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াবের অধিকারী হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি ছয় রাকাত নামায আদায় করে? হুযর (দঃ) এরশাদ করিলেন, তবে তাহার পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ্ মার্জিত হয়।

সাঈদ ইবনে জাবীন সাওবান হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে কোন জামে মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত ও নামায আদায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কথাবার্তা বা কাজ কর্ম না করে, তবে আল্লাহতায়ালার পক্ষে তাহার জন্য বেহেশতে দুইটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়। উহার প্রত্যেকটি প্রাসাদের দৈর্ঘ্য শত বছরের রাস্তার দৈর্ঘ্যের সমতুল্য। প্রত্যেকটি প্রাসাদে এমন একটি করিয়া বাগান থাকিবে, যাহাতে দুনিয়ার সমস্ত লোকের স্থান সংকুলান হইবে।

আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি হিশাম ইবনে আরওয়াহ হইতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, অন্যান্য নামাযাপেক্ষা মাগরিবের নামায আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা এই সময় দিনের শেষ এবং রাতের শুরু। মুকীম বা মুসাফির যেই হউক না কেন, এই নামায আদায়কারী সমান ছওয়াব লাভ করে।

মাগরিবের নামায আদায় করিয়া কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া চারি রাকাত নামায আদায় করিলে আল্লাহ তায়ালা ইয়াকুত ও মারওয়ারিদ দ্বারা নির্মিত দুইটি অট্টালিকা দান করিবেন। তাহাছাড়া দুইটি বাগানও দান করিবেন। উহার বিরাটত্ব ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ অবগত নহেন। আর যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কোন কথাবার্তা না বলিয়া ছয় রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহ তাঁহার চল্লিশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়া দেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নামায আদায় করিতেন।

হিশাম ইবনে আরওয়াহ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন ব্যক্তি বিশ রাকাত নামায আদায় করিলে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দিবেন।

আর একটি হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) উপরোক্ত নিয়মে নামায পড়িতেন আর বলিতেন, ইহাই রাতের উঠা। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ তাহার চাচার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, তিনি যখনই এই সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট যাইতেন, তখনই তাহাকে এইভাবে নামায পড়িতে দেখিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আদনা বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেহ মাগরিবের নামাযের পর সূরা সিজদাহ ও সূরা মূলক পাঠ করিলে রোজ কিয়ামতে তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।

মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের বোযর্গী ও ঐ সময়ের আমলের দরুন হযরত রাসূলে করীম (দঃ) কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে হাবীব হারেসী সাঈদ ইবনে সা'আদ হইতে, তিনি আবু তাইয়্যেবা কুরয ইবনে দারাহ হারেসী হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জনৈক আবদাল। একবার আমার একজন সিরিয়াবাসী বন্ধু কিছু উপঢৌকন সাথে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই উপঢৌকন কোথায় পাইলেন? তিনি জবাবে বলিলেন, ইব্রাহীম তামীমী আমাকে দিয়াছেন। আমি আবার বলিলাম, তিনি কোথায় পাইয়াছেন তাহা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, একদা আমি খানায়ে কাবার পার্শ্বে বসিয়া তাসবীহ-তাহলীল ও হামদ-নাতে মশগুল ছিলাম। এমন সময় মূল্যবান পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে সালাম করতঃ আমার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার পরিচয় কি এবং আপনি আসিলেনই বা কোথা হইতে?

তিনি বলিলেন, আমি খাজা খিজির। তোমার প্রতি আকর্ষণে আমি তোমাকে সালাম করিতে আসিয়াছি। তাহাছাড়া আমি তোমার জন্য একটি উপঢৌকন নিয়া আসিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উপঢৌকনটি কি?

তিনি উত্তর করিলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সাতবার সূরা ফাতিহা, সাতবার সূরা নাস, সাতবার সূরা ফালাক, সাতবার সূরা ইখলাস এবং সাতবার এই দোয়া পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

তারপর সাতবার সূরা কাফিরূন, সাতবার আয়াতুল কুরসী, সাতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং নিজের জন্য, পিতা মাতার জন্য এবং সমস্ত মুমিন মুসলমান নর-নারীর জন্য সাতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

তারপর এই দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبِّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَّلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ بَرٌّ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বিফআল বী অ বিহীম আজিলাউ অ আজলান ফীদ্দীনি অদ্দুনইয়া অল আখিরাতি মা আনতা লাহু আহলুউ অলা তাফআল বিনা ইয়া মাওলানা মা নাহনু লাহু আহলুন ইন্নাকা গাফুরুর রাহীমুন জাওয়াদুন কারীমুম বাররুর রাউফুর রাহীম।

এই দোয়া সর্বদা ভোরে ও সন্ধ্যায় পাঠ করিবে। কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

অতঃপর খাজা খিজির (আঃ) বলিলেন, যিনি আমাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তোমার জীবনে অন্ততঃ ইহা একবারও পাঠ করিও।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি খিজিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে যিনি ইহা শিখাইয়াছেন, তাহার পরিচয় আমার কাছে বলিবেন কি?

খাজা খিজির (আঃ) বলিলেন, ইহা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাকে শিখাইয়াছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি খাজা খিজির (আঃ)কে বলিলাম, আমাকে এমন একটি আমল শিখাইয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিতে পারি। এই কথা বলিয়া আমি আবার বলিলাম, সত্যিই কি আপনি ইহা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন?

ইহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, তবে তুমি কি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছ? আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমার ধারণা তাহা নয়। বরং আমার মনের ইচ্ছা এই যে, আমিও ইহা আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর যবানে শুনিয়া লই।

তখন খাজা খিজির (আঃ) বলিলেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিতে চাও, তবে মাগরিবের নামায আদায় করার পর কাহারও সহিত কথাবার্তা না বলিয়া দুই দুই রাকাতের নিয়তে এশা পর্যন্ত নফল নামায পড়িতে থাক। উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সাতবার করিয়া সূরা ইখলাস পাঠ কর। তারপর জামাতের সহিত এশার নামায আদায় করিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কর এবং বেতের নামায আদায় কর। শুইবার পূর্বেও দুই রাকাত নফল নামায আদায় কর। উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সাতবার সূরা ইখলাস পাঠ কর। নামাযের পর সিজদাহ রত অবস্থায় সাতবার তাওবাহ ইস্তেগফার পাঠ করিয়া সাতবার এই দোয়াটি পাঠ কর ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি আল হামদু লিল্লাহি অ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অল্লাহু আকবার। অলা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

ইহার পর সিজদাহ হইতে মস্তকোত্তোলন কর। তারপর সোজা হইয়া বসিয়া হাত উঠাইয়া এই দোয়া পাঠ কর।

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَااِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَارَحِيْمَا يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ يَااَللّٰهُ ـ يَااَللّٰهُ ـ يَا اَللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু ইয়া যাল জালাল অল ইকরামি ইয়া ইলাহাল আউয়্যালীনা অল আখিরীনা ইয়া রাহমানাদ্দুনইয়া অল আখিরাতি অ রাহীমা ইয়া রাহীমা ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু!

অতঃপর নামায আদায় করার পরের দোয়া পাঠ করার ন্যায় দোয়া পাঠ করিয়া কিবলামুখী হইয়া শয়ন কর। নিদ্রা না আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ কর।

ইহার পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দোয়াটি আপনি কোন সময় কি অবস্থায় শিক্ষা করিয়াছেন? হযরত খাজা খিজির (আঃ) বলিলেন, একবার আমি হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন হুযুর (দঃ)-এর প্রতি অহী নাযিল হইতেছিল। তখনই এই দোয়া হুযুরে পাক (দঃ)কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

ইব্রাহীম বলেন, তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দোয়া পাঠ করিলে কি পুণ্য হাসিল হয়, তাহাও আমাকে এরশাদ করুন।

খাজা খিজির (আঃ) বলিলেন, তুমি যখন রাসূলুল্লাহ (দঃ)কে স্বপ্নে দেখিবে, তখনই তাহার নিকট উহার পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইও।

অতঃপর হযরত খাজা খিজির (আঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি এই আমল করিতে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত চোখে নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিলাম। ইহার পরিবর্তে আল্লাহর রাসূল খুশী হইয়া আমাকে স্বপ্নের মধ্যে ভাল আর একটি আমল শিখাইয়া দিলেন, যাহার আমল করিলে হুযুরে পাক (দঃ) এর সহিত মিলিত হওয়া যায়।

আমার নিদ্রা টুটিয়া গেল, জাগ্রত অবস্থায়-ই ভোর হইল। ফজরের নামায আদায় করিয়া মেহরাবে উপবেশন করিলাম। এই অবস্থায়-ই জোহরের সময় হইল। জোহরের নামায আদায় করার পর সঙ্কল্প করিলাম, যদি জীবিত থাকি, তবে আজ রাতেও এই আমল করিব। রাতে এই আমল করিয়া শয়ন করিতে করিতেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এমন সময় দেখিলাম, দুইজন ফিরেশতা আগমন করিয়া আমাকে বেহেশতে লইয়া গেলেন। বেহেশতে লাল ইয়াকুত ও সাদা যমরূদের তৈরী দুইটি প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম, উক্ত প্রাসাদের মধ্যে কোথাও দুধের, কোথাও মধুর আবার কোথাও বা শরাবের ঝর্ণা প্রবাহিত হইতেছে। অন্য আর এক মহলে এক জন রমণী দেখিতে পাইলাম। পুর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল তাহার মুখমণ্ডল, সে আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

যে ফিরেশতাদ্বয় আমাকে বেহেশতে আনিয়াছেন, তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই অট্টালিকা কাহার, আর এই রমণীই বা কে? ফিরেশতাদ্বয় বললেন, তোমার ন্যায় এইরূপ আমল যে করে, সে এই অট্টালিকার মালিক। ইহার পর আমাকে তৃপ্তি সহকারে বেহেশতের ফল আহার করাইলেন এবং শরবত পান করাইলেন। এই শারাবান-তাহুরার স্বাদ সেই ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারে যে উহা

পান করিয়াছে। অতঃপর ফিরেশতাদ্বয় আমাকে পুনরায় লইয়া আসিয়া আমার বিছানায় শয়ন করাইয়া দিলেন।
আমি হঠাৎ দেখিলাম, হুযুরে পাক (দঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন। তাঁহার সাথে আরও সত্তরজন নবী রাসূল এবং সত্তর কাতার ফিরেশতা। তাহাদের একেকটি কাতারের দৈর্ঘ্য পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। হযরত রাসূলে করীম (দঃ)ও তাশরীফ আনিয়াই আমাকে সালাম করিলেন এবং আমার হাত ধরিলেন।
আমি তাঁহার সকাশে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! হযরত খাজা খিজিরের সাথে আমার সাক্ষাত হইয়াছিল, তিনি আমাকে এই ঘটনা বলিয়াছেন।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, তিনি তোমার নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য! খিজির (আঃ) দুনিয়ার জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য! তিনি আবদাল এবং আল্লাহর লস্করদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়।
ইব্রাহীম তামীমী বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যাহা কিছু দেখিলাম, তাহা ছাড়া আমলকারী অন্য কোন রকম পুণ্যের ভাগীও হইবে কিনা?
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইহার চাইতে আর বেশী কি চাও যে, আমার সাক্ষাত লাভ করিয়াছ, বেহেশতে যে প্রাসাদ ও হুর স্ত্রী লাভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়াছ, বেহেশতের ফল ভক্ষণ করিয়াছ এবং পবিত্র শরবত (শরাবান তাহুরা) পান করিয়াছ। অন্যান্য নবী ও ফিরেশতাগণকেও আমার সহিত দেখিয়াছ।
পুনরায় আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি যাহা কিছু দেখিলাম এবং আমাকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে, আমার মত আমলকারী এই সমস্ত না দেখিলেও কি সে উহা পাইবে?
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন যে আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ, আমি যাহা কিছু বলি, সত্যই বলি, এইরূপ আমলকারীর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যাবতীয় কবীরাহ গুনাহ আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহর শপথ, যিনি আমাকে খাঁটি নবী হিসাবে পাঠাইয়াছেন এইরূপ আমলকারীকে আল্লাহ মার্জনা করিয়া দেন এবং মুহাম্মদ (দঃ) ও নেককার পুরুষ ও রমণীগণকেও তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।
এই ব্যক্তির বাম কাঁধের ফিরেশতার প্রতি আদেশ করা হইবে যে, আগামী বৎসর পর্যন্ত তাহার কোন পাপকার্য (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করিও না
আমি আবার আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার জনক-জননী আপনার জন্য কোরবান হউক। যে আল্লাহ আমাকে আপনার সাক্ষাত লাভ করাইয়াছেন এবং আমাকে বেহেশতে ভ্রমণ করাইয়াছেন, উপরোল্লিখিত রূপ আমলকারীকেও কি উহা দান করিবেন?
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই করিবেন।
আমি পুনরায় আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহা হইলে তো প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও রমণীরই এই আমল শিক্ষা করা ও অন্যকে শিক্ষা দান করা উচিত। যেহেতু ইহাতে অনেক পুণ্য নিহিত।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহর শপথ, এই আমল সেই ব্যক্তিই করিতে পারে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা পরম সৌভাগ্যবান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দুর্ভাগ্যবান সে কখনও এই আমল করিতে সক্ষম হইবে না।
আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই আমলের দ্বারা আরও কোন প্রকার ছওয়াবেরও ভাগী হওয়া যায় কিনা?
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, কোন ব্যক্তি যদি এক রাতও এই আমল করে, তবে দুনিয়ার জন্ম হইতে ইস্রাফীলের সিঙ্গায় ফুঁক দান পর্যন্ত দুনিয়াতে যত বৃষ্টির ফোটা পড়িয়াছে ও পড়িবে,

এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, সাবধানী লোকেরা রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়িয়া ফেলে এবং সাহসী ও দৃঢ়মনা লোকগণ শেষ রাতে বেতের আদায় করে। আর ইহাই উত্তম। অবশ্য হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর প্রথম রাতে বেতের আদায় করার কারণে অনেকেই মনে করে যে, রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়াই উত্তম।

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে এ ব্যাপারে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আমি বেতের নামায রাতের প্রথম ভাগেই আদায় করি। তারপর যদি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইতে পারি তবে আবার বেতের আদায় করি।

হযরত ওসমান (রাঃ) বেতের নামাযের এক রাকাতে সমস্ত কোরআন শরীফ পড়িয়া শেষ করিতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার হাবীব হযরত আবুল কাসেম (হুযুরে পাক) (দঃ) আমাকে তিনটি বিষয় অসিয়ত করিয়াছেন। যথা ঃ প্রথম, শয়ন করার পূর্বে বেতের নামায পড়। দ্বিতীয়, প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখ। তৃতীয়, দুই রাকাত চাশতের নামায আদায় কর। যাহার মনে এইরূপ আশংকা থাকে যে, নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে (রাতে) আর জাগিতে পারিবে না। তাহার জন্য শয়নের পূর্বে বেতের পড়িয়া লওয়া কর্তব্য।

হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, বেতের নামায আদায় করার তিনটি রীতি রহিয়াছে। যথাঃ (১) যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়। তারপর দুই দুই রাকাত করিয়া নফল আদায় কর। (২) আর যদি ইচ্ছা কর তবে বেতেরের এক রাকাত পড়িয়া শয়ন কর। তারপর যদি তোমরা ঘুম হইতে জাগ্রত হও তবে আর এক রাকাত আদায় কর। তারপরে আবার আর রাকাত পড়। (৩) আর যদি ইচ্ছা কর তবে, বেতের নামাযকে শেষ রাতে আদায় করার জন্য রাখিয়া দিতে পার, রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার পর উহা আদায় করিবে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহার এই সন্দেহ হয় যে, শেষ রাতে উঠিয়া বেতের পড়িতে পারে কিনা। তাহার উচিত সে রাতের প্রথম ভাগেই বেতের পড়িয়া শয়ন করিবে। আর যাহার রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, সে বেতের নামায রাতের প্রথম ভাগে না পড়িয়া শেষ রাতে পড়িবার জন্য রাখিয়া দিবে। কেননা শেষ রাতের নামায ফিরেশতাগণ আসিয়া হাজির হন। কাজেই এই সময় বেতের পড়াই উত্তম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) রাতের শেষ ভাগে বেতের নামায আদায় করিতেন। যদি তাঁহার বিবিদের নিকট যাওয়ার হাজত হইত, তবে তিনি বেতের পড়িয়া তাহাদের কাছে যাইতেন। নতুবা জায়নামাযের উপরই শায়িত থাকিতেন। ছোবহে ছাদেক হইলে মুয়াযযিন আসিয়া তাঁহাকে নামাযের জন্য জাগাইয়া দিতেন।

আর একটি হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) রাতের বিভিন্ন সময়ে বেতের পড়িতেন, কখনও বা প্রথম রাতে, কখনও বা মধ্য রাতে, আবার কখনও শেষ রাতেও তিনি বেতের নামায আদায় করিতেন। তবে শেষ রাতের শেষ সময় ছিল সেহরীর ওয়াক্ত।

বেতের নামাযের শেষ রাকাতের দোয়া কুনুত

হাম্বলী মাযহাব মতে শেষ রাকাতের রুকু হইতে মস্তকোত্তোলন করতঃ দোয়া কুনুত পড়িতে হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিধান হইল, শেষ রাকাতের সূরা কিরাত পড়িয়া নূতনভাবে রফয়ে ইয়াদাইন (অর্থাৎ দুই কান পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন করা) সহ তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া দোয়া কুনুত পড়িবে। দোয়া কুনুত এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা অ নাস্তাহ্‌দীকা অ নাস্তাগফিরুকা অ নু'মিনু বিকা অ নাতাওয়াক্কালু আলাইকা অনুছনী আলাইকাল খাইর কুল্লাহু, অ নাশকুরুকা অলা নাকফুরুকা অ নাখলাউ অ নাতরুকু মাইঁয়্যাফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু অলাকা নুছাল্লী অনাসজুদু অ ইলাইকা নাসআ অ নাহফিদু অ নারজু রাহমাতাকা অ নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা জিদ্দা বিল কুফফারি মুলহিক।

দোয়া কুনুতের পরে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যাইতে পারে ঃ

'আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা অ আফিনী ফীমান আফাইতা অ তাওয়াল্লানী অ বারিক লী ফী মা আ-ফাইতা অ ক্বিনী শাররা মা কাদ্বাইতা ইন্নাকা তাক্বদ্বী অলা ইউক্বদ্বী আলাইকা ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান অলাইতা অলা ইয়াইযযু মান আরাইতা তাবারাকতা রাব্বানা অ তাআলাইতা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি রিদ্বাকা মিন সাখাতিকা অ বিআফবিকা মিন আক্কুব্বাতিকা অ আউযুবিকা মিনকা লা উহছী ছানায়ান আলাইকা অ আনতা কামা আছানাইতা আলা নাফসিকা।

রাতের নামায সম্পর্কিত আরও আলোচনা

রাতের নামাযের সময়ে প্রবল নিদ্রার ভাব দেখা দিলে শয়ন করিয়া থাকাই উত্তম। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের অবস্থায় কাহারও অতিরিক্ত নিদ্রা আসিয়া পড়িলে তখন শুইয়া পড়িবে। যাহাতে নিদ্রার ঘোর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কেননা চোখে নিদ্রা রাখিয়া নামায পড়িলে সে বুঝিতে পারিবে না যে, সে কি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেছে, নাকি নিজের নফসকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

আবদুল আযীয ইবনে ছোহাইব হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হুযুরে পাক (দঃ) মসজিদে তাশরীফ আনিয়া দেখেন, দুইটি থামের মধ্যে একটি রশি বাঁধা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রশি বাঁধা কেন? এক ব্যক্তি উত্তর করিলেন যে, জোনাইব বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কারণ নামাযের মধ্যে নিদ্রা বা অলসতা দেখা দিলে এই রশি দ্বারা নিজের হাত বাঁধিয়া রাখিবেন ও সেই হাতবাঁধা অবস্থায় নামায পড়িবেন।

হুযুর পাক (দঃ) একথা শুনিয়া এরশাদ করিলেন, যখন শরীরের অবস্থা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে তখন নামায পড়িও, আর যখন ঘুমে চাপিয়া ধরিবে, তখন শয়ন করিও।

আরওয়াহ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একদিন বনি আসাদ গোত্রের একজন মহিলা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে হুযুরে পাক (দঃ)ও গৃহে তাশরীফ আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলা কে? হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, এই মহিলা রাতে নিদ্রা যায় না।

হুযুরে পাক (দঃ) উক্ত মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার সাধ্য মতই কাজ কর। আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন সৎ কাজে পরিশ্রান্ত না হও,

ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালাও উহার পুরস্কার দিতে পরিশ্রান্ত হন না। আরও এরশাদ করিলেন, যে কাজ সর্বদা করা হয়, উহা কম হইলেও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

হুযুরে পাক (দঃ) কাহাকে কখনও কোন কাজের নির্দেশ দান করিলে সেই ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আদেশ দান করিতেন। লোকগণ যখন বেশী ইবাদাত বন্দেগী শিখাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করিতেন আর বলিতেন যে, আপনি মাসুম আল্লাহ্ আপনাকে যাবতীয় পাপ ও পুণ্যের উর্ধে রাখিয়াছেন। অতএব আমাদের বেশী ইবাদাত করা প্রয়োজন। তখন হুযুরে পাক (দঃ)-এর চেহারা মোবারকে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিত।

মোটকথা, অতিরিক্ত নিদ্রা পাইলে শয়ন করিয়া নিদ্রার অলসতা দূর করিবে। ইহাই সুন্নত তরীকা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাভিভূত হওয়া হুযুর (দঃ) খারাপ মনে করিতেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, কষ্ট করিয়া রাত অতিবাহিত করিও না। কোন কোন বোযর্গ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবেই দিবা নিদ্রা যাইতেন। উদ্দেশ্য, ইহাতে যেন রাতে অধিকক্ষণ সজাগ থাকিবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার কোন কোন বোযর্গ বলেন, স্বেচ্ছায় নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ। নিদ্রাধিক্য না হইলে কখনও শয়ন করিবে না।

বর্ণিত আছে, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিছানায় দেহ এলান নাই। যখন নিদ্রা আসিত, তখন মাথা নীচের দিকে ঝুঁকাইয়া একটু চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন। ইহাতেই তাহার নিদ্রার ভাব কাটিয়া যাইত। আবার তিনি নামাযে দাঁড়াইতেন। বলিতেন, আমার গৃহে বিছানা থাকা অপেক্ষা শয়তান থাকা ভাল। কেননা বিছানা মানুষকে নিদ্রা যাইতে আহ্বান করে।

বোযর্গানে দ্বীনের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আবদালের পরিচয় কি? তাহারা উত্তর করিলেন, ক্ষুধিত অবস্থায়ও না খাইয়া থাকা, অতিরিক্ত নিদ্রা না পাইলে শয়ন না করা এবং প্রয়োজন ব্যতীত কোন প্রকার কথাবার্তা না বলা।

হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, উত্তম আমল কি?

হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, যে কাজ সর্বদা করা হয়। উহা পরিমাণে কম হইলেও ভাল।

আলকামাহ্ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি কখনও অর্ধরাত, কখনও রাতের এক তৃতীয়াংশ, কখনও রাতের এক চতুর্থাংশ আবার কখনও বা রাতের এক ষষ্ঠাংশ ইবাদাত বন্দেগীতে কাটাইতেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বকরীর দুধ দোহন করায় যতটা সময়ের প্রয়োজন ততটা সময় পরিমাণ হইলেও রাতের নামায পড়। এই সময়ের মধ্যে কখনও চারি রাকাত আবার কখনও কখনও দুই রাকাত নামাযও আদায় করা যায়। আরও এরশাদ করিয়াছেন, রাতের দুই এক রাকাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। লোকের জন্য অসুবিধা মনে না করিলে রাতের দুই রাকাত নামায আমি ফরজ করিয়া দিতাম।

রাতে জাগ্রত থাকার যে নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হইল, উহার কারণ এই যে, লোকের পক্ষে রাতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদাত বন্দেগী করা যেন সহজ হয়। ইবাদাত বন্দেগীর প্রতি যাহাতে মন বিমুখ না হয়, সেই জন্যই হুযুরে পাক (দঃ) উপরোক্ত ভাবে এরশাদ করিয়াছেন। সাথে সাথে উহার পুণ্য সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন। রাতের তৃতীয়াংশ ইবাদাত করা মুস্তাহাব। রাতের শেষ প্রহরে ইবাদাত করা একেবারে কম মর্যাদাসম্পন্ন। হুযুরে পাক (দঃ) কখনও প্রভাত হওয়া পর্যন্ত রাতের ইবাদাত করেন নাই। ইবাদাত করার পর কিছুক্ষণ শয়ন করিয়াছেন। আবার এমনভাবে শয়ন করেন নাই যে, সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, প্রথম রাত তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের জন্য, মধ্যরাত ইবাদাতকারীদের জন্য এবং শেষরাত অলস ব্যক্তিদের জন্য।

ইউসুফ ইবনে মারব বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আরশের নীচে মোরগের আকৃতি বিশিষ্ট একজন ফিরেশতা আছে, রাতের প্রথম প্রহর অতীত হইলে তিনি পালক ঝাড়া দিতে দিতে বলেন, হে নামাযী ব্যক্তিগণ! উঠ, তোমাদের উপর কর্তব্যের বোঝা রহিয়াছে।

আরেফদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সকাল বেলা আল্লাহতায়ালা রাত জাগরণকারী লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহাদের অন্তঃকরণ নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দেন। ইহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। তাহাদের এই আলোকিত অন্তর দ্বারা অলস ব্যক্তিদের অন্তরও উপকার লাভ করে।

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার সিদ্দীক বান্দাদের প্রতি এলহামের মাধ্যমে এরশাদ করিয়াছেন, আমার এমন বান্দা আছে, যাহারা আমার সহিত বন্ধুত্ব রাখে। আমিও তাহাদেরকে বন্ধু হিসাবে জানি। তাহারা আমার প্রতি আগ্রহী, আমিও তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ পোষণ করি। তাহারা আমাকে স্মরণ করে আমিও তাহাদেরকে স্মরণ করি। তাহারা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, আমিও তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি। তোমরা যদি তাহাদের অনুসৃত পথ অবলম্বন কর, তবে আমিও তোমাদেরকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব। আর যদি তাহাদের পথ অনুসরণ না কর, তবে তোমরা যেন আমার সহিত বিরোধিতা করিলে।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহাদের পরিচয় প্রকাশ করুন। হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, তাহারা রাতের এমনভাবে তদারক করে, যেমন মেষ পালক নিজের মেষ দলকে তদারক করিয়া থাকে।

এই শ্রেণীর লোকগণ সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য এমনভাবে অপেক্ষমান থাকে, যেমন পাখিকুল বাসায় প্রত্যাবর্তনের জন্য সূর্যাস্তের অপেক্ষা করিয়া থাকে। যখন রাতের অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, রহস্যাবৃত পর্দা লটকাইয়া দেওয়া হয়। সন্ধানী ব্যক্তিরা যখন তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের আশায় ও আনন্দে বিভোর হইয়া যায়, তখন আমার আকাঙ্ক্ষীগণ আমার দিকে পদক্ষেপ করে।

আল্লাহ বলেন, প্রার্থনা করার জন্য ইহারা আমার প্রতি মনোনিবেশ করে। আমার দরবারে আমারই শিখানো কালাম দ্বারা কাকুতি মিনতি সহকারে আবেদন নিবেদন পেশ করে। আমার পুরস্কার পাওয়ার জন্য একান্ত আশা হৃদয়ে পোষণ করে। আমার এই সকল বান্দা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা আমাকে ডাকে, আমার দরবারে রোনাজারী করে। ইহারা রুকু করে, সিজদাহ করে, যাহা কিছু করে, শুধু আমার সন্তুষ্টি বিধানার্থেই করিয়া থাকে। একমাত্র আমার মহব্বতের কথা ছাড়া আর কোন কথাবার্তাই তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না।

ইহাদের প্রতি আমার প্রথম পুরস্কারের বস্তু এই যে, আমি তাহাদের অন্তরে নূর প্রবেশ করাইয়া দেই। ইহার পর তাহারা অন্যান্য লোকদের নিকট আমার সংবাদ দান করে। তাহাদের আমি উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া থাকি।

দ্বিতীয় পুরস্কারের বস্তু হইল, আসমান এবং আসমানের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সব এক পাল্লায় এবং তাহাদের আমল আর এক পাল্লায় রাখি। তাহাদের আমলের পাল্লাই অধিক ভারী হইয়া থাকে।

তৃতীয় পুরস্কারের বস্তু হইল, আমি আমার অনুগ্রহের নজরে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি। এখন তুমিই অনুধাবন করিতে পার যে, আমি স্বয়ং যাহাদের প্রতি অনুগ্রহশীল, তাহাদের পক্ষে ইহা কত বড় নিয়ামত এবং কি পরিমাণ নিয়ামত আমি আমার দরবার হইতে তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি।

রাতভর ইবাদাত বন্দেগী

স্বাস্থ্য, শক্তি ও সামর্থ্যবান লোকগণই সারা রাত জাগ্রত থাকিয়া রাতভর ইবাদাত বন্দেগীতে অতিবাহিত করিতে পারে। আর যাহার প্রতি আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ সেই ব্যক্তিই ঐরূপ স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়। আল্লাহ প্রদত্ব নূর ও শক্তির বলেই ইহারা ঐরূপ সামর্থ্যবান হইয়া থাকে।

রাতভর ইবাদাত করার যোগ্যতা তাহাদের প্রতি আল্লাহতায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত দান।

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি সারা রাত জাগ্রত থাকিতেন এবং নামাযের মাত্র এক রাকাতেই সমস্ত কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

তাবেয়ীনদের মধ্যে চল্লিশজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা সারারাত জাগ্রত থাকিয়া ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করিতেন। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা এশার অজুর দ্বারা ফজরের নামায আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ (১) হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) (২) সাফোয়ান ইবনে সালীম (রহঃ) (৩) আবু হাযেম মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রহঃ)। ইহারা মদীনার অধিবাসী। (৪) ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ (রহঃ) (৫) ওয়াহাব ইবনে ওয়ারদ (রহঃ)। ইহারা মক্কা মোয়াযযমার অধিবাসী। (৬) তাউস (রহঃ) (৭) ওহাহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহঃ)। ইহারা ইয়ামানের অধিবাসী। (৮) রবী ইবনে খাশীম (রহঃ) (৯) হাকাম (রহঃ)। ইহারা কুফার অধিবাসী। (১০) আবু সোলায়মান রাবী (রহঃ) (১১) আলী ইবনে মাক্কাল (রহঃ)। ইহারা সিরিয়ার অধিবাসী। (১২) আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাওয়াস (রহঃ) (১৩) আসেম (রহঃ)। ইহারা আবাদানের অধিবাসী। (১৪) হাবীব আবু মুহাম্মদ (রহঃ)। (১৫) আবু জায়েয সোলায়মানী (রহঃ)। ইহারা পারস্যের অধিবাসী। (১৬) মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) (১৭) সোলায়মান তাহমী (রহঃ) (১৮) ইয়াযীদ ওকাশী (রহঃ) (১৯) হাবীব ইবনে আবু সায়েত (রহঃ) (২০) ইয়াহইয়া বাকাইয়া (রহঃ)। ইহারা বসরার অধিবাসী।

আলস্য বর্জন

যাহাকে আলস্যে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাকে পাপ, ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। তাহার সাফল্যের পথ রুদ্ধ। পাপের প্রাবল্য তাহাকে রাতের ইবাদাত হইতে বিরত রাখিয়াছে।

এই শ্রেণীর লোক যদি বিপথ এবং আলস্য মুক্ত হইয়া সুপথে আসিয়া আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তাহাদের উচিত শয়ন করার সময়ে তিনবার আল্লাহতায়ালার নিকট তাওবাহ ইস্তেগফার পাঠ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। তারপর পাঠ করিবে বিসমিল্লাহসহ সূরা কাহাফের প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত। সূরা বাকারার শেষে 'আমানার' রাসূলু হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত এবং সূরা কাফিরূন।

ইহা পাঠ করিলে আল্লাহ তাহাকে প্রশস্ত নিয়ামত দান করেন, রাতে যথাসময়ে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া দেন এবং রাত জাগরণের শক্তি দান করেন। শয়ন কালে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করিতে হইবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَيْقِظْنِىْ فِىْ اَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ وَاسْتَعْمِلْنِىْ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ لَدَيْكَ الَّتِىْ تُقَرِّبُنِىْ اِلَيْكَ زُلْفٰى وَتُبْعِدُنِىْ مِنْ سَخَطِكَ بُعْدًا - اَسْئَلُكَ فَتُعْطِنِىْ وَاسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرْلِىْ وَاَدْعُوْكَ فَاسْتَجِبْ لِىْ -

اَللّٰهُمَّ لَاتُؤْمِنِّىْ مَكْرَكَ وَلَاتُوَلِّنِىْ غَيْرَكَ وَلَاتَرْفَعْ عَنِّىْ سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِىْ ذِكْرَكَ وَلَاتَجْعَلْنِىْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আইক্বেজনী ফী আহাব্বিস সাআতি ইলাইকা অসতা'মিলনী বি আহাব্বিল আ'মালি লাদাইকাল্লাতী তুক্বাররিবনী ইলাইকা যুলফা, অ তু'বিদনী মিন সাখাতিকা বু'দান। আসয়ালুকা নাসতু'ত্বীনী অসতাগফিরু ফাতুগফিরলী অদউকা ফাতাসতাজীবু লী, আল্লাহুম্মা লা তু'মিন্নী মুকরিকা অ লা তাওয়াল্লিনী গাইরাকা অলা তারফা' আন্নী সাতারাকা অলা তানসিনী যিকরাকা অলা তাজআলনী মিনাল গাফিলীন।

বোযর্গ ব্যক্তিগণ বলেন, শয়ন করিবার সময়ে এই দোয়া পাঠ করিলে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য তিনজন ফিরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন। তাহারা দোয়া পাঠকারীকে জাগ্রত করিয়া দেন। নামায পড়ার পর যখন সেই ব্যক্তি দোয়া করে তখন ফিরেশতাগণ তাহার সাথে সাথে আমীন! আমীন!! বলেন। আর যদি দোয়া পাঠকারী নিদ্রা হইতে না উঠে এবং নামায না পড়ে, তবে ফিরেশতাগণই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নামায আদায় করেন। দোয়া পাঠকারী সেই নামাযের পুণ্য লাভ করে।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি রাতে উঠিয়া নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলে শয়ন করিবার কালে এই দোয়া পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ابْعَثْنِىْ مِنْ مَضْجَعِىْ لِذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَصَلٰوتِكَ اِسْتِغْفَارِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَحُسْنِ عِبَادِكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাব'আছনী মিন মাদ্বজিয়ী লিযিকরিকা অশুকরিকা অছালাতিকা আস্তাগফিরুকা অ তিলাওয়াতি কিতাবিকা অ হুসনি ইবাদিকা।

এই দোয়া পাঠ করিয়া তেত্রিশভার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার তাসবীহ পাঠ করিবে। তারপর পঁচিশবার পাঠ করিবে ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাাহি অলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) যখন শয়ন করিতেন, তখন স্বীয় ডান হাতের উপর নিজের পবিত্র কপোলদেশ স্থাপন করিতেন। ঐ সময় তাঁহার দিকে চাহিলে মনে হইত যে, তাঁহার পবিত্র আত্মা যেন তাঁহার দেহ মুবারক হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। তিনি শয়ন করিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ ـ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ ذِىْ شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ ـ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ بَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اَقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ *

اَشْهَدُ اَنْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ جَارٍ فِىْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِىْ قَضَائِكَ هٰذِهِ يَدَىَّ بِمَا كَسَبَتْ وَهٰذِهِ نَفْسِىْ بِمَا اِجْتَرَحَتْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذَنْبَ الْعَظِيْمَ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّىْ اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَلَاۤاِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ *

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহু। আউযু বি আফবিকা মিন ইক্বাবিকা অ আউযু বি রিদ্বাকা মিন সাখাতিকা অ আউযুবিকা মিনকা লা আহছা ছানায়ান আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা আনা আবদুকা অ ইবনু আবদিকা নাছিয়াতী বিইয়াদিকা জরিন ফিয়্যা হুকমাকা আদলুন ফিয়্যা কাজউকা হাযিহী বাদইয়া বিমা কাসাবতু হাযহী নাফসী বিমা আজতারাহতু লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জোয়ালিমীনা, আমিলতু সূয়া অ জালামতু নাফসী ফাগফিরলী যুনুবীয়াল আজীমা ইন্নাকা আনতা রাব্বী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।

ইহার পরে নামাযের জন্য কিবলামুখী হইয়া পড়িবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরাউঁ অলহামদু লিল্লাহি কাছীরান, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাউঁ অ আছীলা।

তারপর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুল্লিাহ, দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে।

তারপর পড়িবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু যুল মালাকুতি অল জাবারুতি অল কিবরিয়ায়ি অল আজমাতি অল জালালি অল কুদরাতি।

তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে। হুযুরে পাক (দঃ) তাহাজ্জুদ পড়িতে উঠিয়া এই দোয়াটি পাঠ করিতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ زَيْنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ

أَنْتَ الْحَقُّ وَلِقَائِكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ ـ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ ـ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَااَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا وَاَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ فَاِنَّهٗ لَايَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا فَاِنَّهٗ لَايَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْمِسْكِيْنِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْمُفْتَقِرِّ الذَّلِيْلِ فَلَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا كُنْ رَبِّىْ رَؤُفًا رَحِيْمًا ـ يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَاَكْرَمَ الْمُعْطِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামাওয়াতি অল আরদ্বি অ লাকাল হামদু আনতা মালাকুস সামাওয়াতি অল আরদ্বি অ লাকাল হামদু আনতা যুইয়্যিনাস সামাওয়াতি অল আরদ্বি অ লাকাল হামদু আনতা ক্বাইয়্যুমুস সামাওয়াতি অল আরদ্বি অ মিন আলাইহিন্না আনতাল হাক্কু অ মিনকাল হাক্কু অ লিক্বাউকা হাক্কুউঁ অল জান্নাতু হাক্কুউঁ অন্নারু হাক্কুউঁ অন্ন্যাবিয়্যুনা হাক্কুউঁ অ মুহাম্মাদুন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু অ বিকা খাছামতু অ ইলাইকা হাকামতু; ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু অ আখখারতু মা আসরার তু অমা আ'লানতু আনতাল মুক্বাদ্দিমু অ আনতাল মুয়াখখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাক্বওয়াহা অ যাক্কাহা আনতা খাইরুম মান যাক্কাহা অ আনতা অলিয়্যুহা অ মাওলাহা, আল্লাহুম্মাহদিনী লা আহসানাল আ'মালি ফাইন্নাহু লা ইয়াহদী লি আহসানিহা ইল্লা আনতা, অছরিফ আন্নী সাইয়্যিয়াহা ইল্লা আনতা আসয়ালুকা মাসয়ালাতাল বায়িসিল মাসাকীনা অ আদউকা দুআউল মুফতাক্বিরুয যালীলা ফালা তাজ'আলনী বিদুআয়িকা রাব্বী সাক্বিয়্যান অ কুররাব্বী রাউফার রাহীমা। ইয়া খাইরাল মাসউলীনা অ আকরিমুল মুত্বঈনা।

হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, হুযুরে পাক (দঃ) রাতের নামায কিভাবে আরম্ভ করিতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাকবীর পাঠ করার পর হুযুরে পাক (দঃ) এই দোয়া পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বু জিব্রাইলা অ মীকাইলা অ ইস্রাফীলা ফাতিরাস সামাওয়াতি অল আরদ্বি, আলিমিল গাইবি অশ শাহাদাতি আনতা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানু ইয়াখতালিফুন। ইহদিনী লিমাখতালাফু ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা ছিরাতিম মুস্তাক্বীম।

রাতের নামাযে মুস্তাহাব বিষয়সমূহ

রাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়া মুস্তাহাব। প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে দুই রাকাত নামায পড়িবে। নামায ও যিকির-আযকার শেষ না করা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করিবে না। কেননা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার পর অন্তঃকরণের সেই পবিত্রতা আর বিদ্যমান থাকে না। আসলরূপ বিকৃত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণেই নামায শেষ করিয়া কিছু পানাহার করা উত্তম। কিন্তু ক্ষুধা অত্যধিক হইলে কিংবা রমজান মাসে পরে সেহরী খাইলে রোযার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে পানাহার করা মুস্তাহাব।

রাতের যিকির-আযকার

কোরআনের অন্ততঃ তিনশত আয়াত পাঠ না করা পর্যন্ত রাতে শয়ন করা উচিত নহে এবং এইরূপ আমল করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি শয়নের পূর্বে তিনশত আয়াত পাঠ করে সে আবেদ বান্দাগণের মধ্যে পরিগণিত হয় ও অলস লোকদের তালিকাভুক্ত হওয়া হইতে দূরে থাকে। তিনশত আয়াত পূর্ণ হওয়ার জন্য সূরা ফোরকান ও সূরা শো'রা পাঠ করিবে। এই দুইটি সূরার আয়াত সংখ্যা তিন শত। এই সূরাদ্বয় মুখস্ত না থাকিলে সূরা ওয়াক্বিয়াহ, সূরা হাক্কাহ এবং সূরা মুদ্দাসসির পাঠ করিবে। আর যদি ইহাও মুখস্ত না থাকে তবে সূরা তারেক হইতে কোরআনের শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। ইহাতে তিনশত আয়াত পূর্ণ হইবে।

এক হাজার আয়াত পাঠ করিতে পারিলে আরও উত্তম। হাজার আয়াত পাঠকারীর জন্য আরও বেশী উত্তম। হাজার আয়াত পাঠকারীর জন্য বহু প্রতিদান লিখিত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি আবেদদের মধ্যে শামিল হইয়া যায়। সূরা মূলক হইতে কোরআনের শেষ পর্যন্ত এক হাজার আয়াত। এতটা পরিমাণ মুখস্ত না থাকিলে সূরা আহাদ দুইশত পঞ্চাশবার পাঠ করিলেই হাজার আয়াতের পরিমাণ হইবে।

প্রত্যেক রাতে সূরা ইয়াসীন, সিজদাহ হামীম, দুখান এবং মুলক পাঠ করা যারপর নাই ছওয়াবের কাজ। ইহাদের সাথে সূরা জুমর এবং ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করা আরও উত্তম।

হুযুরে পাক (দঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি প্রথমে সূরা সিজদাহ ও মূলক পাঠ করিয়া শয়ন করিতেন। অন্য আর এক হাদীসে আছে, শয়নের পূর্বে তিনি সূরা জুমর এবং সূরা বনী ইসরাইল পাঠ করিতেন।

রাতের নামাযের সাহায্যকারী বিষয়সমূহ

যে সকল কার্যাবলী রাতে জাগ্রত থাকিতে সাহায্য করে, উহাদের মধ্যে হালাল বস্তু আহার করা, তাওবায় মজবুত থাকা, আল্লাহর আযাবকে ভয় করা, ক্ষমালাভে আগ্রহশীল থাকা, সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করা, বার বার পাপ কার্য না করা, মৃত্যুকে ভয় করা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত থাকা, এবং মৃত্যুর পরে কি ঘটিবে তাহা চিন্তা করা।

এক ব্যক্তি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর নিকট বলিল, হে আবু সাঈদ! আমি সুস্থ লোক অথচ সারা রাতই নিদ্রায় কাটাইয়া দেই। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, রাতে উঠিয়া নামায আদায় করি। তজ্জন্য অজুর পানিও ঠিক করিয়া রাখি, কিন্তু রাতে জাগিতে পারি না, ইহার কারণ কি?

তিনি উত্তর করিলেন, তোমার পাপ তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত সূরী (রহঃ) বলেন, আমি একটি পাপ কাজ করিয়াছিলাম, যাহার কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত রাতে উঠিয়া ইবাদাত করিতে পারি নাই।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, যে পাপ কাজ করার কারণে আপনার অবস্থা ঐরূপ হইয়াছিল উহা কি? সূরী (রহঃ) বলিলেন, এক ব্যক্তি ক্রন্দন করিতেছিল, আমি তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, এই ব্যক্তি রিয়াকার।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, পাপের কারণে লোক রাতের ইবাদাত ও দিনে রোযা রাখা হইতে বঞ্চিত থাকে। কোন কোন বোযর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, এমন অনেক কাজ আছে, যাহা করিলে কোরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। এই কথা ঠিক যে, কোন কোন কাজ বা খাদ্য মানুষকে সারা বৎসরই রাতের ইবাদাত-বন্দেগী করা হইতে ফিরাইয়া রাখে। একটু চেষ্টা দ্বারা এই লোকসান ও পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

আবু সোলায়মান বলেন, গাজী (ধর্ম যুদ্ধ বিজয়ী) ব্যক্তি যদি কোন ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা পাপের কারণেই হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বপ্নদোষ হওয়াও এক প্রকার আযাব। অপবিত্রতা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হইতে দূরে রাখে। পানাহারও লোককে এইরূপ আযাব লিপ্ত করে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, জীবনধারণ করার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, ঠিক সেই পরিমাণই পানাহার করিবে। তাহার অধিক নহে। অন্যথায় পেট খালি রাখ, (তাহাও ভাল)।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, বনি ইস্রাইলদের আবেদগণের সামনে যখন খাবার বস্তু রাখা হইত, তখন এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতেন, অধিক আহার করিও না, অধিক আহার করিলে অধিক নিদ্রা হইবে। তোমরা বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিবে। তাহাতে নামায কম পড়া হইবে।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, অধিক পানি পান করিলে অধিক নিদ্রা হয়। আর অন্তরে চিন্তা ভাবনা থাকিলে অন্তর সজীব থাকে। পার্থিব কোন কাজে অধিক পরিশ্রম করিতে নাই।

যদি রাতের প্রথম ভাগে ইবাদাত করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা করিবে। আর যদি নিদ্রা আসিয়া পড়ে তবে শয়ন করিবে। পরে নিদ্রা ছুটিয়া গেলে আবার ইবাদাত শুরু করিবে। আবার নিদ্রা আসিলে আবার শুইয়া পড়িবে। পুনরায় শেষ রাতে উঠিয়া নামায পড়িবে। এইভাবে দুইবার নামায পড়িতে উঠিবে এবং দুইবার শয়ন করিবে। ইহা অবশ্য খুবই কঠিন কাজ এবং অলীদের রীতি। (তবু চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই এই অলীদের রীতি অবলম্বন করিতে পারিবে।)

বর্ণিত আছে যে, যাহারা আবেদ, তাহারা রাতের মধ্যে কয়েক বারই ইবাদাত করেন এবং কায়েকবারই শয়ন করেন। ইবাদাত-বন্দেগী ও শয়নে রাত সমান ভাগে অতিবাহিত করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা আল্লাহর নবী রাসূলদেরও রীতি। সকলের পক্ষে এই সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব নহে। নবী রাসূলদের অন্তঃকরণ ছিল সদাজাগ্রত। তাহা আল্লাহর তরফ হইতে অহী প্রাপ্তির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহাদের অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকে। এই অবস্থা অবশ্য আল্লাহর নবী রাসূলগণ ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে হয় না।

রাতের ইবাদাত

রাতে ইবাদাতকারীদের জন্য শেষ রাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য শয়ন করা মুস্তাহাব। এই শয়নের ফায়েদাহ এই যে, এ সময় আর নিদ্রা মগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ এই শয়নের দ্বারা কিছুটা আরাম নেওয়ার কাজও হইয়া যায়।

ফজরের নামাযের অল্প আগে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ। এই কারণেই ফজরের অল্প আগে শয়ন করা নিষিদ্ধ। কেননা এসময় নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলে ফজরের নামায কাজা হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে ফজরের নামাযের পরে শয়ন করায় কোন বাধা নাই। হুযুরে পাক (দঃ) মাঝে মাঝে ফজরের নামাযের বাদে কিছুক্ষণ শয়ন করিতেন।

শেষ রাতে শয়নের দ্বিতীয় ফায়েদাহ হইল, ইহা দ্বারা মুখের পাণ্ডুরতা দূর হয়। জোরপূর্বক নিদ্রা ফিরাইয়া রাখিলে চেহারায় অনিদ্রার ছাপ পড়িয়া যায়। শেষ রাতে শুইয়া একটু আরাম করিলে উহা

দূর হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলে ঐরূপ অনিদ্রার ছাপ লাগাইয়া রাখা রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার একটি সূক্ষ্ম স্তর। ইহা নফস বা কুপ্রবৃত্তির একটি গোপন শিরকের অবলম্বন। যাহার ভিতরে নফসের তাড়না বা গোপন শিরক থাকে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য। লোকগণ ইবাদাতকারীর মুখে পাণ্ডুরতা বা অনিদ্রার ছাপ দেখিয়া মনে করে যে, এই লোকটি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর ইবাদাত করিয়াছে। এইভাবে নিজের সম্বন্ধে মানুষকে প্রশংসা করা ও আল্লাহওয়ালা ভাবার সুযোগ দেওয়াই নিজের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) শেষ রাতে বেতের নামায আদায় করিয়া ডানকাতে শয়ন করিতেন। এই শয়নে থাকিতেই হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করিতেন। তখন হুযুরে পাক (দঃ) শয়ন হইতে উঠিয়া মসজিদে গিয়া ফজরের নামায আদায় করিতেন।

হুযুরে পাক (দঃ)-এর যমানার বোযর্গ সাহাবীদিগের অভ্যাস ছিল, বেতের নামাযের পর এবং ফজর নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু নিদ্রা যাইতেন এবং তাহাকে সুন্নত মনে করিতেন।

নিদ্রা বা অন্য কোন কারণে রাতের নামায পড়িতে না পারিলে সূর্যোদয়ের পর হইতে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পর জোহরের নামাযের পূর্বে চারি রাকাত নামায আদায় করা হিসাব মতে সকালের নামাযের মতই গণ্য হয়।

আর এক হাদীসে হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং ইবাদাত হইতে বঞ্চিত থাকে বা ভুলিয়া যায়, তবে সে যেন ফজরের পর হইতে জোহরের পূর্ব পর্যন্ত উহা আদায় করে। ইহা রাতের ইবাদাতের মতই মর্যাদাসম্পন্ন হয়।

কোন কোন বোযর্গ বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর পরিবারবর্গ সকলেই ইহাতে একমত যে, রাতে যদি কাহারও নামায ছুটিয়া যায় তবে সে যেন জোহরের পূর্বে উহা আদায় করে। ইহা রাতের নামাযের মতই হইবে। তখন না পড়িতে পারিলে জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়িবে।

দিবাভাগের ও রাত্রিকালের অজীফা

দিনের বেলার অজীফাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ

(১) ছোবহে ছাদেক আসিবার পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

(২) নামাযে দোহা বা চাশতের নামায সূর্য হেলিয়া পড়ার পূর্বে পর্যন্ত (যাবতীয় দোয়াসহ।)

(৩) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পর ভালভাবে সূরা কিরাত সহ একই সালামে চারি রাকাত নামায পড়া। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই নামায আদায়কারীর জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

(৪) জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময় এবং

(৫) আছর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এইভাবে রাতের অজীফাও পাঁচ সময়ে বিভক্ত। যথা ঃ

(১ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়।

(২) এশার পর হইতে শয়ন করা পর্যন্ত।

(৩) মধ্য রাত।

(৪) রাতের তৃতীয়াংশ এবং

(৫) তৃতীয়াংশের পর হইতে ছোবহে ছাদেক পর্যন্ত।

অজীফার নিয়মাবলী

দিনের বেলায় অজীফা আদায়ের মুস্তাহাব পন্থা এই যে, ফজরের নামায আদায় করার পর হইতে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত কোরআন তিলাওয়াত অথবা তাসবীহ-তাহলীল অথবা আল্লাহর নামের যিকির

করিবে কিংবা ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা করিবে। অথবা কোন আলেমের মজলিসে গিয়ে ওয়াজ-নসিহত শুনিবে। আছরের নামাযের পরও এইরূপ করিবে। এই দুই সময়ে (নফল) নামায পড়া দুরস্ত নাই। আবু নসর সনদ পরম্পরায় আবু ইমামাহ বাহেলী হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের সাথে বসিয়া আলাপালোচনা করা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। এই কাজ দুইটি গোলাম আজাদ করার তুল্য আনন্দজনক।

আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করা আল্লাহর নবী হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরদের চারিজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষাও আমার নিকট অধিক আনন্দদায়ক।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে অলসতা করিও না। আর উহা ভুলিয়া গিয়া শয়ন করিয়া থাকিও না।

লোকগণ বলিলেন, আনাস! হুযুরে পাক (দঃ)-এর এই পবিত্র বাণীটি আরও খোলাসা করিয়া বলুন। হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর এই বাণীর অর্থ তোমরা ফজরের নামাযের বাদে তেত্রিশবার এই দোয়া পাঠ কর ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَآاِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি অ সুবহানাল্লাহি অ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহি, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহি এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িবে। তারপর একবার পাঠ করিবে ঃ

لَآاِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু অ হুয়া হাইয়্যুল লা-ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইর। অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আবু নসর নিজ পিতার নিকট হইতে, তিনি আরওয়াহ ইবনে জোবায়ের হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সকালে বা বিকালে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া তাহার সকল বস্তু হইতে উত্তম।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যদি কেহ সমর্থ না হয়? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, মাগরিবের পর হইতে এশা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার সমতুল্য। যদি কোন ব্যক্তি ফজর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির-আযকার করে, তবে তাহা জিহাদের সমতুল্য হয়।

আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি আবু ইমামাহ বাহেলী হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি এই দোয়া দশবার পাঠ করে, আল্লাহ তাহাকে দশটি পুণ্য দান করেন, দশটি পাপ মার্জনা করেন, আর বেহেশতে তাহার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত সে দশজন গোলাম আজাদ করিবার পুণ্য লাভ করে। শিরক ব্যতীত যাবতীয় পাপও আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দেন। দোয়াটি এই ঃ

لَآاِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ লাহুল হামদু ইউহয়ী অ ইউমীতু বিইয়াদিহিল খাইরু অ হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আছরের পর এবং শুইবার সময়ে উপরোক্ত নিয়ামানুযায়ী অজীফা পাঠ করিবে।

যদি কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, আল্লাহর নির্দেশ মত হাত-মুখ ধৌত করে, তবে সে ব্যক্তি চোখ ও হাত দ্বারা যে পাপ করে তাহা আল্লাহতায়ালা মাফ করিয়া দেন। হাত ধৌত করিলে হাত দ্বারা অর্জিত পাপ, কান মোসেহ করিলে কান দ্বারা অর্জিত পাপ, পদদ্বয় ধৌত করিলে পদদ্বয় দ্বারা অর্জিত পাপসমূহ আল্লাহ মার্জনা করেন। যখন সে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া যায়, তখন তাহার এই নামায ফজীলতের মধ্যে গণ্য হয়।

কোন ব্যক্তি অজু করিয়া শয়ন করতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তাহা কবুল করেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর চালনা করে, উহা লক্ষ্যস্থলে পৌছুক কি না পৌছুক সে একজন গোলাম আজাদ করার পুণ্য লাভ করিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলিয়া বৃদ্ধ হইয়া যায়, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তাহাকে নূর দান করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি গোলাম আজাদ করে, তবে সেই আজাদকৃত গোলামের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে আজাদকারীর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দোজখের আগুন হইতে নিরাপদ থাকিবে।

আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইবনে আলী (রাঃ) ইবনে আবু তালিব হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে ফজরের নামায আদায় করার পর হইতে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসিয়া যিকির-আযকার করে এবং সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতঃ পুনরায় যিকির-আযকার করে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য বেহেশতে হাজার মহল তৈরী করাইয়া দিবেন। প্রত্যেক মহলে হাজার হুর থাকিবে। প্রত্যেক হুরের আবার হাজার হাজার দাসী থাকিবে। সেই ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

নাফে' ইবনে ওমর হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) ফজরের নামায পড়িবার পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত নিজের স্থান হইতে উঠিতেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করিয়া অন্য নামায না পড়া পর্যন্ত সেইস্থান পরিত্যাগ না করে এবং সেখানে বসিয়া যিকির-আযকার করে, আল্লাহ্ তাহাকে মকবুল হজ্জ্ব ও ওমরার পুণ্যে পুণ্যবান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত নামাযের স্থান হইতে উঠিতেন না। লোকগণ এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি সুন্নত আদায় করিতেছি।

আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি আকরামাহ হইতে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করিয়া নির্জনে বসিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহু আল্লাহু যিকির করে এবং সূর্যোদয়ের পর চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার আয়াতুল কুরসী, সাতবার সূরা এখলাস, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা অশশামসি অ দুহাহা, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অশশামসি অত্বতারিক্বি, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, তবে সে এইরূপ পুণ্য লাভ করিবে যে, আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক আসমান হইতে ফিরেশতা নাযিল করিবেন, তাহাদের হাতে বেহেশতী পাত্র ও রুমাল থাকিবে। ফিরেশতাগণ সেই পাত্রে নামায রাখিবেন এবং রুমাল দ্বারা উহা

ঢাকিয়া ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইবেন। যাইবার পথে যত ফিরেশতার সাথে দেখা হইবে, তাহারা সকলেই ঐ নামাযীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।
এই নামায যখন আল্লাহতায়ালার দরবারে রাখা হইবে তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার জন্য নামায পড়িয়াছ, আমার ইবাদত করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এখন আবার তুমি নূতন ভাবে আমল আরম্ভ কর।
এই নামায সম্বন্ধে হুযুরে পাক (দঃ) আল্লাহতায়ালার এই বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ করিয়াছেন ঃ হে আমার বান্দা! দিনের সূচনায় আমার জন্য চারি রাকাত নামায আদায় কর, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য জামিন ও সাহায্যকারী থাকিব।
কোন কোন ওলামা এই নামাযের দ্বারা ফজরের দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত ফরজের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে ইহা দ্বারা এশরাক্ব নামাযের কথাই বলা হইয়াছে।

দ্বোহা বা চাশত নামাযের অজীফা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দ্বোহা নামাযই আওয়াবীনের নামায। হুযুরে পাক (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, ইহা হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামায, অর্থাৎ হযরত দাউদ (আঃ) প্রায়শঃ এই সময় নামায পড়িতেন।
আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যে একটা দরজার নাম দ্বোহা। রোজকিয়ামতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়া বলিবেন, যাহারা সর্বদা দ্বোহার নামায আদায় করিত তাহারা কে কোথায় আছ? তাহাদের জন্য আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দাও।
হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলীর (রাঃ) যমানায় লোকগণ মসজিদেই দ্বোহার নামায আদায় করিতেন।
জেহাক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এক যমানায় লোক এই অর্থময় আয়াতের ব্যাখ্যা অবগত ছিল না। রাতে এবং সূর্যোদয় কালে তাসবীহ পাঠ করিত। যখন লোকেরা ইহার ব্যাখ্যা অবগত হইতে পারিল, তখনই তাহারা এই দ্বোহার নামায আদায় করিতে তৎপর হইয়া উঠিল।
ইবনে মালিকাহ বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট দ্বোহার নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জবাবে বলিলেন, আল্লাহর কিতাবে এই সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি কোরআনে পাকের প্রাসঙ্গিক আয়াত শরীফ পাঠ করিলেন।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি দ্বোহার দুই রাকাত নামায পড়িতেন। কিন্তু সব সময় ইহা আদায় করিতেন না।
আকরামা (রাঃ) এই নামায একদিন পর একদিন আদায় করিতেন। লোকেরা ইহাকে বাধ্য-বাধকতার বিষয় ভাবিতে পারে বলিয়া তিনি এই আশঙ্কায়ই মাঝে মাঝে ইহা তরক করিতেন।
দ্বোহার নামায দুই, চারি, আট অথবা বার রাকাত। দুই রাকাতের প্রমাণস্বরূপ আবু নসর তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে বারিদাহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মানব দেহ তিন শত যাটটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য প্রত্যহই একটি করিয়া সদকা করা ওয়াজিব।
সাহাবাগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এইরূপ সদকা করার সামর্থ্য কাহারও আছে?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, মসজিদে নাকের শ্লেষা দেখিলে তাহা দাফন করিয়া দাও। রাস্তায় কাঁটা দেখিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দাও। তাহাতে সমর্থ না হইলে দুই রাকাত দ্বোহার (চাশতের) নামায আদায় কর। ইহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মুআয (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) চাশতের নামায প্রথম দুই রাকাত, পরে চারি রাকাত, তারপরে ছয় রাকাত এবং তারপরে আট রাকাত আদায় করিয়াছেন।

হামীদ তাবীল (রাঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) ছয় রাকাত এবং পরে আট রাকাত চাশতের নামায আদায় করিতেন।

আকরামা ইবনে খালেদ আবু তালিব-কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরে প্রবেশ করিয়া আট রাকাত নামায আদায় করিয়াছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ইহা কোন্ নামায? হুযুরে পাক (দঃ) উত্তরে বলিলেন, দ্বোহার নামায।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) আট রাকাত দ্বোহার (চাশতের) নামায আদায় করিতেন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বড় সূরা দ্বারা আট রাকাত দ্বোহার নামায আদায় করিতেন এবং এই নামায আদায় করিবার কালে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া লইতেন।

ইচ্ছা হইলে এই নামায দশ কিংবা বার রাকাতও আদায় করা যায়। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বার রাকাত চাশত নামায আদায়কারীর জন্য আল্লাহতায়ালা বেহেশতে স্বর্ণের প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দিবেন।

আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি ইব্রাহীম তাইমী হইতে, তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যর! বার ঘন্টায় একদিন। প্রত্যেক ঘন্টায় তুমি একটি রুকূ এবং দুইটি সিজদাহ কর। এইরূপ করিলে প্রত্যেক ঘন্টায় তোমার দ্বারা যে পাপ হইবে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যর! যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায আদায় করে, সে অলস ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত হইবে। চারি রাকাত নামায আদায়কারী যিকিরকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকাত নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি রোজকিয়ামতে হিসাব-কিতাবের জন্য পাকড়াও হইবে না। শিরক ব্যতীত তাহার সমস্ত পাপ মার্জিত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি বার রাকাত নামায আদায় করে, তাহার জন্য বেহেশতে একটি পবিত্র ঘর নির্মাণ করা হইবে।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! এই নামায কি একই বার আদায় করিব, না বিভিন্ন সময় আদায় কবির? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, তাহা তোমার খুশী মত আদায় করিও। সূর্যোদয় হইতে জোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাযের সময়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দ্বোহার নামাযে সূরা আশশামসি অ দ্বোহাহা এবং অদ্বোহা অল্লাইলি পাঠ করিবে।

আমর ইবনে শোআএব তাঁহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি তাহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি দ্বোহার (বা চাশতের) বার রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে একবার আয়তুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, তবে প্রত্যেক আসমান হইতে সাদা কাগজ এবং নূরের

কলম হাতে সত্তর হাজার ফিরেশতা আগমন করেন। তাহারা নামাযীর জন্য পুণ্য লিখিতে থাকেন। রোজকিয়ামতে তাহারা বেহেশতী পোশাক লইয়া তাহার কবরের নিকট আগমন করিয়া বলিবেন, হে কবরে শায়িত ব্যক্তি! আল্লাহ তোমাকে উঠিতে আদেশ করিয়াছেন। যাহারা আজ শাস্তি হইতে নিরাপদ তুমি তাহাদের দলের একজন।

কোন কোন সাহাবী চাশতের নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবনে মাদানী ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যেদিন হইতে আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি সেইদিন হইতেই চাশতের নামায পড়ি নাই। অবশ্য যখন খানায়ে কাবা তাওয়াফ করি তখন চাশতের নামায পড়ি। ইহা ব্যতীত চাশতের নামায পড়া বেদয়াত। তবে উহা বেদয়াতে হাসানাহ অর্থাৎ উত্তম বেদয়াত। যাহারা চাশতের নামায প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহারা ভাল কাজই করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চাশত নামায সম্বন্ধে বলিয়াছেন, চাশতের নামায যদি পড়িতেই ইচ্ছা কর, তবে উহা ঘরের মধ্যে পড়। কেননা যে কাজে আল্লাহ তোমাদিগকে বাধ্য করেন নাই, তোমারও অন্যকে উহা করিতে বাধ্য করিও না।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা চাশতের নামাযের ফজীলত ও পুণ্যের কোন প্রকার ঘাটতি হয় নাই। এইসব কথা বলিবার কারণ হইল, এই নামায যেন ফরজ নামাযের অনুরূপ না হইয়া যায়। লোকগণ যেন উহা আদায় করা ওয়াজিব মনে না করিয়া বসে।

ইতবান ইবনে মালেক বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) নিজের ঘরে চাশতের নামায আদায় করিতেন। যেন লোক তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া গেল এবং মুতকাদী হইয়া ঐ নামায আদায় করিল, এইরূপ না হইতে পারে। হযরত আয়েশা (রহঃ) রুদ্ধ দ্বার কক্ষে চাশতের নামায আদায় করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন চাশতের নামায পড়িতেন তো দশদিন আবার পড়িতেন না।

চাশতের নামাযের ওয়াক্ত

চাশতের নামাযের ওয়াক্ত দুইটি। এক ওয়াক্ত জায়েয বা বৈধ। আর এক ওয়াক্ত মুস্তাহাব। সূর্যোদয় হইতে জোহরের পূর্ব পর্যন্ত উহার বৈধ ওয়াক্ত। আর মুস্তাহাব ওয়াক্ত হইল সূর্য একটু উঠিবার পর হইতে উহা পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়া পর্যন্ত। মুস্তাহাব ওয়াক্তের দলীল এই যে,

হযরত যায়েদ ইবনে আরকান (রাঃ) একদা কোবার মসজিদে একদল লোককে চাশত নামায পড়িতে দেখিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আহা! ইহারা যদি জানিত যে, এই নামায আর একটু দেরী করিয়া পড়িলেই তাহা উত্তম ছিল। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, চাশতের ওয়াক্ত তখন, যখন হইতে উষ্ট্র শাবকের পা একটু গরম হইতে শুরু করে। সূর্য হেলিয়া পড়ার পরও চাশতের নামায আদায় করা জায়েয। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মধ্য আসমান হইতে সূর্য একটু ঢলিয়া পড়ার পর চাশত নামাযের ওয়াক্ত হয়। এই নামায বিনয় প্রকাশকারীদের জন্য। অতিরিক্ত গরমের সময় ইহা আদায় করা উত্তম। জোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত যদি এই নামায পড়া না হয়, তবে জোহরের নামাযের পরে ইহার কাজা করা মুস্তাহাব।

চাশত নামাযের কিরাত

চাশতের নামায সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা বা আয়াত দ্বারা আদায় করা যায়। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই নামাযে সূরা ফাতিহার পরে সূরা অশ শামসি অদ্বোহাহা এবং সূরা অল্লাইলি দ্বারা আদায় করা উত্তম। কেননা স্বয়ং রাসূলে করীম (দঃ) এই দুইটি সূরা দ্বারা চাশত নামায আদায় করিয়াছেন বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে।

অন্য আর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, চাশতের নামায বার রাকাত পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে।

জোহরের নামাযের আগে ও পরে পড়িবার অজীফা

তৃতীয় অজীফার সময় জোহরের নামাযের আগে এবং পরে। আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি উম্মে হাবীবাহ হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জোহরের ফরজের আগে এবং পরে চারি রাকাত করিয়া নামায আদায় করে, তাহার দেহ দোজখের আগুন হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং দোজখের আগুন তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে জোহর পর্যন্ত আসমান এবং বেহেশতের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে যে দোয়া করা হয়, আল্লাহতায়ালা তাহা কবুল করেন। এই সময় ইবাদাত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) জোহরের নামাযের পূর্বে চারি রাকাত নফল নামায আদায় করিতেন। লোকগণ এই নামায পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় আসমানের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং উহা জোহর পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। এই জন্যই আমি নিজে গিয়া পৌছিবার পূর্বেই কিছু পাঠাইয়া দেওয়া উত্তম মনে করি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন নফল নামায হুযুরে পাক (দঃ) সব সময় আদায় করিতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, জোহরের নামাযের পূর্বে লম্বা কিরাত পাঠ এবং অধিকক্ষণ রুকূ সিজদায় থাকিয়া চারি রাকাত আদায় তিনি সব সময়ে করিতেন।

জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের অজীফা

চতুর্থ অজীফা জোহর এবং আছরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে অজীফা পাঠ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার অন্তঃকরণকে সজীব রাখেন। অনেক বোযর্গ ব্যক্তির নিয়ম ছিল, এই সময় তাহারা নির্জন নিরিবিলি স্থানে বসিয়া যিকির-আযকার করিতেন। জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদে বসিয়া যিকির-আযকার করা মুস্তাহাব। আবার রাত্রে অধিকক্ষণ জাগ্রত থাকার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ এই সময়ে একটু ঘুমাইয়া লইতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যহ বার রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করা হয়। উহা আদায় করিবার সময় এই ঃ (ক) দুই রাকাত ফজরের পূর্বে (খ) চারি রাকাত জোহরের পূর্বে এবং (গ) দুই রাকাত জোহরের পর, (ঘ) দুই রাকাত আছরের পূর্বে এবং (ঙ) দুই রাকাত মাগরিবের পরে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সর্বদা আছরের পূর্বে চরি রাকাত নামায আদায় কর। তাহাতে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

মুস্তাহাব নিদ্রা ঃ আট ঘন্টা সময়ের বেশী নিদ্রা যাওয়া মুস্তাহাব নয়। আবার ইহা অপেক্ষা কম নিদ্রা যাওয়াও ঠিক নয়। কেননা তাহাতে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিদ্রার দ্বারা মানুষের শরীরের শান্তি ও শক্তি উভয়ই হাসিল হয়। (কাজেই শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন কিছু সময় নিদ্রা যাওয়া অপরিহার্য)

তৃতীয় অধ্যায়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এবং উহার প্রত্যেক নামাযের ফজীলত

দিবারাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। যথা ঃ (১) ফজর, (২) জোহর, (৩) আছর, (৪) মাগরিব এবং (৫) এশা।

ফজরে ফরজ দুই রাকাত, জোহরে চারি রাকাত, আছরে চারি রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত এবং এশার চারি রাকাত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এই মোট সতের রাকাত ফরজ নামায।

মে'রাজের রাত্রে আল্লাহতায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার (দঃ) উপরে দিবারাতে মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা উম্মতের উপরে কঠিন হইবে বিধায় নবী (দঃ) উম্মতের বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ স্বীয় নবীর (দঃ) প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়া দিলেন। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পুণ্য ও ফজীলত নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলেন। ইহা ঠিক রোযার হুকুমেরই মত হইল। এক সময় রোযার ক্ষেত্রে বিধান ছিল যে, রোযার সময় রাত্রি কালেও পানাহার করা এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ (হারাম) ছিল। কিন্তু এ বিধান পালন করা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার (দঃ) উপরে কঠিন বিধায় উক্ত হুকুম তুলিয়া নেওয়া হইল। অতঃপর সারা রমজান মাস সূর্যাস্ত হইতে ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা, স্ত্রী সহবাস করা জায়েয করিয়া দেওয়া হইল। যেমন আল্লাহতায়ালা পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْاَسْوَدِ *

অর্থাৎ তোমরা ছোবহে ছাদেক উদয় না হওয়া পর্যন্ত পানাহার কর।

নিম্নোক্ত নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা বান্দার উপর নামায ফরজ করিয়া দিয়াছেন। যথা ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ *

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে (মিলিয়া) রুকু কর।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দিষ্ট ওয়াক্তসমূহের ফরজিয়তের দলীল

١- فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ *

٢- اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا *

٣- اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ *

٤- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ *

٥- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى *

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, ত্বুলু আফতাব অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায এবং গুরুবে আফতাব অর্থাৎ সূর্যাস্তের আগে আছরের নামায আর রাত্রের প্রথম ভাগে মাগরিব এবং এশার নামায এবং দিনের মাঝখানে জোহরের নামায ফরজ করা হইয়াছে। উল্লিখিত ওয়াক্তসমূহে নামাযের ফরজিয়ত হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন একবার খানায় কা'বার নিকটে ফিরেশতা জিব্রাইল আমার নামাযের ইমামত করিলেন। সূর্য মধ্যকাশ হইতে হেলিবার সামান্য পরে তিনি জোহরের নামায এবং ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরে আছরের নামায পড়াইলেন। আর রোযার ইফতার করিবার সময় মাগরিব এবং আকাশের লাল রং দূর হইবার পর এশার নামায পড়াইলেন। আর রাত্রি অবসানে যখন রোযাদারদের খানাপিনা নিষিদ্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে তিনি ফজর নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্বেকার পয়গম্বরগণ এই ওয়াক্তসমূহে নামায আদায় করিয়াছেন। উল্লেখ্য নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্টকরণের মূল ভিত্তিই এই হাদীসটি। অবশ্য এই বিষয় সম্পর্কিত আরও কতিপয় হাদীস রহিয়াছে। তবে উহার সবগুলিই প্রায় এই হাদীসেরই অনুরূপ, তাই আর তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি না।

কোন্ নামায কোন্ নবী সর্বপ্রথম পড়িয়াছেন

এক আনছার সাহাবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ফজরের নামায সর্বপ্রথম কোন নবী আদায় করিয়াছিলেন? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন যে ঃ

ফজরের নামায সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) আদায় করিয়াছিলেন।

জোহরের নামায সর্বপ্রথম আদায় করিয়াছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), যখন আল্লাহতায়ালা তাহাকে নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হইতে নাজাত দিয়াছিলেন।

আছরের নামায সর্বপ্রথম আদায় করিয়াছিলেন হযরত ইয়াকুব (আঃ), যখন ফিরেশতা জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর খোশ-খবরী প্রদান করিয়াছিলেন।

মাগরিবের নামায সর্বপ্রথম আদায় করিয়াছিলেন হযরত দাউদ (আঃ), যখন আল্লাহর দরবারে তাহার তাওবার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল।

এশার নামায সর্বপ্রথম আদায় করিয়াছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ), যখন তিনি মাছের পেটের ভিতর হইতে মুক্তি লাভ করতঃ বাহিরে আসিয়াছিলেন।

বর্ণিত রহিয়াছে, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন মাছের পেটের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন সম্পূর্ণ পর-পগাড়-পালকহীন একটি মোরগের মত তাহার অবস্থা হইয়াছিল। তিনি মাছের পেটের ভিতর হইতে বাহির হইবা মাত্র ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া তাঁহার নিকট আরজ করিলেন যে, হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আল্লাহতায়ালা আপনার নিকট সালাম পৌঁছাইয়াছেন এবং তিনি স্বীয় শান অনুযায়ী আপনাকে এইরূপ কঠিন আযাব দেওয়ার জন্য লজ্জানুভব করিতেছেন। আর তিনি আপনার কাছে জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার উপরে খুশী আছেন কিনা?

জিব্রাইলের মুখে এই কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর বাণীর প্রতি আদব প্রদর্শনার্থে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে মাবুদ! তোমার এ অধম বান্দা তোমার উপর খুশী। হযরত ইউনুস (আঃ) তাহার খুশী ও রাজীর বাস্তব স্বাকৃতির প্রমাণস্বরূপ তখন এই এশার চারি রাকাত নামায আদায় করিয়াছিলেন।

আখেরী নবীর (দঃ) প্রতি সর্বপ্রথম কোন্ নামায ফরজ হইয়াছিল

হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ফজর এবং মাগরিবের নামায আদায় করা ওয়াজিব হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি নামায আদায়ের জন্য এইভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ *

অর্থাৎ তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর তাসবীহ্ আদায়ে নিমগ্ন হও।

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ঃ রাত্রির শেষ প্রহরে আকাশের পূর্ব প্রান্ত ফরসা হইয়া উঠিয়া আবার অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরে যে পুনরায় ফর্সা হইয়া উঠে, তখন হইতে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাহা বজায় থাকে। ফজরের নামায একেবারে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম। প্রমাণস্বরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পেশ করা যায়, যেমন ঃ তিনি বলেন, হুযুরে পাক (দঃ)-এর যমানায় মহিলাগণ ফজরের নামায হুযুরে পাক (দঃ)-এর সহিত জামাতে আদায় করিতেন! তারপর আবার চাদরাবৃত দেহে তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তখন প্রত্যুষের অন্ধকারে তাঁহাদেরকে ভালরূপে চিনিতে পারা যাইত না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, ফজরের নামায কোন্ সময়ে পড়া উত্তম তাহা নামাযের মুক্তাদীদের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়। যেমন, মুক্তাদী যদি ওয়াক্তের প্রথম দিকে নামায পড়িতে আসে তবে প্রথম ওয়াক্তে পড়াই উত্তম, আর যদি তাহারা একটু বিলম্ব করিয়া আসে তবে বিলম্ব করিয়া পড়াই উত্তম। কেননা জামাতে বেশী লোক হওয়াই মূল লক্ষ্য। কেননা, লোক জামাতে যত বেশী হইবে ছওয়াব তত বেশী হইবে।

জোহরের নামাযের ওয়াক্ত ঃ সূর্য মধ্য আকাশ হইতে একটু ঢলিয়া পড়িলেই জোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর একটি বস্তুর ছায়া তাহার দ্বিগুণ লম্ব না হইয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বহাল থাকে।

জোহরের নামায সাধারণতঃ আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই আফজল। অবশ্য মুসল্লিদেরকে জামাতে শরীক হওয়ার সুযোগ দিবার কারণে কিংবা অতিরিক্ত গরম অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে জোহরের নামায দেরি করিয়া পড়া চাই।

অত্যধিক গরমের মৌসুমী হইলেও জোহরের নামায বিলম্ব করিয়া পড়িতে হয়, যেমন হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাদীস রহিয়াছে।

হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে নামায তৈরীর খবর দিলাম। হুযুর (দঃ) আমাকে বলিলেন, ঠাণ্ডা হইতে দাও। একটু পরে আমি আবার হুযুর (দঃ)কে খবর দিলাম। হুযুর (দঃ) এবারও এরশাদ করিলেন, একটু ঠাণ্ডা হইতে দাও। আর কিছুক্ষণ পরে গিয়া আমি আবার হুযুর (দঃ)কে নামাযের খবর দিলাম, কিন্তু এবারও তিনি পূর্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং অনেক বিলম্ব করিয়া নামায পড়া হইল। হুযুরে পাক (দঃ) তখন এরশাদ করিলেন যে, অত্যধিক গরম জাহান্নামের অগ্নিশিখা উদগীরণ ছাড়া আর কিছু নয়। অধিক গরমের সময়ে তোমরা জোহরের নামায একটু গরম কমিলে পড়িবে।

স্মরণ রাখিবে যে, সূর্য যখন আসমানের ঠিক মধ্যস্থলে বা মাথা সোজা থাকিবে তখন কোন বস্তুর যে ছায়া পড়িবে, তাহাকে ছায়া আছলী বলা হয়। কোন বস্তুর ছায়া আছলী যখন দ্বিগুণ লম্বা হইয়া যায় তখন আর জোহরের ওয়াক্ত থাকে না। অর্থাৎ কোন বস্তুর ছায়া আছলী দ্বিগুণ লম্বা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বজায় থাকে।

আছরের নামাযের ওয়াক্ত ঃ কোন বস্তুর ছায়া আছলী তাহার দ্বিগুণ লম্বা হওয়া মাত্র আছরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উহা বজায় থাকে।

আছরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম। তবে কাহারও কাহারও মতে কিছু দেরি করিয়া পড়া উত্তম। কিন্তু দেরি করিতে গিয়া যেন সূর্যের রংয়ের পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা না হয়।

মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত ঃ সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। মাগরিবের ওয়াক্তকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আউয়াল ওয়াক্ত এবং আখেরী ওয়াক্ত। সূর্য ডুবিবার সাথে সাথেই আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় এবং আসমানের কিনারার লাল রং বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা বজায় থাকে।

স্বরণ রাখিবে, বৎসরের যে কোন সময়ে মাগরিবের নামায, আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম।

এশার নামাযের ওয়াক্ত ঃ সন্ধ্যার পরে আসমানের কিনারায় লাল রং ডুবিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার সাথে সাথে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ইহার উত্তম ওয়াক্ত বহাল থাকে। এক রেওয়ায়েত অনুসারে রাত্রের প্রথম প্রহর শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং আর এক রেওয়ায়েত অনুসারে মধ্য রাত্র পর্যন্ত।

অবশ্য এশার নামাযের অনুত্তম ওয়াক্ত বজায় থাকে ছোবহে ছাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এশার নামায আদায় করার পূর্বে শয়ন করা মাকরূহ। এই নামায আদায় করার মুস্তাহাব বিধান হইল রাতের প্রথম প্রহরের শেষ ভাগে আদায় করা এবং নামায আদায়ের পরে আর কোন কথা-বার্তায় লিপ্ত না হইয়া শয়ন করা।

এই জন্যই পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম এবং কথাবার্তা শেষ করতঃ এশার নামায আদায় করা চাই, যেন নামায আদায়ের পরেই শয্যায় গমন করা যায়। হাঁ, তবে যাহাদের সন্ধ্যার পরেই চোখে নিদ্রা আসিয়া পড়ে এবং নিদ্রামগ্ন হইলে আর সহজে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তাহাদের এশার নামাযের আগে কোনক্রমেই শয়ন করা উচিত নয়। একান্তই শয়ন করিতে হইলে এশার নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়িয়া শয়ন করিবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে প্রথম ওয়াক্তে এশার নামায পড়া আফজাল, কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এশার নামায দেরি করিয়া পড়া আফজাল মনে করেন। কেননা তাঁহারা হুযুরে পাক (দঃ)-এর একটি হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করিয়া থাকেন। হাদীসটি এই যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা এশার নামায দেরি করিয়া আদায় কর।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা হুযুরে পাক (দঃ) যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া এশার নামায পড়িতে গেলেন এবং বলিলেন যে, যদি আমি আমার উম্মতের কষ্টের দিকে লক্ষ্য না করিতাম, তবে আমি তাহাদেরকে এইরূপ সময়েই এশার নামায পড়িতে নির্দেশ দিতাম। হুযুরে পাক (দঃ) এশার নামায কেবল নিজেই দেরি করিয়া পড়েন নাই বরং অন্যকেও দেরি করিয়া পড়িতে উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সুন্নত রাকাতসমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মোট তের রাকাত নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদহ। উহাকে সুনানে রাতেবাহও বলা হয়।

(ক) ফজরের ফরজের পূর্বে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ দুই রাকাত, (খ) জোহরের ফরজের পূর্বে চারি রাকাত এবং ফরজের পরে দুই রাকাত। (গ) আছরের নামাযে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ নামায নাই। (ঘ) মাগরিবের নামাযে ফরজের পরে দুই রাকাত এবং (ঙ) এশার নামাযে ফরজের পরে দুই রাকাত। আর বেতেরে তিন রাকাত। হানাফী-মাযহাবে অবশ্য বেতেরের তিন রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ নয়, বরং ওয়াজিব।

বেতের নামায ইচ্ছা হইলে মাগরিবের তিন রাকাত ফরজের ন্যায় এক সালামে পড়িতে পারে। ইচ্ছা হইলে প্রথম দুই রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া সাথে সাথে আর এক রাকাত উহার সহিত মিলাইয়াও পড়িতে পারে। হাম্বলী মাযহাব মতে এইভাবে বেতের পড়াই আফজাল।

বেতেরে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম।

ফজরের সুন্নত দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা ভাল।

ফজরের সুন্নত ঘরে আদায় করিয়া মসজিদে গিয়া ফরজ আদায় করিয়া কাহারও সহিত কথাবার্তা না বলিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইবে।

মাগরিবের সুন্নত দুই রাকাত নামাযে ফজরের সুন্নত নামাযে পড়িবার সূরা কিরাতই পাঠ করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, আমি বিশ দিনেরও বেশী হুযুরে পাক (দঃ)কে মাগরিবের সুন্নাত দুই রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত তাউস (রহঃ) ঐ নামাযের প্রথম রাকাতে আমানার রাসূলু এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন।

মাগরিবের সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ দুই রাকাত নামায ফরজের পরে দেরি না করিয়া আদায় করিবে। ইহা মুস্তাহাব।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মাগরিবের ফরজ নামাযের পরে উহার সুন্নত দুই রাকাত তাড়াতাড়ি আদায় কর। তাহা হইলে ফিরেশতাগণ ফরজ নামাযের সাথে উহাও উঠাইয়া নিয়া যাইবে। কাজেই এই সুন্নত দুই রাকাত নামায সংক্ষেপে আদায় করা অর্থাৎ ইহাতে ছোট সূরা-কিরাত পাঠ করা মুস্তাহাব।

এক হাদীসে আসিয়াছে যে, মাগরিবের ফরজ নামাযের পরে কোন কথাবার্তা না বলিয়া যে ব্যক্তি উহার সুন্নত দুই রাকাত আদায় করে, তাহার সেই সুন্নত ফিরেশতাগণ ইল্লিয়্যীনে লইয়া যান।

পক্ষান্তরে আর একটি হাদীস এইরূপ বর্ণিত আছে, যাহার দ্বারা এই রাকাত দুইটি লম্বা করিয়া পড়া মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। যেমন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) মাগরিবের ফরজের পর সুন্নত নামাযসমূহ এত দীর্ঘ সময় বসিয়া আদায় করিতেন যে, মসজিদের সমস্ত মুসল্লিগণ (ততক্ষণে) এদিকে সেদিকে চলিয়া যাইতেন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন যে, আমি হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করিয়াছি, মাগরিবের ফরজের পরে তিনি এশা পর্যন্ত নামায আদায় করিতেন। তারপর গৃহে গমন করিতেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের ফরজের পরে সুন্নত দুই রাকাত ঘরে গিয়া আদায় করা মুস্তাহাব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) মাগরিবের ফরজের পরবর্তী সুন্নত দুই রাকাত আমার ঘরে আসিয়া আদায় করিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) হইতেও এইরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত সোহাইল ইবনে সা'আদ (রহঃ) বলেন যে, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যমানা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন দেখিয়াছি, হযরত আমীরুল মু'মিনীন মাগরিবের ফরজ নামাযের সালাম ফিরাইবার পরে ইহার পরবর্তী সুন্নত দুই রাকাত পড়িবার জন্য আমি আর কাহাকেও মসজিদে

দেখিতাম না। বরং সকলেই তাড়াতাড়ি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাহার যাহার ঘরে গিয়া উহা আদায় করিতেন।

পাঞ্জেগানা নামাযের ফজীলত

আবু সালমাহ (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা খুব উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ, যদি তোমাদের কাহারও বাড়ীর দরজায় একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং সে উহাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তাহার শরীরে কোনরূপ ধূলাবালি বা ময়লা থাকিতে পারে? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহা কখনই থাকিতে পারে না। তখন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও ঠিক একইরূপ। আল্লাহতায়ালা এই পাঞ্জেগানা নামায দ্বারা মু'মিন বান্দার গুনাহসমূহ ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া ফেলেন।

আবু ছা'লিয়াহ কুরতুনী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ সারারাত জ্বলিতে থাকে। তারপর যখন সে প্রত্যুষে ফজরের নামায আদায় করে, তখন তাহার ঐ নামাযের পূর্ববর্তী জ্বালাদানকারী গুনাহগুলিকে ঐ নামায ধুইয়া ফেলে। তারপর যখন সে জোহরের নামায পড়ে, তখন ঐ নামায উহার পূর্ববর্তী গুনাহগুলিকে ধুইয়া ফেলে। অতঃপর যখন সে আছরের নামায পড়ে তখন একইভাবে ঐ নামায তাহার পূর্ববর্তী গুনাহগুলিকে ধুইয়া ফেলে। এইভাবে হুযুরে পাক (দঃ) একে একে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বর্ণনা করিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আজাদকৃত গোলাম হারেস বলেন, একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) একটু বেশী পানি অজুর জন্য আনাইয়া লইয়া উহা দ্বারা উত্তমরূপে অজু করতঃ এরশাদ করিলেন, আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে (অবিকল) এইভাবেই অজু করিতে দেখিয়াছি। এইরূপভাবে অজু করিবার পরে তিনি এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আমার অজুর মত অজু করতঃ দাঁড়াইয়া জোহরের নামায আদায় করিবে তাহার ভোর হইতে জোহর পর্যন্ত কৃত সমস্ত গুনাহ মার্জনা করা হইবে। তারপর যে আছরের নামায পড়িবে, তাহার জোহর হইতে আছর পর্যন্ত কৃত সমস্ত গুনাহ মার্জিত হইবে। একইভাবে যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়িবে তাহার আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হইবে। একইভাবে যে ব্যক্তি এশার নামায পড়িবে তাহার মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত কৃত যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর হয়ত বা সে সারারাত বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইবে, কিন্তু প্রত্যুষে উঠিয়া যখন সে ফজরের নামায আদায় করিবে, তখন এশা হইতে ফজর পর্যন্ত তাহার কৃত সমস্ত গুনাহ আল্লাহতায়ালা মাফ করিয়া দিবেন।

নিশ্চয় জানিবে পুণ্যসমূহ যাবতীয় বদি ও বুরাইকে দূর করিয়া দিয়া থাকে।

নামাযের গুণাবলী ঃ হযরত ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁহার দাদার নিকট হইতে শুনিয়া বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, নামায হইল প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি, ফিরেশতাদের ভালবাসা, নবী-রাসূলদের রীতি, মা'রেফাতের নূর, ঈমানের মূল, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সুপারিশকারী, কবরের আলো, কবরের বিছানা, মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জবাব এবং রোজকিয়ামত পর্যন্ত কবরের ভিতরে পরম সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু সদৃশ!

রোজকিয়ামতে নামায নামাযীদের মাথার উপর ছায়ার কাজ দিবে। নামাযীর মাথার মুকুট হইবে। নামাযীর শরীরের পোশাক হইবে। নামাযীদের পথ দেখাইবার জন্য উজ্জ্বল আলোক হইবে। এই আলোক নামাযীদের আগে আগে থাকিয়া তাহাদের পথ দেখাইয়া দিবে। নামায নামাযী ও দোজখের মধ্যে একটা প্রাচীর সদৃশ হইবে। আল্লাহর দরবারে নামাযীদের পক্ষে দলীল স্বরূপ হইবে। নেকীর

পাল্লাকে ভারী করিবে। পুলছিরাত অতিক্রম করিবার উসিলা হইবে। বেহেশতের চাবি হইবে। কারণ হইল যে, নামাযের মধ্যে একাধারে তাসবীহ-তাহমীদ পবিত্রতা ঘোষণা, তাজীম, কিরাত, দোয়া সব কিছু রহিয়াছে। মোটকথা নির্দিষ্ট ওয়াক্তসমূহে করণীয় সর্বোত্তম আমল হইল নামায।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নিজে হুযুরে পাক (দঃ)কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ। আল্লাহতায়ালা নামায আদায় করা ব্যতীত বান্দার দ্বীনের কোন কাজই কবুল করিবেন না।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দার উপরে কত সংখ্যক নামায ফরজ করিয়াছেন? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি হুযুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, উহার প্রথমে ও পরে আরও কিছু আছে কি? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দার উপরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরজ করিয়াছেন। উহার আগে ও পিছনে আর কোন কিছু নাই। তখন সে লোকটি বলিল, আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার উপরেও কিছু করিব না ও ইহা হইতে কিছু কমও করিব না।

উহার কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যদি লোকটি সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে সে অবশ্যই বেহেশতী হইবে।

তামীমদারী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রোজকিয়ামতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি পূর্ণভাবে নামায আদায় করা হয়, তবে তাহা পূর্ণভাবে আমলনামায় লিখিত থাকিবে আর যদি নামায অপূর্ণভাবে আদায় করা হয় তবে আমালনামায় তাহা অপূর্ণভাবে লিখিত থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা ফিরেশতাদিগকে বলিলেন, আমার এই বান্দার কোন নফল নামায থাকিলে তাহা দ্বারা এই ফরজ পূর্ণ করিয়া দাও!

আনাস ইবনে হাকাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি যখন গৃহে ফিরিবে তোমার গৃহবাসীদেরকে বলিয়া দিবে যে, হুযুর (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার প্রথম হিসাব-নিকাশ হইবে ফরজ নামাযের।

যদি সে নামায পূর্ণতার সাথে আদায় করা হয় তবে তো খুবই ভাল, নতুবা নফল নামায দ্বারা ফরজ নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার প্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের। আর আমার উম্মতদের উপর নামাযই প্রথম ফরজ করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাপ্তাহিক দিন ও রাতের নামাযের ফজীলত

হযরত আবু সালমা (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা গৃহ হইতে বাহির হইবে, তখন তোমরা দুই রাকাত নামায পড়িয়া বাহির হইও। এই নামায তোমাদের পাপকে দূর করিয়া দিবে। আর যখন বাহির হইতে গৃহে প্রবেশ করিবে, তখনও দুই রাকাত নামায পড়িও। ইহাও তোমাদের পাপ স্খালন করিবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি সকালে ফজরের নামায আদায়ের জন্য অজু করে এবং মসজিদে গিয়া নামায আদায় করে, তবে তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে পুণ্য দান করা হয় এবং পাপ মার্জনা করা হয়। আর তাহার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

নামায আদায় করিয়া সূর্যোদয় কালে যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাহার দেহের পশমের সংখ্যার পরিমাণ পুণ্য তাহার আমলনামায় লিখিত হয় এবং তাহাকে হজ্জের ছওয়াব এবং ওমরার ছওয়াব দান করা হয়।

আর যদি কেহ মসজিদ হইতে বাহির না হইয়া পরবর্তী নামায পর্যন্ত মসজিদেই বসিয়া থাকে, তবে ইহার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাহাকে দুই লাখ নেকী দান করেন।

আতা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায আদায় করে, তাহাকেও অনুরূপ পুণ্য দান করা হয় এবং সে একটি মকবুল হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার নামায আদায় করে সে অর্ধরাত ইবাদত করার ছওয়াব হাসিল করে। আর যে জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করে, সে সারা রাত ইবাদত করার পুণ্য হাসিল করে।

আবু ছালেহ (রাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফিক ব্যক্তিদের জন্য এশা ও ফজরের নামায যত বেশী কষ্টদায়ক তত বেশী আর কোন কিছুই নয়। উহার যদি এই দুই ওয়াক্ত নামাযের ফজীলত সম্বন্ধে অবগত থাকিত, তবে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এই দুই ওয়াক্ত নামাযে শরীক হইত। একবার আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যাহারা মুনাফিক এবং এই দুই ওয়াক্ত নামাযের জামাতে শরীক হয় না, লাকড়ি সংগ্রহ করাইয়া আমি তাহাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ ঘটাইয়া দেই।

আতা ইবনে ইয়াসার হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়ার পর যে ব্যক্তি চারি রাকাত নামায আদায় করে, এবং উক্ত নামাযে উত্তমরূপে সূরা পাঠ করে, ভালভাবে রুকূ সিজদাহ আদায় করে, তবে সত্তর হাজার ফিরেশতা তাহার সাথে নামাযে শরীক হইয়া থাকেন এবং তাহারা রাতে ঐ নামাযীর জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রর্থনা করিতে থাকেন।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ)! সর্বদা এই নামায আদায় করিতেন। তিনি কখনও ইহা পরিত্যাগ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, এই সময়ে আসমানের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় আমার আমল আসমানে উঠানো হউক ইহা আমার একান্ত কাম্য এবং পছন্দনীয়।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) ইহা কি দুই দুই রাকাতের নিয়তে আদায় করিব?

হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন যে, না। একই সালামে চারি রাকাত নামায পড়িতে হইবে। হুযুর (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, আছরের পূর্বে চারি রাকাত নামায আদায়কারীর প্রতিও আল্লাহতায়ালা রহমত অবতীর্ণ করিয়া থাকেন।

শনিবার দিনের নামায

সাঈদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শনিবার দিন চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে তবে আল্লাহতায়ালা উহার প্রত্যেকটি লফজের পরিবর্তে একেকটি হজ্জ্ব ও একেকটি ওমরার ছওয়াব এনায়েত করেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক লফজের পরিবর্তে এক বৎসরের রোযা এবং এক বৎসরের রাতের ইবাদতের পরিমাণ পুণ্য লাভ করা যায়, এইরূপ নামায আদায়কারী হাজার সংখ্যক পয়গম্বর এবং হাজার সংখ্যক শহীদের সাথে আল্লাহতায়ালার আরশে মুআল্লার নীচে (রোজকিয়াতের কঠিন সময়ে) অবস্থান করিবে।

রবিবার দিনের নামায

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রবিবার দিন চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করিবে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একবার আমানার রাসূল পাঠ করে, তবে সে দুনিয়ার সমস্ত নর-নারীর সংখ্যার পরিমাণ পুণ্য লাভ করিবে। ইহা ছাড়া সে একজন পয়গম্বরের ন্যায় পুণ্যবান হইবে। তাহা ছাড়া সে তাহার পঠিত কিরাতের প্রত্যেকটি শব্দের পরিবর্তে বেহেশতে মেশকের সুঘ্রাণময় একটি করিয়া শহরের অধিকারী হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, রবিবারের নামায খুব বেশী করিয়া আদায় কর এবং আল্লাহতায়ালাকে শরীকবিহীন এক জান এবং বিশ্বাস কর।

যদি কোন ব্যক্তি রবিবার দিন জোহরের নামায আদায়ের পর চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আলাম নাশরাহ, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মুলক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা জামআ পাঠ করে, তবে আল্লাহর দরবারে যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহতায়ালা তাহাই দান করিবেন। আর ঐ লোককে খৃষ্টানদের ধর্ম মতে বিশ্বাসী হওয়া হইতে আল্লাহ নিরাপদ রাখিবেন।

সোমবার দিনের নামায

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সোমবার দিন সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করে এবং উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা নাস এবং একবার সূরা ফালাক পড়ে। আর নামাযের পর দশবার তাওবাহ ইস্তেগফার এবং দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেন।

সাবেত ইয়ামনী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি সোমবার দিন বার রাকাত নামায পড়ে ও উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আর নামায শেষ করার পর বার বার সূরা ইখলাস এবং বার বার তাওবাহ ইস্তেগফার পড়ে, তবে রোজকিয়ামতে এক ব্যক্তি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, হে অমুকের পুত্র অমুক। তুমি কোথায়? তুমি আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া তোমার পুণ্য গ্রহণ কর।

এই আহ্বান শুনিয়া সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহাকে হাজার রকমের বেহেশতী পোশাক পরিধান করানো হইবে। অতঃপর তাহাকে বেহেশতের প্রাঙ্গণে উপস্থিত করাইয়া বলা হইবে, এখন তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।

এ সময় এক লক্ষ ফিরেশতার প্রত্যেকের হাতে তাহাকে দিবার জন্য একটি করিয়া পুরস্কারের বস্তু থাকিবে। বেহেশতে প্রবেশ করার সময় ফিরেশতাগণ লোকটির সঙ্গে থাকিবেন। উক্ত বেহেশতী বেহেশতে তিনশত নূরের অট্টালিকার মালিক হইবে।

মঙ্গলবার দিনের নামায

ইয়াযীদ রেফায়ী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মঙ্গলবার বেলা এক প্রহর কালে, আর অন্য হাদীস মতে সূর্য কিছুটা উপরে উঠিলে যদি কোন ব্যক্তি এইভাবে দশ রাকাত নামায আদায় করে যে, উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে তবে আল্লাহতায়ালার নির্দেশ মত তাহার আমাল নামায় কোন পাপ লিখিত হয় না। আর যদি উহার পরে সত্তর দিনের মধ্যে মৃত্যবরণ করে, তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং তাহার সত্তর বৎসরের পাপ মার্জিত হইয়া যায়।

বুধবার দিনের নামায

আবু ইদ্রীস খাউলানী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বুধবার দিন সূর্যোদয়ের পর এইভাবে বার রাকাত নামায আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার সূরা ইখলাস, তিনবার সূরা ফালাক এবং তিনবার সূরা নাস পাঠ করে, তবে আরশের নিকট হইতে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলেন, ওহে নামাযী ব্যক্তি! আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী সব পাপ মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। কবরের আযাব ও সংকীর্ণতা এবং কিয়ামতের কঠোর অবস্থা হইতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি এখন হইতে আবার নূতন করিয়া সৎ কাজ করিতে শুরু কর। কোনরূপ অসৎ কাজের প্রতি ধাবিত হইও না।

ঐ দিন হইতে তাহার পুণ্য কাজসমূহ পয়গম্বরদের পুণ্যকাজসমূহের ন্যায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকিবে।

বৃহস্পতিবার দিনের নামায

আকরামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, উহার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং নামায শেষ করিবার পরে আমার উপরে একশত বার দরূদ প্রেরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রজব, শাবান এবং রমজান মাসে রোজা রাখার অফুরন্ত ছওয়াবের ন্যায় ছওয়াব হাসিল করে। হাজীদের ছওয়াবের ন্যায় ছওয়াব লাভ করে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাসীদের পুণ্যের ন্যায় পুণ্যলাভে ধন্য হয় এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরকারীদের পুণ্যের ন্যায় পুণ্য অর্জন করে।

শুক্রবার দিনের নামায

হযরত আলী ইবনে হোসায়েন (রহঃ) তাঁহার পিতার নিকট হইতে, তিনি তাঁহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (দঃ)কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, শুক্রবার সারা দিনটিই নামায আদায়ের সময়। যে ব্যক্তি এই দিন সূর্যোদয় হওয়ার পর উত্তমরূপে অজু করিয়া ঈমান ও ইয়াকীনের সহিত দুই রাকাত চাশতের নামায আদায় করে। আল্লাহতায়ালা তাহাকে দুইশত নেকী দান করেন এবং দুইশত পাপ মার্জনা করেন। আর চারি রাকাত নামায পড়িলে

বেহেশতে তাহার চারিশত মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। আট রাকাত আদায় করিলে তাহার আটশত মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং তাহার যাবতীয় পাপ মার্জনা করিয়া দেন। বার রাকাত নামায আদায় করিলে দুই হাজার দুইশত নেকী দান করেন। দুই হাজার দুইশত পাপ মোচন করেন এবং বেহেশতে দুই হাজার দুইশত মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন।

আবু ছালেহ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবার ফজরের নামায জামাতের সাথে পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসিয়া যিকির আযকার করে, তবে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের সত্তরটি স্তর উন্নীত করিয়া দেন। উহার প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে এত দূরত্ব হইবে যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বৎসর পর্যন্ত যতটা দৌড়াইয়া যাইতে পারে।

আর যে ব্যক্তি আছরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরের আটজন গোলাম আজাদ করিয়া দিল। আর যে শুক্রবারের মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করিল, সে মকবুল হজ্জ্ব এবং ওমরার ছওয়াব লাভ করিবে।

মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি শুক্রবার দিন জুমআ অর্থাৎ জোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায যদি এইভাবে আদায় করে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ইখলাস এবং বিশবার সূরা ফালাক; দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ইখলাস এবং বিশবার সূরা ফালাক আর নামায শেষে পঞ্চাশ বার লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ে, তবে সে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর দীদার লাভে সক্ষম হইবে এবং ইহাও দেখিতে পারিবে যে, বেহেশতের কোন জায়গায় সে থাকিবে।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক গ্রাম্য আরব হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমত আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমরা মদীনা শহর হইতে বহু দূরে একগ্রামে বাস করি। আমাদের পক্ষে ইহা সম্ভব নয় যে, প্রত্যেক জুমআর দিন হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হই এবং আপনার সাথে জুমআর নামায আদায় করি। আমাকে আপনি এমন একটি আমল শিখাইয়া দিন, যাহা আমল করিলে আমরা জুমআর ফজীলত ও জামাতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত না হইয়া যাই। আমি যেন আমার সম্প্রদায়কেও শিখাইয়া দিতে পারে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, হে গ্রাম্য আরব! শুক্রবার দিন সূর্যোদয় হইলে দুই রাকাত নামায আদায় কর, উহার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস পাঠ কর। নামায শেষ করিয়া সাতবার আয়াতুল কুরসী পাঠ কর। অতঃপর চারি রাকাত করিয়া আট রাকাত নামায আদায় কর। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা নাস এবং পাঁচশত বার সূরা ইখলাস পাঠ কর। নামায শেষ করার পরে সত্তর বার এই দোয়া পাঠ কর।

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

যে আল্লহর আয়ত্তে মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যে মুমিন পুরুষ বা রমণী উপরোক্ত বর্ণিত মতে নামায আদায় করিবে, তাহার বেহেশতে যাওয়ার জন্য আমি জামিন রহিলাম। সে ব্যক্তি নামাযের স্থানে বসা থাকিতেই তাহার মুসলমান পিতা-মাতাকে আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন। আরশের নীচ হইতে কেহ ডাকিয়া বলিবেন, হে নামাযী! তোমার পিছনের পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন হইতে আবার নূতনভাবে সৎ কাজ করিতে থাক। যদি কোন ব্যক্তি জুমআর নামাযের সময় আঠার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে তবে আল্লাহ হাতকে অনেক পুণ্য দান করেন।

সাপ্তাহিক রাতের নামাযের ফজীলত

শনিবার রাতের নামায

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি শনিবার মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায় পড়ে, তবে আল্লাহ্তায়ালা তা্র জন্য বেহেশতে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দিবেন। সে ব্যক্তি ইয়াহুদী ধর্মের প্রতি অনাসক্ত ও বীতশ্রদ্ধ থাকিবে এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি আশা রাখিবে যে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

রবিবার রাতের নামাযের ফজীলত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি রবিবার রাতে বিশ রাকাত নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর পঞ্চাশ বার সূরা ইখলাস, একবার সূরা নাস ও একবার সূরা ফালাক পাঠ করে এবং নামায পাঠ শেষ করতঃ নিজের পিতা-মাতার জন্য একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করে, একশত বার হুযুরে পাক (দঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করে, অতঃপর—

لَاحَـوْلَ وَلَاقُـوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

লাহাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। কালাম শরীফ পাঠ করে, তারপর কলেমা তামজীদ পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়েঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَفِطْرَتُهُ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَمُحَمَّدٌ حَبِيْبُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না আদামা ছাফওয়াতুল্লাহি অফিত্বরাতুহূ ইব্রাহীমু খালীলুল্লাহি আযযা অ জাল্লা অ মুসা কালীমুল্লাহি তাআলা অ ঈসা রুহুল্লাহি সুবহানাহূ অ মুহাম্মাদুন হাবীবুল্লাহি আযযা অ জাল্লা।

তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে দুনিয়ার খৃষ্টান জন সংখ্যার সমান পুণ্য দান করিবেন। তাহাছাড়া সে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য লাভকারীদের সাথে কবর হইতে উঠিবে এবং নবী রাসূলদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

সোমবার রাতের নামায

আ'মাশ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সোমবার রাতে চারি রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফতিহার পর বিশবার সূরা ইখলাস, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ত্রিশবার সূরা ইখলাস এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর চলিশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং নামায শেষে পাঁচাত্তর বার সূরা ইখলাস, পাঁচাত্তর বার নিজের ও নিজের পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা,পাঁচাত্তর বার হুযুরে পাক (দঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করার পর আল্লাহর নিকট যে দোয়া করিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাই কবুল করিবেন। উপরোক্ত নামাযকে 'ছালাতুল হাজাত' বা মকছুদ পুরা হওয়ার নামায বলা হয়।

আবু ইমামাহ বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি সোমবার রাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পনের বার সূরা আহাদ দ্বারা দুই রাকাত নামায পড়ে এবং

নামাযের পর পনের বার সূরা আহাদ পড়ে এবং নামাযের পর প্রথম তিন বার আয়াতুল কুরসী এবং পনের বার তাওবাহ্ ইস্তেগফার পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি দোজখী হইলেই বেহেশতীদের তালিকাভুক্ত হইবে। তাহার প্রকাশ্য পাপসমূহ্ মার্জিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকটি আয়াতের পরিবর্তে হজ্জ্ব ও ওমরাহর পুণ্য লাভ করিবে। পরবর্তী সোমার আসার পূর্বেই যদি তাহার মৃত্যু ঘটে তবে সে শহীদদের মধ্যে গণ্য হইবে।

মঙ্গলবার রাতের নামায

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফতিহার পর পাঁচ বার সূরা নাছ দ্বারা বার রাকাত নামায পড়ে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা বেহেশত মধ্যে দুনিয়ার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সাত গুণের সমান একটি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া দিবেন।

বুধবার রাতের নামায

এক হাদীসে আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি বুধবার রাতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা নাস দ্বারা দুই রাকাত নামায পড়ে, তবে প্রত্যেক আসমান হইতে সত্তর হাজার ফিরেশতা আগমন করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত তাহার জন্য পুণ্য লিখিতে থাকেন।

বৃহস্পতি বার রাতের নামায

আবু ছালেহ্ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার রাতে মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফতিহার পর পাঁচ বার আয়াতুল কুরসী, পাঁচবার সূরা ইখলাস, পাঁচবার সূরা নাস এবং পাঁচবার সূরা ফালাক দ্বারা দুই রাকত নামায আদায় করে এবং নামাযের পর পনের বার তাওবাহ্ ইস্তেগফার পাঠ করিয়া উক্ত নামাযের ছওয়াব পিতা-মাতার জন্য বখশেষ করে, সে তাহার পিতা-মাতার হক আদায়ের যিম্মাদারী হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং সিদ্দীক ও শহীদের তুল্য পুণ্য লাভ করে।

শুক্রবার রাতের নামায

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে , হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নামায এইভাবে আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফতিহার পর দশ বার করিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করে, সে একাধারে বার বৎসর পর্যন্ত দিনে রোযা এবং রাতে ইবাদাত বন্দেগীর সমতুল্য ছওয়াব লাভ করিবে।

কাছীর ইবনে সালমাহ (রাঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে জামাতের সাথে এশার নামায আদায় করিয়া দুই রাকাত সুন্নতের পর এইভাবে দশ রাকাত নামায আদায় করে যে, উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস, একবার সূরা ফালাক এবং একবার সূরা নাস পাঠ করিবে এবং তারপরে বেতের নামায আদায় করিয়া ডান কাতে কিবলামুখী হইয়া শয়ন করে, সে যেন কদর রাতের সারা রাত ভর ইবাদাত করিয়া কাটাইয়া দিল।

হুযুরে পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা উজ্জ্বল রাত এবং উজ্জ্বল দিনে (অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ও দিন) আমার উপর অধিক সংখ্যক দরূদ পেরণ কর।

মসজিদে প্রবেশ এবং নামাযে একাগ্রতা ও মনসংযতি

নাফে' (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, একাকী নামায আদায়কারী ও জামাতের সাথে নামায আদায়কারীর মধ্যে ছওয়াবের পার্থক্য সাতাইশ গুণ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি অজু করিয়া মসজিদে প্রবেশ করে, তখন তাহার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ একটি করিয়া পুণ্য দান করেন। একটি করিয়া পাপ মোচন করেন ও একটি করিয়া মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। তাহার প্রতি আল্লাহ এত সন্তুষ্ট হন, যেমন কোন ব্যক্তি বহুদিন বন্ধুর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করিবার পর পুনরায় তাহার মিলন লাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

আবু ওসমান হিন্দী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আপন গৃহে ভালভাবে অজু সমাধা করিয়া আমাকে দর্শন করার আশায় আমার গৃহে আগমন করে, তখন আমার কর্তব্য হইয়া পড়ে আমার দর্শনকারীকে সম্মান করা।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাহার পিতার নিকট হইতে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলেন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ যে, তাহারা রোজকিয়ামতে পূর্ণ নূরপ্রাপ্ত হইবে।

আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে গমন করে, রোজকিয়ামতে আল্লাহতায়ালা তাহাদেরকে নূর (আলো) দান করিবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা জামাতের সাথে নামায আদায় করায় পঁচিশগুণ বেশী নেকী হাসিল হয়।

নাফে' হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা জামাতের সাথে নামায আদায় করিলে সাতাইশগুণ বেশী নেকী অর্জিত হয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করিলে পবিত্র হজ্জ্ব এবং মকবুল ওমরার পুণ্য লাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি জোহরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, তবে জোহরের নামায একাকী পড়িলে যে নেকী লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা পাঁচশ গুণ অধিক ছওয়াব লাভ হয় এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে সে সত্তর গুণ অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়। যদি কোন ব্যক্তি আছরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত মসজিদের অজীফায় লিপ্ত থাকে, তবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশের একজন গোলাম আজাদ করার ছওয়াব লাভ করে।

যদি কেহ মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, তবে সে উহা একাকী আদায় করা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াবের অধিকারী হয় এবং জান্নাতুল আদনে তাহার মর্যাদা সত্তর গুণ বর্দ্ধিত হয়। আর যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করে, সে ব্যক্তি সারা রাত জাগিয়া ইবাদাত করার তুল্য ছওয়াব অর্জন করে।

মসজিদে প্রবেশ কালে বিনম্রতা, একাগ্রতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে লইয়া মসজিদে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। এই সময় অন্তর হইতে সমস্ত পার্থিব চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া ফেলিবে। বরং যে চিন্তা মনকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে, সেই চিন্তাকে অন্তরে, ঠাই দিবে। আর মন হইতে

যাবতীয় গর্ব-অহঙ্কার ও রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো ইচ্ছা এবং মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া সম্পূর্ণ খালেছ অন্তঃকরণে মসজিদে প্রবেশ করিবে। মনে মনে বলিবে ও খেয়াল করিতে থাকিবে যে, আমি আল্লাহর পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিতেছি। এই গৃহে আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, আল্লাহর স্মরণ এবং তাসবীহ-তাহলীল করা হয়। এখানে যাহারা আগমন করে, তাহাদিগকে পার্থিব কোন কাজ বা চিন্তা ভাবনা আল্লাহর কাজ এবং চিন্তা ভাবনা হইতে বিরত রাখিতে পারে না।

মসজিদে প্রবেশ করতঃ জামাতে শরীক হইয়া যাইবে। নামাযের সম্পূর্ণ অংশ জামাতের সাথে পাওয়া গেলে ভাল কথা, নতুবা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু জামাতের সাথে পড়িয়া বাকী অংশ একাকী আদায় করিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ও এইরূপ একটি রাওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কাহারও মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বেই যদি তাকবীর হইয়া যায়, তবে তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরস্থিরভাবে জামাতে শরীক হও। যতটা পাও, ততটা বা-ঈমান নিষ্ঠার সাথে আদায় কর। যাহা না পাও তাহা পরে একাকী আদায় কর।

সাদা-র্সদা ইবাদাত করার জন্য যেন কাহারও মনে গর্ব অহঙ্কার সৃষ্টি না হয়। বরং এইরূপ উহা কোনক্রমে না আসিতে পারে তজ্জন্য সর্বদা সতর্ক এবং চেষ্টিত থাকিবে। কারণ এইরূপ গর্বকারী আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই জঘন্য সাব্যস্ত হয়, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির তো কোন প্রশ্নই উঠে না। গর্বিত ব্যক্তি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে না। তাহার চেষ্টা ও সাধনার নূর নষ্ট এবং মলিন হইয়া যায়। পূর্বে সে ইবাদাতে যে স্বাদ পাইত অন্তরে গর্বের ভাব আসিবার সাথে সাথে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হয়, তাহার মারেফাতের আয়না অন্ধকার হইয়া যায় এবং তাহার ইবাদাত-বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল না হইয়া ফিরিয়া আসে। হাদীসে আসিয়াছে, অহঙ্কারী ও গর্বিত ব্যক্তি তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত তাহার ইবাদাত কবুল হওয়ার যোগ্যই নহে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সারা রাত ইবাদাত করিলেন, সকালে তাঁহার এই কাজের জন্য তিনি নিজেই বিস্মিত হইয়া সগর্বে বলিলেন, ইব্রাহীমের প্রভু মহান এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ বান্দা ইব্রাহীম। ঐদিন তিনি দ্বিপ্রহরে আহার করিবার সময়ে কাহাকেও আহার করার সাথী পাইলেন না তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি কখনও একা আহার করিতেন না। অন্ততঃ একজন জায়গীর-মুসাফির বা ভিক্ষুক সাথে লইয়া তিনি প্রতিদিন আহার করিতেন, কিন্তু সেই দিন কোন লোক না পাইয়া খাবার দ্রব্য সামনে লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুইজন ফিরেশতা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহমান বেশী ফিরেশতাদ্বয়কে বলিলেন, আস, তোমরা আজ আমার আহারের সাথী হও। তাঁহারা রাজী হইলে তাহাদেরকে নিয়া অদূরস্থ একটি বাগানের কাছে আহার করিতে চলিয়া গেলেন এবং তিনজনে মিলিয়া আহার করিলেন। ঐ বাগানের নিকটেই একটি মিঠা পানির কূপ ছিল। আহার শেষ করিবার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহমানদেরকে লইয়া সেই কূপটির কাছে পানি পান করিতে গেলেন, কিন্তু গিয়া দেখিলেন, কূপে এক ফোটাও পানি নাই। ইহা দেখিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খুবই অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত হইলেন। ফিরেশতাদ্বয় বলিলেন, কূপে পানি আসার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন, কিন্তু পানি আসিল না। ইহাতে তিনি আরও বেশী লজ্জিত হইলেন।

তখন তিনি তাঁহার মেহমানদ্বয়কে পানির জন্য দোয়া করিতে বলিলেন। তাহারা দোয়া করিবামাত্র কূপটি মিঠা পানিতে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। এই সময় ফিরেশতাদ্বয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

এর নিকট নিজেদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, আমরা দুইজন আল্লাহর প্রেরিত ফিরেশতা। আপনি গতরাতের ইবাদাতে গর্বিত হইয়াছিলেন। তাই আল্লাহর দরবারে আপনার দোয়া কবুল হয় নাই। বস্তুতঃ আল্লাহর সম্মুখে বিনয় এবং আদবের সাথে দণ্ডায়মান হওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য। মনে মনে ভাবিতে হইবে যে, তিনি আমার ভিতর বাহির সবকিছু দেখিতেছেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা এইভাবে ইবাদাত কর যে, যদিও তোমরা আল্লাহকে দেখ না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে দেখিতেছেন।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট প্রত্যাদেশ করিলেন, যখন তুমি আমার দরবারে দণ্ডয়মান হইবে, এইভাবে হইবে যে, তুমি অত্যন্ত বিনয়ী এবং আমার ভয়ে কম্পমান। নিজেকে অত্যন্ত ছোট এবং হেয় মনে করিবে। দোয়া করিবার কালে এইভাবে করিবে যেন তোমার দেহের অস্থিরতায় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির একটি হইতে অন্যটি পৃথক হইয়া যায়। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও আল্লাহতায়ালা এইরূপ অহী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আল্লাহওয়ালাদের নামাযের দৃষ্টান্ত

এইরূপ বর্ণিত আছে আছে যে, হযরত ইবনে সিরীন (রহঃ) যখন নামায পড়িতে দণ্ডায়মান হইতেন, আল্লাহর ভয়ে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে লোকের কথাবার্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইত না।

হযরত সাআদ ইবনে মাআয বলেন, আমি এমন কোন নামায পড়ি নাই, যাহার মধ্যে আমি কোনরূপ পার্থিব চিন্তা করিয়াছি।

মুজাহিদ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তাঁহাকে এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মত মনে হইত। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে তিনি একবারে অনুভূতিহীন নিশ্চল জড় পদার্থের মত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া লোকের ধারণা হইত, তিনি সম্ভবতঃ চোখের সামনে দোজখের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন।

গোলাম আতাবাহ (রহঃ) যখন তীব্র শীতের মৌসুমে নামাযে দাণ্ডায়মান হইতেন তখন তাঁহার সমস্ত শরীর বহিয়া দরদর বেগে ঘর্ম নিগৃত হইতে থাকিত। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আমার লজ্জা এবং ভয় উপস্থিত হয়, তাই এইভাবে শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া যায়।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) একবার যে গৃহে নামায পড়িতেছিলেন, ঘটনাক্রমে হঠাৎ সেই গৃহে আগুন লাগিয়া গেলে। বসরা শহরের সব লোক দৌড়াইয়া আগুন নিভাইতে আসিল এবং শোরগোল করিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই দুর্যোগ এবং এত লোক সমাগম ও তাহাদের শোরগোল মুসলিম ইবনে ইয়াস্যার (রহঃ) কিছুই টের পাইলেন না। তিনি পরম একাগ্রতার সাথে নামাযেই মগ্ন রহিলেন। নামায শেষ হইবার পর তিনি জানিতে পারিলেন যে, গৃহে আগুন লাগিয়াছিল এবং লোকজনে তাহা নিভাইয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, আর একবার তিনি জামে মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় ছাদের একটি ভারী বর্গা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার একেবারে পার্শ্বে পতিত হইল। উপস্থিত লোকগণ চিৎকার শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তিনি এইসব কিছুই জানিতে পারিলেন না।

আম্মার ইবনে জোবায়ের বলেন, একবার তিনি জুতা সামনে রাখিয়া নামায পড়িতেছিলেন। জুতার তলাটি নূতন ছিল। উহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। নামায শেষ করিয়াই তিনি জুতা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি জুতা পরিধান করেন নাই।

রাবিআ ইবেন খোশাইম একবার নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহার সামনে বিশ হাজার দেরহাম মূল্যের একটি অশ্ব বাঁধা ছিল। চোর তাহার সম্মুখ হইতে ঘোড়াটিকে রশি খুলিয়া লইয়া গেল। সকাল বেলা লোকগণ জানিতে পারিল যে, তাঁহার ঘোড়াটি চুরি হইয়াছে। অতএব অনেকেই তাঁহার সামনে দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন, ঘোড়াটি আমার সম্মুখ হইতেই অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু আমি যে কাজে লিপ্ত ছিলাম, ঘোড়া রক্ষা করা হইতে আমার সে কাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান ছিল। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে অল্পক্ষণের মধ্যেই উক্ত চোর ঘোড়াটি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

নামাযের প্রতি একাগ্রতা

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হযরত রাসূলে করীম (দঃ) লাল ডোড়াওয়ালা কাল কম্বল গায়ে দিয়া নামায পড়িতেছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি এরশাদ করিলেন, এই লাল ডোড়া আমাকে আল্লাহর দিক হইতে গাফেল রাখিয়াছে।

আ'মাশ শকীক ইবনে সালমাহ হইতে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন বান্দা আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে, তখন তাহার নামায আসমানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং সে নামাযের সাথে একটি আলো থাকে। সেই আলোতেই নামায আরশে মুআল্লা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। নামায আরশে মুআল্লার নিকটে থাকিয়া রোজকিয়ামত পর্যন্ত নামাযীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। নামায নামাযীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, হে নামাযী! তুমি আমার প্রতি যেরূপ খেয়াল রাখিয়াছ, আল্লাহতায়ালাও তোমার প্রতি তদ্রুপ খেয়াল রাখিবেন।

কোন ব্যক্তি বে-ওয়াক্তে নামায পড়িলে তাহাও আসমানে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু ঐ নামাযের সাথে কেউ থাকে না। ঐ নামায আসমানে লইয়া যাওয়ার পর উহাকে কাপড়ের ন্যায় লেপটাইয়া নামাযী ব্যক্তির মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। তখন নামায বলে, হে নামাযী? তুমি যেমন আমাকে খারাপ করিয়াছে, তদ্রূপ আল্লাহও তোমাকে খারাপ করিবেন।

আব্বাস ইবনে সামেত বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে অজু করে এবং রীতিমত সূরা-কিরাত দ্বারা এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করিয়া নামায আদায় করে, তখন নামায বলে, হে নামাযী! তুমি আমাকে যেমনভাবে হেফাজত করিয়াছ, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে সেইভাবে হেফাজত করিবেন। অতঃপর নামাযকে আসমানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। নামায নূরের আকার ধারণ করে। পূর্ব হইতেই এই নামাযের জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া রাখা হয়। খোলা দরজা দিয়া সেই নামায আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকে।

আর যে ব্যক্তি সূরা-কিরাত ও রুকু সিজদাহ যথাযতভাবে আদায় না করিয়া নামায পড়ে, সেই নামায নামাযীকে বলে, তুমি আমাকে যেরূপ ক্ষতি করিয়াছ আল্লাহ তোমাকেও তদ্রূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন। অতঃপর সেই নামায অন্ধকার পথে আকাশের দিকে উঠিতে থাকে। কিন্তু আকাশের দরজা বন্ধ থাকার কারণে আকাশে প্রবেশ করিতে পারে না। তখন উক্ত নামাযকে পুরাতন কাপড়ের ন্যায় লেপটাইয়া নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

একবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক ভাল কাজ কি?

হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, সময় মত নামায আদায় করা, পিতা-মাতার আজ্ঞানুবর্তী হওয়া এবং ধর্মের জন্য কাফিরদের সাথে জিহাদ করা।

আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ *

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন তাহাদের জন্য ধ্বংস।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এইখানে ঐসব নামাযীদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়াছেন, যাহারা নামায পরিত্যাগ করে না, অথচ ঠিক ওয়াক্ত মত নামায আদায়ও করে না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দোজখের মধ্যে একটি জঙ্গলের নাম 'গাঈ'! যাহারা অসময়ে নামায পড়ে, তাহারা এইখানে থাকিবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আস (রাঃ) বলেন, একদিন হুযুরে পাক নামায প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজাত করিবে, নামায তাহার জন্য আলো হইবে এবং আযাব হইতে রেহাই পাওয়ার কারণস্বরূপ হইবে। এই ব্যক্তি ফিরাউন, কারুন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে দোজখে দগ্ধ হইবে না এবং উবাই খালফের সাথী হইবে না।

হারেস হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করিতে আলস্য করে, আল্লাহ্ তাহাকে পনেরটি শাস্তি দান করেন। উহার ছয়টি এই দুনিয়ায় হইয়া থাকে। তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে এবং অবিশষ্ট তিনটি কবর হইতে উঠার সময় হইবে।

দুনিয়ার ছয়টি আযাব ঃ

(১) নেককার ব্যক্তিদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হয়।

(২) কোন কাজেই বরকত থাকে না।

(৩) জীবিকার বরকত থাকে না।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের পূর্ণতা সাধন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন নেক কাজ গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৫) তাঁহার দোয়া কবুল হয় না এবং

(৬) নেককার ব্যক্তিদের দোয়া হইতেও সে কোনরূপ অংশ পায় না।

মৃত্যুকালীন তিনটি আযাব ঃ

(১) মৃত্যুর সময় পিপাসার্ত হইয়া মরিবে, সাত সাগরের পানি তাহার গলায় ঢালিয়া দিলেও পিপাসার্ত থাকিবে।

(২) হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং

(৩) তাহার ঘাড়ে লৌহ, পাথর ও কাঠের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। বোঝার চাপে সে হয়রান এবং পেরেশান থাকিবে।

কবরের তিনটি আযাব ঃ

(১) কবর সংকীর্ণ হইবে।

(২) তাহার কবর আলোর অভাবে অন্ধকার থাকিবে।

(৩) মুনকার এবং নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম থাকিবে।

কবর হইতে উঠার সময়ে তিনটি আযাব ঃ

(১) আল্লাহতায়ালা তাহার উপর ভীষণ ক্রোধান্বিত থাকিবেন।

(২) খুব কড়াকড়িভাবে তাহার নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করা হইবে।

(৩) আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে দোজখের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে এবং দোজখের গর্তে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে।

আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত মেহেরবান, হয়ত বা তিনি কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারেন এবং দোজখের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! কোন আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, যথা সময়ে (অর্থাৎ ঠিক ওয়াক্ত মত) নামায আদায় করা, পিতা-মাতার অনুবর্তী হওয়া এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

ইব্রাহীম ইবনে আবি মাখদুর (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, মধ্যম ওয়াক্তে নামায আদায় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্তি এবং শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় আল্লাহর তরফ হইতে মার্জনা লাভের কারণস্বরূপ।

নামাযের খাস বৈশিষ্ট্য

নামাযের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য অসীম। উহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবারসাধ্য কাহারও নাই। নামাযের আহকাম এবং আরকানসমূহও একইরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ। আল্লাহতায়ালা স্বীয় প্রিয় নবীর প্রতি এই জন্যই বিশেষভাবে নামায কায়েমের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি যাবতীয় নির্দেশের প্রথমই নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ নবুয়তের অহী নাযিল হইবার পরেই রাসূলুল্লাহর (দঃ) উপরে নামায সম্পর্কিত অহী নাযিল হইয়াছে।

হাদীস শরীফ দ্বারা জানা যায় যে, হুযুরে পাক (দঃ) তাঁহার দ্বীন প্রচারের শুরুতে তাউহীদে বিশ্বাসের পরেই যেমন সর্ব প্রথম উম্মতের প্রতি নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়াছেন, ঠিক তেমনি আবার তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও বার বার নামাযেরই জন্য তাকীদ দিয়া গিয়াছেন।



পঞ্চম অধ্যায়

ইবাদাত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা সার্থক, সুষ্ঠু ও নিখুঁৎ হয়

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআনে পাকে বহু স্থানে এরশাদ করিয়াছেন। একস্থানে আল্লাহ বলেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণ করা শিখাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহা হইলেই তোমরা মুক্তি লাভ করিবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম রীতি।

আর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার ধন-সম্পদ খুয়া গিয়াছে এবং রোগ-ব্যাধিতে আমার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

লোকটির কথা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, শুন, যদি কাহারও ধন-সম্পত্তি নষ্ট না হয় এবং সে অসুস্থ না হয় তবে সেই ব্যক্তির কোন নেক কাজই সুষ্ঠু ও নিখুঁৎ হয় না। কেননা আল্লাহতায়ালা যখন কোন বান্দাকে খাঁটি বন্ধুতে পরিণত করিতে চাহেন তখন তাহাকে বিপদাপন্ন করিয়া ধৈর্যাবলম্বনের শিক্ষা দান করেন।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন হইতে চলে, তখন সে নিজের কার্য দ্বারা উহা সম্ভব করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার উপর কোন বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়।

যখন কোন ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, 'তখন তাহাকে অসৎ কাজের অনুরূপই প্রতিফল দেওয়া হইয়া থাকে।' আল্লাহর তরফ হইতে যখন উক্ত বাণী অবতীর্ণ হইল, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! তাহা হইলে মানুষ মুক্তি লাভ কিভাবে করিবে? হুযুরে পাক (দঃ) উত্তর করিলেন, হে আবুবকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি কি কখনও অসুস্থ হও না? যখন অসুস্থ হও, তখন কি ধৈর্যাবলম্বন কর না? এই অসুস্থ হওয়াই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিফল।

ধৈর্য তিন প্রকার। এক প্রকার আল্লাহর জন্য। যেমন মানুষ আল্লাহর নির্দেশ ধৈর্যের সাথে পালন করে।

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর নির্দ্ধারিত তাকদীরের সাথে, যেমন মানুষের জন্য ভালমন্দ যাহা ঘটে তাহা ধৈর্যের সাথে বরণ করিয়া লওয়া।

তৃতীয় প্রকার আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ওয়াদার উপর। যেমন আল্লাহতায়ালার জীবিকা প্রদান, পরকালে নেক কাজের বিনিময়ে পুণ্য এবং পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির প্রতি ধৈর্য সহকারে উহা পাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা।

কোন কোন বোযর্গের মতে ধৈর্য দুই প্রকার। যেমন নিজের কাজের উপর ধৈর্য ধারণ করা এবং যে কাজ বান্দার আয়ত্তে নয়, উহার উপর ধৈর্য ধারণ করা। নিজের কাজের উপর ধৈর্য ধারণ করা আবার দুই প্রকার। প্রথমতঃ ঐ সম্বন্ধে আল্লাহর যে নির্দেশ তাহাতে ধৈর্য ধারণ করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে ধৈর্য ধারণ করা। আর যাহা বান্দার কাজ নয় তাহাতে ধৈর্য ধারণ করা হয় এইভাবে, যেমন বান্দার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়, তাহাতে ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লামা শিবলী (রহঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, সর্বাপেক্ষা কঠিন ধৈর্য ধারণ করার রূপটি কি? শিবলী (রহঃ) উত্তর করিলেন, আল্লাহতে ধৈর্য ধারণ করা। লোকটি বলিল, না। শিবলী (রহঃ) আবার বলিলেন, আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণ করা। লোকটি বলিল, না। শিবলী (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহর সাথে ধৈর্য ধারণ করা। লোকটি এবারও বলিল, না। তখন শিবলী (রহঃ) বলিলেন, তবে তুমিই বল?

লোকটি বলিল, আল্লাহর নিকট হইতে ধৈর্য ধারণ করা। লোকটির কথা শুনিয়া আল্লামা শিবলী (রহঃ) গগন বিদারী চীৎকার করিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়া হইতে আখেরাতের সফর করা সহজ, কিন্তু স্রষ্টার জন্য সৃষ্টিকে পরিত্যাগ করা সহজ নয়। আর তাহা অপেক্ষা কঠিন হইল, প্রবৃত্তির বাসনা পরিত্যাগ করা, আল্লাহর আশেক হওয়া। আল্লাহর সাথে ধৈর্য ধারণ করাও কঠিন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানরূপ দেহের মস্তক ধৈর্য।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, ধৈর্যের অর্থ মানুষের শত্রুতা হইতে দূরে থাকা। বিপদাপদ হাসি মুখে সহ্য করা এবং অভাব থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে হীনতা অবলম্বন না করা। সুখের সময় যেমন মানুষ অধৈর্য হয় না, তেমনি দুঃখ ও বিপদাপদের সময়েও অস্থির এবং অধৈর্য না হওয়ার নামই ধৈর্য।

বোযর্গ লোকেরা বলিয়াছেন, আল্লাহর রাস্তায় সুদৃঢ় ও অবিচল থাকা এবং শান্তভাবে বিপদাপদ বরণ করিয়া লওয়ার নামই ধৈর্য। তাহারা আরও বলিয়াছেন, দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করা ও নত মস্তকে আল্লাহর রাসূলের (দঃ) সুন্নত মানিয়া চলা ধৈর্যের বিশেষ নিদর্শন।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয রাজী (রহঃ) বলেন যে আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, আশেক কিভাবে ধৈর্য ধারণ করে! তাহাদের ধৈর্য সর্বাধিক কঠিন।

শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ *

অর্থাৎ তোমরা শোকর (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ কর। আমি তোমাদের নিয়ামত অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া দিব।

জ্ঞানবান লোকেরা বলেন যে, শোকরের অর্থ বিনয় ও নম্রতার সাথে নিয়ামত দানকারীর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মুখে ও অন্তরে আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি করাই বান্দার শোকর আদায় করা।

বোগর্যগণ বলেন, সত্য কথা বলা এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ প্রকাশ করা আলেমদের এক প্রকার শোকর। আল্লাহর নির্দেশ বহির্ভূত কোন কাজ না করা আবেদদিগের এক প্রকার শোকর।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)কে মার্জনা করার সংবাদ আল্লাহ্ দান করিলেন পর তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন, হে মাবুদ! আমার আয়ু বাড়াইয়া দাও। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, তাহা কি জন্য?

হযরত ইদ্রীস (আঃ) বলিলেন, তোমার শোকর আদায় করিবার জন্য। আমি প্রথমে তো তোমার ক্ষমা ও নিয়ামত পাইবার আশায় সৎকাজ করিতাম। এখন হইতে শুধু তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। ইহার পর আল্লাহর আদেশে ফিরেশতাগণ তাহাদের ডানা যমিনে বিছাইয়া দিলেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) উক্ত ডানার উপর উপবেশন করিলেন। ফিরেশতাগণ তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একখণ্ড ছোট পাথরের পার্শ্ব দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। দেখিলেন, পাথরের গাত্র হইতে পানি ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন আল্লাহর কুদরতে পাথরের বাকশক্তি আসিল। পয়গম্বর পাথরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? পাথর বলিল, যেইদিন আমি এই কথাটি শুনিলাম যে, দোজখের আগুনের ইন্ধন হইবে মানুষ এবং পাথর, আমি সেইদিন হইতে ভয়ে আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করিতেছি। পয়গম্বর পাথরের মুখে এই কথা শুনিয়া আল্লাহর দরবারে তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন। আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবীর দোয়া কবুল করিয়া পাথরটিকে মুক্তিদান করিলেন। আল্লাহর নবী খুশী হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

আর একদিন ঘটনাক্রমে নবীবর সেই পথে যাওয়ার সময়ে দেখিলেন, এইবার পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ঐ পাথর অশ্রুধারা (পানি) নির্গত হইতেছে। তিনি পাথরের কাছে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজও আল্লাহতায়ালা পাথরের যবান খুলিয়া দিলেন। পাথর বলিল, হে আল্লাহর নবী (আঃ)! ঐদিন যে আপনি আমাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, আমার সে কান্না ছিল আল্লাহতায়ালার ভয়ে এবং আমার নিজের চিন্তায়। কিন্তু আজ আমার এ কান্না হইল কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের কান্না।

বোযর্গ লোকেরা বলেন যে, শোকের অর্থাৎ কৃতজ্ঞ লোকদের নিয়ামত সর্বদাই বর্ধিত হয়। কেননা বর্ধিত করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ আল্লাহর হেফাজতে থাকেন। তাই তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারেন। আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ *

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।

এক ছহীহ হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর প্রশংসাকারীগণের সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করা হইবে। কারণ যে বস্তু তাহারা পায় নাই, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

এক বোযর্গ বলিয়াছেন, কোন এক সময়ে আমার জনৈক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল। আমি তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমি আমার এক পিতৃব্য কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলাম, সেও আমার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইল। প্রথম দিন বাসর ঘরে আমাদের পরস্পরে সাক্ষাত হইলে আমরা একে অন্যকে বলিলাম, আল্লাহতায়ালা আমাদের মধ্যে যে মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আমরা উভয়ে তখন শোকরানার নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। উভয়েই সারারাত নামায পড়িলাম। তাহার পরের রাতও এইভাবে নামায পড়িয়া কাটাইয়া ছিলাম। এই একইভাবে সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, মনে হয় বাকী দিনগুলিও আমাদের এইভাবেই কাটিবে।

উক্ত বৃদ্ধের স্ত্রীও ঐ সময় তাহার সাথেই ছিল। তিনি তাহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি বল? আমি সত্য বলিলাম কি না? বৃদ্ধের স্ত্রী বলিল, হাঁ তুমি সত্যই বলিয়াছ।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

আল্লাহতায়ালা আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *

অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহর উপর নির্ভর কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জের সময়ে আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতগণকে আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, আমার উম্মতের সংখ্যা এত অধিক যে, যমিন ও পাহাড়ের সব স্থানেই তাহারা।

আল্লাহতায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার নবী! তোমার উম্মতের এই সংখ্যাধিক্যে তুমি খুশী কি না?

আমি আরজ করিলাম, হাঁ মাবুদ! আমি খুশী।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, ইহার মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবেই বেহেশতে যাইবে— যাহারা অসুখ-বিসুখে ঔষধ সেবন করে না। ঝাড়-ফুক করে না, বরং শুধু আমার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

আকাশাহ ইবনে মাহসান (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাহাদের মধ্যে পরিগণিত করেন।

হুযুরে পাক (দঃ) দোয়া করিলেন, হে মাবুদ! তুমি আকাশাহকে তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া দাও।

ইহার পর আর এক ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমার জন্যও ঐরূপ দোয়া করুন, আমিও যেন ঐরূপ তাহাদের মধ্যে পরিগণিত হই।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করেন, এ বিষয়ে আকাশাহ অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে।

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার অর্থ এই যে, সমস্ত কাজ আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া তদবীরের কুয়াশায় লিপ্ত না থাকিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশিত পথে চলা। মনে বদ্ধমূল ধারণা রাখিবে যে, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহার পরিবর্তন হইবে না, ভাগ্য লিখন রদবদল হইবে না। আর যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহা কখনও পাওয়া যাইবে না। অন্তরের শান্তি বজায় রাখিয়া আল্লাহ যাহার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষায় থাকিবে। ইহাও একান্তভাবে বিশ্বাস রাখিবে যে, আল্লাহ যাহা কিছু দেওয়ার ওয়াদাহ করিয়াছেন, অবশ্যই তাহা দিবেন।

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার পর্যায় তিনটি, যথা ঃ (১) তাওয়াক্কুল (২) তাসলীম এবং (৩) তাফবীজ।

আল্লাহর ওয়াদায় যে অন্তরকে শান্তি দান করে, সে মুতাওয়াক্কিল।

আর আল্লাহর জ্ঞানকেই যথার্থ মনে করা হইল তাসলীম।

আর আল্লাহর খুশীতে খুশী ও সন্তুষ্ট থাকাকে বলে তাফবীজ।

বোযর্গ লোকেরা বলেন, তাওয়াক্কুল শুরু, তাফবীজ শ্রেষ্ঠ পর্যায় এবং তাসলীম হইল মধ্যম পর্যায়। কাহারও কাহারও মতে তাওয়াক্কুল মুমিন ব্যক্তিদের নিদর্শন। তাসলীম অলীদের এবং তাফবীজ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসীদের গুণাবলী। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাওয়াক্কুল পয়গম্বরদের গুণ। তাসলীম হযরত ইব্রাহীম (দঃ)-এর গুণ এবং তাফবীজ আমাদের নবী করীম (দঃ)-এর গুণ।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য চড়কে বসানো হইয়াছিল, তখন ফিরেশতা জিব্রাইল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি আপনার কোন উপকার করিতে পারি?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, না, তোমার সাহায্যে আমার কোন দরকার নাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই উত্তর এই জন্য দিয়াছিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই তাহার মধ্যে ছিল না। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছু তিনি দেখিতে পাইতেন না।

সহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসলদানকারী যেভাবে উল্টাইয়া গোসল করায়, মৃত ব্যক্তির উহাতে কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে না, তদ্রূপ নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়াই তাওয়াক্কুলের প্রথম স্তর। তাওয়াক্কুলকারী একমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই চাহিয়া থাকে। সে না কিছু আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে, আর না আল্লাহ্র দান ফিরাইয়া দেয়।

বোযর্গগণ বলেন, আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত ভাগ্যে কিসমতের উপর শোকরিয়া আদায় করাও তাওয়াক্কুল।

হামদুন বলেন, আল্লাহর দানের রশি মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকাই তাওয়াক্কুল।

ইব্রাহীম খাস বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় না করা বা কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করাই তাওয়াক্কুল।

জাফর বলেন, ইব্রাহীম খাস বলিয়াছেন, একবার মক্কাশরীফ যাত্রাকালীন একজন বন্য ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি জ্বিন, না মানব?

সে বলিল, আমি একটি জ্বিন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথায় যাইবে?

সে বলিল, মক্কা শরীফ যাইব।

আমি বলিলাম, কিভাবে যাইবে? তোমার নিকট তো কোন যানবাহনাদি নাই, খাওয়া-দাওয়ারও কিছু নাই।

সে বলিল, আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যাহারা শুধু তাওয়াক্কুলের উপরই সফর করিয়া থাকে।

আমি জিজ্ঞাস করিলাম, তাওয়াক্কুল কি?

সে বলিল, আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা।

সহল বলেন, জীবিকাদাতাকে ভালভাবে জানার নামই তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল ঐ সময়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যখন আকাশ তামায় এবং যমিন লৌহে পরিণত হয়। না আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িবে, না মাটি শস্য উৎপাদন করিবে, তখন এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কখনও অনাহারে রাখিবেন না। কেননা তিনিই তো আহার্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অন্য এক বোযর্গ বলিয়াছেন, জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অবাধ্য না হওয়াই তাওয়াক্কুল।

হাতেম আসামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি এইরূপ তাওয়াক্কুল কিভাবে লাভ করিলেন?

তিনি উত্তর করিলেন, তিনটি স্বভাব দ্বারা। প্রথমতঃ আমি এই কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার খাদ্য আমিই খাইব। আমা ব্যতীত উহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। এইজন্য আমি আমার জীবিকা অর্জনে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করি না।

দ্বিতীয়তঃ আমি এই কথা জানি যে, আমার কাজ আমিই করিব। আমা ব্যতীত উহা আর কেহই করিবে না। এই জন্য আমি সর্বদা আমার কাজে লিপ্ত থাকি। কখনও কাজ করায় কোনরূপ অলসতা করি না।

তৃতীয়তঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি সর্বদাই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত থাকি। তিনি সর্বদা আমাকে দেখিতে থাকেন। সেহেতু আমি সর্বদাই তাঁহার নিকট লজ্জিত থাকি।

আবু মুসা (রাঃ) বলেন, আমি আবদুর রহমানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য কি?

তিনি উত্তর করিলেন, যদি তুমি কোন অজগরের মুখে হাত রাখ এবং উহা যদি তোমার হাতের কব্জা পর্যন্ত গিলিয়া ফেলে, তখনও তোমার মনে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ভয় উদয় না হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। আমি এই কথা শুনিয়া বোস্তাম নগরে হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর (রহঃ) নিকট গেলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন, আবদুর রহমানের কথায় তোমার মনে সান্ত্বনা আসে নাই?

আমি বলিলাম, আপনিও এই সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।

তিনি বলিলেন, প্রথমেই এই সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিতাম। আরশের নিকট যেই সাপ গুলজার করিয়া রহিয়াছে, উহাও যদি তোমাকে আক্রমণোদ্যত হয় তখনও তোমার অন্তরে যেন আল্লাহতায়ালা ব্যতীত আর কাহারও ভয় না আসে।
তাউস (রহঃ) একবার এক গ্রাম্য আরবকে উটের পৃষ্ঠে দেখিলেন। তিনি উটটি এক স্থানে রাখিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমার উট ও আসবাব পত্র তোমার যিম্মায় রাখিয়া গেলাম। এই কথা বলিয়াই তিনি মসজিদে হারামে চলিয়া গেলেন।
ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার উট ও আসবার পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহার উট ও আসবার পত্র না দেখিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার যাহা কিছু অপহৃত হইয়াছে, উহা আমার নিকট হইতে যায় নাই বরং তোমার যিম্মা হইতেই গিয়াছে।
তাউস বলেন, আমি হঠাৎ দেখিলাম, আবু কোরাইস পাহাড় হইতে বাম হাতে উটের রশি ধরিয়া এক ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে। তাহার ডান হাত কর্তিত। কর্তিত হাতটি গলার সহিত ঝুলানো। সে গ্রাম্য আরব লোকটির নিকট আসিয়া বলিল, এই নাও তোমার উট। আর এই দেখিয়া লও তোমার আসবাবপত্র সব ঠিক আছে কি না!
তাউস সেই লোকটির নিকট তাহার হাত কর্তিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি এই সব জিনিস লইয়া আবু কোবাইস পাহাড়ে আরোহণ করিয়া মাত্র জনৈক অশ্বারোহী ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাত হইল। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, হে চোর! তোর ডান হাতটি সম্মুখে বাড়াইয়া দে। আমি তাহার কথা মত আমার ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিতেই সে আমার হাতখানা একটি পাথরের উপর রাখিয়া আর একখণ্ড পাথর দ্বারা উহা কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অতঃপর কর্তিত হাতখানা আমার গলায় সহিত ঝুলাইয়া দিয়া বলিল, যা, তুই এখনি গিয়া এই উট ও আসবাবপত্র উহার মালিককে ফিরাইয়া দিয়া আস।
হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুরাপুরিভাবে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয়, আল্লাহ তাহাকে পূর্ণভাবেই জীবিকা দান করিয়া থাকেন। যেমন পাখিকুল প্রত্যুষে খালি পেটে বাসা হইতে বাহির হইয়া যায় এবং দিবাশেষে ভরা পেটে বাসায় ফিরিয়া আসে। নির্ভরশীল ব্যক্তি ঠিক এমনিভাবেই জীবিকা পাইয়া থাকে।
মুহাম্মদ ইবনে কাআব বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ বোযর্গী লাভ করিবার ইচ্ছা করে, তবে তাহার উচিত আল্লাহতায়ালাকে ভয় করা। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ অর্জন করিতে চায়, তাহার নিজের হাতে যাহা কিছু আছে, তদপেক্ষা আল্লাহর হাতে যাহা কিছু আছে, তাহার উপর বেশী নির্ভর করা।
বশীর (রহঃ) বলেন, কোন কোন লোক দাবী করে যে, আমি আল্লাহর উপর নির্ভরকারী। আসলে সে কিন্তু মিথ্যাবাদী। কেননা আল্লাহ যাহা করেন, তাহার উপর রাজী থাকিলেই প্রকৃত নির্ভরকারীরূপে গণ্য হওয়া যায়।
যুন্নুন মিসরীর (রহঃ) নিকট তাওয়াক্কুল সম্বেন্ধ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন যে কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করার নামই তাওয়াক্কুল।
প্রশ্নকারী বলিল, কথাটি আর একটু খুলিয়া বলুন। তিনি বলিলেন, নফসকে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত রাখা এবং ঈর্ষা ও অহঙ্কার হইতে উহাকে পবিত্র রাখা এবং লোভ-লালসা হইতে অন্তরকে বিরত রাখাই হইল তাওয়াক্কুলের অপর নাম।
তবে অবশ্য হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য সুন্নত তরীকায় (অর্থাৎ সিদ্ধ উপায়ে) যে শ্রম ব্যয় করা হয়, তাহাতে তাওয়াক্কুলের কোন অংশ ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা ইহাতে বান্দার মনে এই প্রত্যয় বদ্ধমূল

থাকে যে আল্লাহর নির্দ্ধারিত ভাগ্য লিপি যথার্থ। যে জীবিকা অর্জনে অস্বীকারকারী, সে সুন্নত তরীকারই অস্বীকারকারী। আর তাওয়াক্কুলের অর্থাৎ আল্লাহর উপর নির্ভরতার অস্বীকারকারী ঈমানেরই অস্বীকারকারী।
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক উষ্ট্রারোহী হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার ইচ্ছা এই উটটি ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া থাকি।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, উটটির গলায় ঘন্টা বাঁধিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া থাক। অর্থাৎ তুমি জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ কর এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর।
কোন কোন বোযর্গ বলিয়াছেন যে, নির্ভরকারী ব্যক্তি স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায়। সে যেমন প্রথম কিছুই চিনে না, অবশ্য মায়ের স্তন চিনে, তেমনি নির্ভরকারী ব্যক্তিও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই চিনে না, কাহারও উপর ভরসাও করে না।

সচ্চরিত্র

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ *

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) নিশ্চয় আপনি অত্যুত্তম চরিত্রের অধিকারী।
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর নিকট লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, জনাব! ঈমানদার মুসলমানদের মধ্যে উত্তম কোন ব্যক্তি? তিনি উত্তর করিলেন, যাহার চরিত্র সৎ। (অর্থাৎ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি)। কেননা মানুষের স্বভাবসমূহের মধ্যে সচ্চরিত্রই হইল সর্বোকৃষ্ট। ইহাতে মানুষের আশরাফুল মাখলুকাত তথা জীবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী প্রকাশ পায়। মানুষের মনুষ্যত্বের নিদর্শন প্রতিভাত হয়।
বোযর্গগণ বলেন যে, আল্লাহতায়ালা হযরত রাসূলে করীম (দঃ)কে মো'জেযা, বোযর্গী, মহত্ত্ব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ ব্যতীতও বিশেষভাবে সচ্চরিত্র দান করিয়াছেন। মূলতঃ তাঁহার জন্য এই নিয়ামতটিই ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। কেননা যে কোন মানুষের জন্যই সচ্চরিত্রের মত এত বড় গুণ আর দ্বিতীয়টি নাই। যাহার ভিতরে সচ্চরিত্র আছে, তাহার মধ্যে সব কিছু আসিয়া গিয়াছে। আর যাহার মধ্যে সচ্চরিত্র নাই, তাহার অন্যান্য যাবতীয় গুণ মিথ্যা এবং বিলীন হইয়া গিয়াছে।
হুযুরে পাক (দঃ)-এর সচ্চরিত্র সম্পর্কে যত বেশী প্রশংসা করা হইয়াছে, তত আর কোন কিছু সম্পর্কে করা হয় নাই।
আল্লাহর সাথে বিবাদ না করাকেই সচ্চরিত্র বলা যায়। যাহারা চরিত্রবান নয়, তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহর সাথে বিবাদ ও ঝগড়াকারী।
আবু সাঈদ হামরাজ বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) শুধু আল্লাহর সাথেই সদ্ভাব এবং সুসম্পর্ক রাখিয়াছেন। অন্য কিছুর সাথেই তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না।
হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, তিনটি বস্তু দ্বারা তিনটি বস্তুকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছে। যেমন ঃ
(ক) সৌন্দর্যকে যত্ন দ্বারা (খ) মিষ্টি ভাষাকে সত্য কথা দ্বারা (গ) আমানতকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা দ্বারা। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুদ্র এবং অন্যকে মর্যাদাশীল মনে করে। সে নিজেকে কষ্ট দিয়া অন্যকে আরামে রাখে।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা ধন-সম্পত্তি দ্বারা মানুষের উপকার করিতেছ না, বরং তোমাদের উচিত, নিজেদের অন্তরের উদারতা ও প্রশস্ততার দ্বারা অন্যের উপকার করা।

আল্লাহর সাথে সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহতায়ালার আদেশ-নিষেধ মনে প্রাণে পালন করা, আল্লাহর বিধানে রাজী থাকা, তাঁহার ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর আদায় করা এবং কিছু না পাওয়ার জন্য অবাধ্য ও অসন্তুষ্ট না হওয়াকেই আল্লাহর সাথে সদ্ব্যবহার করা বলা হয়।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর করিলেন, যাহার চরিত্র অসৎ।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা হযরত রাসূলে করীম (দঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমার কাপড় পবিত্র কর। যাহার অর্থ সচ্চরিত্রবান হও। আল্লাহ্ আরও বলিয়াছেন যে আমি তোমাকে প্রকাশ্য নিয়ামত দান করিয়াছি। যাহার অর্থ সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও সচ্চরিত্র।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, দুনিয়াতে আপনি কখনও আনন্দিত হইয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ দুইবার হইয়াছি। একবার আমি উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে একটি কুকুর আসিয়া তাহার পা উঁচু করিয়া আমার শরীরে প্রস্রাব করিয়া দিল।

আর একবার আমি চিন্তামগ্ন আছি, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়া সে তাহার সর্ব শক্তি দিয়া আমাকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসাইয়া দিল।

এইরূপ বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ)কে রাস্তায় যখন দুষ্ট ছেলের দল দেখিত, তখন তাহারা তাঁহাকে ইট-পাথর নিক্ষেপ করিত। তাহাতে তিনি বলিতেন, ওহে বালকগণ! তোমরা একটু ছোট পাথর মার। বড় পাথর মারিলে শরীর যখম হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইবে। আমি নামায পড়ি, কিন্তু শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইলে নামায পড়িতে অক্ষম হইয়া পড়িব।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ)কে এক ব্যক্তি গালি দিতেছিল আর তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল। আহনাফ যখন তাহার গ্রামের প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়া গিয়া গালিদাতা লোকটিকে বলিলেন, বন্ধু! তোমার গালি দেওয়া আরও বাকী থাকিলে এইখানে দাঁড়াইয়াই দিয়া লও। কেননা আমি যে আমার গ্রামের একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। এখনই আমি নিজের গ্রামে ঢুকিব। তুমি আমার গ্রামে ঢুকিয়া আমাকে গালি দিলে আমার গ্রামের লোকেরা তোমাকে শায়েস্তা করিয়া ছাড়িবে।

হাতেম আসাম (রহঃ)কে লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যেক লোকের কথাই কি সহ্য করা যায়? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, যায়। কিন্তু নফস তাহা সহ্য করিতে পারে না।

একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার গোলামকে ডাকিলেন। দুই তিনবার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, গোলাম শুইয়া রহিয়াছে। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার ডাকাডাকি শুন নাই? সে বলিল, অবশ্যই শুনিয়াছি। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আমার ডাকে কেন সাড়া দিলে না?

গোলাম বলিল, আমি জানি যে, যত অন্যায়ই করি না কেন, আপনি আমার কোন ক্ষতি করিবেন না। গোলামের কথা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করিয়া দিলাম।

ইঞ্জীল কিতাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার বান্দাগণ! যখন তোমাদের ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ কর। আবার আমার যখন ক্রোধ হইবে, তখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।

মালেক ইবনে দীনারকে এক রমণী বলিল, হে ঈর্ষাপরায়ণ ও অহংকারী!

মালেক রমণীকে বলিলেন, বসরার লোকেরা আমার সম্বন্ধে যাহা ভুলিয়া গিয়াছে তুমি তাহা ঠিকভাবে বলিয়াছ।

লোকমান হাকীম তাহার ছেলেকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, তিনটি অবস্থা ব্যতীত মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না—(ক) ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ক্রোধের সময়ে, (খ) বাহাদুর ব্যক্তিকে যুদ্ধের সময়ে এবং (গ) ভাই বা বন্ধুকে বিপদের সময়ে।

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে মাবুদ! যাহা আমার মধ্যে নাই, সেই সম্বন্ধে আমাকে আদেশ করিও না।

আল্লাহতায়ালা উত্তর করিলেন, এই স্বভাব আমার জন্যও আমি আমার মধ্যে অবশিষ্ট রাখি নাই। যাহা নিজের জন্য পছন্দ করি না তাহা তোমার জন্য কিভাবে পছন্দ করিব?

বিবিধ বিষয়

দশটি জরুরী বিষয়

আল্লাহওয়ালা লোকদের মধ্যে এই দশটি বিষয় অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। বিষয়গুলি এই ঃ

(১) সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক আল্লাহর নামে শপথ করিবে না । যখন লোক এই শপথ না করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করিবে, তখনই সে এই অভ্যাসটিকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই বিষয়টিকে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে আল্লাহতায়ালা নূরের একটা দরজা তাহার জন্য খুলিয়া দেন। সেই নূরের উপকারিতা অন্তর দ্বারা উপলব্ধি বা অনুভূতি সারা দেহের উপরও প্রভাব বিস্তার করে আর তাহার ফলে মানুষের উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রকার লোকগণ সূদর্শী হইয়া থাকে। সকলে তাহাকে বোযর্গ হিসাবে সম্মান করে এবং তাহার অনুগত হয় এবং তাহাকে ভয় করে।

(২) বিপদে-বিপাকে পড়িয়া বা হাসি-তামাসাচ্ছলে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। সত্যবাদী লোক নিজের নফসের উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে এবং সর্বদা সত্য কথা বলা ক্রমে ক্রমে তাহার অভ্যাসে পরিণত হয়। আল্লাহতায়ালা সত্যবাদীর বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেন। তাহার জ্ঞানকে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করিয়া দেন। তাহার কাজকর্ম ও অবস্থা এইরূপ হয় যে, সে যেন মিথ্যা কথা বলিতেই জানে না।

সে কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিলে নিষেধ করিবে এবং মিথ্যাবাদীর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবে, হে মাবুদ! তুমি এই ব্যক্তিকে সত্য বলার স্বভাব দান কর। এইরূপ দোয়াকারীর আমলনামায় বহু পুণ্য লিখিত হয়।

(৩) প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে। অবশ্য সিদ্ধ ওজরবশতঃ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারিলে কোন দোষ নাই। সর্বাপেক্ষা উত্তম, কাহারও সহিত কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দান না করা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মিথ্যাবাদী হইয়া যায়। এইরূপ অভ্যাস করিলে আল্লাহ তাহার জন্য দানশীলতা ও লজ্জার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং বন্ধুবান্ধব তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে সম্মান করে। আল্লাহর দরবারে সে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।

(৪) আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে মন্দ বলিবে না, এমন কি কোন সাধারণ একটি কীটকেও কষ্ট দিবে না। বোযর্গলোকদের মধ্যে এই স্বভাব বজায় থাকে। ইহারা আল্লাহর সুনজর লাভ করে। ইহাদের পরকাল মঙ্গলজনক হয়।

(৫) কাহাকেও বদদোয়া করিবে না, এমন কি কেহ খুব বেশী অতিষ্ট করিলেও তাহার জন্য বদদোয়া করিতে নাই। অত্যাচারী ব্যক্তিকেও কার্য বা কথার দ্বারা কোন মতেই ক্লেশ দিবে না। কেননা বোযর্গ লোকেরা এইরূপ করিতে নিষেধ করেন। অত্যাচারী ব্যক্তির বিচারের ভার আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া দিবে। এইরূপ স্বভাব গড়িতে পারিলে সে মর্যাদাশীল হয়। দুনিয়াতেই তাহার সম্মান বৃদ্ধি পায়। নিকট ও দূরের সকলের নিকটই সে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হয়।

(৬) স্বীয় পরিবারের কাহারও সম্বন্ধে শিরক, কুফরী এবং মুনাফিকের সাক্ষ্য দান করিবে না। এইরূপ সাক্ষ্যদান না করিলে তাহাদের সাথে সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সে আল্লাহর অসীম রহমত এবং করুণার ভাগী হয়।

(৭) প্রকাশ্যে কিংবা অপকাশ্যে কোন পাপের প্রতিই আসক্ত থাকিবে না। যাবতীয় পাপ কার্য হইতে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

(৮) নিজের বোঝা কাহারও উপর চাপাইবে না । বরং সাধ্যানুসারে অন্যের সাহার্য্য করিবে। অন্যের নিকট কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হইলেও চাওয়া হইতে বিরত থাকিবে। এইরূপ অমুখাপেক্ষী থাকিলে আবেদদের মর্যাদা ও পরহেজগারী লাভ হয়। এইরূপ স্বভাবাপন্ন হইলে সে অন্যের দ্বারা সৎকাজ করাইতে এবং অসৎকাজ হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হয়। আর তারপরেই আল্লাহ তাহাকে সম্পদশালী করেন এবং সে পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করিতে সমর্থ হইবে।

(৯) লোভ লালসা বর্জন করিতে হইবে। অন্যের ধন-সম্পত্তি ও জাকজমক দেখিয়া কখনও মনকে লোভাতুর না করিলে মানুষ বিশেষ সম্মান লাভ করে। এই প্রকার স্বভাব আল্লাহর উপর নির্ভরতার স্তরসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম স্তর। নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ব্যক্তিদের পরহেজগারী ও ইবাদাত-বন্দেগী পূর্ণতা লাভ করে।

(১০) ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি একাগ্রতা অক্ষুণ্ন রাখিবে। এই স্বভাবাপন্ন লোক আবেদ ব্যক্তিদের পদে উন্নীত হয়। আল্লাহর সৃষ্ট জীবের নিকট তাহার মর্যাদা বর্দ্ধিত হয়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে কোন কাজেই সে একাগ্রতা লাভ করে। একাগ্রতাই সমস্ত ইবাদাতের মূল।

কবরের আযাব দূর করার নামায

আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, প্রথম রাকাত সূরা ফাতিহার পর সূরা মুমিনীনের প্রথম আয়াত হইতে—

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ *

পর্যন্ত পড়িয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলে মানব বা জিনের শত্রুতা হইতে রক্ষা পায়। রোজকিয়ামতে ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত হইবে এবং কবর আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ইচ্ছা না থাকিলেও আল্লাহ তাহাকে কোরআন ও কোরআনের রহস্য এবং হেকমত শিখাইয়া দিবেন। ক্ষতি সাধন হইতে তাহার অন্তঃকরণ উজ্জ্বল থাকিবে। মানুষ যখন বিপদাপন্ন থাকিবে, তখন আল্লাহ তাহাকে নিরাপদ রাখিবেন। দুনিয়ার মোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া সে সিদ্দীকীনদের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

প্রয়োজন উদ্ধারের নামায

আবু হাশেম আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির আল্লাহর নিকট কোন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রার্থনা করিবার থাকিলে উত্তমরূপে অজু করতঃ দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। উহার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর (আমানার রাসূল) হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে। নামায শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ يَامُؤْنِسًا كُلِّ وَحِيْدٍ وَيَا صَاحِبًا كُلِّ فَرِيْدٍ وَيَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ اَسْئَلُكَ بِنَعْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِىْ لَاتَأْ خُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ وَّاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِىْ عَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ وَخَشِعَتْ لَهُ الْاَصْوَاتُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ اَنْ تُصَلِّىْ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْ تَجْعَلْ لِىْ مِنْ اَمْرِىْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّتَقْضِ حَاجَتِىْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুনিসান কুল্লি অহীদিন অইয়া ছাহিবান কুল্লি ফারীদিন ওয়া ইয়া ক্বারীবান গাইরা বাঈদিন ওয়া ইয়া শা-হিদান গাইরা গায়িবিন ওয়া ইয়া গালিবান গাইরা মাগলুবিন আসয়ালুকা বিনাআমিকা, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমিল হাইয়্যিল ক্বাইয়্যূমিল্লাযী লা তাখুযুহু সিনাতুউঁ অলা নাউমুন অ আসয়ালুকা বিইসমিকা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমিল হাইয়্যিল ক্বাইয়্যূমিল্লাযী আনাত লাহুল উজুহু অ খাশিআত লাহুল আসওয়াতু অ অজালত মিনহুল ক্বুলুবু আন তুছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন অ আন তাজআলনী মিন আমরী ফারজান অ মাখরিজান অ তাক্বদ্বি হাজাতী।

চিন্তাদূর এবং ঋণ পরিশোধের উপায়

হযরত আবু মুসা আশআরি (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, চিন্তিত ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِىْ قَضَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْعَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلِ الْقُرْاٰنَ الْكَرِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ غَمِّىْ وَهَمِّىْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা অ ইবনু আবদিকা নাছিয়াতী বিইয়াদিকা মাজিন ফী হুকমিকা আদলুন ফী ক্বাজায়িকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা বিকুল্লি ইসমিন হুঅলাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতাহু ফী কিতাবিকা আও আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিকা আবিসতাছারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইনদিকা আন-তাজআলিল ক্বুরআনাল কারীমা রাবীআ ক্বালবী অ নূরা ছাদরী অ জাল হোযনী অ যাহাবা গাম্মী অ হাম্মী।

এক ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! যদি এই দোয়া সম্পূর্ণরূপে কাহারও স্মরণ না থাকে বরং কোন শব্দ ভুল চুক হইয়া যায় তবে কোন ক্ষতি হইবে কি?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন যে, হাঁ, অবশ্যই ক্ষতি হইবে। অতএব উহা ভালভাবে মুখস্ত করিয়া লও। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার তাঁহার পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে যে একটি দোয়া শিখাইয়াছেন, সে দোয়াটি আপনি জানেন কি? তিনি উহা আমাকে শিখাইবার কালে বলিয়াছেন, কাহারও যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও ঋণ থাকে, তবে আল্লাহ্তায়ালা এই দোয়াপাঠকারীর সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

উক্ত দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ الدَّعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْحَمْنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةٍ مِّنْ سِوَاكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া ফারিজাল হাম্মি কাশিফাল গাম্মি মুজীবাদ্দাওয়াদিতিল মুদ্বতাররীনা রাহমানাদ্দুনইয়া অরাহীমা আসয়ালুকা আন তারহামনী রাহমাতাম মিন ইন্দিকা তুগ্বনিনী বিহা আর-রাহমাতিম মিন সিওয়াকা।

হযরত ঈসা (আঃ)ও তাঁহার উম্মতগণকে এই দোয়াটি শিখাইয়াছিলেন।

একবার হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-এর নিকট তাঁহার জনৈক বোযর্গ বন্ধু আসিয়া বলিলেন, হে আবু সাঈদ। আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমাকে ইসমে আজম শিখাইয়া দিন।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলিলেন, তুমি ইসমে আজম শিখিতে চাহিলে অজু করিয়া আস।

বোযর্গ বন্ধু অজু করিয়া আসিলে হযরত হাসান বছরী (রহঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এইবার পাঠ কর ঃ

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اَنْتَ اللّٰهُ بَلٰى وَاللّٰهِ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَقْضِ عَنِّىْ الدَّيْنَ وَارْزُقْنِىْ بَعْدَ الدَّيْنِ ○

*

উচ্চারণ ঃ ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু আনতাল্লাহু বালা অল্লাহি আতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল্লাহু আল্লাহু অল্লাহু অল্লাহি ইন্নাহু লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আক্বদ্বি আন্নিদ্দাইনা অরযুক্বনী বা'দাদ্দাইনি।

ইহার আমল করিবামাত্র পরদিন সকালে হাসান বছরীর উক্ত বোযর্গ বন্ধু দেখিলেন যে, একলাখ দেরহাম পূর্ণ একটি থলিয়া মুখ বন্ধ অবস্থায় মসজিদের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে। থলিয়ার উপরে লিখিত রহিয়াছে যে, আরও অধিক চাহিলে তাহাও তোমাকে দেওয়া হইত। তুমি বেহেশতের প্রার্থনা কেন করিলে না?

ইহার পর উক্ত বোযর্গ বন্ধু হযরত হাসান বছরী (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, আমার দুঃখ ও অনুতাপ এই যে, আমি বেহেশতের প্রার্থনা কেন কলিলাম না।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলিলেন, তুমি বন্ধু বলিয়াই তোমাকে ইহা শিখাইয়াছি। ইহা গোপন রাখ। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইহা জানিতে পারিলে কিন্তু আর রক্ষা থাকিবে না।

মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হুযুরে পাক (দঃ) যখন হেরা পর্বতের দিকে যাইতেছিলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, তখন ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (দঃ)! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন আর তিনি আপনাকে এই শিখাইয়া দিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি এই দোয়া পড়িলে আপনার ও কোরায়েশদের মধ্যে একটি পর্দার অন্তরাল সৃষ্টি হইয়া যাইবে। দোয়াটি এই ঃ

يَا كَبِيْرُ كُلِّ كَبِيْرٍ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا مَنْ لَّا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا وَزِيْرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيْرِ يَا عِصْمَةَ الْبَائِسِ الْخَائِنِ الْمُسْتَجِيْرِ يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيْرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ يَا قَاهِرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ اَسْئَلُكَ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْبَائِسِ الْفَقِيْرُ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ الْضَرِيْرِ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمَفَاتِيْحَ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِالْاَسْمَاءِ الثَّمَانِيَّةِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلٰى قَرْنِ الشَّمْسِ اَنْ تَفْعَلَ بِىْ كَذَا وَكَذَا *

উচ্চারণ ঃ ইয়া কাবীরু কুল্লি কাবীরিন ইয়া সামীউ ইয়া বাছীরু ইয়া মাল্লা শারীকা লাহু অলা অযীরা, ইয়া খালিক্বাশ শামসি অল ক্বামারিল মুনীরি উয়া আছমাতাল বায়িসিল খায়িনিল মুসতাজীরি ইয়া রাযিক্বাত্ব ত্বিফলিছ ছাগীরি ইয়া জাবিরাল আজমিল কাসীরি ইয়া ক্বাহিরা কুল্লি জাব্বারিন আনীদিন আসয়ালুকা অ আদউকা দুআয়াল বায়িসিল ফাক্বীরি দুআয়াল মুদ্বতাররিদ্ব দ্বারীরি আসয়ালুকা বিমা আক্বিদিনিল ইযযি মিন আরশিকা অ মাফাতীহার রাহমাতি মিন কিতাবিকা অবিল আসমায়িছ ছামানিয়্যাতিল মাকতুবাতি আলা ক্বারনিশ শামসি আন তাফআলা বী কাযা অ কাযা।

চোর ডাকাত এবং হিংস্র জীব হইতে নিরাপত্তা

সফরের মধ্যে চোর ডাকাত এবং ক্ষতিকারক জীব জানোয়ার হইতে নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ احْرِ سْنَابِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَاتَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِىْ لَايُرَامُ وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا لَانُهْلِكُ وَاَنْتَ رِجَاؤُنَا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা এহরিসনা বি আইনিকাল্লাতী লা তানামু অকনুফনা বিরুকনিকাল্লাযী লা ইউরামা অরহামনা বিক্বুদরাতিকা আলাইনা লা নুহলিক অ আনতা রিজাউকা।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন যে, আমি হুযুরে পাক (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সফরে যাইবার পূর্বের রাত্রে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে, সফরে তাহার চোর ডাকাত কিংবা কোনরূপ জীব জানোয়ার দ্বারা বিপদাপন্ন হইতে হইবে না। দোয়াটি এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মাআ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি অলা ফিচ্ছামায়ি অ হুচ্ছামীউল আলীম।

আবু ইউসুফ খোরাসানী (রহঃ) আবু সাঈদ ইবনে আবী রাওহা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি একবার মক্কা শরীফ যাত্রা করিয়া রাত্রি বেলা পথ হারাইয়া ফেলিলাম। হঠাৎ আমি একটি আওয়াজ শুনিয়া একেবারে অধিক ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। কে যেন উচ্চ আওয়াজে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? ঐরূপ আওয়াজ শুনিলাম কিন্তু আমি লোকজন কাহাকেও

দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি বিশেষভাবে কর্ণ নিয়োগ করিলাম যে, আবার কোন আওয়াজ আসে নাকি! এইবার আমি শুনিতে পাইলাম, কে যেন কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিতেছে। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কে কোথায় বসিয়া কোরআন পড়িতেছে?

ইতিমধ্যে সেই আওয়াজ, প্রদানকারী লোকটি না জানি কোন স্থান হইতে বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল যে, আমার মনে হইতেছে তুমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমি উত্তর করিলাম, হাঁ জনাব, আপনার অনুমান সত্য। আমি নিশ্চয়ই পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল, তবে আমি কি তোমাকে এমন জিনিস শিখাইয়া দিব, যে জিনিস পাঠ করিলে পথে-ঘাটে চলিতে রাস্তা হারাইয়া ফেলিলে সহজেই পথের খোঁজ লাভ করা যায়? আর যদি মনে কোন ভয় ভীতির উদ্রেক হয় তবে উহা পাঠ করা মাত্র ভয়ভীতি দূর হইয়া যায়?

আমি বলিলাম, জনাব, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অবশ্যই আমাকে সেই জিনিসটি শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তবে তুমি এই দোয়াটি পাঠ কর—

بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّانِ الْعَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدِ السُّلْطَانِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَانٍ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ـ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি যিশশানিল আজীমিল বুরহানি শাদীদিস সুলতানি কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শানিন আইযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানি, মা-শাআল্লাহু কানা লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি।

আবু সাঈদ বলেন যে, আল্লাহর কি অসীম মেহেরবানী! আমি এই দোয়াটি পড়িবার সাথে সাথেই আমি আমার হারানো পথ ফিরিয়া পাইলাম এবং সেই পথে অল্পক্ষণ চলিয়াই আমার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হইলাম। হঠাৎ আমার মনে আমাকে সেই দোয়া শিক্ষাদাতার কথা জাগিয়া উঠিল। আমি ব্যস্ত-ত্রস্ততার সাথে তাহাকে তালাশ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

আবু হেলাল (রহঃ) বলেন যে, আমি একবার মিনার পথে আমার সঙ্গীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। বহু সময় পর্যন্ত সব দিকে তালাশ করিয়াও কোথাও আর তাহাদিগকে পাইলাম না। অবশেষে বর্ণিত দোয়াটি পড়িবামাত্র আমি তাহাদের সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাতবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে, তাহার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এবং দুঃখ-দুর্দশা দূর হইয়া যাইবে ঃ

اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَيَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না অলিয়্যাল্লাহুল্লাযী নাযযালাল কিতাবা অ হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাছ ছালিহীনা হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু অ হুয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিপদাপদের সময়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে আল্লাহ অবশ্যই তাহার ঐ বিপদাপদ দূর করিয়া দিবেন ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللّٰهُ الْعَلِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্লাহুল আলীমু সুবহানাল্লাহি রাব্বুল আরশিল আজীমি আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অন্তরে শান্তি ও স্থিরতা লাভের নামায

যাহার মনে অশান্তি, উদ্বেগ এবং অস্থিরতা বিরাজমান, সে নিম্নোক্ত নিয়মে দুই রাকাত নামায আদায় করিলে আল্লাহর রহমতে তাহার মনে শান্তি, নিরুদ্বিগ্নতা এবং স্থিরতা ফিরিয়া আসিবে।

এই নামায আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। যখন ইচ্ছা পড়িতে পারে। পড়িবার নিয়ম হইল, ইহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে দশবার সূরা ইখলাস এবং 'ফাসাইয়াকফীকা হুমুল্লাহু অহুয়াস সামীউল আলীম' আয়াত পঞ্চাশ বার পাঠ করিবে এবং নামায শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিবে ঃ

يَا اَللّٰهُ ـ يَا رَحْمٰنُ ـ يَا رَحِيْمُ ـ يَا حَنَّانُ ـ يَا مَنَّانُ ـ يَامُسَبِّحًا
بِكُلِّ لِسَانٍ يَا كَافِىَ مُحَمَّدِ نِ الْاَحْزَابُ وَيَا كَافِىَ اِبْرَاهِيْمَ النِّيْرَانِ
وَيَا كَافِىَ مُوْسٰى فِرْعَوْنَ ـ فَيَا كَافِىَ عِيْسٰى الْجَبَابِرَ وَيَا كَافِىَ
نُوْحَانِ الْغَرَقِ وَيَا كَافِىَ لُوْطًا فَحْشَ قَوْمِهٖ وَيَا كَافِىَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ
حَتّٰى لَايَخَافُ وَلَا اَخْشٰى مَعَ اِسْمِكَ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়ারাহীমু ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া মুসাব্বিহাম বিকুল্লি লিসানিন ইয়া কাফিয়া মুহাম্মাদিনিল আহযাবু অ ইয়া কাফিয়া ইব্রাহীমান্নীরানি অ ইয়া কাফিয়া মুসা ফিরআউনা অ ইয়া কাফিয়া ঈসাল জাবায়িরা অ ইয়া কাফিয়া নুহানিল গারক্বি অ ইয়া কাফিয়া লূত্বান ফাহশা ক্বাওমিহী অ ইয়া কাফিয়া মিন কুল্লি শাইয়িন হাত্তা লা ইয়াখাফু অলা আখশা মা আ ইসমিকাল আজীম।

শত্রুতা দূর হওয়ার নামায

শত্রুতা দূর করার জন্য চারি রাকাত নামায আছে। ইহা আদায় করার নিয়ম এই ঃ

এই নামায চারি রাকাত একই সালামে আদায় করিবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে দশবার সূরা ইখলাস এবং তিনবার সূরা কাফিরূন পাঠ করিবে। তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে দশবার সূরা ইখলাস এবং তিনবার সূরা তাকাছুর পাঠ করিবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে পনের বার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে। নামাযের বাদে দোয়া মুনাজাত করিয়া উহার যাবতীয় ছওয়াব শত্রুর উদ্দেশ্যে বখশেষ করিয়া দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে ঐলোক চিরদিনের জন্য শত্রুতা করা হইতে বিরত থাকিবে। আর এই নামাযের ফলে নামায আদায়কারীর রোজকিয়ামতে যাবতীয় বিপদ আপদ স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই দূর করিয়া দিবেন।

এই নামায আদায় করার সময় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত তারিখসমূহে ইহা আদায় করিতে হয়। যথা ঃ

(১) রজব মাসের প্রথম রাত্র (২) ঐ মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্র (৩) শাবান মাস এবং রমজান মাসের শেষ জুমাআর রাত্র (৪) দুই ঈদের পূর্ব রাত্র (৫) আরফার দিন এবং (৬) আশুরার দিন।

কবর আযাব মুক্তির নামায

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুই রাকাত নফল নামায এইভাবে আদায় করিবে যে, উহার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফোরকানের শেষ রুকূ অর্থাৎ রুকূর প্রথম হইতে শুরু করিয়া সূরার শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মু'মিনূন-এর প্রথম হইতে 'ফাতাবা-রাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন' পর্যন্ত পাঠ করিবে। এইভাবে নামায আদায়কারীকে আল্লাহ্ কবর আযাব হইতে মুক্তি দান করেন। তাহাছাড়া ইহারা আল্লাহর কৃপায় জ্বিন ও মানব জাতির যে কোনরূপ ক্ষতি ও অপকার হইতে নিরাপদ রাখেন। আর রোজ কিয়ামতে ইহাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে।

এইরূপও বর্ণিত আছে যে, এই নামায আদায়কারীকে আল্লাহতায়ালা কোরআনে পাকের এলেম দান করিবেন! আল্লাহ্ ইহার গরীবী এবং পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিবেন। পার্থিব জীবনে ইহাকে আল্লাহ শান-শওকত দান করিবেন। কবরে এবং রোজকিয়ামতে বিভিন্ন রকম সুয়ালসমূহের যথাযথ উত্তর ইহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার অন্তঃকরণে আল্লাহ্ নূর সৃষ্টি করিয়া দিবেন। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও মহব্বত ইহার অন্তর হইতে আল্লাহতায়ালা উঠাইয়া দিবেন। আর সিদ্দীকীনদের দফতরে ইহার নাম লিখিত হইবে।

দুর্যোগ দুর্বিপাক এবং উৎপীড়ন দূর করিবার দোয়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)কে নিম্নোক্ত দোয়া শিখাইয়া দিয়াছিলেন। এই দোয়া শিখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যখন তোমাদের উপরে কোন দুর্যোগ দুর্বিপাক আসিবে কিংবা কোন শাসক প্রশাসকের অত্যাচার উৎপীড়নের আশঙ্কা দেখা দিবে বা তোমাদের কোন জীব জন্তু হারাইয়া যাইবে, তখন তোমরা তোমাদের হাত উপরে তুলিয়া মুনাজাতের অবস্থায় এই দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالسَّرَائِرِ يَا مُطَاعُ يَاعَزِيْزُ يَاعَلِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا هَازِمَ الْاَحْزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَائِدَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ظَلَمَةٍ يَا مُخْلِصَ قَوْمِ نُوْحٍ مِّنَ الْغَرْقِ يَا رَاحِمَ عَبْرَةَ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُنْجِىَ ذِى النُّوْنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ يَا فَاعِلَ كُلِّ خَيْرٍ يَا هَادِيْنَا اِلٰى كُلِّ خَيْرٍ يَا دَالًّا عَلٰى كُلِّ خَيْرٍ وَيَا اَهْلَ الْخَيْرَاتِ اَنْتَ اللّٰهُ رَغِبْتُ اِلَيْكَ فِيْمَا قَدْعَلِمْتَ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া আলিমাল গাইবি অসসারাইরি ইয়া মুত্বাউ, ইয়া আযীযু ইয়া আলীমু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া হাযিমাল আহযাবি লিমুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, ইয়া

কায়িদু ফিরআউনা লিমুসা আলাইহিস সালামু মিন জালামাতিন ইয়া মুখলিছা ক্বাওমি নূহিম মিনাল গারক্বি ইয়া রাহিমা আবরাতি ইয়াক্বুবা আলাইহিস সালামু ইয়া মুনজিয়া যিন্নুনি মিনাজ্জুলুমাতিছ ছালাছি ইয়া ফাইলা কুল্লি খাইরিন ইয়া হাদীনা ইলা কুল্লি খাইরিন ইয়া দাল্লান আলা কুল্লি খাইরিন অ ইয়া আহলাল খাইরাতি আনতাল্লাহু রাগিবতু ইলাইকা ফীমা ক্বাদ আলিমতা অ আনতা আল্লামুল গুইউবি, আসয়ালুকা আন তুচ্ছালী আলা মুহাম্মাদিন অ আলা আলি মুহাম্মাদিন।

এই দোয়াটি পড়িয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিলে আল্লাহ তাহার যে কোন হাজত ও মাকসুদ পূর্ণ করিবেন।

শত্রুর ক্ষতি হইতে নিরাপত্তা লাভের দোয়া

শত্রুর তরফ হইতে ক্ষতি লোকসান না হইবার জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি খুবই কার্যকর। হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এই দোয়াটি জঙ্গে আহযাব অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধের সময়ে পড়িয়াছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) মতে সেই দোয়াটি হইল এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَبِنُوْرِ قُدْسِكَ وَعَظْمَةِ طَهَارَتِكَ وَبَرَكَاتِ جَلاَ لِكَ مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ وَّعَاهَةٍ وَطَارِقِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلاَّ طَارِقًا يَّطْرُقُ مِنْكَ بِخَيْرٍ اِنَّكَ اَنْتَ عَيَاذِىْ فَبِكَ اَعُوْذُ وَاَنْتَ مَلاَذِىْ فِيْكَ الْوُذُ وَيَا مَنْ ذَلَّتْ لَهٗ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَجَمَعَتْ لَهٗ مَقَالِيْدُ الرِّعَايَةِ اَعُوْذُ بِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَكَرَمِ جَلاَلِكَ مِنْ حِزْيِكَ وَكَشْفِ سِتْرِكَ وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْاِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ اَنَا فِىْ كَنْفِكَ فِىْ لَيْلِىْ وَنَهَارِىْ وَنَوْمِىْ وَ قَرَارِىْ وَظَعْنِىْ وَاَسْفَارِىْ ذِكْرُكَ شِعَارِىْ وَثَنَاؤُكَ دِشَارِىْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ تَنْزِيْهًا لِّاِسْمِكَ وَتَكْرِيْمًا لِّسَبْحَاتِ وَجْهِكَ اَجِرْنِىْ مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَعِبَادِكَ وَاضْرِبْ عَلَىَّ سَرَادِ قَاتِ حِفْظِكَ وَاَدْخِلْنِىْ فِىْ عِنَايَتِكَ وَقِنِىْ سَيِّاٰتِ عَذَابِكَ وَاَغْنِنِىْ بِخَيْرٍ مِّنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা অ বিনূরি কুদসিকা অ আজমাতি ত্বাহারাতিকা অ বারাকাতি জালালিকা মিন কুল্লি আফাতিউঁ অ আহাতিউঁ অতারিক্বিল জিন্নি অল ইনসি ইল্লা তারিক্বাইঁ ইয়াত্বরাকু মিনকা বিখাইরিন ইন্নাকা আনতা আইয়াযী ফাবিকা আউযু অ আনতা মালাযী ফীকাল উযু অ ইয়ামান যাল্লাত লাহু রিক্বাবুল জাবাবিরাতি অ জামাআত লাহু মাক্বালীদুর রিআইয়াতি আউযু বিজালালি অজহিকা অ কারামি জালালিকা মিন হিযবিকা অ কাশফি সিতরিকা অনিসবাতি যিকরিকা অল ইনছিরাফি আন শুকরিকা আনা ফী কানফিকা ফী লাইলী অ নাহারী অ নাওমী অ ক্বারারী অ জিগনী অ আসফারী যিকরুকা শাআরী অ ছানাউকা দিশারী লা ইলাহা ইল্লা আনতা তানযী হাল্লিইসমিকা অ তাকরীমাল্লিসাবহাতি অজহিকা আজিরনী মিন খিযইয়িকা অ মিন শাররি আযাবিকা অ ইবাদিকা অদ্বরিব আলাইয়্যা সারাদিক্বাতি হিফজিকা অ আদখিলনী ফী এনাইয়াতিকা অ ক্বিনী সাইয়িয়্যাতি আযাবিকা অগনিনী বিখাইরিম মিনক্বা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই দোয়া পাঠের দ্বারা আল্লাহর রহমতে শত্রুর উপরে বিজয় লাভ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বহু ফায়েদাহ লাভের নামায

আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আনাস ইবনে আবদুল মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি শাওয়াল মাসের দিনে বা রাতে এইভাবে আট রাকাত নামায আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পনের বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং নামাযান্তে সত্তরবার সুবহানাল্লাহ এবং সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়ে, তবে যে আল্লাহ আমাকে সত্য সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ ব্যক্তির অন্তরে হেকমতের ঝর্ণা উন্মুক্ত করিয়া দেন অর্থাৎ তাহার সূক্ষ্ম জ্ঞান বিবেচনা এবং বুদ্ধিমত্তায় অন্তর পূর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহর শপথ, এই নামায আদায়কারী শেষ সিজদায় থাকিতেই আল্লাহ তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেন। ঐ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করিলে আল্লাহতায়ালা তাহাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন।

আর যদি এই নামায ছফর মাসে আদায় করে, তবে নামায আদায়কারীকে আল্লাহ নির্বিঘ্নে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেন। সে ব্যক্তি ঋণী থাকিলে আল্লাহ তাহার ঋণ মুক্ত করিয়া দেন। তাহার যখন যাহার প্রয়োজন হয়, আল্লাহ সে প্রয়োজন তাহাকে পূর্ণ করিয়া দেন।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, এই নামায যে আদায় করে, আল্লাহ তাহাকে নামাযে পঠিত প্রত্যেকটি শব্দ ও আয়াতের জন্য বেহেশত মধ্যে মাখরেকা দান করিবেন।

লোকগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! মাখরেকা কি?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, বেহেশতের এক ধরনের বৃক্ষের নাম মাখরেকা। উক্ত বৃক্ষের ছায়ায় শত বৎসর ভ্রমণ করিলেও সেই এক সীমা হইতে ছায়ার অপর সীমান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

গৃহ হইতে বাহির হওয়াকালীন পড়িবার দোয়া

যখন কেহ সফর করিবার নিয়তে গৃহ হইতে বাহিরে বাহির হয়, তখন এই দোয়াটি পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি অ লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন এই দোয়াটি পাঠ করা হয়, তখন ফিরেশতাগণ উক্ত দোয়া পড়িতে শুনিয়া উহার জবাবে বলিয়া উঠেন ঃ তোমার হেফাজাত এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তোমাকে বালা-মুসীবত হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

সফর গমন কালে যান বাহনে আরোহণের দোয়া

সফরকারী যখন কোন যানবাহনে আরোহণ করিবে, তখন প্রথমে তিনবার আলহামদুলিল্লাহ কালামটি পড়িয়া তার পরে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ سُبْحَانَكَ لَااِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ *

উচ্চারণ ঃ সুবাহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা অমাকুন্না লাহু মুকুরিনীন। সুবহানাকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা জালামতু নাফসী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক সফরের উদ্দেশ্যে যখন কোন যান বাহনে আরোহন করিতেন, তখন তিনি নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا التُّقٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى - اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَنَا وَاَطْوِلَنَا بُعْدَا الْاَرْضِ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْ فِىْ اَهْلِنَا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ফী সাফারী হাযাত্তুক্বা **অ মিনাল** আমালি মা তারদ্বা আল্লাহুম্মা হাওয়্যিন আলাইনাস সাফারানা আত্বওয়ি-লানা বু'দাল আরদ্বি আল্লাহুম্মা আনতাছ ছাহিবু ফী সাফারিনা অখলুফ ফী আহলিনা।

সফর কালে গন্তব্যে পৌছিয়া পড়ার দোয়া

সফরকারী নিজ গন্তব্য স্থানে চাই গ্রাম হউক, কিংবা শহর পৌছিয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ اَهْلِيْهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِيْهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا اَسْئَلُكَ مَوَدَّةَ خِيَارِهِمْ وَاَنْ تَجَنَّبْنِىْ مِنْ شَرِّ اَشْرَا رِهِمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি অমা আজলালনা অ রাব্বাল আরদ্বীনাস সাবয়ি অমা আফলাননা অ রাব্বাশ শাইয়াত্বীনি অমা আদ্বলালনা আসয়ালুকা মিন খাইরি হাযিহিল ক্বারইয়াতি অ খাইরি আহলীহা অখাইরি মা ফীহা অ আউযুবিকা মিন শাররিহা অ শাররি আহলীহা অ শাররি মা ফীহা আসয়ালুকা মাওয়াদ্দাতা খিয়ারিহিম অ আন তাজান্নাবনী মিন শাররি আশরারিহিম।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিভিন্ন নফল নামাযসমূহ
ছালাতুত্তাসবীহ

আবু নসর সনদ পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) একদা তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুতালিব (রাঃ)কে বলিলেন, চাচাজান! আমি কি আপনাকে এমন দশটি জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিফ করিব না, যাহা আমল করিলে আপনার অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত ছগীরাহ ও কবীরাহ্ গুনাহ চাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় করিয়া থাকেন, চাই ইহা প্রকাশ্য হউক, চাই অপ্রকাশ্য হউক মার্জিত হইয়া যাইবে।

উক্ত দশটি বস্তু হইল, আপনি চার রাকাত নামায পড়িবেন। যাহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পাঠ করিবেন।

ঐ নামাযের প্রথম রাকাতে ছানা পড়িবার পরে নিম্নোক্ত তাসবীহ্ পনের বার, সূরা কিরাতের পরে দশবার, রুকূর ভিতরে দশবার, রুকূর পরে দাঁড়াইয়া দশবার, প্রথম সিজদায় দশবার, প্রথম সিজদাহ্র পর বসিয়া দশবার আবার দ্বিতীয় সিজদায় দশবার পাঠ করিবে। অন্যান্য রাকাতগুলিতে সূরা কিরাত শুরু করার পূর্বে পনের বার এবং অন্যান্য স্থানসমূহে অবিকল প্রথম রাকাতের ন্যায় দশবার করিয়া উহা পাঠ করিবে। ইহাতে প্রতি রাকাতে মোট পঁচাত্তর বার এবং চার রাকাতে সর্বমোট তিনশত বার উক্ত তসবীহ্ পাঠ করা হইবে।

এই নামাযে এত বেশী সংখ্যায় তাসবীহ্ পাঠ করা হয় বলিয়াই ইহার নাম ছালাতুত্তাসবীহ্ বা তাসবীহের নামায রাখা হইয়াছে।

তাসবীহ্ এই ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

এই নামায প্রত্যহ একবার করিয়া আদায় করিতে পারিলে সর্বোত্তম। তাহা না পারিলে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার, তাহাও না পারিলে অন্ততঃ মাসে একবার, আর তাহাও না পারিলে অন্ততঃ বৎসরে একবার। আর যদি ঘটনাক্রমে তাহাও না পারা যায় তাহা হইলে অন্ততঃ সারা জীবনেও যেন একবার আদায় করা হয়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, উক্ত চারি রাকাত নামাযে এইভাবে কিরাত পড়িবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা যিলযালাহ্, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠ করিবে।

অন্য হাদীস আছে, আবু নসর তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) জাফর ইবনে তালিবকে এরশাদ করিলেন, জাফর! তুমি সতর্ক হও। আমি তোমাকে একটি মূল্যবান পুরস্কার দান করিতেছি। সতর্ক হও আমি তোমাকে একটি অমূল্য বস্তু পুরস্কার দিতেছি। তারপর রাসূলে পাক (দঃ) উপরোক্ত নামাযের হাদীস বর্ণনা করিলেন।

অন্য একটি হাদীস আছে, তাহাতে দেখা যায়, হুযুরে পাক (দঃ) আমর ইবনুল আস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া এই নামাযের বিষয় বলিয়াছিলেন এবং উক্ত হাদীসে দাঁড়ানো অবস্থায় আরও দশবার বেশী তাসবী পাঠের উল্লেখ রহিয়াছে।

এক হাদীসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, উক্ত নামাযে মোট বারশত বার তাসবীহ্ পড়িতে হইবে। আর সে তাসবীহ্ এইরূপ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ ঃ সুবহান্নাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।
বর্ণিত রহিয়াছে যে, এই নামায প্রত্যেক জুমআর দিন দিবা ভাগে একবার এবং রাত্রি কালে একবার করিয়া আদায় করিবে। ইহা মুস্তাহাব।

এস্তেখারার নামায

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) আমাদেরকে যে কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ কাজের জন্য পূর্বাহ্নে এস্তেখারা করিয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছেন। যেভাবে তিনি আমাদেরকে কোরআনে পাক (দঃ)এর সূরাসমূহ শিক্ষাদান করিয়াছেন, এস্তেখারাও তদ্রূপ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দান করিয়াছেন।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের সামনে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসিয়া পড়িবে তখন তোমরা দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিবে এবং তাহার পরে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِـعِلْـمِـكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُـكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ
عَـلَّامُ الْـغُـيُـوْبِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি ইলমিকা অস্তাক্বদিরুকা বিক্বদরাতিকা অসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকাল আজীমি ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অ তালামু অলা আ'লামু অ আনতা আল্লামুল গুইউব।
এই দোয়ার সাথে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَ الْاَمْرَ خَيْرًلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْـيَاىَ وَ
اُخِرَتِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِه وَاٰجِلِـه فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ
بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِلَّا فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَيَسِّرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَارْضِنِىْ
بِقَضَائِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরু খাইরুল্লী ফী দীনী অ দুনইয়ায়া অ আখিরাতী অ আকিবাতী অ আজিলিহী ফাক্বদিরহুলী অ ইয়াসসিরহুলী ছুম্মা বারিক লী ফীহি অ ইল্লা ফাছরিফহু আন্নী অ ইয়াসসির লিয়াল খাইরা হাইছু কানা মা কুনতু অ আরদ্বিনী বিক্বাজায়িকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া পাক পবিত্র অবস্থায়ই শয্যা গ্রহণ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُرُوْجَ فِىْ وَجْهِىْ هٰذَا بِلَاثِقَةٍ مِّنِّىْ بِغَيْرِكَ
وَلَارَجَاءٍ اِلَّابِكَ وَلَاقُوَّةٍ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَلَاحِيْلَةِ اَلْجَاءُ اِلَيْهَا اِلَّا طَلَبَ

فَضْلِكَ وَالتَّعَرُّضِ بِمَعْرُوْفِكَ وَرَحْمَتِكَ وَالسُّكُوْنَ إِلٰى حُسْنِ عِبَادَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ قَدْسَبَقَ لِيْ فِيْ وَجْهِيْ هٰذَا مِمَّا أُحِبَّ وَأَكْرَهُ - اَللّٰهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّيْ بِقُدْرَتِكَ مَقَادِيْرَ كُلِّ بَلَاءٍ وَّنَفِّسْ عَنِّيْ كُلَّ كَرْبٍ وَرَاءٍ وَّابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفًا مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَلُطْفًامِّنْ عَوْنِكَوَحِذْرًامِّنْ حِفْظِكَ وَجَمِيْعَ مِمَّا فَاتِكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উরুজা ফী অজহী হাযা বিলা ছিক্বাতিম মিন্নী বিগ্বাইরিকা অলা রিজায়িন ইল্লা বিকা অলা ক্বওয়্যাতিন আতাওয়াক্কালু আলাইকা অলা হীলাতিন আলজাউ ইলাইহা ইল্লা তালাবা ফাদ্বালিকা অত্তাআররুজা বিমা'রুফিকা অ রাহমাতিকা অসসাকূনা ইলা হুসনি ইবাদিকা অ আনতা আ'লামু ক্বাদসাবাক্বা লী ফী অজহী হাযা মিম্মা উহিব্বু অ আকরাহু, আল্লাহুম্মা ফাছরিফ আন্নী বিক্বুদরাতিকা মাক্বাদীরু কুল্লি বালায়িন অ নাফসিন আন্নী কুল্লি কারবিউঁ অ রায়িন অবসুত্ব আলাইয়্যা কানাফাম মির রাহমাতিকা অ লুত্বফাম মিন আওনিকা অ হিযরাম মিন হিফজিকা অ জামীই মুআফাতিকা।

এস্তেস্কা বা বৃষ্টিপাতের জন্য নামায

দেশে ভীষণভাবে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এবং পানির অভাবে মানুষ, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, বাগ-বাগিচা, শস্যক্ষেত প্রভৃতি সব কিছুর জন্য দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সূত্রপাত ঘটিলে ছালাতুল এস্তেস্কা বা বৃষ্টিপাতের নামায পড়া আবশ্যক। এই নামায পড়া সুন্নত বৈ কি।

ঈদের নামায যেমন ইমামের পিছনে জামাত সহকারে মাঠে ময়দানে গিয়া আদায় করা হয়, এই নামাযও ঠিক তদ্রূপই চাশতের ওয়াক্তে মাঠে ময়দানে গিয়া জামাতের সাথে আদায় করিতে হয়।

এই নামায আদায়ের নিয়ম ও রীতি অনেকটা-ই ঈদের নামাযের অনুরূপ। অবশ্য ঈদের নামাযে যেমন অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলিতে হয়, এই নামাযে উক্ত প্রকার অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলিতে হয় না।

যেদিন এই নামায পড়িবে, ভোরে অজু গোসল করিয়া পাক পবিত্রভাবে সকলে মিলিয়ে ময়দানে যাইবে। শরীরে বা কাপড়ে সুঘ্রাণ ব্যবহার করিবে না, ঈদের নামায আদায়ের জন্য সুঘ্রাণ ব্যবহার করা মুস্তাহাব হইলেও ছালাতুল এস্তস্কায় মুস্তাহাব নহে। কেননা ঈদের নামায হইল খুশীর নামায, পক্ষান্তরে ছালাতুল এস্তেস্কা হইল বিপদ এবং সঙ্কট মুক্তির নামায। সুতরাং এই নামাযে সুগন্ধী ব্যবহার করা সামঞ্জস্যমূলক নয়। বরং এই নামাযে বান্দার অন্তরের চিন্তা, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি বাহিরেও প্রকাশ করার জন্য নম্র ও বিনীতভাবে পুরাতন এবং মামুলি বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজেদের দুর্বলতা, অভাব অভিযোগ এবং সঙ্কটাপন্ন অবস্থার নিদর্শন প্রকাশ করতঃ ময়দানে নামায আদায় করিতে যাওয়া মুস্তাহাব।

এই নামাযে বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা বালক কিশোর সকলেরই শরীক হওয়া চাই। এই নামাযের উদ্দেশ্যে প্রকৃত প্রস্তুতি হিসাবে যাহারা নামায পড়িবে, তাহাদের যাবতীয় হক্কুল এবাদ আদায় করিয়া লওয়া চাই। যে যত রকমের গুনাহ-খাতা করিয়াছে সে সব হইতে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে খাঁটিভাবে তাওবাহ করিতে হইবে, এমন কি যদি কাহারও যাকাত ফিতরা মানত কাফফারা প্রভৃতি আদায় করা বাকী থাকে, তবে তাহা আদায় করিয়া লইবে। উপরন্তু নামায আদায়ের আগে

কিছু কিছু নফল দান খয়রাতও করিবে। তাহাছাড়া কিছু পরিমাণ নফল নামায ও নফল রোযাও আদায় করিবে। তাওবাহর উপর মজবুত থাকিবে এবং ভবিষ্যতেও মজবুত থাকিবার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং কঠোর প্রতিজ্ঞা মনে মনে পোষণ করিবে।

এই দিনকার আল্লাহর দরবারে দোয়া মুনাজাত এবং আবেদন নিবেদনের ভিতরে আলেম ফাজেল বোযর্গ মুর্শিদ এবং খোদাভীরু লোকদের উসীলা গ্রহণ করিয়া লইবে। কেননা এক রাওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে—

একবার হযরত ওমর (রাঃ) ছালাতুল এস্তেস্কা আদায় করিতে বাহির হইয়া হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর সম্মানিত চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হস্ত ধারণ করতঃ কিবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া এইভাবে আল্লাহর দরবারে আরজ করিতে লাগিলেন, হে মাবুদ! ইনি আমাদের মহানবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর পিতৃব্য, দ্বীনদার ব্যক্তি। আমরা তাঁহাকে উসিলা হিসাবে পেশ করতঃ তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি তাঁহার পাক তোফায়েলের বরকতে আমাদের প্রতি মেঘের বারি বর্ষণ করিয়া আমাদের বৃষ্টির অভাবজনিত এই মহাসঙ্কট দূর কর।

বর্ণনাকারী বলিতেছেন যে, এইরূপ দোয়া করার পর হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য লোকগণ নামাযের স্থান হইতে বিদায় হইয়া গৃহে পৌঁছিবার পূর্বেই আল্লাহর রহমতে এমন মুসলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হইল যে, তাহারা সকলেই ভিজিয়া একাকার হইলেন। তাহাদের মন-প্রাণ-দেহ শীতল হইয়া গেল।

মূলতঃ দেশে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি, এইগুলি আল্লাহতায়ালার গজবে হইয়া থাকে, আর এই গজব আসে মানুষের আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁহার নির্দেশে অমান্যের কারণে। যেমন এক রাওয়ায়েতে আসিয়াছে, কোন বেঈমান কাফিরকে যখন মাটির নীচে দাফন করা হয়, তখন মুনকার নাকীর হাজির হইয়া তাহার নিকট স্রষ্টা, নবী এবং দ্বীন ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তাহাদের কাছে উত্তর না পান, তখন তাঁহারা উহাদেরকে ভারী লৌহ গুর্জ দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রহারের আঘাতে যখন উহারা মর্মন্তুদভাবে আর্তনাদ করিতে থাকে, তাহা একমাত্র জ্বিন এবং মনুষ্য ব্যতীত সকল পশু-পাখিরাই শুনিতে পায়। ইহাতে তাহাদের মনে কোন প্রকার দয়া না হইয়া বরং তাহারাও আল্লাহর ঐ সকল অবাধ্য বান্দাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিতে থাকে এবং ইহা অনাবরতই চলিতে থাকে। এমন কি একটি বকরীকে যখন যবেহকারী যবেহ করিতে শুরু করে, তখনও সে আল্লাহর ঐসব অবাধ্য বান্দাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করে ও বলে যে, এইসব পাপীদের পাপের কারণেই আল্লাহ আমাদের দেশে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কোরআনে পাকের কোন এক আয়াতের মর্মে জানা যায় যে, মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্যতার দ্বারা আল্লাহর গজব তথা ব্যাপক বিপদ ডাকিয়া আনে, তখন সেই বিপদের জালে অন্যান্য মানুষ তো ভাল এলাকার পশু-পাখি পর্যন্ত জড়াইয়া পড়ে।

অতএব এই কঠিন বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর দরবারে রোনাজারী ও কাকুতি-মিনতি সহকারে ইবাদত করিয়া ফরিয়াদ করিতে হয়।

এস্তেস্কার নামায আদায়ের নিয়ম ঃ দেশের প্রশাসক কিংবা প্রশাসক মনোনীত কোন প্রতিনিধি ছালাতুল এস্তেস্কার ইমাম হইবেন। আযান ব্যতীত এই নামায (দুই রাকাত) আদায় করিবে। ইহাতে একামতও বলিতে হইবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই নামায ঈদের নামাযের অনুরূপ, কিন্তু ইহাতে ঈদের নামাযের মত অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলিতে হইবে না। অবশ্য ইহাতে ইমামের খুৎবাহ পড়িতে হইবে।

কাহারও কাহারও মতে ইহার প্রথম রাকাতে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচটি তাকবীর বলিতে হইবে। নামায শেষ করিয়া খুৎবাহ পড়িতে হইবে। এক রাওয়ায়েতে নামাযের আগে (জুমআর নামাযের ন্যায়) খুৎবাহ পাঠ করা জায়েয বলা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এক রাওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে,এস্তেস্কা নামাযে খুৎবাহ পাঠ করা সুন্নত নয় বরং নামাযের বাদে খুৎবাহর বদলে ইমাম দুই হাত তুলিয়া মুক্তাদীগণসহ শুধু দোয়া-মুনাজাত করিবেন। মোটকথা, ইমাম যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করিবেন। এ ব্যাপারে শুধু ইমামেরই অধিকার।
আর ইমাম যদি খুৎবাহ পাঠ করেন তবে ঈদের নামাযের অনুরূপ তাকবীর দ্বারা খুৎবাহ শুরু করিবেন। খুৎবাহর ভিতরে অধিক সংখ্যায় দরূদ পাঠ করিবে। আর কোরআনে পাকের আয়াত শরীফও পড়িবে ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا *

উচ্চারণ ঃ ফাকুলতাস তাগ্বফিরূ রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলুস সামাউ আলাইকুম মিদরারা।
খুৎবাহ পাঠ শেষ করিয়া ইমাম সাহেব নিজের গায়ের চাদর উলটাইয়া ফেলিবেন অর্থাৎ তাঁহার ডাহিন কাঁধের দিকের আচল বাম কাধের দিকে ও বাম কাঁধের আচল ডাহিন কাঁধের দিকে ঘুরাইয়া দিবেন এবং চাদরের নীচের দিকের কিনারা উপরের দিকে ও উপরের দিকের কিনারা নীচের দিকে দিয়া উহা গায়ে জড়াইবেন। ইমামের দেখাদেখি সমস্ত মুক্তাদীও এই আমল করিবে। গৃহে পৌঁছা পর্যন্ত চাদর এইভাবেই গায়ে রাখিবে।
এস্তেস্কার নামায সম্পর্কিত এক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, এবাদ ইবনে তামীম নিজের চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) একদা লোকজন ছালাতুল এস্তেস্কা পড়িবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন এবং গিয়া প্রকাশ্য কিরাতে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। নামাযান্তে মুক্তাদীগণের দিকে ফিরিয়া আল্লাহর দরবারে বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করিলেন।
কিন্তু ইমামদের উচিত কিবলামুখী হইয়া আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করা।
এস্তেস্কার নামাযের মুনাজাতের দোয়া ঃ হযরত রাসূলে করীম (দঃ) খোদ এস্তেস্কার নামাযে এই দোয়ার দ্বারা মুনাজাত করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا هَنِيًّا مَّرِيْعًا غُلَامًا مُّجَلَّلًا (يَا مُجَلَّلًا) عَامًّا طَبَقًا سُحْبًا دَائِمًا ـ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ سَقْيَا رَحْمَةٍ لَّاسَقْيَا عَذَابٍ وَلَامَحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَاهَدَمٍ وَّلَاغَرْقٍ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بِا لْبِلَادِ وَالْعِبَادِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْاَذَاءِ وَالْبَلَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَالَاتَكْوٰى اِلَّا اِلَيْكَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَاَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَاَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ـ اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرٰى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ

كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَّنَا اِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَا كَمَا اَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَّنَا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসক্বিনা গাইছাম মুগীছাম মুরীয়ান হানিয়াম মুরীয়ান গুলামাম মুজাল্লান (ইয়া মুজাল্লালান) আ'মান ত্বাবাক্বান সাহইয়ান দায়িমান, আল্লাহুম্মা আসক্বিনাল গাইছা অলা তাজআলনা মিনাল ক্বানিত্বীনা, আল্লাহুম্মা সাক্বইয়া রাহমাতিল লা সাক্বইয়া আযাবিন অলা মাহক্বিন অলা বালায়িন অলা হাদামিন অলা গারক্বিন, আল্লাহুম্মা ইন্না বিল বিলাদি অল ইবাদি অল খালক্বি মিলাল আযায়ি অল বালয়ি অল জুহদি অদ্দ্বানাকি মা লা তাকওয়া ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আনিবতু লানায যারআ অ আদিরু লানাদ্ব দ্বারাআ অ আসক্বিনা মিম বারাকাতিস সামায়ি অ আনিবতু লানা মিম বারাকাতিস সামায়ি অ আনিবতু লানা মিম বারাকাতিল আরদ্বি আল্লাহুম্মারফাআ আন্নাল জুহদা অল জুআ অল উরা অকশিফ আন্না মিনাল বালায়ি মালা ইয়াকশিফুহু গাইরুকা, আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাগ ফিরুকা ইন্নাকা কুনতা গাফফারান ফারসিলিস সামায়া আলাইনা মিদরারা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আমারতানা বিদুয়ায়িকা অ অ আদতানা ইজাবাতাকা ফাক্বাদ দাআওনা কামা আমারতানা ফাস্তাজিব লানা কামা অ আদতানা।

একটি বর্ণনা এইরূপ আছে যে, ছালাতুল এস্তেস্কার খুৎবাহ ইমাম সাহেব কিবলারোখ হইয়া পাঠ করিবেন। তারপর মুক্তাদীদের দিকে ফিরিয়া মুনাজাত করিবেন। কিন্তু আসলে উত্তম ব্যবস্থা হইল, খুৎবাহ পাঠ করিবেন মুক্তাদীগণের দিকে ফিরিয়া এবং মুনাজাত করিবেন কিবলারোখ হইয়া। কেননা খুৎবাহর ভিতরে নসিহত, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং খোশ-খবরী প্রদান এবং অন্যান্য শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথাবার্তাসমূহ সবিস্তারে বিবৃত হইয়া থাকে মুক্তাদীদেরকে লক্ষ্য করিয়া, পক্ষান্তরে মুনাজাত ও প্রার্থনা করা হয় আল্লাহর দরবারে। কাজেই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ও যুক্তির বিচারেই খুৎবাহ পাঠ হওয়া উচিৎ মুক্তাদিগণের দিকে ফিরিয়া এবং মুনাজাত ও প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় বলিয়া উহা কিবলারোখ হইয়া করাই সুসঙ্গত।

কুসুফ বা সূর্যগ্রহণের নামায

আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে কুসুফ অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সময়ে দুই রাকাত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু হানাফী মাযহাবে উহা আদায় করা নফল। গ্রহণ শুরু হইবার সাথে সাথে এই নামায পড়িতে আরম্ভ করা যায় এবং যতক্ষণ গ্রহণ থাকে ততক্ষণই ইহা আদায় করা যায়, কিন্তু গ্রহণ ছাড়িয়া যাইবার সাথে সাথেই এই নামায পড়ার সময় সমাপ্ত হয়। তখন আর ইহা পড়া যায় না।

এই নামায আদায়ের নিয়ম হইল, ইহা মসজিদে গিয়া জামাতের সাথে আদায় করিতে হয়। অবশ্য ইহা বাসগৃহেও পড়া জায়েয আছে।

এই নামায এক বিশেষ নিয়মে আদায় করিতে হয়। যথা ঃ ইমাম তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা ও তায়াউয তাসমিয়া পড়িয়া সূরা ফাতিহা পাঠ করিবে। তারপরে প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা পাঠ করিবে। তারপর তাকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে। রুকূ এত দীর্ঘ করিবে যে, একশত আয়াত কিরাত পড়া যায় এই পরিমাণ সময় পর্যন্ত রুকূর তাসবীহ পাঠ করিবে। তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ সূরা আলে এমরান পাঠ করিবে। তারপর আবার তাকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে। রুকূতে প্রথম রুকূ অপেক্ষা কিছু কম সময় পর্যন্ত থাকিয়া রুকূর তাসবীহ পড়িতে থাকিবে।

দ্বিতীয় রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া তারপর তাকবীর বলিয়া সিজদায় যাইবে। সিজদাহ্ এত সময় পর্যন্ত দীর্ঘ করিবে যে, সেই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ একশত আয়াত পাঠ করিতে পারা যায়। তারপর তাকবীর বলিয়া সিজদাহ্ হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া আবার দ্বিতীয় সিজদায় যাইবে। এই সিজদায়ও প্রথম সিজদাহ্র অনুরূপ সময় থাকিয়া সিজদাহ্র তাসবীহ্ পড়িতে থাকিবে।

অতঃপর তাকবীর বলিয়া দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে। এই রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়িয়া তাহার সাথে সূরা নিসা পাঠ করিবে। তারপর রুকূতে গিয়া অবিকল প্রথম রাকাতের রুকূর মত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকূর তাসবীহ্ পড়িতে থাকিবে। তারপর রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়িয়া তাহার সাথে সূরা মায়েদাহ্ পাঠ করিবে। তারপর তাকবীর বলিয়া আবার দ্বিতীয় রুকূতে যাইবে এবং রুকূতে প্রথম রুকূর ন্যায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকূর তাসবীহ্ পড়িতে থাকিবে।

এইভাবে দ্বিতীয় রুকূ শেষ হইবার পর প্রথম রাকাতের অনুরূপ দুইটি সিজদাহ্ করিবে ও সিজদাহ্র মধ্যে প্রথম রাকাতের সিজদাহ্র অনুরূপ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিজদাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করিবে।

উল্লিখিত সূরাসমূহ যদি কাহারও মুখস্ত না থাকে, তবে ঐ সমস্ত সূরা পাঠ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে, আন্দাজ করিয়া ঠিক ততক্ষণ সময় কিয়ামে থাকিয়া নিজের মুখস্ত ছোট ছোট সূরাই ঐ সময় পর্যন্ত পাঠ করিবে, তাহাতে উহা যতবার পাঠ করা যায়। আর যদি অন্য কোন সূরাও মুখস্ত না থাকে তবে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করিবে এবং উল্লিখিত দীর্ঘ সময় ধরিয়া উহা যত বার পড়া যায় ততবার পড়িবে।

কিয়ামে কয়েকবার সূরা কিরাত পড়িতে একবারের সাথে অন্য বারের ব্যবধান এই পরিমাণ, যেমন প্রথম রাকাতের প্রথম কিয়ামে যে পরিমাণ কিরাত পাঠ করিবে, প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় কিয়ামে উহার তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ কিরাত পাঠ করিবে। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের প্রথম কিয়ামে কিরাতের পরিমাণ প্রথম রাকাতের প্রথম কিয়ামের পরিমাণের অর্দ্ধেক হইবে। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় কিয়ামের কিরাতের পরিমাণ দ্বিতীয় রাকাতের প্রথম কিয়ামের কিরাতের পরিমাণের তিন ভাগের দুই ভাগ হইবে।

এই নামায গৃহে আদায় করা জায়েয হইলেও মসজিদে আদায় করাই উত্তম।

খুসুফ এবং চন্দ্র গ্রহণের নামায

চন্দ্রগ্রহণ শুরু হইয়া গেলে একাকী গৃহে অথবা মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করিবে। কোন কোন বর্ণনায় ইহা চারি রাকাত পড়িবারও বিধান আছে দেখা যায়। তবে এই নামায জামাতে পড়িবার বিধান নাই। এই নামাযের সূরা কিরাত নীরবে পড়িতে হয়।

শুধু কেবল সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ-ই নয়; প্রবল ঝড় তুফান, ভূমিকম্প ইত্যাদি যে কোন বিপদাপদ কিংবা দূর্যোগ ঘটিতে দেখা গেলে তাহা দূর করিবার নিয়তে দুই বা চারি রাকাত নামায আদায় করা সুন্নত।

সূর্য গ্রহণের নামাযের প্রমাণ ঃ সূর্যগ্রহণ কালে নামায আদায়ের বিধান হুযুরে পাক (দঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমেই প্রমাণিত হইয়াছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর যমানায় একবার সূর্যগ্রহণের ঘটনা দেখা গেল, গ্রহণ শুরু হইবা মাত্র হুযুরে পাক (দঃ) লোকজনসহ ঈদের ময়দানে চলিয়া গেলেন এবং তথায় যাইয়া তাকবীরে তাহারীমা বলিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। লোকগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিয়ামে হুযুরে পাক (দঃ) দীর্ঘ কিরাত পাঠ করিলেন। তারপর রুকূতে গেলেন। রুকূতে দীর্ঘ সময় থাকিয়া রুকূ হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবার লম্বা কিরাত পাঠ

করিলেন, তারপর আবার রুকূতে গিয়া দীর্ঘ সময়ে রুকূতে কাটাইয়া পুনরায় রুকু হইতে উঠিয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া সিজদায় গেলেন। দুইটি সিজদাহও তিনি যথেষ্ট দীর্ঘ করিলেন।

প্রথম রাকাতের শেষ সিজদাহ্ করিবার পরে হুযুর (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় রাকাতও অবিকল প্রথম রাকাতের ন্যায় আদায় করিলেন। এইভাবে দুই রাকাত নামাযে হুযুর (দঃ) মোট চারিটি রুকূ এবং চারিটি সিজদাহ্ আদায় করিলেন।

নামায আদায়ের পরে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন যে, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহতায়ালার দুইটি প্রকাশ্য নিদর্শন। উহার মধ্যে কোনটার জন্ম বা মৃত্যুর কারণে অবশ্য গ্রহণ হয় না। কিন্তু তোমরা যখন দেখিবে যে সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণে শুরু হইয়াছে তখনই ভীত সন্ত্রস্তভাবে নফল নামাযে লিপ্ত হইয়া যাইবে।

ছালাতে খাওফ বা ভয়–ভীতিকালীন নামায

ভয়-ভীতির নামায (এর রীতি নীতি) চারটি শর্ত বর্তমানে জায়েয হয়। শর্তগুলি এই ঃ

(১) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সিদ্ধ হওয়া।

(২) শত্রু কিবলার দিক ছাড়া অন্য দিকে থাকা।

(৩) শত্রুর তরফ হইতে যে কোন মুহূর্তে হামলা শুরুর আশঙ্কা থাকা।

(৪) সিপাহী-লশকরদের মধ্যে অন্যূন এই পরিমাণ লোক মৌজুদ থাকা যে, তাহাদেরকে বিভক্ত করিয়া শত্রুর মোকাবেলা করা যায় অর্থাৎ সর্বনিম্ন সংখ্যা অন্তত ছয়জন হওয়া চাই।

এই নামায আদায়ের নিয়ম হইল, সৈন্যদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় রাখিয়া অন্য ভাগকে লইয়া ইমাম নামাযে দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহাদেরকে লইয়া ইমাম এক রাকাত নামায আদায় করিয়া যখন দ্বিতীয় রাকাত পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবে, তখন নামাযে লিপ্ত মুক্তাদিগণ পৃথকভাবে নিজেদের বাকী রাকাত শেষ করিয়া নামায ছাড়িয়া শত্রুর মোকাবেলায় চলিয়া যাইবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় নিযুক্ত সৈন্যগণ আসিয়া নামাযে রত হইবে। ইহাদেরকে লইয়া ইমাম এক রাকাত নামায পড়িয়া যখন তাশাহহুদের বৈঠকে বসিয়া তাশাহহুদ পড়িতে থাকিবে তখন মুক্তাদিগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের এক রাকাত ফওত নামায আদায় করিয়া বসিয়া তাশাহহুদ-দরূদ পড়িয়া ইমামের সাথেই সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। এইভাবে দুই ভাগের এক ভাগ লোক ইমামের সাথে নামায শুরু করিবার বরকত এবং অন্যভাগ লোক ইমামের সাথে নামায শেষ করিবার বরকত হাসিল করিবে।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) গোযওয়ায়ে যাতুর রুকায় এইভাবে ছালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছিলেন।

হযরত সহল ইবনে খুজাইমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ইমামের সঙ্গে একটি দল নামাযে দাঁড়াইবে এবং অন্য দল শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াইবে। ইমাম প্রথম দলটিকে এক রাকাত নামায দুই সিজদাহ্ সহ পড়াইয়া দিয়া নিজে দাঁড়াইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে মুক্তাদীগণ নিজেদের দ্বিতীয় রাকাত পুরা করিয়া লইয়া নামায শেষ করিয়া শত্রুর মোকাবেলায় চলিয়া যাইবে এবং বাকী দল আসিয়া ইমামের সহিত নামায আরম্ভ করিবে। তাহাদেরকে লইয়া ইমাম দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া বৈঠকে বসিয়া খুব ধীরে ধীরে তাশাহহুদ পাঠ করিবে যেন মুক্তাদিগণ তাহাদের বাকী এক রাকাত নামায আদায় করিয়া বসিয়া তাশাহহুদ পড়িয়া ইমামের সাথেই সালাম ফিরাইতে পারে।

নামায যদি চার রাকাত যেমন জোহর ও আছর হয়, তবে ইমামের সহিত প্রত্যেক ভাগ লোক উপরোক্ত নিয়মে দুই দুই রাকাত করিয়া আদায় করিবে।

এমন কোন যুদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় পক্ষ হইতে ভীষণভাবে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলিতেছে, সেখানে উল্লিখিত নিয়মে নামায আদায় করা সম্ভব হইলে করিবে, না হইলে একাকী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাতে, যমিনে বা বাহনের উপরে যাহার যেভাবে নামায আদায় করা সম্ভব হয়, সে সেই ভাবেই আদায় করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বকরা ঈদ এবং কোরবানী

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না আত্বাইনা কাল কাওছার ফাছাল্লি লি রাব্বিকা অনহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থাৎ (আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মদ) আমি তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি। অতএব তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড় ও কোরবানী দান কর। নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই নির্বংশ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাউসার অর্থ বহুতর পুণ্য ও অমূল্য নিয়ামত। পবিত্র কোরআন, নবুয়ত এবং স্রোতস্বিনী বা ঝর্ণা ধারাও এই অপূর্ব নিয়ামতের মধ্যে গণ্য। এই স্রোতস্বিনী বেহেশত হইতে প্রবাহিত।

উহার পানি মধু অপেক্ষা মিষ্ট এবং উহা মাখন অপেক্ষা মোলায়েম। স্রোতস্বিনীর মৃত্তিকা কর্পূরের ন্যায় সাদা, প্রস্তরসমূহ মোতির ও ইয়াকুতের। উহার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহমান।

এই স্রোতস্বিনী আল্লাহ হযরত রাসূলে করীম (দঃ)কে দান করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই স্রোতস্বিনীটি বেহেশতের মধ্যে প্রবাহমান, বেহেশতে যতগুলি স্রোতস্বিনী আছে, তন্মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম কাওছার রাখা হইয়াছে। ইহার (তলদেশস্থ) কঙ্করসমূহ ইয়াকুত এবং জবরযদ ও মারওয়ারিদের। ইহার পানি বরফ সদৃশ সাদা, মধু অপেক্ষা মিষ্ট এবং ইহা মাখনাপেক্ষা কোমল ও মোলায়েম।

স্রোতস্বিনীর পাশে যুগল মোতি নির্মিত গম্বুজ। ইহা আয়তনে নয় বর্গক্রোশ। গম্বুজে চারি হাজার মোতির দরজা। প্রত্যেক গম্বুজে অসংখ্য কক্ষ ও তাহাতে রহিয়াছে আয়তনয়না অপরূপ হুরীগণ। প্রত্যেক হুরীর জন্য আবার রহিয়াছে সত্তর হাজার করিয়া পরিচারিকা।

মেরাজের রাত্রে হুযুরে পাক (দঃ) ফিরেশতা জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, স্রোতস্বিনীর পার্শ্বে এত তাঁবু কিসের? জিব্রাইল উত্তর করিলেন, হে আল্লাহর নবী (দঃ)! এগুলি আপনার সহধর্মিণীদের।

বেহেশতের কাওছার হইতে চারিটি নহর (স্রোতধারা) প্রবাহিত হইতেছে। উহার একটি পানির, দ্বিতীয়টি মধুর, তৃতীয়টি দুধের এবং চতুর্থটি পবিত্র শরাব তথা শরাবান তহুরার।

'ফাছাল্লি লি রাব্বিকা অনহার'- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর এবং কোরবানীর দিন উট কোরবানী কর। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বকরা ঈদের নামায পড় ও মিনায় উট কোরবানী কর।

'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একবার হুযুরে পাক (দঃ) সহল ইবনে আমর ইবনে হাদীস-এর দরজা দিয়া খানায়ে কাবায় প্রবেশ করেন। কোরায়েশগণ এ সময় কাবা গৃহের ভিতরে ছিল। হুযুরে পাক (দঃ) কাবা গৃহে প্রবেশ করিয়াই আবার রাত্রে সাফার দিকে চলিয়া গেলেন। কোরায়েশগণ তাঁহাকে যাইতে দেখিল বটে কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিল না। বাবে সাফা দিয়া বাহির হইবার সময়ে আস ইবনে ওয়ায়েল তাঁহাকে দেখিয়াছিল।

এই সময়ে হুযুরে পাক (দঃ)-এর পুত্র আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় কাহারও পুত্র সন্তান মারা গেলে এবং তাহার অন্য কোন ওয়ারিস না থাকিলে তাহাকে আবতার অর্থাৎ লেজকাটা

নির্বংশ বলা হইত। আস ইবনে ওয়ায়েল কোরায়েশদের নিকট আসিলে তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পথে তোমার কাহারও সাথে সাক্ষাত হইল? সে বলিল, হাঁ, দেখা হইয়াছে নির্বংশের সাথে। তাহার এই জাতীয় উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, হে নবী (দঃ)! যাহারা তোমার শত্রু, নির্বংশ তাহারাই। (তুমি নহ) তাহারা পুণ্য ও মঙ্গল হইতে বঞ্চিত।

আল্লাহতায়ালা আরও এরশাদ করিলেন, হে মুহাম্মদ! তোমার নাম আমার নামের সহিত স্মরণ করা হয়। প্রত্যেক আরফা ও জুমআর দিনে মিম্বর হইতে তোমার নাম উচ্চারিত হয়, খুৎবাহর সময়, আযান একামতের সময় এবং প্রতেক সৎ কাজের সময়ে তোমার নাম স্মরণ করা হয়। জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার স্থান। শত্রুকুল যাহাই বলুক না কেন উহাতে তোমার কিছুই যাইবে আসিবে না। আস ইবনে ওয়ায়েলের স্থান জাহান্নামে। সে নানারূপ সাজা ভোগ করিবে। কেননা সে আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর সাথে বেআদবী করিয়াছে।

অতএব যাহারা আল্লাহর রাসূল (দঃ)-এর শত্রু নয় বন্ধু, আল্লাহ তাহাদেরকে বেহেশত দান করিবেন। আর যাহারা আল্লাহর নবীর শত্রু কাফির এবং মুনাফিক আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন করিবেন।

আল্লাহ বলেন, আমার উদ্দেশ্যে কোরবানী কর। বিশেষভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপরে কোরবানীর নির্দেশ বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোরবানীর ঘটনাটি এইরূপ ঃ

আল্লাহতায়ালা যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তি দান করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমি বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা করিতেছি। তিনি আরও বলিলেন যে, আমার এই হিজরত বা দেশ ত্যাগের কারণ এই যে, আল্লাহ আমাকে দ্বীন সম্বন্ধে হেদায়াত করিবেন। দ্বীনের জন্য যাহারা হিজরত বা দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী হাজেরা বিবি, খালাতো ভাই হযরত লুত (আঃ) এবং হযরত লুত (আঃ)-এর ভগ্নি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! তুমি আমাকে একটি ভাগ্যবান পুত্র সন্তান দান কর।

আল্লাহতায়ালা তাঁহার এ দোয়া কবুল করিয়া তাঁহাকে শুভ সংবাদ দান করিলেন যে, তোমাকে জ্ঞানবান সন্তান দান করা হইল। আল্লাহতায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম রাখা হইল ইসমাইল।

ইসমাইলের বয়োবৃদ্ধি হইবার পর একদা পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাকে লইয়া আরাফাতে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ইসমাইল! তোমাকে কোরবানী করার জন্য আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি পুত্রকে বলিলেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া তোমার মতামত আমাকে জানাও এবং আমার কর্তব্য সম্পর্কে তুমি আমাকে পরামর্শ দান কর।

হযরত ইসমাইল বলিলেন, পিতঃ, আপনাকে যাহা করার জন্য নির্দেশ করা হইয়াছে, সে কাজ আপনি অবশ্য পালন করুন। তাহা হইলে আপনি আল্লাহর নিকট অবাধ্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর পর তিন রাত্র এই একই স্বপ্ন দেখিলেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করার জন্য রোযা রাখিলেন, নামায পড়িলেন এবং আল্লাহর দরবারে নিজের কাম্য বলিলেন, হে মাবুদ! তুমি কোরবানীর ব্যাপারে আমাকে ইনশা আল্লাহ ধৈর্যশীল পাইবে।

অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ই আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হইলেন। যথাস্থানে গমন করিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে যবেহ করার জন্য উপুড় করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার গলায় অস্ত্র

ধারণ করিলেন। আল্লাহতায়ালা পিতা-পুত্রের সততা ও একনিষ্ঠতা দেখিয়া এরশাদ করিলেন, হে ইব্রাহীম! পুত্রকে যবেহ্ করিতে গিয়া তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। এখন তুমি তোমার পুত্রকে যবেহ্ করার পরিবর্তে একটি দুম্বা যবেহ্ কর।

হযরত ইসমাইলের পরিবর্তে যে দুম্বা যবেহ্ করা হইয়াছিল, তাহার নাম যবীর। এই দুম্বাটি চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতে বেহেশতের বাগিচায় বিচরণ করিত।

আবার কেহ কেহ বলেন, হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীল যিনি ভ্রাতা কাবীল কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তিনি এই দুম্বা কোরবানী করিবার জন্য মানত করিয়াছিলেন, তখন হইতে উহা বেহেশতেই বাস করিত।

আবার কেহ কেহ বলেন, পুত্রকে কোরবানী করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখেন নাই, বরং প্রত্যক্ষ নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন পুত্র ইসমাইলের গরদানে ছুরি ধরিয়াছিলেন তখন প্রত্যাদেশ আসিল যে, হে ইব্রাহীম! পুত্রকে যবেহ করিও না, তোমার পুত্রকে কোরবানী করানোই আমার ইচ্ছা নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার অন্তর হইতে (তোমার প্রভুর আদেশ পালনার্থে) পুত্র স্নেহ দূর করিয়া দেওয়া।

কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে যবেহ্ করার সময় আরজ করিলেন, হে মাবুদ! এই যবেহ আমার নিজের হাতে না হইয়া অন্যের হাতে হইলে ভাল হইত। জবাবে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, না, তোমাকে নিজেকেই যবেহ্ করিতে হইবে।

ফিরেশতাগণ আরজ করিলেন, হে দয়াময় প্রভু! এমন কঠিন নির্দেশ কেন দিলেন? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, বিপদের উপর বিপদ প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য। ফিরেশতাগণ বলিলেন, কেন? আল্লাহ বলিলেন যে, আমি চাইনা যে, আমার বান্দা আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও ভাল বাসুক। আমি চাইনা যে আমার বন্ধুত্বে অন্য কেহ অংশীদার হউক। ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে অত্যধিক স্নেহ করে। এই কারণেই আমি তাহার পুত্রকে এইভাবে যবেহ্ করার জন্য বাধ্য করিয়াছি।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাহার পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)কে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত তিনি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছিলেন। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসায়েন (রঃ)কে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন। ইহারই প্রেক্ষিতে ফিরেশতা জিব্রাইল আসিয়া বলিয়া গেলেন, এই দুইজনের একজন বিষপানে এবং অন্যজন শত্রুর অস্ত্রে শহীদ হইবেন।

এইসব ঘটনা এইজন্যই ঘটিয়াছিল যে, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও প্রতি আসক্ত না হয়।

আল্লাহ্ এক মহাবাণী

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ *

অর্থাৎ হে 'ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক সংখ্যায় আল্লাহর যিকির কর। তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আমার নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হইও না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বাণীর ব্যাখা হইল, তোমরা ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য দানের মাধ্যমে স্মরণ করিবেন।

সাঈদ ইবেন জাবীর বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আমাকে ইবাদাতের মাধ্যমে স্মরণ কর। আমি তোমাদিগকে ক্ষমার মাধ্যমে স্মরণ করিব।

ফোজাইল ইবনে আইয়াজ বলেন, তোমরা আমাকে ইবাদাতের মাধ্যমে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে পুণ্য দানের মাধ্যমে স্মরণ করিব।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত সে আল্লাহ্র স্মরণকারী। যদিও সে রোযা, নামায এবং কোরআন তেলাওয়াত কম করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমান, অধিক রোযা, নামায ও কোরআন তেলাওয়াতকারী হইলেও সে আল্লাহকে ভুলিয়া যাইতে চায়।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, ইবাদাতের জন্য তাওহীদ যথেষ্ট এবং পুণ্যের মধ্যে বেহেশতই যথেষ্ট।

ইবনে কাছীর বলেন, ইহার অর্থ, তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ তোমাকে অধিক নিয়ামতের সাথে স্মরণ করিবেন।

আবার কেহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ্ও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন।

এক বর্ণনায় আছে, কোন এক কিতাবে আল্লাহর উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে—

"যে পরিমাণ বা যেভাবে বান্দা আমার সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে, আমিও ঠিক সেইভাবেই তাহার নিকটবর্তী থাকি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে অন্তর দ্বারা স্মরণ করে, আমিও তাহাকে অন্তর দ্বারা স্মরণ করি, যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্দ্ধহাত অগ্রসর হয়, আমিও একগজ তাহার দিকে অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি পায়ে হাটিয়া আমার দিকে আসে, আমি দৌড়াইয়া তাহার দিকে আগাইয়া যাই। আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত কোন ব্যক্তিও যদি আমার দিকে আসে তবে আমিও পরিপূর্ণ ক্ষমার সাথে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করি। অবশ্য যদি সে শিরক না করে।"

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পরে বিপদাপন্ন হয়, তখন ফিরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরজ করেন, তোমার এই বান্দা বিপদে জড়িত, আমরা তাহার জন্য সুপারিশ করিতেছি, তুমি তাহাকে বিপদমুক্ত কর। আল্লাহ তাহাদের এই সুপারিশ গ্রহণ করেন। আর কেহ যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে স্মরণ না করে, বরং বিপদে পড়িয়াই আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ফিরেশতাগণ বলেন, এই ব্যক্তি বিপদে পড়িয়াই আল্লাহকে ডাকিতেছে। কিন্তু সুখের সময়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে নাই। অতএব তাহার সম্বন্ধে আমরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিব না। যেমন ফিরাউন সদল বলে নীল নদে ডুবিয়া মরার মুহূর্তে তাওবাহ্ করিয়াছিল, অথচ ইহার পূর্বে কখনও আল্লাহ্কে স্বীকার করে নাই।

সুফইয়ান ইবনে আইনিয়া বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দাদিগকে এমনভাবে বস্তু দান করি যে, ইহা যদি জিব্রাইল ও মিকাইলকে দান করা হয়, তবে ইহা তাহাদের জন্য বড় পারিশ্রমিক হইবে। আমি আমার বান্দাদিগকে এরশাদ করিয়াছি, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগেকে স্মরণ করিব।

হযরত মুসা (আঃ)কে আল্লাহ্ এরশাদ করিয়াছেন, তুমি অত্যাচারী লোকদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকি। আর অত্যাচারী ব্যক্তিগণকে স্মরণ করার অর্থই আমি তাহাদের উপর লানত করিয়া থাকি।

আবু ওসমান হিন্দী বলেন, আমার আল্লাহ্ যখন আমাকে স্মরণ করেন, তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি। লোকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিভাবে? তিনি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। অতএব আমি যখন আল্লাকে স্মরণ করি, তখন আল্লাহ্ও আমাকে স্মরণ করেন।

আল্লাহ্তায়ালা হযরত দাউদ (আঃ)কে অহী প্রেরণ করিলেন, হে দাউদ! তুমি আমার যিকির কর। যেহেতু আমার প্রতি আমার যিকিরে সন্তুষ্ট থাক। আমার নিয়ামতের শোকর আদায় কর। নূরী (রাঃ) বলেন, প্রাণীর জন্য কষ্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে, আবেদ ব্যক্তির কষ্ট আল্লাহ্র যিকির করা হইতে তাহাকে বিরত রাখা।

জনৈক বোযর্গ বলেন, যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্র যিকির স্থায়ী আসন পাতিয়া লয় এবং উহার প্রতিক্রিয়া বেশ স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়, তখন শয়তান তাহার নিকট আসিলে সে মৃগী রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আর এমন অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, শয়তান কাহারও উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে সে যেমন জ্ঞানলুপ্ত হইয়া যায়। যখন এই প্রবল পরাক্রান্ত শয়তানের এই অবস্থা, অন্যান্য শয়তান ও তাহাদের চেলা-চামুণ্ডাগণ দেখে, তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করে, ইহার কি ব্যাপার, কি হইল, এ কোন মানুষের তাছির নাকি?

সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া সর্বাধিক গুরুতর পাপ। এতদপেক্ষা বড় আর কোন পাপ নাই। কোন কোন বোযর্গ বলেন যে, অতি সংগোপনে যে যিকির করা হয়, তাহা ফিরেশতাগণ আসমানে লইয়া যান না। কেননা ঐ প্রকার যিকিরের কথা তাহারা মোটে জানিতেই পান না। ইহা শুধু আল্লাহ্ এবং যিকিরকারী এই দুইজনের মধ্যকার গোপন ব্যাপার।

এক ব্যক্তি বলেন, কোন একটি লোক আল্লাহ্র যিকির করিতেন। আমি তাহার পরিচয় জানিতে পারিলাম যে, তিনি এক নির্জন অরণ্যের অধিবাসী। আমি লোকটির নিকট গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় একটি ভয়ংকর হিংস্র জন্তু লোকটির নিকট আসিল এবং আসিয়াই লোকটির দেহে স্বীয় নখর দ্বারা থাবা মারিয়া এক খণ্ড মাংস উঠাইয়া লইয়া গেল। লোকটি বেহুশ হইয়া পড়িল। আমিও ভয়ে চেতনা হারাইলাম। আমার চেতনা আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অবস্থা এমন হইল কেন?

লোকটি উত্তর করিল, আমি আল্লাহ্র যিকির করায় অলসতা করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দান করিতে আমার নিকট এই জন্তুটি পাঠাইয়াছেন। আর সে আসিয়া প্রভুর নির্দেশ মত আমার দেহ হইতে মাংস ছিড়িয়া লইয়া গেল। ঘটনাটি তো তুমি চোখেই দেখিলে।

ঈদগাহে যাতায়াত পথ

ঈদের নামায পড়িতে যেই পথে ঈদগাহে যাওয়া হয়, তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে সেই পথে না আসিয়া অন্য পথে আসা মুস্তাহাব।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এক রাস্তায় ঈদগাহে গিয়াছেন, আবার অন্য রাস্তায় গৃহে ফিরিয়াছেন।

এই ব্যাপারটিতে লাকগণ নানা মত পোষণ করেন। যেমন কেহ কেহ বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) মুশরিকদের ভয়ে এইরূপ করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হুযুর (দঃ) যেই পথে যাইতেন, সেই পথের যমিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিত। তাই এক পথে গমন করিয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিতেন যেন, উভয় পথের যমিনই পক্ষে সাক্ষ্যদান করে।

আবার এইরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন যে, তিনি যাওয়ার সময় এক পথ দিয়া যাইতেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্য পথ দিয়া ফিরিতেন। ইহার কারণ হইল, যাহাতে দুইটি দিকের লোকই

তাঁহাকে দর্শন করিয়া নেকী অর্জনের সুযোগ লাভ করে। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

কোন কোন লোক আবার এইরূপও বলেন যে, যখন তিনি ঈদগাহে যাইতেন, তখন তাঁহার ধারণা থাকিত, আমি আমার প্রভুর দিকে যাইতেছি। আর প্রত্যাবর্তনের কালে ধারণা থাকিত যে, আমি পরিবার পরিজনের দিকে আসিতেছি, তাই যে পথে আল্লাহর দিকে যাওয়া আবার সেই পথেই ঘর সংসারের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তিনি ভাল মনে করিতেন না।

কেহ কেহ বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) যে পথে ঈদগাহে যাইতেন আবার যদি সেই নির্দিষ্ট পথেই প্রত্যাবর্তন করিতেন, তবে সেই পথটিই হুযুর (দঃ)-এর যাতায়াতের সুনির্দিষ্ট পথ হিসাবে তাঁহার উম্মতদের উপরে সেই পথে যাতাযাত করা সুন্নতের অনুসরণ করার মত বাধ্যবাধকতায় পরিণত হইত। তদবস্থায় ঈদের নামাযের পরে হুযুরে পাক (দঃ)কে ছাড়িয়া বিভিন্ন পথে গমন করা সাহাবীদের পক্ষে অসুবিধানক হইয়া পড়িত। উম্মতের এই অসুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি অন্য পথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

চারি সম্প্রদায়ের চারিটি ঈদ

চারিটি সম্প্রদায়ের জন্য চারিটি ঈদ। উহার একটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঈদ। আল্লাহ্ বলেন, অতঃপর হযরত ইব্রাহীম নক্ষত্ররাজির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি অসুস্থ। ঈদের দিন যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈদগাহে যাইতেছিল, তখন তিনি বাহানা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের সাথে যাইব না। উদ্দেশ্য এই যে, ঐসব লোক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে দীক্ষিত ছিল না। তাই তিনি তাহাদের সাথে ঈদগাহে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

সম্প্রদায়ের সব লোক ঈদগাহে চলিয়া গেলে তিনি একখানা কুঠার হস্তে লইয়া দেব মন্দিরে হাজির হইলেন। মন্দিরে রক্ষিত সবমূর্তি ভাঙ্গিয়া সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তিটির গলায় কুঠারখানি ঝুলাইয়া রাখিলেন। লোকগণ ঈদগাহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরের ভিতরের এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল যে মূর্তিগুলি কে ভাঙ্গিল?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, বড় মূর্তিটির গলায় কুঠার দেখা যাইতেছে হয়ত বা সে-ই এই কাজ করিয়াছে। লোকগণ বলিল মূর্তি তো প্রাণহীন। সে মূর্তিগুলি কিভাবে ভাঙ্গিতে পারে? তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, যে মূর্তির এতটা শক্তি নাই, সে তবে তোমাদের অভাব অভিযোগ কিভাবে পূর্ণ করিবে? তাহারা এ কথার আর কোন জবাব দিতে পারিল না।

প্রকৃত খোদার বদলে দেব-দেবীর পূজা করিতে দেখিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল এবং তিনি ক্রোধও হইয়াছিলেন অত্যধিক। আর এই ক্রোধ বশেই তিনি মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিজেকে খুবই বিপদাপন্ন মনে করিয়াছিলেন। অবশ্য এই কাজটি তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে করিয়াছিলেন। এইজন্য আল্লাহ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর (খলীলের) সম্মান দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বহুমৃত জীব জন্তুকে প্রাণ দান করাইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক নবী-রাসূল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এমন কি স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)ও তাঁহারই বংশধর।

দ্বিতীয় ঈদ হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বনি ইস্রাইলদের।

আল্লাহতায়ালা পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ *

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিশ্রুত সময় যিনাতের দিন।' যিনাতের দিন বলার কারণ এই যে, এইদিন ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর ইহা ছিল হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য ঈদ বা খুশীর দিন। এই দিনটিতে তাহারা ঈদোৎসব করিতেন।

ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের সাথে মতান্তরে তিয়াত্তরজন যাদুকর ছিল। তাহাদের নিকট সাতশত লাঠি এবং রশি ছিল। লাঠিগুলির মধ্যে পারদ ভর্তি ছিল। যাদুকরদের যাদু দেখার জন্য বিরাট সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সূর্যের তেজ প্রখর হওয়ায় লাঠির মধ্যস্থিত পারদ গরম হইয়া চলমান হইল। সাথে সাথে রশি পেচানো লাঠিগুলিও চলিতে লাগিল। লাঠি দৌড়াইতে দেখিয়া লোকগণ মনে করিল, সত্যি বুঝি সাপ দৌড়াইতেছে।

হযরত মূসা (আঃ) দেখিলেন, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের মন দুর্বল হইয়া উঠিতেছে, তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, না জানি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকগণ মুরতাদ হইয়া যায়। কিন্তু তিনি ভয়ের কথা প্রকাশ করিলেন না।

এমনি মুহূর্তে আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা (আঃ)কে এরশাদ করিলেন, তোমার লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ কর। আল্লাহর আদেশ মত হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার হস্তস্থিত লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করিতেই তাহা একটি ভয়ঙ্কর অজগরে পরিণত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরদের কৃত্রিম সর্পগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া প্রত্যেকটিকে গিলিয়া ফেলিল কিন্তু মনে হইল তাহাতেও অজগরের পেট ভরে নাই। সে আরও কিছু খাওয়ার জন্য যেন উদগ্রীব হইয়া উঠিল। আল্লাহর এই অসীম কুদরত দেখিয়া হযরত মূসা (আঃ) সিজদায় পতিত হইলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া যাদুকরদের সর্দার শামাউন তাহার দলবলসহ আল্লাহর উপর ঈমান আনিল। অতঃপর অজগর ফিরাউনের সৈন্য সামন্তের দিকে ধাবিত হইল। ভয়ে ও আতঙ্কে তাহারা ঊর্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পালাইতে লাগিল।

কথিত আছে যে, সেদিন শুধু পায়ের নীচে পড়িয়াই ফিরাউনের পঞ্চাশ হাজার লোক মারা গিয়াছিল।

তৃতীয় ঈদ হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের। আল্লাহতায়ালা পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا *

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বানা-আঞ্জিল 'আলাইনা-মা-য়িদাতাম মিনাস সামা-য়ি তাকূনু নানা-'ঈদান।

অর্থাৎ হে প্রভু! আমাদের জন্য একটি খাবার পাত্র প্রেরণ কর, যাহা আমাদের জন্য ঈদ স্বরূপ হয়।

এইরূপ প্রার্থনা করার কারণ এই ছিল যে, সঙ্গীগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে বলিয়াছিল, আপনি যদি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য খাবার চান, তবে আল্লাহ উহা আপনাকে দান করিবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) উত্তর করিলেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং এই বিপদ ডাকিয়া আনিও না। যদি আসমান হইতে খাবার আসে, আর যদি তোমরা উহাকে মিথ্যা মনে কর, তবে তোমরা ভয়ঙ্কর শাস্তিতে পতিত হইবে।

তাহারা বলিল, আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছি। এখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন, এই সময় যদি আমরা আসমান হইতে খাবার পাই, তবে আমাদের ঈমান আরও মজবুত হইবে এবং আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিব। উহাতে কোন প্রকারই ইতস্ততঃ করিব না। অধিকন্তু আমরা যখন বনি ইস্রাইলদের নিকট ফিরিয়া যাইব, তখন সাক্ষ্য দিব যে, আল্লাহর তরফ হইতে আমরা এই খাদ্য পাইয়াছি।

অতঃপর একদিন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে পাঁচ হাজার লোক ছিল। তাঁহারা এবং হযরত ঈসার অন্যান্য ভক্তগণ বলিল, আমাদিগেকে আসমানী খাদ্য দিন।

তখন হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, হে মাবুদ! আমাদিগকে আসমানী খাদ্য দাও, যেন উহা আমাদের জন্য ঈদস্বরূপ হয়। আমাদের পরবর্তীদের জন্যও যেন উহা ঈদস্বরূপ হয়। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিলেন, শীঘ্রই তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, যদি কেহ আমার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, তবে এমন শাস্তি দান করিব যাহা কখনও অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

অতঃপর রবিবার দিন আল্লাহতায়ালা আসমান হইতে একটি করিয়া ভাজা মাছ, একখানি পাতলা রুটি ও কিছু পরিমাণ খেজুর প্রেরণ করিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একটি বাগানে অবস্থানরতঃ সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কিছু খাবার বস্তু আছে কি? শামাউন নামক এক ব্যক্তি দুইটি ছোট ভাজা মাছ ও পাঁচখানি রুটি বাহির করিয়া দিল। হযরত ঈসা (আঃ) মাছ দুইটি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন এবং রুটিগুলি ছোট ছোট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্গীরা নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাদের সামনে বহু পরিমাণ আহার্য বস্তু মৌজুদ রহিয়াছে! হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া খাইতে আরম্ভ কর। যত খুশী খাও, কিন্তু সাথে করিয়া কেহ নিও না। সকলেই তৃপ্তি সহকারে আহার করিল। খাওয়ার পরেও প্রথম যে পরিমাণ খাদ্য ছিল, ঠিক ততটাই রহিয়া গেল। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সকলেই ঈমান আনিল। কিন্তু খাওয়ার পর চারিজন লোভী ব্যক্তি তাহাদের কম্বলের মধ্যে করিয়া বহু পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য লইয়া গেল। ইহারা বনি ইস্রাইলদের মধ্যকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা তাহাদের বস্তিতে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহারা তথায় যাওয়ার পর তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া ফেলিল। পুনারায় তাহারা কাফির হইয়া গেল। এমন কি আসমান হইতে অবতীর্ণ খাদ্য তাহারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াও উহাকে অস্বীকার করিল।

এই বেঈমানীর জন্য আল্লাহ তাহাদের প্রতি ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ করিলেন। ঐদিনই রাত্রে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। ভোরে উঠিয়া দেখিল যে, তাহারা সকলে শূকরে পরিণত হইয়াছে।

এ ঘটনাইটি এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই সামান্য পরিমাণ খাদ্য এতগুলি লোকে খাওয়ার পরেও উহা এতটুকু কমিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, যে পরিমাণ খাদ্য প্রথমে ছিল, ঠিক ততটাই রহিয়া গেল। অতএব চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহর কুদরত ও রহমত কত অফুরন্ত ও অসীম।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, আল্লাহর শত রহমত, উহা হইতে একটি রহমত দুনিয়াতে দান করিয়াছেন। যাহারই বদৌলতে সৃষ্টি জগতে একে অন্যের প্রতি মায়ামমতাশীল এবং সহানুভূতিশীল। বাকী নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন রোজকিয়ামতে দান করার জন্য। চতুর্থ ঈদ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতের জন্য। যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমামের গুণাবলী

নিম্নে বর্ণিত গুণাবলী যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে না পাওয়া যাইবে, তাহাকে নামাযের ইমাম বানানো যায় না। গুণগুলি এই ঃ পরহেজগার হওয়া। পরহেজগার লোক থাকিতে ধর্মে উদাসীন ব্যক্তি ইমাম হইতে পারে না। আলেম-ফাজেল হওয়া। আলেম-ফাজেল ব্যক্তি থাকিতে জাহেল মূর্খ ইমাম হইতে পারে না। এইরূপ লোকের ইমামতী করা জায়েয হইবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,

আমাকে যদি নিহত করার আদেশ দেওয়ার পর বলা হয় যে, যে সম্প্রদায়ে আবুবকর (রাঃ) আছেন, সেই সম্প্রদায়ের যদি ইমামতী কর, তবে তোমাদের বাঁচাইয়া রাখিব। এই অবস্থায় আমি বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা নিহত হওয়াকেই উত্তম মনে করিব।

অতএব বুঝা গেল, ধর্মভীরু কোরআন পাঠকারী এবং দ্বীন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সুন্নতের পায়বন্দ ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার উপযুক্ত।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ফকীহদের সামনে পেশ কর এবং ক্বারীদেরকে ইমাম নিযুক্ত কর। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম তাহাকে ইমাম কর। কেননা তাহারাই তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট পৌঁছাইবে। এই কাজের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকেই নির্বাচিত করিয়াছেন। যেহেতু ইহারা আহলে দ্বীন, উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহর আলেম। আল্লাহকে ভয়কারী এবং নিজের ও অন্যের নামায সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। ইহারা নিজের এবং মুক্তাদীদের নামাযের ভার বহনে ভয় পায়।

আল্লাহর রাসূল ঐ সমস্ত লোকদিগকে পছন্দ করেন নাই, যাহারা কোরআনে হাফেজ ও ক্বারী অথচ আমলকারী নহে। কিন্তু যাহারা কোরআনে হাফেজ, ক্বারী এবং আমলকারী তাহাদিগকেই তিনি পছন্দ করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কোরআন পাঠ করার উপযুক্ত যে কোরআন অনুযায়ী চলে ও আমাল করে। এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা যদিও কোরআন পাঠ না করে তবুও সে ইমামতের উপযুক্ত। কোন কোন লোক কোরআন পাঠ করে অথচ সে তদনুরূপ আমল করেনা এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করে এবং যে সকল কাজ হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই কাজ করে। এমন ব্যক্তি কখনও ইমামতের উপযুক্ত নয়।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন বর্ণিত হারামকে হালাল মনে করে, সে নিশ্চয় কখনও কোরআনের উপর ঈমান আনে নাই। এমন ব্যক্তিকে ইমাম করিতে নাই।

আল্লাহর আলেম ও আল্লাহকে ভয়কারী ছাড়া অন্য কাহাকে ইমাম নির্বাচিত করিলে সর্বদা অপদস্থ হইতে হয়। উহা দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয় এবং আল্লাহ নারাজ থাকেন। উহারা আল্লাহর বেহেশত হইতে দূরে থাকিবে। আর যাহারা খোদাভীরু পরহেজগার ব্যক্তিকে ইমাম করিবে, তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হইবে।

ইমামের কর্তব্য ঃ (১) ইমামের কর্তব্য হইল, পরনিন্দা না করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা হইতে বিরত থাকা।

(২) লোকদিগকে সদোপদেশ দেওয়া।

(৩) সৎলোকের সহিত বন্ধুত্ব এবং সংশ্রব রাখা।

(৪) অসৎ লোকরে সংশ্রব সাহচর্য হইতে বিরত থাকা।

(৫) হালাল হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা।

(৬) হালাল রুজীর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।

(৭) হারাম (নিষিদ্ধ) এমন কি সন্দেহযুক্ত রুজী হইতে পরহেজ করা।

(৮) কেহ তাহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিলে ধৈর্য ধারণ করা।

(৯) কথা কম বলা। (তাহার অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও কথা বলিবে না। জরুরী কথা অবশ্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ আলেম এবং উপযুক্ত ইমামের নিকট লোকগণ বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল এবং নসীহতমূলক অনেক কিছুই জানিতে এবং শিখিতে চাহিবে। তাহা তাহাদেরকে ভালভাবে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে কথা কম বলার অর্থ বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিবে না)।

(১০) ইমামকে সব সময়ই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার এবং অন্য লোকের অবস্থার ভিতরে বহু ব্যবধান রহিয়াছে।

(১১) ইমামকে রুক্ষ্ম এবং কর্কশভাষী হইলে চলিবে না। তাহাকে শান্ত এবং মিষ্টভাষী হইতে হইবে।

(১২) সততা এবং সত্যবাদীতা ইমামের একটি প্রধান গুণ। কাজেই উহা তাহার মধ্যে অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১৩) ইমাম যখন মেহরাবে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহার মনে করিতে হইবে যে, আমি পয়গম্বরদের স্থানে, বিশেষতঃ হুযুরে পাক (দঃ)-এর প্রতিনিধিদের স্থানে দাঁড়াইয়াছি এবং আল্লাহতায়ালার সাথে কথাবার্তা বলিতে যাইতেছি।

(১৪) নামাযের আরকানসমূহ ইমাম অত্যন্ত একাগ্রতা এবং সুষ্ঠু সুন্দরভাবে আদায় করিবে। পূর্বকৃত পাপের জন্য মনে মনে তাওবাহ করিবে। আর নিজের অন্তরে যেন ইমামত করার কারণে কোনরূপ অহমিকা বা অহঙ্কারের ভাব না আসিতে পারে, সেদিকে খুবই সতর্ক থাকিবে। নিজেকে মুক্তাদীদের অপেক্ষা খুব উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে না করিয়া হাকীর এবং নাচিজ মনে করিবে। মনের মধ্যে সর্বদা বিশেষতঃ নামায শুরুর প্রাক্কালে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিবে। আর তাঁহার পিছনে যাহারা মুক্তাদী থাকিবে, তাহাদের নামায যাহাতে যথাযথভাবে আদায় হইতে পারে, সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে এবং সে ব্যাপারে স্বীয় কর্তব্য যথারীতি পালন করিবে।

(১৫) নামায খুব দীর্ঘ না করিয়া কিছুটা সংক্ষিপ্তই করিবে, তাহাতে নামাযের আরকান তথা বিধি-বিধানসমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করা অনায়াসসাধ্য হইবে। আর নামাযে যেহেতু বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল, মাজুর এবং নামাযের প্রতি কম আগ্রাহী লোকও অনেক শরীক থাকিবে, তাই নামায কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা, সূরা-কিরাত দীর্ঘ না করিয়া ছোট সূরা পাঠ করা, রুকূ-সিজদায় দীর্ঘ সময় না থাকা যুক্তিযুক্ত হইবে। নতুবা অনেকের যেমন কষ্ট হইবে, তেমন কতকের আবার নামাযের প্রতি যাহা কিছুটা আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল, তাহা হ্রাস পাইবে।

ইমামের অন্যান্য কর্তব্য

(১) লোকগণ খুব প্রশংসা করিলে আনন্দিত হইবে না।

(২) কেহ নিন্দা দুর্নাম করিলে নাখোশ কিংবা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৩) কেহ যদি কোন ব্যাপারে ভুল-ক্রটি ধরে তবে তাহা সঠিক না হইলেও তাহার উপর ক্রোধ বা আক্রোশ রাখিবে না। বরং সম্ভব হইলে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া মিষ্টি ও নরমভাবে বুঝাইয়া বলিবে যে, আপনি আমার যে ভুল-ক্রটির কথা বলিয়াছেন তাহা তো ঠিক নয়, আপনি একটু ভালভাবে জানিয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখুন, আমার বিষয় যাহা আপনি বলিয়াছেন তাহা সত্য কি না।

(৪) এই জাতীয় ঘটনায় ইমামের উক্ত গীবতকারী বা দুর্ণাম রটনাকারীর উপরে কোনরূপ জিদ করা বা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার মনোভাব রাখা কোন ক্রমেই ঠিক হইবে না।

(৫) মানুষের প্রশংসা এবং দুর্ণাম উভয়কেই সমান দেখিবে। অর্থাৎ অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া বেশী আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। আবার অপরের দ্বারা নিজের দুর্ণাম প্রচারেও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে নাই। নিজের মনকে সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক রাখিবে। অবশ্য নিজে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় হক পথে থাকিবে। তাহাতে ফল যাহাই হউক না কেন।

(৬) ইমামের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পদানুযায়ী অর্থাৎ ইমাম পদের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়া চাই।

(৭) ইমামের দ্বারা এমন কোন কাজ না হওয়া চাই, যাহার কারণে লোক তাহার উপরে অশ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতে পারে বা মানুষের মনে তাহার সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন বা ইতস্তঃতার সৃষ্টি হইতে পারে।

(৮) যে সম্প্রদায়ের লোক ইমামকে পছন্দ করে না বা সুনজরে দেখে না তাহাদের ইমামতী করিতে নাই। হাঁ, তবে কিছু সংখ্যক লোক যদি এইরূপ হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহার সম্পর্কে ভাল মনোভাব পোষণ করে, তবে তাহাদের ইমামতী করা যাইতে পারে।

(৯) কোনরূপ পক্ষপাতমূলক মনোভাবের কারণে যদি লোক ইমামের বিরোধিতা করে, তবে তেমন ক্ষেত্রে ইমামতী পরিত্যাগ করিবে না। তবে যদি ঝগড়া বিবাদ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তেমন ক্ষেত্রে ইমামতী বর্জন করিবে।

(১০) ইমামের আমানতের হেফাজত করা একান্ত কর্তব্য। কেহ তাহার নিকট কোন গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিলে বা কোন বিষয়ে কোনরূপ পরামর্শ চাহিলে তাহা অবশ্যই গোপন রাখিবে। কোন অবস্থায়ই উহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না।

(১১) নিজে ইমাম হওয়ার জন্য কখনও কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ করিবে না এবং এ ব্যাপারে মনে কোনরূপ জিদকে প্রশ্রয় দিবে না। অপর ব্যক্তি হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবে না।

(১২) কখনও কাহারও নিকট আত্মপ্রশংসা করিবে না।

(১৩) নূতন কোন স্থানে গিয়া তথাকার লোকের অনুমতি ব্যতিরেকে কখনও নিজে ইমামতী করিতে যাইবে না।

(১৪) নূতন স্থানে নামাযের ইমামতীতে দাঁড়াইয়া কখনও নামাযকে দীর্ঘস্থায়ী করিবে না।

(১৫) লোকে প্রশংসা করুক এই মনোভাব লইয়া কখনও নামাযের মধ্যে সূরা কিরাত পাঠে নূতনত্ব এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না। স্মরণ রাখিবে, নামায পড়া হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। মানুষের প্রশংসা এবং সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নহে।

(১৬) দুই পক্ষ ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা কিংবা বিচারের উদ্দেশ্যে আসিলে সর্বদা হক বিচার অথবা ন্যায্য ফায়ছালা করিয়া দিবে। কোন পক্ষের প্রাবল্য বা শক্তিমত্তা দেখিয়া কিংবা নিজের ব্যক্তিস্বার্থের বশে প্রলুব্ধ হইয়া অন্যায় পক্ষের সমর্থন এবং ন্যায় পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিবে না।

(১৭) সম্ভব হইলে অন্যায় পক্ষকে তাহাদের অন্যায়াচরণ হইতে বিরত করিতে সাধ্যমত শক্তি প্রয়োগ করিবে। আর তাহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ তাহাদিগকে মুখে নসীহত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিবে।

(১৮) ইমামের উচিত সৎ, নেককার ও উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট লোকদের সহিত উঠাবসা ও যাওয়া-আসা করা, অসৎ, বদকার এবং দুশ্চরিত্র লোকদের সহিত তাহার সংশ্রব রাখা মোটেই উচিত নয়।

ইমামতের জন্য লালায়িত না হওয়া ঃ ইমামের কোন অবস্থাতেই ইমামত পদ নিয়া ঝগড়া বিবাদ করা উচিত নয়। কেননা এই কাজ একান্তই নিঃস্বার্থ কাজ। কাজেই এমন কিছু করা চাই না যাহাতে এই কথা মনে করা যায় যে, ইহাতে কোনরূপ ব্যক্তি স্বার্থ নিহিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে সরাইয়া দিয়া নিজে ইমামতী করার জন্য আগ্রহান্বিত ও চেষ্টিত হয়, তবে তাহার সহিত কোনরূপ কলহ না করিয়া বিনা দ্বিধায় তাহাকে ইমামতী করার সুযোগ দিবে। কেননা পূর্ব যমানার অনেক নেতৃস্থানীয় বোযর্গ ইমামের কথা এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা ইমামের পদ গ্রহণ না করিয়া পারিলে কোনক্রমেই ইহা মাথায় তুলিয়া লইতেন না। বরং অন্য কোন আগ্রহী ব্যক্তি থাকিলে ইমামতের বোঝা তাহার উপর সোপর্দ করিয়া নিজেই ঐ পদ হইতে আলগ হইয়া যাইতেন, অথচ ঐ ব্যক্তি ইমাম বোযর্গী ও তাকওয়া (পরহেজগারী) প্রভৃতির দিক দিয়া উচ্চস্তরের তো নহেই বরং সমতুল্যও নয়। এই ধরনের আমলের সপক্ষে তাহাদের বক্তব্য ছিল এই যে, মাথায় বোঝা এবং

একটি বিরাট দায়িত্ব হইতে বাঁচিয়া থাকা গেল। তাঁহাদের ঐ দায়িত্ব বহন করিতে এইজন্য ভয় হয় যে, নাজানি কখনও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া বসে, যাহার ফলে শুধু একার তো নয় বরং সমস্ত মুক্তাদীর নামাযই বাতিল হইয়া যাইতে পারে।

নামাযের জামাতে যদি দেশের মুসলিম শাসক বা বাদশাহ্ উপস্থিত থাকেন তবে তাহার অনুমতি নিয়া ইমামতী শুরু করিবে। তাহার অনুমতি ছাড়া কোনক্রমেই ইমামতী শুরু করিবে না।

এইভাবে যখন কোন নূতন স্থানে বা সম্প্রদায়ের কাছে যাইবে, তখন তাহাদের অনুমতি ছাড়া ইমামতী করিবে না। বরং তাহারা যদি খুশীর সঙ্গে অনুমতি দান করে, তবে নূতন জায়গায় এইরূপ স্থলেই শুধু ইমামতী করিবে। অহেতুক চেষ্টা তদবীর করিয়া বা বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কখনও ইমামতী করিতে যাওয়া চাই না। এইভাবে কোন সমাবেশে কিংবা সফরে কোন বড় কাফেলার সাথে চলিবার কালেও অন্যান্য লোকের ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া নিজে নিজেই গিয়া ইমামের স্থানে দাঁড়াইবে না। আর নামায যখন যেখানেই পড়াহউক না কেন, খুব দীর্ঘ না করিয়া সংক্ষেপেই আদায় করিবে। কেননা জামাতে বালক, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বহু মাজুরও শরীক হইয়া থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কেহ্ নামাযের ইমাম হও তখন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করিও। কেননা তোমাদের পিছনে অনেক বালক, বৃদ্ধ এবং শ্রমজীবি লোকও জামাতভুক্ত হইয়া থাকে। হাঁ, তবে যখন তোমরা একাকী নামায পড়িবে, তখন যত চাও লম্বা করিয়া পড়িও।

হযরত আবু ওয়াকিদ (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) যখন জামাতে নামায পড়াইতেন, তখন নামায খুবই সংক্ষিপ্ত করিতেন। কিন্তু যখন একাকী নামায পড়িতেন তখন তিনি নামায সর্বাধিক দীর্ঘ করিয়া পড়িতেন।

ইমামতীর রীতিনীতি

ইমাম দিলে মুখে নিয়ত না করা পর্যন্ত নামাযের কোন কাজ শুরু করিবে না। নামায শুরুর প্রাক্কালে অন্তরে নিয়ত করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই সাথে মুখেও নিয়ত করা উত্তম।

নামায আরম্ভ করার আগে ডাহিনে ও বামে তাকাইয়া দেখিয়া মুক্তাদীগণকে বলিবে, তোমরা কাতার সোজা করিয়া ঠিক মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যাও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করিবেন। মুক্তাদিগণকে বলিতে হইবে যে, তোমরা পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। দুই জনের মধ্যে ফাঁক জায়গা থাকিলে নামাযের বিশেষ ক্ষতি হয়। কেননা সেখানে শয়তান আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কাতার সোজা কর ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। কাতারের মধ্যস্থল পূর্ণ কর, যেন বকরীর ছানার মত শয়তান তোমাদের মধ্যকার খালিস্থানে দাঁড়াইতে না পারে।

হুযুর (দঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে ডাহিনে বামে দৃষ্টিপাত করিয়া এরশাদ করিতেন, তোমাদের কাতার এবং কাঁধ সোজা কার। এই কথা বলার পর তাকবীর বলিতেন। তাকবীরের আগে তিনি আরও বলিতেন, তোমরা আগে পিছে দাঁড়াইও না।

একদা হুযুর (দঃ) কোন এক ব্যক্তির বক্ষ কাতারের বাহিরে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, তোমার স্কন্ধ অন্যের স্কন্ধের সমান কর। অন্যথায় তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ্ বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম সালেম ইবনে জুর (রহঃ) হইতে এবং তিনি হযরত নো'মান ইবনে বশীর হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তেমরা নামাযের কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহতায়ালা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

আর এক হাদীসে আসিয়াছে, হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইত বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নামাযের কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতারই একটি অংশ বিশেষ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে শুধু মসজিদের নামাযের কাতার সোজা করিবার জন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন। যখন পর্যন্ত তিনি নামাযের কাতার সোজা হইয়াছে বলিয়া আমীরুল মুমিনীনকে না জানাইতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলিতেন না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর-ও এইরূপ নিয়ম ছিল। তিনিও কাতার সোজা করিবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, মুয়াযযিন হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিতেন আবার নামাযের কাতারও সোজা করিতেন, তিনি কাতার সোজা করিবার কালে মুসল্লীদের হাটুতে চাবুক মারিয়াও উহা সোজা করিতেন। কোন কোন ওলামা কিরাম বলেন, এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হযরত বিলাল (রাঃ) নবীর (দঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তিনি আর কাহারও ইমামতীর জন্য আযান দেন নাই।

হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর মদীনা শহর তাঁহার জন্য একটি অশান্তির স্থানে পরিণত হইয়াছিল। তথায় আর তাঁহার মন বসিতে ছিল না। তাই তিনি মদীনা ছাড়িয়া সিরিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সিরিয়া হইতে প্রত্যোবর্তনের পর মদীনাবাসীরা রাসূল (দঃ)-এর যমানার মুয়াযযিন বিলালের কণ্ঠের আযান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহারা হযরত বিলাল (রাঃ)কে একবার আযান দিবার জন্য বহু ধর-পাকড় শুরু করিলেন। কিন্তু হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর বিয়োগ বেদনায় তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, রাসূল (দঃ) বিহীন মদীনায় তিনি আর কখনও আযান দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একান্ত অনুরোধে একবার আযান দিতে রাজি হইলেন এবং আযান দিতে শুরু করিলেন। যখন তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ' পর্যন্ত পৌছিলেন ও উহা উচ্চারণ করিলেন, তখন তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন হুযুরে পাক (দঃ)-এর পবিত্র বদনখানা ভাসিয়া উঠিল। রাসূল (দঃ)-এর প্রেমে তিনি এমনই পাগল ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আযানের বাক্য বলার সাথে সাথেই বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন।

হযরত বিলাল (রাঃ)-এর অবস্থা দেখিয়া আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই একবারে দিশাহারা ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। নবীজির বিদায় ঘটনার শোক আবার তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। তাঁহারাও সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। এমন কি অন্তঃপুর বাসিনী রমনীরাও হযরত বিলাল (রাঃ)কে দেখিবার জন্য গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বর্ণিত আছে, ইহার পর হযরত বিলাল (রাঃ) আর কোন দিনই আযান দেন নাই। তবে বর্ণনান্তরে ইহাও দেখা যায় যে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসায়েন (রাঃ) হুযুরে পাক (দঃ)-এর এই দুইজন স্নেহের পুতলি ও কলিজার টুকরার একান্ত অনুরোধেও তিনি একবার আযান দিতে রাজী হইয়াছিলেন ও আযান দিতে শুরুও করিয়াছিলেন এবং তখনও তিনি উক্ত কালাম 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত বলিয়া আর সামনে বলিতে পারেন নাই বরং ঐ কালাম মুখ হইতে উচ্চারণ করা মাত্র চেতনালুপ্ত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনাটি কি একই দিনের ঘটনা, না দুই দিনই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য অস্পষ্ট। তবে একথা স্পষ্ট যে, এই ঘটনার পর আর সারা জীবনে কোন দিনই তিনি আযান দেন নাই। তাঁহাকে হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর ইন্তেকালের পরও মদীনার মসজিদে মুয়াযযিন পদে বহাল রাখার জন্য সমস্ত সাহাবায় কিরাম বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হন নাই।

এখন এই ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, হযরত বিলাল (রাঃ) যখন হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের পরে মদীনার মসজিদে মুয়াযযিন পদেই বহাল রহিলেন না, তিনি চলিয়া গেলেন অন্যত্রে, তখন উহার আনুসঙ্গিক কাজ কর্মও আর তাঁহার দ্বারা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

নামাযের কাতার সোজা করার জন্য মুসল্লিদের হাটুতে চাবুক মারার ঘটনা শুধু মাত্র মুয়াযযিন বিলাল (রাঃ) দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। অন্য আর কাহারও দ্বারা হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাও কোন না কোন হাদীসে বর্ণিত হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর কাতার সোজা করার জন্য চাবুক মারার মত কঠোর ব্যবস্থা আর কখনও নেওয়া হয় নাই। উহা হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর যমানায় প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার ইন্তেকালের সাথে সাথে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জামাতের নামায শেষ করিয়া ইমাম বেশীক্ষণ পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসিয়া না থাকিয়া বরং মেহ্রাবের বাম পার্শ্বস্থ এক কোণায় সরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্নতে রাতেবা বা ওয়াক্তের সুন্নাত কিংবা নফল নামায পড়িবে।

হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুযুরে (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ইমাম যে স্থানে দাঁড়াইয়া ফরজ নামায আদায় করে, সে স্থানে দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়িবে না মুক্তাীগণ যেখানে দাঁড়াইয়া ফরজ নামায আদায় করে, সেস্থানে দাঁড়াইয়া বা একটু এদিকে সেদিকে দাঁড়াইয়া নফল পড়িতে পারে। ফরজের স্থানে দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়া ভাল নয়।

ইমাম একেবারে মেহ্রাবের মধ্যে নামাযে না দাঁড়াইয়া মেহ্রাবের বাহিরে দাঁড়ানো উচিত। শুধু তাঁহার রুকূ-সিজদাহ্ মেহ্রাবের ভিতরে হইলেই হয়। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে ইমামের মেহ্রাবের ভিতরে দাঁড়ানো দোষের কিছু নহে বরং মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম যেন মুক্তাদীদের দাঁড়াইবার স্থান হইতে উঁচু জায়গায় না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ইমাম ফরজ নামায আদায় করিয়া নফল নামায শুরু করিবার পূর্বে সামান্য কিছু সময় বসিয়া আরাম করিতে পারে।

ইমাম কিয়ামের কিরাত শেষ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে না যাইয়া একটু বিলম্বে রুকূতে যাওয়ার তাকবীর বলিবে। কিরাতের সাথে রুকূতে যাইবার তাকবীর একেবারে মিলাইয়া না নিয়া ইমাম কিরাতের পর একটু দম লইয়া রুকূর তাকবীর বলিবে।

হাদীসে আসিয়াছে হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, কিরাত শেষ করিবার সাথে সাথেই তাকবীর বলিবে না।

ইমাম কোন কাজেই তাড়াহুড়া করিবে না। ইমাম তাড়াহুড়া করিলে মুক্তাদীরাও তাহাই করিবে এবং তাহাতে তাহাদের অনেকেরই নামায বাতিল হইয়া যাইবে এবং সেই পাপ ইমামের উপর বর্তিবে। নামায আরম্ভ করিবার কালে ইমাম মুক্তাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, তোমরা আমার পূর্বে নামাযের মধ্যের কোন কাজ করিবে না। করিলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দান করিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, প্রত্যেক ইমাম একেকজন রক্ষণাবেক্ষণকারী। প্রত্যেক রক্ষণাবেক্ষণ-কারীকেই তাহার নিজের ও তাহার অধীনস্ত এবং আওতাধীনদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তদ্রূপ ইমাম তাহার মুক্তাদিগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব মুক্তাদীদের কাজ-কর্মের তদারক করা ইমামের কর্তব্য। নামাযের আহকাম, আরকান, রুকূ, সিজদাহ ইত্যাদি বিষয় ইমাম মুক্তাদীগণকে শিখাইয়া দিবে। নচেৎ মুক্তাদিগণ ঐসব ব্যাপারে কোন ভুলভ্রান্তি করিলে তাহারা নিজেরা যেমন পাপী হইবে, ইমামও তাহাদের সাথে তেমনি পাপের ভাগী হইবে।

মুক্তাদীদের কর্তব্য

মুক্তাদিগণ যে ইমামের পিছনে নামায পড়িবে, নিয়তের মধ্যে তাহার ইক্তেদা বা অনুসরেণের নিয়তও থাকিতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। মুক্তাদী একজন হইলে সে ইমামের ডাহিন পার্শ্বে দাঁড়াইবে। আর মুক্তাদী একাধিক হইলে তাহাদের ইমামের পিছনে দাঁড়ানো সুন্নত।

নামায শুরুর সময়ে যদি একজন মুক্তাদী থাকে এবং অতঃপর আরও একজন বা একাধিক মুক্তাদী আসিয়া নামাযের শরীক হয় তবে মুক্তাদিগণ সকলে মিলিয়া ইমামের এক সিজদাহ্ পরিমাণ জায়গা পিছনে গিয়া এক কাতারে দাঁড়াইবে। কিন্তু ইমাম নিজের স্থান হইতে সম্মুখে আগাইয়া দাঁড়াইবে না। অবশ্য যদি পিছনে মুক্তাদীদের দাঁড়াইবার মত জায়গা না থাকে, তবে এমত ক্ষেত্রে ইমাম সামনে আগাইয়া দাঁড়াইলে কোন দোষ হইবে না।

ইমাম রুকূ-সিজদায় যাওয়ার পূর্বে মুক্তাদিগণ কখনও রুকূ-সিজদায় যাইবে না বা ইমামের রুকূ-সিজদাহ্ হইতে মাথা উত্তোলনের পূর্বে মুক্তাদিগণ রুকূ-সিজদাহ্ হইতে কখনও মাথা উত্তোলন করিবে না।

জামাত দাঁড়াইয়া যাইবার পরে কোন লোক আসিয়া যদি দেখে যে, কাতারের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইবার জায়গা নাই তবে সে নিজের সহিত আরেকজনকে লইয়া পিছনের কাতারে দাঁড়াইবার জন্য সম্মুখের কাতার হইতে কাহাকেও টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে না। কেননা, যাহাকে টানিয়া আনিতে চাহিবে, সে হয়ত মাসলা জানা না থাকার কারণে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়া পড়িবে। কাজেই এই অবস্থা হইতে বাঁচার জন্য পিছনে একাকী দাঁড়াইয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ হাম্বলী মাজহাব মতে যাহাকে তাহার স্থান হইতে টানিয়া আনিবে তাহার নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

কোন মুক্তাদী যদি এমন সময়ে আসিয়া জামাতে শরীক হয় যে, ইমাম ইতিমধ্যে তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া নামায শুরু করিয়াছে। তবে উক্ত মুক্তাদী তাকবীর বলিয়া নামাযে শামিল হইয়া যাইবে।

আর মুক্তাদী যদি এমন সময় মসজিদে আসে যে, ইমাম তাকবীর বলিয়া রুকূতে গিয়াছে তবে মুক্তাদী দুই তাকবীর বলিয়া নামাযে শরীক হইবে। এক তাকবীর, তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় তাকবীর রুকূর তাকবীর। তবে কেহ যদি এক তাকবীর বলিয়াই দুই তাকবীরের নিয়ত করে, তবে তাহাও জায়েয আছে।

আর মুক্তাদী আসিয়া যদি দেখে যে, ইমাম তাশাহহুদের শেষ বৈঠকে আছেন, তবে মুক্তাদী তাকবীর বলিয়া তদবস্থায়ই ইমামের সাথে বৈঠকে বসিয়া যাইবে। ইহাই মুস্তাহাব, ইহাতে ফায়েদাহ এই যে, ঐ ব্যক্তি জামাতের ফজীলত হইতে বঞ্চিত হইল না। সে অন্যান্যের মতই জামাতের ফজীলত লাভ করিতে পারিল।

ইমামের সালাম ফিরাইবার সাথে সাথে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বাদ পড়া নামায একাকী যথারীতি আদায় করিবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নামাযের রুকূ সিজদায় যাওয়া, রুকূ সিজদাহ্ হইতে উঠা এবং বৈঠকে বসা, এক কথায় নামাযের কোন রোকনই যেন কোন মুক্তাদী ইমামের অগ্রে সম্পাদন না করে। বরং প্রত্যেক কাজেই ইমামের অনুসরণ করিবে অর্থাৎ তাঁহার পরে করিবে। আবার তাই বলিয়া ইমামের কাজের খুব বেশী পরে করিবে, তাহাও ঠিক নয়। মোটকথা, যে কোন কাজ মুক্তাদিগণ ইমামের কাজের সাথে সাথে আদায় করিবে। ইমামের আগেও নয় এবং বেশী পরেও নয়। এই সম্পর্কে খোদ হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এবং সাহাবায় কেরামদের বহু হাদীস রহিয়াছে। এখানে কতিপয় প্রাসঙ্গিক হাদীস পেশ করা গেল।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর পিছনে নামায পড়িতাম। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় গিয়া ললাট যমিনে না ঠেকাইতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেহ

আমাদের পিঠ বাকা করিতাম না। তাকবীর বলিয়া যখন তিনি মস্তক যমিনের কাছে নিতেন, সাহাবাগণ তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পরে সিজদাহ্ করিতেন। আবার যখন তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন, সাহাবাগণ তখনও সিজদায় থাকিতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে ইমামের পূর্বে রুকূ সিজদাহ্ হইতে মস্তক উত্তোলন করে, তাহার কি এ ব্যাপারে ভয় নাই যে, রোজকিয়ামতে তাহার মাথা গাধার মাথার মত করিয়া দেওয়া হইবে?

অন্য হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কি এই বিষয়ে মনে ভয় আসে না যে, ইমামের পূর্বে রুকূ সিজদাহ্ হইতে মাথা উঠাইলে তোমাদের মাথা শূকর কিংবা গাধার মাথায় রূপান্তরিত করা হইবে।

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে ইমামের পিছনে নামাযের মধ্যে ইমামের পূর্বে রুকূ-সিজদাহ্ আদায় করিতে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, না তুমি একাকী নামায পড়িলে, আর না তুমি নামায ইমামের সাথে আদায় করিলে। যে ব্যক্তি এইরূপ না একাকী ও না ইমামের সাথে নামায আদায় করে, তাহার নামাযই আদায় হয় না।

এইরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, তুমি না ইমামের সাথে নামায পড়িলে, না একাকী নামায পড়িলে। অতঃপর তিনি তাহাকে পুনরায় নামায আদায় করিতে বলিলেন।

আবু ছালেহ্ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এজন্য ইমাম নির্বাচন করা হইয়াছে যে, লোকে যেন নামাযে ইমামের অনুসরণ করে। তাই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বলিবে, ইমাম যখন রুকূ করে, তোমরাও রুকূ করিবে। ইমাম যখন রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন করে, তোমরাও রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন কর। ইমাম যখন 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলে, তোমরাও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বল। ইমাম যখন সিজদায় যায়, তোমরাও সিজদায় যাও। ইমাম যখন সিজদাহ হইতে উঠে, তোমরাও সিজদাহ হইতে উঠ। কিন্তু তোমরা ইমামের আগে কোন কিছুই করিও না। ইমাম যখন বৈঠকে বসে, সাথে সাথে তোমরাও বসিয়া পড়। রুকূতে ও সিজদায় ইমাম চুপে চুপে যে তাসবীহ্ পাঠ করে তোমরাও চুপে চুপে সেই তাসবীহ পাঠ কর। আর ইমাম কিয়ামে যখন উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পাঠ করে, তোমরাও চুপে চুপে সেই তাসবীহ পাঠ কর। আর ইমাম কিয়ামে যখন উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পাঠ করে, তোমরা চুপ করিয়া থাকিয়া মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ কর। আর যখন সে নীরবে কিরাত পাঠ করে, তখনও তোমরা নীরবে দাঁড়াইয়া থাক। তোমরা সরবে বা নীরবে কোন অবস্থায়ই কিরাত পড়িবে না। আর ইমাম বৈঠকে বসিয়া যখন চুপে চুপে তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ করে, তোমরাও বসিয়া চুপে চুপে তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ কর।

ইমামের আগে মুক্তাদীর কাজে নামায কবুল হয় না

রোজকিয়ামতে এইরূপ বহু লোক হইবে যাহাদের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই। কেননা রুকূ-সিজদাহ, বৈঠক-কিয়াম প্রভৃতিতে তাহারা ইমামের আগে আগে কাজ করিয়াছে।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, একটি যমানা এইরূপ আসিবে যে, লোকগণ নামায তো আদায় করিবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা নামায পড়িবে না। সম্ভবতঃ সেই যমানাই এখন আসিয়াছে। কেননা এই যমানায় বেশীর ভাগ লোকই নামাযের রোকনগুলি ইমামের আগে আগে আদায় করে। আর এইরূপ করিয়া তাহারা নামাযের রোকন, ওয়াজিব, সুন্নত সব কিছু বরবাদ করিয়া দিতেছে। যদি কেহ কাহাকে নামাযের মধ্যে এইরূপ ত্রুটি করিতে দেখে, তবে তাহাকে এ ব্যাপারে বাতাইয়া দেওয়া ও নসিহত করা অবশ্য কর্তব্য, যেন সে ভবিষ্যতে এই কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া নামায বিশুদ্ধ করিতে পারে এবং তাহার পূর্বেকার ত্রুটিযুক্ত নামাযসমূহের কাজা আদায় করিয়া আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার তাউফিক হাসিল করিতে পারে।

কিন্তু কেহ অপরের এইরূপ ভুল-ত্রুটি দেখিয়াও যদি সে তাহাকে বাতাইয়া দিতে ও নসিহত করিতে অবহেলা করে, তবে সেও সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির সহিত নামায আদায়কারীর মত গুনাহগার হইবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, জাহেল (মূর্খ অজ্ঞ)দের কারণে আলেমদের বরবাদীর কারণ ঘটিবে। কেননা আলেমগণ জাহেলদিগকে শিক্ষাদান করিতে অবহেলা করিয়াছে! এই হাদীস মর্মে বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞ-নাজানা লোকদের শিখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া আলেমদের প্রতি ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। আর এই কারণেই হুযুরে পাক (দঃ) এ ব্যাপারে আলেমদিগের এইরূপ বরবাদীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর মূলতঃও যাহারা ফরজ ও ওয়াজিবের ব্যাপারে উদাসীন তাহারা বাস্তবিকই ধমকি এবং শাস্তির উপযুক্ত।

গুনাহগারের পরিশুদ্ধি ঃ হযরত বিলাল ইবনে সাআদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, গুনাহ যে পর্যন্ত গোপন থাকে, সে পর্যন্ত উহা একমাত্র গুনাহগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও জন্য ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু যখন গুনাহ প্রকাশ হইয়া পড়ে বা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এবং উহার প্রতিকার বা সংশোধন না করা হয়, তখন তাহার ক্ষতি সর্বসাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। কেননা সকলের উপর অবশ্য কর্তব্য, যাহার দ্বারা গুনাহর কার্য সংঘটিত হয়, তাহাকে বাধাদান করা এবং গুনাহর প্রতিকার ও সংশোধন করা। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা নীরব ভূমিকা পালন করায় ঐ গুনাহ বা অপরাধমূলক কাজের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া উহা সব লোককেই জড়াইয়া ধরে। আর এইভাবেই অসৎ লোকদের অসৎ কাজের ভিতরে সৎ লোকগণ অংশীদার হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সৎ লোকগণ যদি অসৎ লোকের অসৎ কাজের প্রতিরোধ করে, তবে আর তাহাদের অসৎ কাজের প্রতিফল ভোগে শরীক হইতে হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচুতি দেখিয়া তাহার প্রতিকার না করে তবে সে ব্যক্তিও ঐ লোকের গুনাহর অংশীদার হইবে। কাহাকেও গুণাহর কার্য করিতে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে বিরত না করে। সে মূলতঃ অভিশপ্ত শয়তানের কাজেরই অনুরূপ কাজ করে। কেননা শয়তান কোন অসৎ কাজ দেখিয়া বারণ তো করেই না বরং সে আরও প্রেরণা যোগায় এবং নেক কাজ ও তাকওয়ার পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া রাখে। অথচ আল্লাহতায়ালা কোরআনে পাকে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى *

উচ্চারণ ঃ তা'আ-অনূ 'আলাল বিররি অত্তাক্বওয়া।'

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের নেককাজ এবং ধর্ম ভীরুতায় সহযোগিতা কর।

মুসলমানের জন্য মুসলমানের করণীয় ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নসিহত করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা শয়তান এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, মুসলমানের দ্বীন দুর্বল হউক এবং ইসলাম দুনিয়া হইতে বিলীন হইয়া যাউক ও সারা দুনিয়ার লোক গুনাহর ভিতরে লিপ্ত হইয়া পড়ুক। অথচ কোন জ্ঞানবান লোকই ইহা পছন্দ করিবে না যে, সে শয়তানের অনুবর্তী বা অনুসারী হউক এবং তাহার কথামত চলুক। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا بَنِىْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ *

উচ্চারণ ঃ 'ইয়া বানি আদামা 'লা ইয়াফতিনান্নাকুমুশ শাইত্বানু কামা আখরাজ্বা আবাঅইকুম মিনাল জান্নাতি।'

অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! যেন শয়তান তোমাদেরকে ফেতনায় লিপ্ত করিতে না পারে যেমন ভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতা মাতা (আদম ও হাওয়া)কে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছিল।

আল্লাহতায়ালা আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাশ শাইত্বানা লাকুম 'আদুব্বুন ফাত্তাখিযুহু আদুওয়ান, ইন্নামা ইয়াদই হিযবুহু লিইয়াকূনূ মিন আছহাবিচ্ছা'ঈর।

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রবল শত্রু। (অতএব) তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও। বেশক শয়তান এবং তাহার দলবল তোমাদেরকে সেদিকেই ডাকিতেছে যেন তোমরা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

ওলামাদের নীরবতার ফল ঃ নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতসমূহে যে অপূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা শুধু আলেম এবং ফকীহদের নীরবতা পালনের ফল। যেমন তাহারা খাঁটি ওয়াজ ও নসিহত বন্ধ করিয়াছে, দ্বীন ধর্মের শিক্ষা প্রদান ছাড়িয়া দিয়াছে। আর তাহার ফলে ইবাদাতের ভিতরে যে অপূর্ণতা ও ত্রুটি ঘটিতেছে প্রথমতঃ তাহার সূচনা মূর্খ এবং অজ্ঞদের মধ্যে হইলেও ক্রমশঃ উহা আলেম এবং ফকীহদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থার যিম্মাদার খোদ আলেম ও ফকীহগণই হইয়া পড়ে। জন সাধারণও নির্দ্বিধায় বলিতে শুরু করে যে, সমস্ত অপরাধ শুধু আলেম-ফাজেল এবং ফকীহদিগেরই।

একটি ব্যাপার ভাবিলে খুবই আশ্চর্য লাগে যে, একজন মুসলিম ব্যক্তি যদি জনৈক মুসলিম কিংবা ইয়াহুদী ব্যক্তিকে সামান্য একটি রুটি চুরি করিতে দেখে তবে তাহাকে চোর চোর বলিয়া সাড়া এলাকাকে তোলপাড় করিয়া ছাড়ে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি একজন মুসলমানকে নামাযের মধ্যে উহার কোন রোকন কিংবা ওয়াজিব কার্য চুরি করিতে দেখে তবে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নীরব ভূমিকা পালন করে, তাহার মুখ হইতে কোন একটি কথা মাত্র বাহির হয় না। না তাহাকে কোনরূপ ধর-পাকড় করে, না উহার কোনরূপ প্রতিকার করে। অর্থাৎ এই ব্যাপারটিকে সে এমন ভাবেই পাশ কাটাইয়া যায় যেন ইহার কোন গুরুত্বই নাই। ইহা একটি অতি নগণ্য ও মামুলি ব্যাপার। অথচ হাদীস শরীফে আসিয়াছে নামাযের মধ্যে কোন কিছু ছাড়িয়া দেওয়া বা নামাযকে অপূর্ণভাবে আদায় করা হইলে মারাত্মক চুরি। যথা ঃ হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে চুরি করে, সে অত্যন্ত জঘন্য চোর। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! নামাযের মধ্যে চুরি কিভাবে করে? হুযূর (দঃ) জবাবে বলিলেন, রুকূ ও সিজদাহ যথাযথভাবে আদায় না করাই নামাযের মধ্যে চুরি।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে বলিব কি সর্বাপেক্ষা জঘন্য চোর কে? সাহাবাগণ আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! কে সেই সর্বাধিক জঘন্য চোর? হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে রুকূ ঠিক মত আদায় করে না এবং সিজদাহ ঠিক মত করে না।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, নামায এমন এক বস্তু, যে ইহা পুরাপুরিভাবে পেশ করে, তাহাকে তাহার বদলাও পুরাপুরিভাবে দেওয়া হয়। আর যে ইহা অসম্পূর্ণভাবে পেশ করে, তাহার ফল কি হইতে পারে, তাহা তো অবগতই রহিয়াছে যে, কম দাতাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে কি এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ অইলুল লিল মুতাফ্যিফীন।

অর্থাৎ মাপে যাহারা কম দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে ওয়ায়েল দোজখ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আলী অথবা আলী ইবনে শায়বান (রাঃ) বলেন যে, একবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে আমাদের কবিলা হইতে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে হইতে আমিও একজন ছিলাম। ঐ সময়ে হুযুরে পাক (দঃ) (প্রসঙ্গ ক্রমে) এরশাদ করিলেন, আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপার দৃষ্টি করেন না, যে রুকূ ও সিজদাহ্র ভিতরে নিজের কমর সোজা রাখে না।

নামায দোহরাইবার হুকুম ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা হুযুরে পাক (দঃ) মসজিদের এক কোণায় অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় একটি লোক মসজিদে আসিয়া নামায আদায় করতঃ হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সালাম আরজ করিল। হুযুর (দঃ) সালামের জবাব দিয়া লোকটিকে বলিলেন, যাও, তুমি গিয়া পুনরায় নামায পড়। কেননা (তুমি যে নামায পড়িয়াছ, তাহা) নামায পড় নাই। লোকটি গিয়া পূর্বের মতই আবার নামায পড়িল এবং নামাযের বাদে হুযুর (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইল। হুযুরে পাক (দঃ) লোকটিকে আবার বলিলেন, যাও, তুমি আবার গিয়া নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় কর নাই। লোকটি আবার যাইয়া পূর্বানুরূপ নামায পড়িয়া পুনরায় হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিল। তিনবার এইরূপ করার পর সে এইবার হুযুরে পাক (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি নামায আদায়ের রীতি-নীতি শিক্ষা ভালরূপে লাভ করি নাই আপনি আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।

তখন হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াইতে যাইবে, তখন প্রথমে ভালরূপে অজু করিয়া লইবে, তারপর কিবলামুখী দাঁড়াইয়া তাকবীরে তাহরীমা বলিবে। তারপর কোরআনে পাকের যে আয়াত-কিরাত মুখস্ত আছে, তাহা পাঠ করিবে। অতঃপর ঠিকভাবে রুকূ আদায় করিবে। তারপর রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন করত ঠিকভাবে দাঁড়াইয়া যাইবে। তারপর ঠিকমত সিজদাহ্ করিবে। তারপর উঠিয়া সোজা হইয়া বসিবে। তারপর আবার ঠিকভাবে আর একটি সিজদাহ্ করিয়া অতঃপর মাথা উঠাইয়া ঠিকমত বসিয়া যাইবে। এইরূপ ঠিকমত নামায আদায় করিবে।

আর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, হযরত রেফা' ইবনে রাফে' বলেন, একদা আমরা হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া কিবলারোখ হইয়া নামায আদায় করিল। তারপর সে হুযুর (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া সালাম পেশ করিল।

হুযুরে (দঃ) লোকটিকে আদেশ করিলেন, তুমি নামায দোহরাইয়া পড়। কেননা তুমি নামায পড় নাই! লোকটি এইভাবে দুই তিন বার নামায পড়িল এবং হুযুরে পাক (দঃ)ও দুই তিনবারই তাহাকে নামায দোহরাইয়া পড়িতে আদেশ করিলেন।

অবশেষে লোকটি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা যত্নের সাথে নামায আদায় করিতেছি, নামাযের মধ্যে কোন অপূর্ণতা রাখিতেছি না। তবে জানি না, ইহা সত্ত্বেও আপনি আমার দ্বারা কিরূপ নামায পড়াইতে চাহেন?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, কামিল (পরিপূর্ণ) অজু ব্যতীত কাহারও নামায আদায় হয় না। যেমন আল্লাহতায়ালা পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *

উচ্চারণ ঃ 'ইযা-কুমতুম ইলাচ্ছালা-তি ফাগ্বসিলু বুজুহাকুম অ আইদিইয়াকুম ইলাল মারা-ফিক্বি অমসাহু বি-রুউসিকুম অ আরজুলাকুম ইলাল কা'বাইনি।'

অর্থাৎ তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াইবে, তখন তোমরা তোমাদের চেহারা এবং দুই হাত কনুই সমেত উত্তমরূপে ধৌত কর এবং তোমরা তোমাদের মাথা মোসেহ্ কর ও তোমাদের দুই পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত কর।

অতঃপর নামাযে দাঁড়াইয়া তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া (হাত বাঁধিয়া তায়াউয তাসমিয়াসহ) ছানা পাঠ কর। তারপর আবার তাকবীর বলিয়া রুকূতে চলিয়া যাও। রুকূর মধ্যে দুই হাত দুই পায়ের হাটুর উপর রাখ। এ সময় তোমার শরীরকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিবে। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়া রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজাভাবে দাঁড়াইয়া যাও। তারপর আবার তাকবীর বলিয়া সিজদায় গমন কর। এইভাবে হুযুরে পাক (দঃ) নামাযের চারিটি রাকাতের রীতি-নীতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন। তারপর এরশাদ করিলেন, এইরূপে আদায় না করিলে কাহারও নামায যথাযথভাবে আদায় করা হয় না।

এখন সকলে চিন্তা করুন, হুযুরে পাক (দঃ) কিভাবে নামাযের কিয়াম ও রুকূ-সিজদাহ্ আদায় করিবার নির্দেশ দান করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, এইরূপভাবে নামায আদায় ব্যতীত নামায আদায় করা হয় না। তদুপরি তিনি কোন একটি লোককেই নাকেছ নামায পড়িতে দেখিয়া চুপ না থাকিয়া সাথে সাথে উহা দোহরাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং পড়িবার সুষ্ঠু রীতি-নীতিও শিখাইয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, এইরূপ কাহাকেও অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত নামায পড়িতে দেখিয়া তাহাকে পরে বা অন্য কোন সময় এ বিষয়ে শিক্ষা দান বা সংশোধন করা শরীয়তে জায়েয হইত, তবে হুযুরে পাক (দঃ) নিজেই সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ উহাদের ভুল না শোধরাইয়া তাহা অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দিয়া তখনকার মত নীরব থাকিতেন। কিন্তু তিনি সে পথ অবলম্বন না করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রেই যখন ঐরূপভাবে ক্রটিযুক্ত নামায আদায়কারীর দ্বারা নামায দোহরাইয়াছেন ও তাহাকে নামাযের রীতি-নীতি শিখাইয়া দিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, জাহিল এবং মূর্খ ব্যক্তিকে অলসতা ও উদাসনীতাকে প্রশ্রয় না দিয়া নামাযের তালীম প্রদান করা ও ভুল নামায শোধরাইয়া দেওয়া (আলেমদের প্রতি নিঃসন্দেহে) ওয়াজিব।

হুযুরে পাক (দঃ) স্বীয় সাহাবাবৃন্দকে এইরূপ প্রকাশ্য নির্দেশও দিয়াছেন যে, যদি কাহাকেও তোমরা ত্রুটিযুক্ত নামায পড়িতে দেখ, তবে তোমরা তাহাদের ভুল শোধরাইয়া দিবে ও নামায আদায়ের বিশুদ্ধ রীতি-নীতি শিক্ষাদান করিবে।

মুয়াযযিনের আযান দিবার আদব বা রীতি-নীতি

মুয়াযযিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য এই যে, তাহারা আযানের মধ্যে যখন আশহাদু শব্দ বলিবে তখন কোন ক্রমেই যেন (শীন)-এর উচ্চারণের স্থলে ছীনের উচ্চারণ না হয়, সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকিবে ও লক্ষ্য রাখিবে।

যে কোন ওয়াক্তের আযান উক্ত ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্র প্রদান করিবে। একমাত্র ফজরের ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য কোন ওয়াক্তেই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দিবে না। অবশ্য একমাত্র ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে উহার আযান দেওয়া জায়েয রহিয়াছে।

আযান দিয়া (সম্ভব হইলে ও সাধ্যে কুলাইলে) তাহার বিনিময় বা মূল্য গ্রহণ করিবে না বরং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে ও ছওয়াবের নিয়তে আযান দিবে।

আযান দিবার সময়ে মুয়াযযিন অবশ্যই দাঁড়াইয়া কিবলামুখী হইয়া আযান দিবে। শুধু মাত্র আযানের মধ্যে যখন 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' বলিবে তখন মুখ ডাহিন দিকে ও যখন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলিবে, তখন মুখ বাম দিকে ফিরাইবে। আযান বসিয়া কখনও দিবে না। বসিয়া আযান দিলে পুনরায় দাঁড়াইয়া আযান দোহরাইবে।

মাগরিবের আযান দিবার পরে মুয়াযযিন একামত বলিবার পরে অন্তত ঃ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও একটু বসিবে। —হাম্বলী মাযহাব

জানাবতের অবস্থায় আযান দেওয়া নিষিদ্ধ এবং বে-অজু অবস্থায় আযান দেওয়া যায়, তবে মাকরূহ। মুয়াযযিন আযান দিবার অবস্থায় যদি মুছল্লিগণ যথারীতি কাতার বাঁধিয়া ফেলে এমতাবস্থায় মুয়াযযিন আসিয়া কাতার চিড়িয়া ফাড়িয়া সামনের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করিবে না।

নামাযের মধ্যে খুশু-খুজু বা মনোসংযতি ও একগ্রতা

গভীর একাগ্রতা, মনোযোগ-মনোসংযতি, ভক্তিশ্রদ্ধা নম্রতা, দুর্বলতা, এবং আল্লাহর ভয়-ভীতি ও বেহেশতের আশা-আগ্রহ নিয়া নামায পড়িলে তাহার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।

নামাযের মধ্যে নামাযী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থাকিবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা। নামাযের রুকূ ও সিজদাহর মধ্যে তাহার মনোভাব থাকিবে যে, একমাত্র আল্লাহর রাস্তায়ই তাহাকে অবিচল থাকিতে হইবে এবং এইজন্য নামাযের মধ্যে দুনিয়াবী সমস্ত বিষয়-বস্তু অন্তর হইতে দূর করিয়া দিবে।

তদুপরি নামাযের মধ্যে এইরূপ খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই যে সে এক নামাযের মধ্যে আছে, ইহার পরবর্তী ওয়াক্তের নামায আর তাহার পড়িবার ভাগ্য নাও হইতে পারে। অধিকন্তু সে যে সকল ইবাদাত-বন্দেগী করিতেছে, তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইতেছে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মনের ভিতরে এই সমস্ত ভয়-ভীতি নিয়া আল্লাহর কৃপা ও রহমতের জন্য একেবারে অধীর থাকিবে। আর তাহার উপস্থিত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য মনে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে। যদি এ নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া যায়, তবে তো পরম সৌভাগ্যের কথা। আর যদি কোন ক্রমে উহা আল্লাহর দরবারে কবুল না হইয়া প্রত্যাখাত হয়, তবে আর তাহার মত দুর্ভাগ্য ও হতভাগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নাই। হাঁ, তবে ইহা অতীব সত্য এবং নিঃসন্দেহ যে, যাহাদের নামাযে খুশু ও খুজু থাকে এবং তাহা যদি খালেছ নামায হয়, কোনরূপ রিয়া বা পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যমুক্ত হয়, তবে অবশ্যই সেই নামায কখনও আল্লাহর দরবারে মকবুল না হইয়া পারে না।

মানুষ ভুল ও আলস্যের শিকার ঃ হে মানুষ! তোমাদের ভুল এবং আলস্যের প্রতি দারুণ বিস্ময়বোধ করিতেছি এইজন্য যে, দিবা-নিশির প্রতি মুহূর্তে তোমাদের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। প্রতি মুহূর্তে তোমরা তোমাদের নির্দ্ধারিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছ, তাই বলিতেছি, তোমরা তোমাদের সেই অবধারিত মৃত্যুকে ভয় কর। সেই ভীষণ ও ভয়াবহ বস্তু যাহা তোমাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার কথা ভুলিয়া যাইও না। জানিও মৃত্যুর সেই তিক্ত স্বাদ তোমাদের প্রত্যেককেই অবশ্য উপভোগ করিতে হইবে। তোমাদের এ পার্থিব বিষয়বস্তু সব কিছুরই মায়া কাটাইয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে এই দুনিয়া হইতে বিদায় লইতে হইবে। এরূপও সম্ভব আছে যে, আজ ভোরে কিম্বা রাতেই মৃত্যু আসিয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইবে এবং সব কিছু রাখিয়া কেবল একা তোমাকেই তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাকে নিয়া সে কি বেহেশতের দিকে, না কি দোজখের দিকে যাত্রা করিবে তাহা তো তোমার মোটেই জানা নাই। বেহেশতের দিকে যাত্রা করিলে তাহা তো তোমার পরম সৌভাগ্যের কথা, তাহা হইলে তো তোমার জীবন ধন্যই হইল, সার্থকই হইলে তুমি।

কিন্তু তাহা না হইয়া যদি অবস্থা বিপরীত হয়, অর্থাৎ মৃত্যুদূত যদি তোমাকে লইয়া দোজখের দিকে যাত্রা করে তবে যে তোমার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও চরম দুর্ভাগ্যজনক। কেননা সে দোজখের অবস্থা ও উহার আযাবের কঠিন অবস্থার কথা কেহ যে লিখিয়া প্রকাশ করিবে, তেমন সাধ্য কাহারও নাই।

বেহেশতের আকাঙক্ষী ও দোজখমুক্তিকামী ঃ এক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, আমি ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়ি যে, যে ব্যক্তি দোজখ হইতে মুক্তি কামনা করে, সে কিভাবে নিদ্রা যাইতে পারে? আর যে ব্যক্তি বেহেশতের আশা পোষণ করে, সে-ই বা কি করিয়া শয্যা পাতিয়া নিদ্রামগ্ন হইতে পারে? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার মনে যদি দোজখের ভয় এবং বেহেশতের আকাঙক্ষা ইহার কোনটাই না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি সেই আযাবের যোগ্য হতভাগাদের মধ্যে গণ্য হইয়া তোমার সর্বনাশ এবং ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। এইরূপ অবস্থায় তোমার দুর্ভাগ্য চরম দুর্ভাগ্যে পরিণত হইবে। তোমার হয়রানী, পেরেশানী, দুর্ভোগ ও বিপদ এবং আহাজারী দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবে। অতএব বলিতেছি, সত্যিই যদি তুমি নিজেকে বেহেশতের আকাঙক্ষী এবং দোজখ হইতে মুক্তির প্রত্যাশী বলিয়া দাবী কর, তবে তুমি হুশিয়ার এবং সতর্ক থাক যেন কোন প্রকার আলস্য এবং উদাসীনতার শিকার না হইয়া পড়।

তুমি প্রতি মুহূর্তে পরিশ্রম এবং সাধানায় ব্যাপৃত থাক। নফস (কুরিপু) এবং শয়তানকে সকল সময়ের জন্য ভয় করিয়া চল। কেননা এতদোভয়েরই আনাগোনা ঘটে খুবই সঙ্গোপনে ও ইহাদের ছলনা এবং প্রতারণা ভারী সূক্ষ্ম। তদুপরি দুনিয়ার মোহ, মায়া, রূপশ্রী-সৌষ্ঠব, ভোগ-উপভোগের লালসা আরও বেশী মারাত্মক। ইহার কোনটাই যেন কোন প্রকারে তোমাকে উহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতে না পারে।

দুনিয়া ভীষণ ধোকাবাজ এবং ক্ষতিকারক ঃ হযরত রাসূলে কারীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া মানুষকে নানাভাবে ধোকা দিয়া থাকে এবং ক্ষতিও করে মারাত্মকভাবে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلَاتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا *

উচ্চারণ ঃ 'লা তাগুররান্নাকুমুল হাইয়াতুদ দুনইয়া।'

অর্থাৎ পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা দান করিতে না পারে।

আল্লাহপাকের আরও এরশাদ রহিয়াছে ঃ

فَلَايَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ *

উচ্চারণ ঃ 'ফালা ইয়াগুররান্নাকুম বিল্লা-হিল গ্বারূর।'

অর্থাৎ ধোকাদানকারী শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে ধোকাদান করিতে না পারে।

অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় কর। নামায এবং অন্যান্য ইবাদাতসমূহ যথাযথভাবে পালন কর। নিষিদ্ধ কাজগুলি হইতে বিরত থাক। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহর কাজগুলি হইতে পরহেজ কর। আল্লাহ তোমার নছীবে যে রুজী ও রিজিক ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপরই রাজী থাক ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধসমূহ মানিয়া চল এবং তাঁহার বাধ্যগত হইয়া যাও। যে কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে কাজগুলি হইতে দূরে সরিয়া থাক। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে রুজী বন্টিত হইয়াছে ও আরও বহু ব্যাপার যাহা তোমার ইচ্ছা মাফিক নয় উহার হেতু ও রহস্য তোমার জানা নহে এবং উহার পরিণতিও তোমার নিকট অ প্রকাশ্য উহার বদলা ও বিনিময় তোমার নিকট গুপ্ত, সুতরাং তুমি আল্লাহতায়ালার ঐ সমস্ত কাজ ও ব্যবস্থার উপর প্রতিবাদ কিংবা অনুযোগ করিয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাইও না।

আল্লাহতায়ালা কোরআনে পাকে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ অ 'আসা-আন তাকরাহূ শাইয়াউ অ হুঅ খাইরুল্লাকুম, অ 'আসা-আন তুহিব্বু শাইয়াউ অ হুঅ শাররুল্লাকুম, অল্লা-হু ইয়া'লামু অ আনতুম লা তা'লামূন।'

অর্থাৎ অনেক সময়ই তোমরা কোন বিষয়কে খারাপ ভাবিয়া থাক অথচ উহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক সময় তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে কর, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহতায়ালাই (সমস্ত রহস্যের ভেদ) সর্বাধিক অবগত, কিন্তু তোমরা কিছুই জান না। অতএব তোমাদের উচিত, তোমরা সর্বদা নিজেদের প্রভুর আজ্ঞাবহ হও, তাঁহার বিধি ব্যবস্থার উপরে খুশী ও রাজী থাক, তাঁহার পাঠানো বিপদাপদের উপরে ধৈর্য ধারণ কর। তাঁহার প্রদত্ত নিয়ামতের উপরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তাঁহার নাম-নিয়ামত এবং কুদরতের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট দোয়া প্রার্থনা কর। তাঁহার কার্য, মর্জী এবং ব্যবস্থাবলীর ভিতরে ত্রুটি খুঁজিও না। বরং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে থাক। তাহা হইলে পুণ্যবানদের সাথে তোমার মৃত্যু এবং আম্বিয়াগণের সাথে হাশর অনুষ্ঠিত হইবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কৃপায় ও অনুগ্রহে অন্যান্য নেককারদের সাথে তোমারও পবিত্র বেহেশত নছীব হইবে।

খাস বান্দাগণের নামায

যাহারা আল্লাহর খাস বান্দা যাহাদের অন্তর সদা জাগ্রত এবং যাহাদের মধ্যে খুশু খুজু আছে, যাহারা মুরাকাবা মুশাহাদা করে, দিলকে হেফাজতে রাখে, যাহারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত তাহাদের নামাযের অবস্থা ভিন্ন।

এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ইউসুফ ইবনে আছাম কতিপয় সঙ্গীকে লইয়া খোরাসানের এক জামে মসজিদের তাশরীফ নিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, একটি বিরাট দ্বীনি বৈঠক চলিতেছে। হযরত ইউসুফ (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ কাহার বৈঠক চলিতেছে? কেহ জবাব দিল যে, এ শায়খ হাতেম (রহঃ)-এর বৈঠক। এই সময়ে সে পুণ্যময় বৈঠকে জোহদ, তাকওয়া, আশা ও নৈরাশ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপরে আলোচনা চলিতেছেল।

ইউসুফ ইবনে আছাম (রহঃ) তাঁহার সঙ্গীদেরকে বলিলেন, চল দেখি, আমরা তাঁহার নিকট নামায সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিয়া দেখি, যদি তিনি সঠিক উত্তর দেন তবে আমরাও বৈঠকে বসিয়া তাঁহার কিছু নসীহত শুনিব।

অতঃপর হযরত ইউসুফ (রহঃ) উক্ত বৈঠকের নিকটবর্তী হইয়া হযরত হাতেম (রহঃ)কে সালাম করিলেন ও বলিলেন, আল্লাহ্ আপনার উপরে রহমত নাযিল করুন। আমি আপনার নিকট একটি বিষয় আরজ করিতে চাই।

হাতেম (রহঃ) সালামের জবাব দিয়া বলিলেন, বল, কি বলিতে চাহ?

হযরত ইউসুফ (রহঃ) বলিলেন, আমি নামায সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় আপনার নিকট প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।

হাতেম (রহঃ) বলিলেন, নামাযের মারেফাত সম্বন্ধে, না কি নামাযের মধ্যকার আদব সম্বন্ধে জানিতে চাও? ইউসুফ (রহঃ) বলিলেন, আমি নামাযের আদব সম্বন্ধেই জানিতে চাই।

নামাযের আদব ঃ হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রস্তুত হইয়া তুমি উঠ ও ছওয়াব হাসিলের আশা লইয়া মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা হও। মসজিদে প্রবেশ করিয়া নিয়ত করতঃ আল্লাহ্ পাকের শান অনুরূপ তাকবীরে তাহরীমা বল। তারপর তারতীবের সাথে কোরআনের

আয়াত তিলাওয়াত কর। খুশুর সহিত রুকূ কর, নম্রতার সাথে সিজদাহ্ কর। ইখলাসের সাথে তাশাহহুদ পাঠ কর। অতঃপর রহমত পূর্ণ দিলে সালাম ফিরাও।

নামাযের মারেফাত ঃ হযরত হাতেম (রহঃ)-এর বয়ানের পর হযরত ইউসুফ (রহঃ)-এর সঙ্গীগণ বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে আমাদের নামাযের মারেফাত সম্বন্ধেও কিছু শুনা উচিত। তাহাদের ইচ্ছানুসারে এইবার হযরত ইউসুফ (রহঃ) হযরত হাতেম (রহঃ)-এর নিকট নামাযের মারেফাতের বিষয়ও কিছু বলার জন্য আরজ করিলেন।

তখন হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, নামাযের মারেফাত এই যে, যখন নামাযে দাঁড়াইবে, বেহেশত নিজের ডান দিকে, দোজখকে নিজের পিছনে, পুলছিরাত নিজের পায়ের নীচে এবং দাড়ি-পাল্লা নিজের চোখের সামনে মনে করিবে। আর মনে মনে ইয়াকীন রাখিবে যে, আল্লাহকে তুমি দেখিতেছ আর যদি তোমাদের এতটা মর্তবা হাসিল না হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই পর্যায়ে তোমরা না পৌঁছিয়া থাক) তবে অন্ততঃ এতটুকু মনে কর যে, আল্লাহ্ আমাদের দেখিতেছেন।

হযরত ইউসুফ (রহঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুযুর! আপনি কতদিন ধরিয়া এই ধরনের নামায আদায় করিতেছেন?

হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, বিশ বৎসর ধরিয়া।

তাঁহার কথা শুনিয়া হযরত ইউসুফ (আঃ) তাহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, শীঘ্র উঠ, আমাকে পঞ্চাশ বছরের নামায দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

হযরত ইউসুফ (রহঃ) হযরত হাতেম (রহঃ)কে ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুযুর! আপনি মারেফাতে নামাযের এই শিক্ষা কাহার নিকট হইতে হসিল করিলেন?

হযরত হাতেম (রহঃ) জবাবে বলিলেন, ঐ কিতাব হইতে, যে কিতাব তুমিই আমাদের শিক্ষার জন্য লিখিয়াছিলে।

আবু হাযেম (রহঃ)-এর বিবরণ ঃ আবু হাযেম (রহঃ) হইতে এই ধরনের একটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, একবার সমুদ্রের তীরে আমার একজন বোযর্গ সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হইল। সাহাবী আমাকে বলিলেন, আবু হাযেম! তুমি কি উত্তমরূপে নামায আদায় করিতে ইচ্ছা কর?

আমি বলিলাম, আমি তো নামাযের ফরজ এবং সুন্নতসমূহ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছি। তাহার পরেও আবার উত্তমরূপে নামায আদায় করার অর্থ কি হইতে পারে?

সাহাবী সে কথা শুনিয়া বলিলেন, আবু হাযেম! বল তো দেখি নামাযের আরকানসমূহ আদায়ের জন্য দাঁড়াইবার পূর্বে কয়টি ফরজ আছে?

আমি বলিলাম, ছয়টি ফরজ আছে।

তিনি বলিলেন, বল তো তাহা কি কি?

আমি বলিলাম, (১) শারীরিক পবিত্রতা (২) পোশাকের পবিত্রতা (৩) নামাযের স্থানের পবিত্রতা (৪) ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা (৫) কিবলামুখী হইয়া নামায আদায় করা (৬) নামাযের নিয়ত করা।

সাহাবী বলিলেন, কি নিয়ত করিয়া মসজিদের দিকে গমন কর?

আমি বলিলাম, আমার প্রভুর সহিত সাক্ষাত করিবার নিয়ত করিয়া।

তিনি বলিলেন, কি নিয়ত করিয়া সমজিদে প্রবেশ কর?

আমি বলিলাম, আমার প্রভুর ইবাদাত করিবার নিয়ত করিয়া ।

তিনি বলিলেন, কি নিয়ত করিয়া ইবাদাতের জন্য দাঁড়াইয়া যাও?

আমি বলিলাম, আমার প্রভুর প্রভুত্বের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের নিয়ত করিয়া।
তিনি বলিলেন, তুমি কি কি জিনিস রইয়া কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াও?
আমি বলিলাম, তিনিটি ফরজ এবং সুন্নত লইয়া।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেগুলি কি কি?
আমি বলিলাম, কিবলামুখী হইয়া দাঁড়ানো, নিয়ত করা এবং তাকবীরে তাহরীমা, এই তিনটি ফরজ এবং তাকবীরে তাহরীমা বলাকালীন দুই হাত উত্তোলন করা এই একটি সুন্নত।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু হাযেম! বলিতে পার কি কতগুলি তাকবীর ফরজ এবং কতগুলি সুন্নত?
আমি বলিলাম মোট চৌরানব্বইটি তাকবীর, তাহার মধ্যে মাত্র পাঁচটি তাকবীর ফরজ এবং বাকীগুলি সবই সুন্নত।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায কোন বস্তু দ্বারা শুরু হয়?
আমি বলিলাম, তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা শুরু করি।
তিনি বলিলেন, নামাযের বোরহান (দলীল) কি?
আমি বলিলাম, কিরাত।
তিনি বলিলেন, নামাযের জওহর কি?
আমি বলিলাম, তাসবীহসমূহ।
তিনি বলিলেন, নামাযের জীবন কি?
আমি বলিলাম, খুশু-খুজু।
তিনি বলিলেন, নামাযের মধ্যে খুশু কি জিনিস?
আমি বলিলাম, সিজদাহর দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা।
তিনি বলিলেন, নামাযের স্থৈর্য কি জিনিস?
আমি বলিলাম, ধীর স্থিরতা ও প্রশান্তি।
তিনি বলিলেন, সেই কাজটি কি যাহার ভিত্তিতে নামায ব্যতীত সব কাজ নিষিদ্ধ হইয়া যায়?
আমি বলিলাম, তাকবীরে তাহরীমা।
তিনি বলিলেন, কি কাজ দ্বারা নামাযকে সমাপ্ত করিতে হয়?
আমি বলিলাম, ডানে ও বামে সালাম ফিরানো দ্বারা।
তিনি বলিলেন, আচ্ছা! নামায সমাপ্তির প্রকাশ্য নিদর্শন কি?
আমি বলিলাম, সালাম ফিরানোর পরে বসা অবস্থায় 'সুবহানালাহ আল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' তাসবীহ পাঠ করা।
অতঃপর উক্ত সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিতে পার কি, এই সমস্তের কুঞ্জী (চাবিকাঠি) কি জিনিস?
আমি বলিলাম, নিয়ত।
তিনি বলিলেন, নিয়তের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, ইয়াকীন।
তিনি বলিলেন, ইয়াকীনের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, তাওয়াক্কুল।
তিনি বলিলেন, তাওয়াক্কুলের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, আল্লাহর ভয়।
তিনি বলিলেন, আল্লাহর ভয়ের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, আশা-আকাঙক্ষা।

তিনি বলিলাম, আশা-আকাঙক্ষার কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, রেজা (সন্তুষ্টি)।
তিনি বলিলেন, রেজার কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, এত্বাআত (ইবাদাত ও আনুগত্য)
তিনি বলিলেন, এত্বাআতের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, একরার (স্বীকৃতি)।
তিনি বলিলেন, একরারের কুঞ্জী কি?
আমি বলিলাম, আল্লাহর প্রভুত্ব ও তাউহীদের স্বীকৃতি।
তিনি বলিলেন, এই সমস্ত বিষয় তুমি কোথা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে?
আমি বলিলাম, এলেমের মাধ্যমে?
তিনি বলিলেন, এলেম কোথা হইতে শিক্ষা লাভ করিলে?
আমি বলিলাম, শিখিয়া লইয়াছি।
তিনি বলিলেন, শিখিবার উসিলা কি?
আমি বলিলাম, জ্ঞান।
তিনি বলিলেন, জ্ঞান কোথা হইতে আসিল?
আমি বলিলাম, জ্ঞান দুই রকমের। এক রকমের জ্ঞান যাহা কেবল আল্লাহতায়ালা পায়দা করেন। আর দ্বিতীয় রকমের, যাহা মানুষ স্বীয় যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করে। যখন উভয় রকম জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়, তখন উহারা একে অপরের সাহায্যকারী স্বরূপ হইয়া যায়।
তিনি বলিলেন, তুমি এই সমস্ত ব্যাপার কোথা হইতে শিখিলে?
আমি বলিলাম, আল্লাহ প্রদত্ত তৌফিক দ্বারা। আল্লাহতায়ালা আমাকে ও আপনাকে এমন তাউফিক দান করুন যাহাতে তিনি খুশী থাকেন।

উপরোক্ত সুয়াল-জওয়াবের (প্রশ্নোত্তরের) পর সাহাবী আমাকে বলিলেন, আলাহর কসম, তুমি বেহেশতের চাবি যথার্থই প্রস্তুত করিয়াছ। এখন বল দেখি, তোমার ফরজ কি এবং ফরজের ফরজইবা কি? আর সেই ফরজ কিরূপ যাহা ফরজের দিকে লইয়া যায়। আর ফরজের মধ্যে সুন্নত কি? আর সেই সুন্নত কিরূপ, যাহা দ্বারা ফরজ পরিপূর্ণ হয়।

আমি তাঁহার এই প্রশ্নের জবাবে বলিলাম, আমার ফরজ এই যে, আমি নামায আদায় করি। আর ফরজের ফরজ হইল পবিত্রতা অর্জন। দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া পানি লওয়া এমন ফরজ, যাহা অন্য ফরজ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। আর পানি দ্বারা আঙ্গুল খেলাল করিয়া ধৌত করা এমন সুন্নত, যাহা ফরজের মধ্যে শামিল। আর যে সুন্নত দ্বারা ফরজের পরিপূর্ণতা আসে, তাহা হইল খাতনাহ বা ত্বকছেদন।

আমার কথা শুনিয়া সাহাবী বলিলেন, আবু হাযেম! তুমি তোমাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াছে, তোমার জন্য আর কোন কিছুই বাকী নাই। এখন তুমি এই কথাটা বল তো, খানা খাওয়ার ভিতরে তোমার জন্য ফরজ কি কি এবং সুন্নতই বা কি কি?
আমি বলিলাম, খানা খাওয়ার ভিতরে কোন ফরজ এবং সুন্নত আছে না কি?
তিনি বলিলেন, হাঁ চারিটি ফরজ, চারিটি সুন্নত এবং চারিটি মুস্তাহাব আছে।
ফরজ চারিটি হইলঃ (১) বিসমিল্লাহ বলিয়া খানা খাওয়া শুরু করা। (২) খানা খাওয়ার বিনিময়ে আল্লাহর প্রশংসা করা (৩) আল্লাহর শোকর আদায় করা (৪) খাদ্য হালাল কি হারাম, জানিয়া লইয়া হালাল খাদ্য খাওয়া।

সুন্নত চারিটি হইল ঃ (১) বাম রানের উপর ভর দিয়া বসা (২) ছোট ছোট লোকমা তুলিয়া খাওয়া (৩) খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চিবাইয়া খাওয়া (৪) আহার শেষে আঙ্গুলিগুলি চাটিয়া খাওয়া।
মুস্তাহাব চারিটি এই ঃ (১) খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা (২) ছোট ছোট লোকমা তুলিয়া খাওয়া। (৩) নিজের সম্মুখ হইতে খাওয়া (অর্থাৎ এক বরতনে কয়েক জনে আহার করিতে বসিলে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া মুখে দিবে। একে অন্যের সম্মুখ হইতে খাদ্যদ্রব্য তুলিবে না।) (৪) সঙ্গী খাদ্যরত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

কছর নামায

বাসস্থান হইতে সফরের নিয়ত করতঃ বাহির হইয়া অন্ততঃ আটচল্লিশ মাইল দূরবর্তী কোন একটি স্থানে বা বিভিন্ন স্থানে রওয়ানা করিলেই সে মুসাফিরের জন্য চারি রাকাত ফরজ নামাযের স্থলে দুই রাকাত আদায় করিতে হয়। আর ইহাকেই কছর নামায বলে।
কছর নামায আদায়ের জন্য শর্ত হইল, গন্তব্যস্থলে পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত হওয়া। যদি পনের দিন তথায় অবস্থান করার নিয়ত করা না হয়, তবে তাহার জন্য কছর নহে বরং পুরা নামাযই পড়িতে হয়।
পনের দিন থাকিবার নিয়ত করা হয় নাই, কিন্তু সফর হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া দুই তিন মাসেও দেশে ফিরা হয় না বরং বহুদিন এমন কি মাসের পর মাসও সফরে থাকা হয়, তবু তাহাকে কছর পড়িতে হয়।
কতদিন সফরে থাকা হইবে সে বিষয় অনিশ্চিত থাকা অবস্থায় পুরা নামায আদায় করিবে না। এক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ) একবার মক্কা মোয়াযযমায় আঠার দিন এক রাত অবস্থান করিয়াছিলেন, তবু তিনি সেখানে কছর আদায় করিয়াছিলেন।
হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন বলেন, ফতেহ্ মক্কার (মক্কা বিজয়ের) সময়ে আমি হুযুরে পাক(দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। ঐ সময় তিনি চারি রাকাত বিশিষ্ট নামায সমূহের দুই রাকাত করিয়া আদায় করিতেন ও তিনি উক্ত শহরবাসীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, হে লোকগণ! তোমরা তোমাদের চারিরাকাত পুরা করিয়া লও। আমি মুসাফির, তাই দুই রাকাত পড়িয়াছি।
হুযুরে পাক (দঃ) এইভাবে জঙ্গে তবুকে বিশ দিন অবস্থান করা সত্তেও সেখানে নামায কছর করিয়াছেন। (যেহেতু এই সকল সফরে হুযুর (দঃ) কতদিন অবস্থান করিবেন তাহার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ত ছিল না। তাই তিনি কছর আদায় করিয়াছেন।)
অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) একবার আজারবাইজান শহরে গমন করতঃ একাধারে ছয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, তবু তিনি সেখানে নামায কছর করিয়াছিলেন।
কেহ যদি সফর অবস্থায় নামায আরম্ভ করিয়া নামাযের মধ্যেই তথায় একামতের নিয়ত করতঃ মুকীম হইয়া যায়, তবে সে কছর না করিয়া পুরা নামাযই আদায় করিবে।
সফর যদি কোন খেলা-ধুলা বা শুধু বিলাস-ভ্রমণ ইত্যাদি কারণে হইয়া থাকে তবে তাহাতে নামায কছর করা সিদ্ধ হইবে না বরং পুরা নামাযই পড়িতে হইবে। ইহা সব মাযহাবেরই অভিমত।
যদি শুধু ওয়াজিবাত, নফলিয়াত এবং মুবাহ অর্থাৎ সিদ্ধ কাজোপলক্ষ্যে সফর করা হয় তবে তেমন স্থলেই নামায কছর করা যাইবে। যেমন হজ্জ্ব, জিহাদ, ধর্মীয় ওয়াজ নসিহতের মাহফিল বা অন্য কোন দ্বীনি অনুষ্ঠান অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি।
নামাযে কছর করা আল্লাহর তরফ হইতে বান্দার প্রতি তাহার ক্লেশ বা অসুবিধার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মেহেরবাণী সদৃশ। তাই সেখানে আল্লাহর অবাঞ্ছিত কার্যাবলম্বন দ্বারা ক্লেশ বা অসুবিধা

স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, সেখানে আল্লাহর উক্ত খাস মেহেরবানী লাভের অধিকার ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য থাকিতে পারে না। এই অধিকার শুধু তাহাদের জন্য সংরক্ষিত যাহারা কোন ওয়াজিব নফল এবং সিদ্ধ কাজের জন্য সফরে বাহির হয়।

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, নামাযে কছর করা পুরা নামায আদায় অপেক্ষা উত্তম। অবশ্য সফরে পুরা নামায আদায় করাও সিদ্ধ।

তবে অন্যান্য মাযহাব এবং ওলামাগণের অভিমত এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুমতি ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করার মত দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন না করিয়া বরং আল্লাহর এই দানের ফায়েদাহ হাসিল করা বেশী ভাল। কেহ কেহ এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি সফর অবস্থায় পুরা নামায আদায় করায় ও রোযা রাখায় আত্মম্ভরিতা এবং আত্মার অহমিকার ভাব ফুটিয়া উঠে, পক্ষান্তরে কছর করা ও রোযা না রাখার ভিতরে যদি আল্লাহর নির্দেশ হুবহু পালন করা ও এক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দরবারে দুর্বল, বিনয়ী ও ভীত-সন্ত্রস্তরূপে তুলিয়া ধরা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় তবে সফর অবস্থায় নামাযে কছর করা ও রোযা না রাখাকে উত্তম বলাই সঙ্গত।

একবার সফর অবস্থায় হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করা হইল, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আমরা তো এখন বেশ নিরাপদ শান্তির ভিতরে আছি, সুতরাং এখন আমাদের নামাযে কছর না করাই তো ভাল।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, এই ছদকা (দান) আল্লাহ নিজের বান্দাগণকে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া এই ছদকাকে তোমরা গ্রহণ কর। হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিলেন, আল্লাহ যেমন তাঁহার নির্দেশ তা'মীল করাকে পছন্দ করেন, ঠিক তেমনই তদপ্রদত্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করাকেও পছন্দ করেন।

জানাযার নামায

নামাযে দাঁড়াইবার রীতি ঃ যে কোন মৃত মুসলমান ব্যক্তির উপরে জানাযার নামায পড়া ফরজে কিফায়া।

জানাযার নামাযের ইমামতের সর্বাধিক অধিকার মৃত ব্যক্তি যাহার জন্য অসিয়ত করিয়া যায়। তাহার পরে মুসলিম শাসক, তারপর মৃত ব্যক্তির তারতীব অনুসারে আত্মীয়গণ। যথা, প্রথম অধিকার নিকটবর্তী আত্মীয়ের, তারপর দূরবর্তী আত্মীয়ের।

মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তবে ইমাম লাশের সিনা বরাবর এবং যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে লাশের কোমর বরাবর দাঁড়াইবে। মুক্তাদিগণ যদি সকলেই একই শ্রেণীর এবং একই ধরনের হয়, তবে তাহারা সকলে ইমামের পিছনে মিলিয়া মিশিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যদি বিভিন্ন শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে উত্তম এবং নেককার লোকগণ ইমামের নিকটে দাঁড়াইবে। তারপর ইমামের পিছনে প্রথম কাতারে দাঁড়াইবে বয়স্ক পুরুষগণ। তারপর নাবালেগ পুরুষগণ, তারপর স্ত্রীলোকগণ দাঁড়াইবে।

যদি মৃত পুরুষ ও মৃত স্ত্রীলোকের লাশ জানাযা নামায আদায়ের জন্য একস্থানে রাখা হয়, তবে মৃত স্ত্রীলোকের কোমর বরাবর মৃত পুরুষের বক্ষ রাখিবে।

ইমামের করণীয় ঃ জানাযার নামায আদায় কালেও ইমাম অন্যান্য নামাযের কাতারের ন্যায় ডাহিন ও বাম দিকে দেখিয়া জানাযায় উপস্থিত লোকদের কাতার সোজা করাইয়া লইবে।

ইমাম নামায শুরু করার পূর্বে স্বীয় গুনাহ হইতে আল্লাহর দরবারে তাওবাহ ইস্তেগফার করিবে। তারপর মনে মনে কবর ও হাশরের কথা চিন্তা করিবে এবং মৃত্যুর কথা এইভাবে স্মরণ করিবে যে, সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকেও একদিন মৃত্যুর পিয়ালা পান করিতে হইবে। মৃত্যুর ছোবল হইতে বাঁচিয়া থাকার কোন পথ নাই।

অতঃপর একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে খুশু ও খুজুর সহিত নামায শুরু করিবে। এইভাবে জানাযার নামায আদায় করিলে, আল্লাহতায়ালার মহান দরবারে উহা সঙ্গে সঙ্গে মকবুল হইবে।
নামাযে সর্বমোট চারিবার তাকবীর বলিবে।

জানাযার নামায আদায়ের নিয়ম

জানাযার নামাযের নিয়ত করতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া নামায শুরু করিবে। এই নামাযে আযান একামত নাই। তাকবীরে তাহরীমা বলিবার কালে অন্যান্য নামাযের মত পুরুষ দুই হাত দুই কান পর্যন্ত ও স্ত্রীলোকগণ দুই স্কন্ধ পর্যন্ত উত্তোলন করিবে। অন্য তিন তাকবীরে হাত উত্তোলন করিবে না।
এই নামাযের মধ্যে কোন রুকূ-সিজদাহ বা তাশাহহুদ-দরূদের বৈঠক নাই। ইহা শুধু দাঁড়াইয়া আদায় করিতে হয় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিতে হয়।
নামাযের প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া যথারীতি হস্তোত্তোলন করতঃ আবার উহা নামাইয়া পুরুষগণ নাভীর উপরে ও স্ত্রীলোকগণ বুকের উপর উহা বাঁধিবে।
প্রথম তাকবীর বলার পর হাম্বলী মাযহাব মতে ছানা পাঠের পর সূরা ফতিহা পাঠ করিবে। এই প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস আছে। তিনি বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়িতে আমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় রাকাতের পরে দরূদ (তাশাহহুদের পরে যে দরূদ পড়া হয়) এবং তৃতীয় তাকবীরের পরে মাইয়্যেতের জন্য ও নিজেদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া মুনাজাত পেশ করিবে।
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি আঠারজন সাহাবায় কিরামের নিকট জানাযার নামাযের নিয়ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ও তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, জানাযার নামাযের প্রথম তাকবীর বলিবার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করিবে। তারপর তাকবীর বলিয়া দরূদ পড়িবে। তারপর তাকবীর বলিয়া দোয়া পাঠ করিবে। দোয়ার পর চতুর্থ তাকবীর বলিয়া সালাম ফিরাইবে।

জানাযার নামাযের দোয়া

মাইয়েত যদি বালেগ পুরুষ হয় তবে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দোয়া পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্বফির লি হাইয়িনা অ মাইয়্যিতিনা অ শাহিদিনা অ গ্বায়িবিনা অ ছাগীরিনা অ কাবীরিনা অ যাকারিনা অ উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসালামি অ মান তাওয়াফ্যাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্যাহু আলাল ঈমানি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
মাইয়েত যদি বালেগা স্ত্রীলোক হয় তবে তাহার জন্যও উপরোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। তবে কেবল উক্ত দোয়ার মধ্যে যে যে স্থানে 'হু' এবং 'হি' শব্দ রহিয়াছে সেগুলি বদলাইয়া হা শব্দ উচ্চারণ করিবে। (উল্লিখিত দোয়াটি হানাফী মাযহাবের লোকেরা পড়িয়া থাকে। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা এই দোয়ার সাথে আরও অনেক কালাম বাড়াইয়া পড়িয়া থাকে।)
অবশ্য হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে তৃতীয় তাকবীরের পর তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং মৃত ব্যক্তির জন্য তোমাদের পছন্দ মত যে কোন একটি দোয়া পাঠ করিতে পার। তবে এই দোয়াটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

দোয়া পাঠ করিবার পরে চতুর্থ তাকবীর বলিয়া পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাউ অফিল আখিরাতি হাসানাতাউ অ ক্বিনা আযাবান্নার।

বিভিন্ন ওলামায় কেরামও ইমামগণের মতে চতুর্থ তাকবীরের পরে কোন কিছু না পড়িয়া সামান্য একটু থামিয়া ডাহিন দিকে সালাম ফিরাইবে। অবশ্য ডাহিনে ও বামে দুই দিকেই সালাম ফিরানোও জায়েয বৈকি।

হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব মতে দুই দিকেই সালাম ফিরাইতে হয়। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে শুধু ডাহিন দিকে সালাম ফিরাইবে। তিনি বলেন যে, কয়েকজন সাহাবী যেমন হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত ওয়াছিলা (রাঃ) প্রমুখদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা সকলেই জানাযার নামাযে শুধু ডাহিন দিকেই সালাম ফিরাইতেন।

এক মারফু' হাদীস এইরূপ রহিয়াছে যে, হুযুরে পাক (দঃ) এক জানাযার নামাযে শুধু ডাহিন দিকে সালাম ফিরাইয়াছিলেন।

নাবালেগ বালক ও বালিকাদিগের জানাযার দোয়া

বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ বা মহিলা মাইয়্যেতের জানাযার দোয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকা মাইয়েতের জানাযার দোয়া তদনুরূপ নয়, উহা ভিন্নরূপ। যথা ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ 'আলহু লানা ফারাত্বাউ' অজআলহু লানা আজরাউ' অ যুখরাউ' অজ'আলহু লানা শ্যাফি আউ' অ মুশাফফাআ।

উল্লিখিত দোয়া মৃত বালকের জানাযার, কিন্তু মৃত যদি বালিকা হয় তবে উল্লিখিত দোয়ার যেখানে যেখানে "হু" শব্দ রহিয়াছে, সেই স্থানসমূহে "হা" উচ্চারণ করিতে হইবে। আর "শাফিআন" শব্দস্থলে "শাফিআতান" এবং মুশাফফাআন শব্দস্থলে মুশাফফাআতান শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে।

জানাযার নামাযের ইমামত

জানাযার নামাযের ইমামতের হক সর্বাধিক তাহার, মাইয়্যেত যাহার কথা অসিয়ত করিয়া গিয়াছে। তারপর হক মুসলিম শাসকের। তারপর হক পর্যায়ক্রমে মাইয়্যেতের আত্মীয় এগানাদের, যেমন বাপ, দাদা, পুত্র, পৌত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্যপুত্র ইত্যাদি।

নারী মাইয়েতের জানাযার ইমামতের প্রথম হক তাহার স্বামীর। তারপর পুত্রের, তারপর পিতার, তারপর ভ্রাতার। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী আত্মীয়গণ।

জানাযার ইমামতের জন্য সাহাবাদের অসিয়ত

বিভিন্ন সাহাবী তাঁহাদের মৃত্যুর পর কে কাহার জানাযার নামায পড়াইবে, তদসম্পর্কে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমার জানাযার নামায পড়াইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানাযা হযরত হাবীব (রাঃ) পড়াইবেন। অথচ তখন তাঁহার নিজের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্তমান ছিলেন।

হযরত শুরাইহ (রাঃ) অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার জানাযা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) পড়াইবেন।

হযরত মাইসারাহ (রাঃ) অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানাযা হযরত শুরাইহ (রাঃ) পড়াইবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার জানাযা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) পড়াইবেন।

হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) অসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার জানাযা সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) পড়াইবেন।

অপূর্ণাঙ্গ সন্তানের প্রতি নামাযে জানাযা

কোন সন্তানের শারীরিক গঠন ও আকৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলেও যদি উহা মানবাকৃতি বিশিষ্ট দেখা যায় তবে উহার গোসল ও জানাযা আদায় করিতে হইবে। আর যদি মানব আকৃতি প্রকাশ না পায় বরং শুধু একটি মাংসপিণ্ডের মত মনে হয়, তবে তাহার গোসল ও জানাযা কিছুই লাগিবে না। বিনা গোসল ও জানাযায়ই তাহা দাফন করিয়া দিবে।

নাবালেগ মাইয়্যেত বালক বা বালিকা যাহাই হউক না কেন তাহার গোসল পুরুষ বা স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই দেওয়া জায়েয।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম আট মাস বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রীলোকগণ গোসল করাইয়াছিলেন।

মৃত্যুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

প্রত্যেক মুমিন ও জ্ঞানীদের 'মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী' একথার উপর বিশ্বাস রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাহাদের উচিত মৃত্যুকে বার বার স্মরণ করা এবং মৃত্যুর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া রাখা ও প্রতি মুহূর্তে তাওবাহ করা, নিজের লেন-দেনের হিসাব নিকাশ করিয়া ও অন্যের হক হুকুম আদায় করিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া থাকা। তারপর আত্মীয় এগানা এবং ওয়ারিশদের জন্য অসিয়তনামা তৈরী করিয়া রাখা। এমন সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হইতে কোন রকমই অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা চাই না। যেহেতু মৃত্যুর আগমনে কোন সন্দেহ নাই। মৃত্যুর স্মরণ করা এইজন্য প্রয়োজন যে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা বেশী পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ কর। যদি তোমরা তোমাদের স্বচ্ছল এবং প্রাচুর্যের অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ কর, তবে তোমরা বিলাসিতা ও ভোগ উপভোগের মোহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। আর যদি তোমরা তোমাদের অভাব অভিযোগের সময় মৃত্যুকে স্মরণ কর, তবে ঐ দূরবস্থা তোমাদের জন্য অসহনীয় ও অস্বস্তিকর মনে না হইয়া বরং তোমাদের কাছে উহাই অধিকতর প্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা জান কি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি কে? সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই, যে সদা-সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে। আর সর্বাধিক সতর্ক ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি সে-ই, যে মৃত্যুর জন্য বেশী পরিমাণে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

সাহাবায় কিরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! মৃত্যুর জন্য বেশী প্রস্তুতির অর্থ কি?

হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, উহার অর্থ হইল, এই প্রতারণাকেন্দ্র অর্থাৎ দুনিয়া হইতে খুব দূরে অবস্থান করা এবং চিরস্থায়ী গৃহের দিকেই মন ঝুঁকাইয়া রাখা।

হযরত লোকমান হেকিম তাঁহার পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন যে, হে প্রিয়পুত্র! তুমি তাওবাহ্ করাকে আগামী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিও না। কেননা মৃত্যু অতর্কিতে আসিয়া পড়িবে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদেড়র মধ্যে যাহার নিকট ধন-সম্পদ আছে, অসিয়তনামা তৈরী না করা অবস্থায় তাহাদের দুইটি রাত কাটানোও উচিত হইবে না।

হাদীস শরীফে আরও আসিয়াছে যে, তোমরা হিসাব প্রদান করিতে যাওয়ার পূর্বেই নিজেদের হিসাব করিয়া লও। দাড়ি-পাল্লায় আমল মাপা হইবার পূর্বেই নিজেদের আমল ওজন করিয়া দেখ। আর তোমরা দুনিয়াবী জীবনে আমলসমূহ করিতে এ কথা ভুলিও না যে, কালই তোমাদের মৃত্যু হাজির হইতে পারে।

এই জন্যই জ্ঞানীদের উচিত, তাহাদের মৃত্যু আসিবার পূর্বেই সেইসব কাজ সমাধা করিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ তৈরী হইয়া থাকিবে যাহা তাহাদের উপরে অবশ্য কর্তব্য। গুনাহসমূহ হইতে তাওবাহ্ করিয়া পাক পবিত্র হইয়া থাকিবে। অন্যের যাবতীয় দেনা-পাওনা ও হক-হুকুম হইতে মুক্ত হইয়া থাকিবে। যদি এইরূপভাবে প্রস্তুত না হইয়া থাক, তবে জানিয়া লও যে, মৃত্যু তো অবশ্যই হঠাৎ আসিয়া পড়িবে, আর তখন তোমার মাথায় ঐ সময় দায় দায়িত্ব লইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইতে হইবে এবং যাহার ফলে তুমি কঠিনভাবে গ্রেফতার হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ কবরেই তোমার ভয়ংকর আযাব শুরু হইয়া যাইবে। তুমি যতই শক্তিধর, সাহসী ও বাহাদুর হও না কেন তাহা কোনই কাজে আসিবে না। তোমার যে কোন কৌশল, জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচালনা কিংবা আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি সব কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। তখন তোমার অবস্থা তো এইরূপ হইবে যে, দুনিয়াতে তোমার সঞ্চিত নাহক মাল দৌলত হয়ত বা তোমার স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুর হাতে চলিয়া যাইবে। অথবা তোমার পরম শত্রুর হাতে গিয়া পৌছিবে। তোমার সঙ্গে উহার কিছুই যাইবে না। কিছু তোমার কবরের মধ্যে রাখিয়া দিলেও উহার দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না, উহা তোমার কোন কাজে আসিবে না।

পক্ষান্তরে ঐ মাল দৌলতেরই কারণে তুমি ভয়ংকর শাস্তির শিকার হইবে এবং একাধারে ঐ শাস্তি চলিতে থাকিবে।

করজদার বা ঋণ গ্রস্তের শাস্তি

হযরত সামরাহ ইবনে জানদাব (রাঃ) বলেন, আমরা একদা হুযুরে পাক (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াইলেন। সালাম ফিরাইবার পরে তিনি এরশাদ করিলেন, অমুক বংশের কোন লোক এখানে উপস্থিত আছে কি?

এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! আমি সেই বংশের লোক। রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, (তোমার বংশের) অমুক (মৃত) ব্যক্তি করজের দায়ে গ্রেফতার হইয়াছে।

বর্ণনাকারী হযরত সামরাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিলাম, অতঃপর সেই মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনগণ তাহার উক্ত করজ শোধ করিয়া দিতে শুরু করিল। শেষ পর্যন্ত উক্ত মৃতের আর কোন পাওনাদার থাকিল না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন যে, অমুক ব্যক্তি অন্যের কাছে ঋণী থাকিবার কারণে বেহেশতের বহির্দ্বারে আবদ্ধ রহিয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবীদের মধ্যে জনৈক আহলে ছুফফাহ্ ইন্তেকাল করিলেন। লোকগণ হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)! ঐ ব্যক্তি মৃত্যুকালে একটি দীনার এবং একটি দেরহাম রাখিয়া গিয়াছে। একথা শুনিয়া হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, ইহা তো তাহার জন্য আগুনের দুইটি দাগ সদৃশ। তোমরা তোমাদের এই সঙ্গীর জানাযা

পড়িয়া দাও। আমি তাহাতে শরীক হইব না। কেননা মৃত্যুর পূর্বে তাহার উপরকার দায়িত্বের বোঝা হইতে সে মুক্ত হইয়া যায় নাই।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযুরে পাক (দঃ)-এর দরবারে এক আনছার সাহাবীর জানাযা উপস্থিত করা হইল। হুযুরে পাক (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উপর কি করজের বোঝা আছে? বলা হইল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আছে। একথা শুনামাত্র হুযুরে পাক (দঃ) সেইখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি তাহার করজ আদায় করার জামিন হইয়াছি। হযরত আলীর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া হুযুর (দঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির জানাযা পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আলী! আল্লাহ তোমাকে এমনভাবে তোমার ঘাড়ের বোঝামুক্ত করিবেন, যেমনভাবে তুমি তোমার এক মুসলমান ভাইকে ঘাড়ের বোঝামুক্ত করিলে। জানিও, যে ব্যক্তি কাহাকেও করজ মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবেন।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহতায়ালা পাওনাদারের হক দেনাদার হইতে অবশ্যই আদায় করিয়া দিবেন। এমন কি দুনিয়াতে শৃংগহীন একটি বকরীকে শৃংগবিশিষ্ট বকরী তাহার শৃংগ দ্বারা আঘাত করিলে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থাও সেদিন করা হইবে। হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা অপরকে জুলুম করা হইতে বিরত থাক। রোজ কিয়ামতে জালিম ব্যক্তি চারিদিক শুধু অন্ধকার দেখিবে। অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা আল্লাহতায়ালা নির্লজ্জতাকে পছন্দ করেন না। কৃপণতা পরিহার কর। কেননা কৃপণেরা তোমাদের পূর্ব যমানার লোকদিগকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। কৃপণতা কৃপণদিগকে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করিতে শিখাইয়া দেয় এবং কৃপণ ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়ের হক বিনষ্ট করে।

বিমার পুরসী বা রোগীর সেবা

মুমিন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে তাহার সেবা-যত্ন করা মুস্তাহাব।

এক মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের বিমার পুরসী বা সেবা-যত্ন করিতে যায় তখন তাহাকে দেখিয়া রোগ ভাল হইবার আশা করা গেলে তাহার জন্য দোয়া করিয়া প্রত্যাবর্তন করা খুবই পুণ্যের কাজ। আর যদি রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে মনে হয়, তবে রোগীকে তাওবাহ্ করার প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়। রোগীর যাবতীয় মালের এক তৃতীয়াংশ গরীব আত্মীয় স্বজনকে অসিয়ত করিবার পরামর্শ দান করে, তবে জানিবে, এই সমস্ত কাজ অপেক্ষা উত্তম কাজ আর নাই।

মুমূর্ষু অবস্থায় তালকীন তথা আল্লাহর নাম স্মরণ করানো

রোগী ব্যক্তি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয় অর্থাৎ তাহার মৃত্যু একেবারে আসন্ন হইয়া পড়ে, তখন পরিবার-পরিজন উক্ত রোগীর একান্ত আপন এবং সর্বাধিক খোদাভীরু কোন লোককে রোগীর নিকট এইজন্য বসাইয়া দিবে যে, সে রোগীকে আল্লাহর নাম স্মরণ করাইতে থাকিবে। কালেমাসমূহ পাঠ করাইবে এবং একটু একটু করিয়া তাহার মুখে শীতল শরবত দিয়া জিহ্বা ও কণ্ঠসিক্ত রাখিবে। আর ভিজা তুলা দ্বারা রোগীর দুই ঠোট বারে বারে মুছিয়া দিবে।

এইভাবে তালকীন অর্থাৎ রোগীর মুখ দিয়া উত্তম কালামসমূহ বলাইবার পর যদি রোগীর মুখ হইতে কোনরূপ অবাঞ্ছিত বা পার্থিব কালামাদি বাহির হয়, তবে আবার তালকীন করাইবে। যাহাতে রোগীর জীবনের শেষ কালামটি কালেমায় তাউহীদ বা শাহাদাত হয়। তালকীনদাতা খুব ধীরস্থির ভাবে কালেমায় তাউহীদ এবং কালেমায় শাহাদাত পাঠ করিবে এবং রোগীকেও সাথে সাথে উহা পাঠ করিতে বলিবে।

রোগী যদি সাথে সাথে পাঠ করে তবে তো খুবই ভাল কথা, আর যদি পাঠ না করে তবে জোর জবরদস্তি পাঠ করাইবার জন্য চেষ্টা করিবে না। কেননা তাহাতে খোদা না করুন তাহার মুখ হইতে বিপরীত বা উলটা-পালটা কোন কথা বাহির হইয়া হিতে বিপরীত হইতে পারে। রোগী কোন কথা না বলা অবস্থায় তালকীনকারীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা এই যে, সে নিজে নিজেই কালেমাসমূহ পাঠ করিবে। রোগী তাহা নীরবে শুনিয়া থাকার ভিতরেও ফায়েদা নিহিত আছে। এই সময়টি এমনই এক সঙ্কটময় মুহূর্ত যে, এ সময়ে রোগীর সঙ্গে অত্যধিক নরম এবং শান্ত ব্যবহার করা চাই।

এ সময় রোগীর পার্শ্বে বা শিয়র দেশে বসিয়া আস্তে আস্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা ভাল। ইহার ফলে খুবই আছানীর সাথে রূহ বাহির হইয়া থাকে।

রূহ বাহির হইয়া যাওয়ার পর মৃতকে উত্তর শিয়রী করতঃ চিতভাবে শোয়াইয়া দিবে এবং মুখ কিবলার দিকে ফিরাইয়া রাখিবে। চক্ষুদ্বয় খোলা থাকিলে তাহা বুজাইয়া দিবে। হাত পা বাঁকা অবস্থায় থাকিলে সোজা করিয়া দিবে। ঘাড় বাঁকা হাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে মাথার নীচে বালিশ না দিয়া বালিশ সরাইয়া দিবে। তাহা ছাড়া তাহার শরীরের বিভিন্ন কাপড়-চোপড় সরাইয়া নিয়া একখানা বৃহৎ চাদর দ্বারা সর্বশরীর ঢাকিয়া দিবে।

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বলেন, হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকিলে তাহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দাও। কেননা ঐ চোখের নজর তাহার উড়ন্ত রূহের পিছনে ধাবিত হয়, যাহাতে চোখ বে-নূর অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া যায়।

মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে সদোক্তি করা ঃ মানুষ মরিয়া গেলে তাহার সম্পর্কে উত্তম উক্তি করা চাই। যেমন লোকটি খুবই ভাল ছিল, নেককার ছিল। তাহার চরিত্র ও আচরণ অত্যন্ত সৎ এবং প্রশংসনীয় ছিল ইত্যাদি।

মৃতের গোসল

যে কোন অবস্থায় মৃতের গোসল এবং কাফন-দাফন যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিবে।

কোন চওড়া কাঠ কিংবা খাটের উপর মৃতকে উত্তর শিয়রী করিয়া শয়ন করাইবে। অতঃপর উপরে পর্দা করিয়া লইয়া সর্ব প্রথম মৃতের নাভীর উপর হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বাকী সব বস্ত্র তাহার দেহ হইতে খুলিয়া লইবে। মৃতের লজ্জাস্থান ধৌত করাইবার কালে যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিবে। গোসলদাতা হাতে মোটা কাপড় পেচাইয়া লইবে যেন মৃতের গুপ্ত অঙ্গের সাথে তাহার হাতের সংস্পর্শ না হয়। আর এই সময় গোসলদাতা তাহার চক্ষু বন্ধ করিয়া লইতে পারিলে বেশী ভাল হয়।

মৃতের দেহের জোড়ায় জোড়ায় হাডডি যদি শক্ত হইয়া বাকা-তেড়া হইয়া যায় তবে পানি দিয়া রগড়াইয়া কিছুটা নরম করা সম্ভব হইলে করিবে, কিন্তু বেশী চাপ দিয়া বা জোর খাটাইয়া সোজা করিতে যাইবে না। কেননা তাহাতে হাডডি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, মৃতের হাডডি ভঙ্গ করা জীবিত ব্যক্তির হাডডি ভঙ্গ করার মত।

গোসল শুরু করিবার পূর্বে মৃতকে ধরিয়া তাহার দেহের ঊর্দ্ধাংশ কিছুটা উঁচু করিয়া বসাইবার ভাবে রাখিয়া আস্তে আস্তে পেটের উপরে বিশেষতঃ নাভিস্থলে আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকিবে। তাহাতে যদি পেট হইতে কিছুটা ময়লা নির্গত হয়, তবে তাহা প্রথমেই ধুইয়া ফেলিবে। মৃতের মলদ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে এবং একখানা ভিন্ন কাপড় আনিয়া দেহ আবৃত করিয়া পূর্বের কাপড়খানা সরাইয়া নিয়া তাহা ভালরূপে ধৌত করিবে। তারপর গোসল দাতা নিজের উভয় হাত উত্তমরূপে ধুইয়া পাক করিয়া লইবে।

অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে নামাযের অজুর অনুরূপ বা-তারতীব অজু করাইবে। গোসলদাতা নিজেই অজুর নিয়ত করতঃ বিসমিল্লাহ বলিয়া নিজের দুইটি আঙ্গুল পানিতে ভিজাইয়া মৃতের দাঁত মাজিয়া

দিবে। একইভাবে আঙ্গুল ভিজাইয়া লইয়া নাসিকা ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া নাসিকার অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করিবে। অতঃপর মুখমণ্ডল পানি দ্বারা ধৌত করিবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যেন পানি মুখ ও নাকের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। মৃতের দ্বারা কুলি করানো সম্ভব নয়। অতএব গোসলদাতা নেকড়া ভিজাইয়া আঙ্গুলে পেচাইয়া উহা মৃতের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার মুখ পরিষ্কার করিয়া আনিবে। তারপর তারতীব মত অজুর বাকী অঙ্গসমূহ ধৌত এবং মোসেহর দ্বারা অজু শেষ করিবে।

অজু সমাপ্ত করিয়া বরই পাতা ভিজানো জোশ দেওয়া পানি ঠাণ্ডা করতঃ সেই পানি দ্বারা এবার মস্তক এবং দাড়ি ধৌত করিবে। তবে মাথার চুলে চিরুনী চালাইবে না। তারপর মাথা হইতে পা পর্যন্ত পানি ঢালিয়া দিবে। তারপর মৃতকে কাত করাইয়া প্রথমে ডান পার্শ্ব, তারপর বাম পার্শ্ব পানি ঢালিয়া ধুইয়া ফেলিবে। এইভাবে মৃতের দেহের দুই পার্শ্ব ধুইবার পর পুনরায় সর্বশরীরে পানি ঢালিয়া তাহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া একবার আবার খালেছ পানি দ্বারা তাহার সর্ব শরীর ধৌত করাইয়া দেওয়া উত্তম।

মৃতের গোসল কালে নাসিকা ছিদ্রের মত তাহার কানের মধ্যেও ভিজা নেকড়া আঙ্গুলে পেচাইয়া উহা দ্বারা কানের ভিতরে পরিষ্কার করিয়া আনিবে। আঙ্গুলের নখের ভিতরে ময়লা থাকিলে শলাকা দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিবে।

গোসল শেষ হইবার পর আবার একবার মৃতের পেট আস্তে আস্তে চাপিয়া দেখিবে যদি ময়লা নির্গত হয় তবে তাহা ধুইয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া অজু ও গোসল করাইবে। কর্পুর মিশ্রিত পানির দ্বারা মৃতকে গোসল করানো ভাল।

মৃতের দেহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন একবার, তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার পর্যন্ত গোসল করানো যাইবে। অবশ্য যতবারই করানো হউক না কোন জোড় সংখ্যক বার না করাইয়া বেজোড় সংখ্যক বার করাইবে এবং উর্দ্ধে সাত বারের বেশী করাইবে না।

যদি কোন মৃতের মলদ্বার হইতে অনবরতই ময়লা বাহির হইতে থাকে উহা কিছুতেই বন্ধ না হয় তবে তুলা, নেকড়া কিংবা মৃত্তিকা দিয়া মলদ্বার বন্ধ করিয়া দিবে যেন আর ময়লা বাহির হইতে না পারে। অবশ্য কোন কোন আলেম বলেন যে, এভাবে ময়লা নির্গত হওয়া বন্ধ না করিয়া বরং কাফন পরাইবার আগে একবার গুহ্যদ্বার ধৌত করাইয়া দিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর নিকট ঐভাবে ময়লা নির্গত হওয়াকে বন্ধ করা মাকরূহ।

গোসল কার্য সমাপ্ত করিয়া মৃতের সারা দেহ তোয়ালে বা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে।

গোসলের পরে মৃতকে কাফন পরাইবার জন্য কাফন বিছানো কাঠ বা খাটের উপর নিয়া শয়ন করাইবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে তিন খানা এবং স্ত্রীলোক হইলে পাঁচখানা কাফন পরাইবে। কাফনের কাপড় সাদা হইতে হইবে যেন রঙ্গিন না হয়।

পুরুষের তিনখানা কাফন হইল ঃ চাদর, তহবন্দ এবং কামীছ অর্থাৎ জামা। কাপড়ের প্রস্থ যদি কম হয় তবে দুইখানা কাপড় সেলাই করিয়া জোড়া দিয়া লইবে। কাফন পরাইবার আগে উহা ধূপ-চন্দন অথবা আগর বাতির ধূয়া ইত্যাদির দ্বারা সুঘ্রাণযুক্ত করিয়া লইবে।

কোন কোন আলেম বলেন যে, পুরুষের জন্য তিনখানা কাফন দেওয়া উত্তম। কিন্তু দুইখানা কাফনও পরানো যাইতে পারে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, হুযুরে পাক (দঃ)কে তিনখানা সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল।

কাফনে সুঘ্রাণ লাগানো ছাড়া মৃতের সিজদাহর স্থান অর্থাৎ ললাট, নাসিকা, হাত, জানু ও পায়ে কর্পুর লাগাইয়া দিবে। চোখের বহির্ভাগেও কর্পূর লাগাইবে, তবে ভিতরে লাগাইবে না। সর্ব শরীরে কর্পুর এবং সুঘ্রাণ লাগাইয়া দেওয়া উত্তম। তবে তাহা না পারিলে উল্লিখিত স্থানসমূহে লাগালেই চলিবে।

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতের বোগল, রান এবং কনুইর উপরেও মেশক লাগাইয়া দিতেন।

মৃতকে বিছানো কাফনের উপর শয়ন করাইয়া প্রথম বাম দিকের কাফন লেপটাইয়া ডাহিন দিক ঢাকিয়া দিবে। তারপর ডাহিন দিকের কাফন লেপটাইয়া বাম দিক ঢাকিয়া দিবে। এইভাবে প্রত্যেকখানা কাফনই প্রথমে ডান দিক, তারপর বামদিক লেপটাইয়া দিবে।

কাফনের মাথার দিক এবং পায়ের দিক মোড়াইয়া রাখিবে এবং উহা যাহাতে খুলিয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। কিন্তু লাশ কবরে রাখিয়া উক্ত সূতার বাঁধন আবার খুলিয়া দিবে।

স্ত্রীলোকদের কাফন দিতে হয় মোট পাঁচখানা। তন্মধ্যে পুরুষের যে তিনখানা দিতে হয়, তাহা বাদে আর দুইখানা। একখানা ছিনাবন্দ, আর একখানা ওড়না। এই পাঁচখানার স্থলে চারিখানা দেওয়াও জায়েয বটে, যেমন, পুরুষের তিনখানার স্থলে দুইখানা দেওয়া জায়েয হয়। আর যদি এমন মজবুরী অবস্থা হয় যে, কাপড় সংগ্রহ করা যায় না, তবে এমতাবস্থায় মাত্র একখানা কাফনের কাপড় লেপটাইয়াও মৃতকে দাফন করা যায়।

পুরুষ মাইয়্যেতকে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক মাইয়্যেতকে স্ত্রীলোক গোসল করাইবে। ইহার ব্যতিক্রম করা জায়েয নয়। অবশ্য মজবুরী অবস্থায় অর্থাৎ লোকাভাবে স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর গোসল নিজে করাইতে পারে। কিন্তু পুরুষ কোন অবস্থায়ই তাহার স্ত্রীর গোসল করাইতে পারিবে না। কেননা ইহা শরীয়ত জায়েয রাখে নাই।

কোন কোন আলেমের মতে অবশ্য পুরুষের জন্যও নিজ স্ত্রীকে গোসল করানো জায়েয আছে। তাহাদের দলীল এই যে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার স্ত্রী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা জোহ্রার (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁহাকে তিনি নিজের হাতেই গোসল করাইয়াছিলেন।

মৃতের পরিত্যক্ত মাল দ্বারা তাহার করজ এবং অসিয়ত আদায়ের পূর্বে তাহার কাফনের ব্যবস্থা করা শরীয়তের বিধান। সুতরাং কাফনের খরচের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই যতটা সম্ভব করজ পরিশোধ এবং অসিয়ত আদায় করিবে।

কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

কবরের দৈর্ঘ্য লাশ অপেক্ষা এতটুকু বেশী হওয়া চাই, যাহাতে লাশ শয়ন করাইতে কোন অসুবিধা না হয় এবং প্রস্থ দেড় হাত হইতে পৌণে দুই হাত করিতে হয়। আর উহার গভীরতা লাশ যতটুকু লম্বা হয় তাহার অর্দ্ধেক অথবা কোমর পর্যন্ত গভীর করিতে হয়।

(একটি কথা প্রচলিত আছে এবং উহার বাস্তবতাও রহিয়াছে। যেমন সকলেই বলিয়া থাকে যে, দুনিয়াতে এত জায়গা যমিন দিয়া কি হইবে? এমন এক সময় তো প্রত্যেকের জন্যই আসিতেছে, যখন একেকজনের মাত্র সাড়ে তিনহাত দৈর্ঘ এবং দেড় হাত প্রস্থ জায়গার অতিরিক্ত প্রয়োজন হইবে না এই মর্মে) হুযুরে পাক (দঃ)-এর এক হাদীস রহিয়াছে। যথাঃ

হুযুরে পাক (দঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, হে ওমর! তোমাদের সেই সময় কি অবস্থা হইবে, যখন তোমাদের জন্য মাত্র সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ এবং দেড় হাত চওড়া স্থান প্রস্তুত করা হইবে? তারপর তোমারই পরিজনগণ তোমাকে গোসল করাইবে, কাফন পরাইবে, তোমার দেহে ও কাফনে সুঘ্রাণ মাখিবে। তারপর তোমাকে উঠাইয়া নিয়া উক্ত সাড়ে তিন হাত এবং দেড় হাত জায়গায় যমিনের নীচে রাখিয়া দিয়া মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া দিবে এবং এইভাবে তোমাকে একাকী রাখিয়া দিয়া যার যার গৃহে চলিয়া আসিবে।

অত্র হাদীসের মর্মে কবরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা সকল মানুষই যার যার হাতের সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য এবং সেই দৃষ্টিতেই সাড়ে তিন হাত কবরের কথা

বলা হইয়াছে। ইহা ছিল হুযুর পাকের (দঃ) দৃষ্টান্তমূলক একটি কথা। মূলতঃ কবর যদি সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য করা হয়, তবে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ লাশ তাহার ভিতরে রাখা সম্ভব নহে বরং স্বচ্ছন্দে লাশ কবরে রাখিতে হইলে সাড়ে তিন হাত অপেক্ষা কিছু দৈর্ঘ অবশ্যই করিতে হইবে।

লাশ কবরে রাখা

কবরস্থানে লাশের খাট আনিয়া কবরের পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর শিয়রী করিয়া রাখিবে। তারপর ঐস্থান হইতে লাশ ধরিয়া কবরে নামাইবে।

লাশ কবরে নামাইবার নিয়ম হইল, মৃতের দুইজন ঘনিষ্ট আপন লোক প্রথমে কবরে নামিয়া দাঁড়াইবে, তারপর কয়েকজন ঘনিষ্ট ব্যক্তি লাশ হাতে ধরিয়া উহা কবরে দাঁড়ানো ব্যক্তিদ্বয়ের হাতে উঠাইয়া দিবে। তাহারা অত্যন্ত আস্তে এবং ধীরস্থির ভাবে অতি সন্তর্পণে মৃত লাশ কবরের মধ্যে যমিনের উপর রাখিয়া মাইয়্যেতের মুখ কিবলা-রোখ করিয়া দিবে।

মৃতের দাফন কার্য সাধারণতঃ পুরুষগণই করিবে। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, মৃত স্ত্রীলোকের দাফন কার্য স্ত্রীলোকেরাই করিবে। কিন্তু লোকাভাবে মৃত স্ত্রীলোকের লাশ পুরুষও দাফন করিতে পারে।

কবর খনন করা যে মাটি কবরের উপর স্তূপিকৃত থাকিবে ঐ মাটির দ্বারাই কবর ঢাকিবে। বাহির হইতে মাটি আনা মাকরূহ। তবে ওজরে (প্রয়োজনে) বাহিরের মাটি দিয়াও কবর ঢাকা যাইতে পারে। প্রথমত সব মাটি দিয়া তারপর উহাতে পানি ছিটাইয়া ঐ মাটি লেপিয়া আটকাইয়া দিবে।

কবর এক বিঘত উঁচু করা মুস্তাহাব। মধ্যভাগ কিছু উঁচু এবং মাথা ও পায়ের দিক কিছুটা ঢালু করিয়া দিবে। উহা ঠিক যেন একটি মাছের পিঠের মত দেখা যায়। কবরের উপরে কোন বস্তু দিয়া লেপিয়া উহার রং সাদা করা মাকরূহ! কবরের আকৃতি চৌকা ও চেপটা করা সুন্নতের খেলাফ।

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) বলেন যে, আমি হুযুরে পাক (দঃ)-এর কবর এবং তাঁহাই দুই বন্ধু হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবর দেখিয়াছি, তাহা মাছের পিঠের মতই আকৃতিবিশিষ্ট।

কবরে লাশ রাখিবার কালে পড়িবে

মৃতকে কবরে যমিনের উপর শোয়াইয়া রাখিবার কালে এই কালাম পাঠ করিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি অ 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি।

উত্তর শিয়রী করিয়া কবরের লাশ শোয়াইয়া দিয়া তাহার মুখ কিবলারোখ করিয়া দিবে এবং মৃতের কাফনের দুইদিক কিছু দিয়া বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া দিয়া কবরে দাঁড়ানো লোক দুইটি উপরে উঠিয়া আসিবে।

তারপর কোন কাঠের কিংবা বাঁশের বাতা চওড়াভাবে দিয়া লম্বভাবে ঘন করিয়া কিছু বাঁশ অথবা কাঠ বিছাইয়া দিয়া উহার উপরে নরম চাটাই, হোগলা কিংবা কলাপাতা দিয়া তাহার উপরে মাটি দিবে। সব মাটি এক সঙ্গে না দিয়া কিছু কিছু করিয়া মাটি দিতে থাকিবে এবং উহা আটকাইতে থাকিবে।

লাশ দাফনকারিগণ প্রত্যেকেই প্রথমে এক এক করিয়া তিন মুষ্টি মাটি হাতে লইবে এবং নিম্নোক্ত কালামত্রয়ের এক একটি কালাম পড়িবে ও এক এক মুষ্টি মাটি কবরের উপর দিবে। যেমন প্রথমতঃ পাঠ করিবে ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ *

মিনহা খালক্বনা-কুম'—এ মাটি হইতেই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি।

এখন প্রথম মুষ্টি মাটি দিবে। তারপর পাঠ করিবে ঃ

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

'অ 'ফীহা নুঈদুকুম'—এই মাটিতেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করাইব।
এখন দ্বিতীয় মুষ্টি মাটি দিবে। তারপর পাঠ করিবে ঃ

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى *

'অ মিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান উখরা'—পরিশেষে এই মাটি হইতেই (কেয়ামত দিবস) তোমাদের বাহির করিব।
এখন তৃতীয় মুষ্টি মাটি দিবে।

মাইয়্যেতের তালকীন

হাম্বলী মাযহাব মতে মাইয়্যেতের তালকীন করা সুন্নত। নিম্নোক্ত হাদীসকে তাহাদের দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। যথা ঃ
হযরত আবু ইমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন ইন্তেকাল করে ও তাহাতে দাফন করা হয়, তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তাহার কবরের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিবে যে, হে অমুকের পুত্র অমুক! সে যদিও এ ডাকের সাড়া দিতে পারিবে না, কিন্তু এই ডাক সে অবশ্যই শুনিবে। কাজেই দ্বিতীয়বার আবার তাহাকে আওয়াজ দিয়া বলিবে, হে অমুকের পুত্র অমুক! এই আওয়াজ শুনিয়া এইবার সে উঠিয়া বসিবে।
অতএব তৃতীয় বার আবার তাহাকে সম্বোধন করিয়া আওয়াজ দিবে! তোমরা যদিও তাহার কথা শুনিতে পাইবে না, কিন্তু তৃতীয় বার আওয়াজ দিবার পর সে আওয়াজ প্রদানকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমার উপরে রহমত নাযিল করিবেন, তুমি আমাকে সোজা ও সরল পথ বাতাইয়া দাও।
অতএব তোমাদের আওয়াজ দানকারী ব্যক্তি এ সময় কবরবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, হে কবরবাসী! তুমি যে কালেমার উপরে দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছ, সেই কলেমাকে স্মরণ কর। তুমি দুনিয়াতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। তাহা ছাড়া তুমি তো দুনিয়াতে আল্লাহর প্রভুত্ব, দ্বীন ইসলাম, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং পবিত্র কোরআন ইত্যাদির উপরে পূর্ণ ঈমানদার ও দৃঢ় বিশ্বাসী এবং উহার উপর খুশী ও রাজী ছিলে।
এই সময় ফিরেশতা মুনকার ও নাকীর নিকটে বসিয়া ইহা শ্রবণ করিয়া পরস্পরে বলিবে যে, ইহাকে যে, আমাদের প্রশ্ন সমূহেরই খাঁটি ও পাকা-পোক্ত উত্তর শিখাইয়া দেওয়া হইল। এখন আর ইহার নিকট প্রশ্ন করিয়া কি লাভ হইবে? এই কথা বরিয়া তাহারা উভয় কবরবাসীকে সালাম করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় হইবেন।
জনৈক সাহাবী হুযুরে পাক (দঃ)-এর এই উক্তি শুনিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুলাল্লাহ (দঃ)! যদি মৃত ব্যক্তির মাতার নাম কাহারও জানা না থাকে, তবে তাহাকে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান বলিয়া সম্বোধন করা যাইবে?
হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, এমতাবস্থায় তাহাকে আদি মাতা বিবি হাওয়ার সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিবে। হুযুর (দঃ) আরও বলিলেন, মাইয়্যেতে তালকীনকারী ইচ্ছা করিলে আরও কিছু কথা অতিরিক্ত বলিতে পারে। যেমন—হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি দুনিয়াতে মুসলমানকে স্বীয় ভাই এবং খানায়ে কা'বাকে তোমার কিবলা বলিয়া স্বীকার করিয়া কর্তব্য পালন করিয়াছিলে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ বিষয়
ইরাদাত, মুরাদ ও মুরীদ

যে সমস্ত কাজ করার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা বর্জন বা পরিত্যাগ করাকে ইরাদাত বলে। বিশেষ অর্থে অন্তরকে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্য যে সকল কাজ ও অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল তাহা সব কিছু পরিত্যাগ করার নাম ইরাদাত। সুতরাং বলা যায়, পার্থিব মোহ ও লোভ লালসার বশে মানুষ যে সকল কাজ কর্ম ও উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত রহিয়াছে, যে সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-উপভোগ ও আরাম-আয়েসে বিভোর রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিলেই তাহার ইরাদাত নিখুঁৎ এবং বিশুদ্ধ হয়। যাহারা আল্লাহর পথের প্রকৃত পথিক তাহাদের জন্য উক্ত পথের প্রথম মঞ্জিলই হইল ইরাদাত।

যাহারা ইরাদাত অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, উঠা-বসা ও আনা-গোনা, নিকটে স্থানদান করা দ্বীনী-শরীয়তের বিধান। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে স্বীয় প্রিয় নবী (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ *

উচ্চারণ ঃ অলা-তাত্বরুদিল্লাযীনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম বিল-গ্বাদা-অতি অল আশিয়্যে ইউরীদূনা অজ্‌হাহূ।

অর্থাৎ—আল্লাহ্ বলেন ঃ যাহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের প্রভুকে ডাকে (বা স্মরণ করে) ও তাহাকে পাওয়ার আশা রাখে তুমি তাহাদিগকে ধমকি ঝিরকি দিও না (অর্থাৎ তাড়াইয়া দিও না।)

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মানে হইতেছে যে, যাহারা আল্লাহকে পাওয়ার আশায় ভোরেও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাহাদের উপরে রাজী; সুতরাং তাহাদের উপরে সকলেরই রাজী থাকা ও তাহারাই নেককারদের সাহচর্যের উপযোগী বলিয়া মনে করা সকলেরই কর্তব্য।

যাহারা আল্লাহকে পাওয়ার ও খুশী রাখার ইরাদায় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহারা প্রকৃত ইরাদাহকারী মুরীদই হইল। আর এই শ্রেণীর মুরীদদের মধ্যে এই সিফাতগুলি অবশ্যই থাকিবে, যথা ঃ (১) তাহারা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ এবং আল্লাহর ইবাদাতের দিকে রুজু থাকিবে। (২) আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তুতে তাহারা খুশী থাকিবে না। (৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তুকে স্বীকার করিয়া লওয়াকে তাহারা ঘৃণার্হ মনে করিবে। (৪) তাহারা আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল (দঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণ আমল করিবে। (৫) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন দিকের কথার প্রতি তাহারা পূর্ণ বধির তুল্য হইবে। (৬) তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত খাস নূরের আলোকে সব কিছু দেখিবে এবং সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ও কাজে কর্মে একমাত্র আল্লাহর নিদর্শনই দেখিবে। (৭) আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন দিকের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধতুল্য হইবে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন যে, হে মাবুদ! যে তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সেই বন্ধুত্বই যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু দেখা ও শুনা হইতে তাহাকে অন্ধ এবং বধির করিয়া দেয়। কেননা সে তোমার ভূবন ভুলানো সৌন্দর্যের মধ্যেই মুগ্ধ ও মোহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার সৌন্দর্য এমনই অপূর্ব যে, তাহার মোকাবেলায় পার্থিব যে কোন সৌন্দর্য ম্লান ও বিবর্ণ প্রতিভাত হয়।

হে মাবুদ! যে তোমার স্মরণকারী, সে অন্য কোন কিছুর প্রতিই আসক্তি অনুভব করে না। অতএব তোমার প্রকৃত বন্ধু তোমাকে ছাড়া আর যে কোন কিছুর সাথেই বন্ধুত্ব রাখে না, অন্য যে কোন কিছুর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। এই অবস্থায় তাহার ইরাদাহ সম্পূর্ণ খালেছ হয়। যতক্ষণ

পর্যন্ত ইরাদাহর ভিতরে খুলুছিয়ত থাকে না ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় ও তাঁহার সহিত সত্যিকার দোস্তী, মহব্বত এবং ভালবাসাও সৃষ্টি হয় না।

যখন বান্দার মনে ভয়ের উদয় হয় তখন তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুকে জ্বালাইয়া দেয়। আল্লাহ্ বলেন, যখন কোন বাদশাহ্ জনবসতিতে আগমন করে, তখন সে জনবসতিকে তছনছ করিয়া দেয়, মানী-সম্মানী ব্যক্তিগণকে অপমানিত করে। বান্দার অন্তরেও এই অবস্থা ঘটে। অর্থাৎ যখন তাহার অন্তরে আল্লাহর ধ্যান অন্তরে আসন গাড়িয়া বসে তখন তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, সকলই নির্মূল হইয়া যায়।

আরও বলা হইয়াছে যে, মহব্বতে ইলাহী এমনই একটি বেদনা বিধূর আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা যে, তাহার প্রভাবে তাহার হৃদয়ের অন্য সকল দুঃখ ও বেদনা হালকা ও সহজ হইয়া যায়।

এই শ্রেণীর লোকগণ নিদ্রা যায়, নিদ্রায় চোখ একেবারে ছাপাইয়া আসিলে, পানাহার করে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলে, কথা বলে কথা বলা ব্যতিরেকে অনন্যোপায় হইয়া পড়িলে। কেননা তাহারা সর্বদা লিপ্ত থাকে নফসকে তিরস্কার এবং নসিহত করিতে চেষ্টায় রত থাকে উহাকে আল্লাহর পথে ধাবিত করিতে, সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিতে, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি সাধন করিতে।

ইহারা নিজেরা নির্জনে থাকিয়া আল্লাহর প্রেমসুধা পান করে। নিজেদেরকে পাপ ও অন্যায় কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। প্রভুর আনুগত্য ও ইবাদাতে সর্বদা রত থাকে। কোন অবৈধ কাজ করিতে যাইতে আল্লাহর দৃষ্টিকে লজ্জা করে। তাহাদের যাবতীয় শ্রম ও সাধনাই আল্লাহর মহব্বতের লক্ষ্যে সাধিত হয়। যাহার ফলে তাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারে। সৃষ্টির তারীফ ও প্রশংসাকে তাহারা পছন্দ করে না ও তাহার প্রত্যাশাও করে না। তাহারা কেবল আল্লাহ্ পাকের নফল ইবাদাতেই মগ্ন থাকে। যাহাতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উসিলা হইয়া যায়। আর এইভাবেই তাহারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য হাসিল করে এবং প্রকৃত সালেকীন বা আল্লাহর পথের পথিকদের দপ্তরে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই হইল মুরীদদের মুরাদ বা লক্ষ্যস্থল।

এই অবস্থায় তাহাদের জন্য আল্লাহর পথের যাবতীয় অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ সরাইয়া দেওয়া হয়। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের বারি দিয়া তাহাদেরকে অবগাহন করাইয়া পবিত্র ও মর্যাদাশীল করা হয়। এ সময় তাহাদের আল্লাহর প্রতিবেশী স্বরূপ করা হয় এবং তাহাদেরকে নানারূপ খেলওয়াত ও উপঢৌকন দ্বারা মহা সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ইহাই হইল আল্লাহর মা'রেফাত। এসময় আল্লাহর সঙ্গে তাহাদের পরম ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হইয়া যায়। কেবলমাত্র আল্লাহতেই তাহারা শান্তি লাভ করে এবং এ সময়ে তাহাদের মনে এক পরম শান্তিময় তৃপ্তির অভ্যুদয় ঘটে।

এ সময় তাহারা কথাবার্তা বলে তাহাতে শুধু আল্লাহর ইঙ্গিত, নির্দেশ, ইশারা, হেকমত এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের নিদর্শন বিদ্যমান থাকে।

এসময় আল্লাহর দরবারে তাহাদেরকে আল্লাহর বন্ধু নামে সম্বোধন করা হয়। আল্লাহর বিশিষ্ট খাস বান্দারূপে পরিগণিত হইয়া যায়।

এসময় তাহাদের এমন কতিপয় নামকরণ করা হয় যাহা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে।

এসময় তাহারা এমন কতগুলি রহস্যের ভেদ উন্মোচনে সক্ষম হয়, যাহা শুধু তাহাদের জন্যই খাস। ঐ সমস্ত ভেদের বিষয় তাহারা শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

এই অবস্থায় তাহারা যাহা কিছু শুনে, যাহা কিছু করে ও যাহা কিছু বলে সবই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় ও সাহায্যে হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহর বান্দা, শহর-নগর এবং আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদেরও প্রহরা ও তত্ত্বাবধান কার্যে নিযুক্ত হইয়া যায়।

এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে করীম (দঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, আমার মুমিন বান্দা নফল ইবাদাত বন্দেগী দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে। আর আমি আমার বন্ধুত্ব দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করি। আমি যাহাকে আমার বন্ধুতে পরিণত করি, তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আমি আমার নূর দান করি। সুতরাং তাহার যাবতীয় কাজ কর্মই মূলতঃ আমার দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে।

অতএব এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান মহৎ জ্ঞানে পরিণত হয়। কারণ যে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহতায়ালার রহস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়।

হে বান্দা! যদি তুমি উহা জানিতে চাও তবে উল্লিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালন কর।

মুরীদ ও মুরাদের পার্থক্য ঃ প্রাচীন কালের কোন এক বোযর্গ বলিয়াছেন, মুরীদ ও মুরাদ বা মকছুদের আসল অর্থ হইল, আল্লাহতায়ালার যদি তাহাকে মুরীদ বানানো উদ্দেশ্য না থাকিত, তবে সে কিছুতেই মুরীদ হইতে পারিত না। আল্লাহতায়ালা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হইয়া থাকে। এই জন্যই আল্লাহ যখন কাহাকেও কোন বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে চাহেন, তখন তিনি তাহাকে ইরাদাহ করার তাউফিক দান করেন এবং অনুগ্রহে ভূষিত করেন।

অন্য একজন বোযর্গ বলিয়াছেন যে, মুরীদ ব্যক্তি সে-ই, যে কোন কিছু আরম্ভ করে। আর মুরাদ বা মাকছুদ হইল তাহার পরিণতি বা ফলাফল।

সালেক বা মুরীদ সেই ব্যক্তি, যাহাকে বিপদাপদ এবং কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পক্ষান্তরে মুরাদ হইল লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া ও বিপদাপদ এবং কষ্ট-ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করা। আল্লাহতায়ালার সাধারণ পদ্ধতিই এই যে, সালেকীন বা মুরীদকে মুজাহাদাহর কঠিন কষ্ট বরণ করান, তারপর আস্তে আস্তে তাহাকে নিজের নিকট লইয়া যান তাহার মাথার উপর হইতে সমস্ত শ্রমের বোঝা অপসারিত করেন। নফল ইবাদাতের আধিক্য এবং প্রকৃতির কামনা বর্জনের মাধ্যমে সে শান্তির দরজায় উপনীত হয়। তখন আর তাহার ফরজ ও ওয়াজিবাতসমূহ আদায় ব্যতীত অতিরিক্ত ইবাদাতের বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেই দিক দিয়া তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এমনি অবস্থায় তাহার উপর আল্লাহর নির্দেশ থাকে, শুধু তাহার দিল হেফাজাত করিবার এবং আল্লাহর বিধানাবলী সংরক্ষণে নিবিষ্ট হইবার জন্য। আরও নির্দেশ থাকে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হউক। এ সময় ইহারা প্রকাশ্যে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিলেও ভিতরে ইহাদের মন থাকে শুধু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। এ সময় ইহারা যাহা কিছু বলে, আল্লাহ পাকের ইঙ্গিতেই বলে এবং অন্তর আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ থাকে। আর তাহার যবান এ সময় মানুষকে সদোপদেশ ও নেক নসিহত প্রদান করার জন্য খাস বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অন্তরদেশ আল্লাহর আমানতসমূহ হেফাজতের লক্ষ্যে উৎসর্গিত হয়। অতএব এমতাবস্থায় আল্লাহর রহমত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)কে মুরীদ এবং মুরাদের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, মুরীদের অভিভাবক হইল জ্ঞান উদ্ভূত অবস্থা এবং মুরাদের অভিভাবক হইল আল্লাহর হেফাজাত। মুরীদ পায়ে হাঁটিয়া চলে ও মুরাদ আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। আর এটা সর্বসম্মত ও অতি স্বাভাবিক কথা যে, পদব্রজে ভ্রমণকারী উচ্চ মার্গের গন্তব্যে পৌঁছিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে শূন্যে বিচরণকারী যখন তখনই উক্ত গন্তব্যে হাজির হইতে পারে। তাই বলা চলে যে, সে গন্তব্যে পৌঁছিয়াই গিয়াছে।

হযরত মূসা (আঃ) এবং সরোয়ারে কায়েনাত হযরত রাসূলে কারীম (দঃ)-এর দৃষ্টান্ত দেখ। হযরত মূসা (আঃ)-এর গন্তব্যস্থল ছিল তুর পর্বত এবং সরোয়ারে কায়েনাত হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের গমন ঘটিয়াছিল আরশে মুআল্লা এবং লৌহে মাহফুজ পর্যন্ত।

অন্যভাবে বলা চলে যে, মুরীদ হইল তালিব বা প্রত্যাশী আর মুরাদ হইল মাতলুব বা প্রত্যাশিত। মুরীদ বিনিময়ের প্রত্যাশায় ইবাদাত করে আর মুরাদের ইবাদাত হইল খেলওয়াত বা উপঢৌকন স্বরূপ। উহা প্রদান করার ভিতরে কোন বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা নাই। মুরীদ আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব নূর দ্বারা দেখে, কিন্তু মুরাদ খোদ আল্লাহতায়ালারই মাধ্যমে দেখে। মুরীদ খাহেশাতে নফসানীর বিরোধিতা করে আর মুরাদের ভিতরে খাহেশাতে নফসানীর অস্তিত্বই থাকে না। মুরীদ তাহার কার্যক্রম দ্বারা নৈকট্য হাসিল করে। আর মুরাদকে নৈকট্য প্রদান করা হয়। মুরীদ নিজে নিরাপদ, কিন্তু মুরাদ দ্বারা অপর ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করে। মুরীদ উচ্চসোপানে আরোহণরত, আর মুরাদ উচ্চসোপান নয় শুধু বরং স্বীয় প্রভু পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছেন। সেই প্রভুর নিকটে সর্বরকম উত্তম, মূল্যবান এবং আকাঙ্ক্ষিত নিয়ামতসমূহ বিদ্যমান, এই কারণেই মুরাদ যে কোন আবেদ, মুক্বাররব, পরহেজগার এবং নেককারদের তুলনায় বেশী অগ্রগণ্য।

মুতাছাওয়্যেফ ও ছুফীর ব্যবধান

যে ব্যক্তি ছুফী হওয়ার জন্য চেষ্টা ও সাধনারত, তাহাকেই বলে মুতাছাওয়্যেফ। মুতাছাওয়্যেফগণই চেষ্টা ও সাধনার বলে ছুফী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এপথে আসিয়া যে কঠিন পরিশ্রম করে এবং এই পথের পথিকদের রীতি-নীতি ও কার্যক্রমকে স্বীয় অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে আর তাহাদের অনুরূপ জীবন যাপনে ব্যাপৃত হয় তাহাদের প্রকৃত মুতাছাওয়্যেফ বলা যায়। যেমন জামা পরিধানকারী ও দিস্তারধারীকে জামাওয়ালা ও দিস্তারধারী বলিয়া লোকে আখ্যায়িত করে। ঠিক একইভাবে জুহদ অবলম্বনকারীকে তাজহীদ বলা হয়। আর জুহদওয়ালা যখন জুহদ অবলম্বনের ক্ষেত্রে উহার শীর্ষস্তরে পৌঁছিয়া পরিপূর্ণতা অর্জন করে। যার ফলে তাহার নিকট পার্থিব যে কোন বস্তু অত্যন্ত নগণ্য মনে হয়, তখন তাহাকে জাহিদ বলা হয়। এ সময় তাহাদের কাছে এমন অনেক বিষয় আসে, যাহার জন্য সে লালায়িত নহে আবার সেগুলিকে সে ঘৃণাও করে না। বরং এমতাবস্থায় সে কেবল আল্লাহ্র বিধানকে ধরিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ছুফী ও মুতাছাওয়্যেফের পার্থক্য উপলব্ধি করা চাই।

মুতাছাওয়্যেফের মধ্যে উল্লিখিত অবস্থা ও গুণাবলী সৃষ্টি হইলেই সুফী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এক দৃষ্টিতে যাহাদের মধ্যে ছাফাইয়ে কলব সৃষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নফসের ছলনা ও প্রতারণামুক্ত, আল্লাহর নির্দেশে সুপথ গ্রহণকারী, হাকীকত অর্জনকারী এবং যাহার অন্তর পার্থিব ব্যাপারে একেবারেই নির্লিপ্ত সে-ই প্রকৃত অর্থে ছুফী।

আছায়্যোফ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর সাথে সত্য ও খাঁটি সম্পর্ক এবং তাঁহার বান্দাদের সাথে নেক আচরণ প্রদর্শন করা হইল, তাছওয়্যোফের পরিচয়।

ছুফী ও মুতাওয়্যেফের মধ্যে সত্যিকার ব্যবধান হইল, মুতাছাওয়্যেফ হইল কেবলমাত্র প্রারম্ভ, আর ছুফী হইল শেষ বা সমাপ্তি। মুতাছাওয়্যেফ হইল সালেকীন বা সুলুকের পথের যাত্রীদের পথ প্রদর্শক, পক্ষান্তরে ছুফী সেই ব্যক্তি যে সুলুকের পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং মকছুদে হাকীকী হাসিল করিয়াছে।

সালেকের সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের হাকীকত

প্রকৃত সালেক (খোদার পথের পথিক) যদিও সৃষ্টির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া এবং মিলিয়া মিশিয়া চলে, তবু তাহার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় কার্য তাহার সমস্ত অবস্থা, নিয়ত-খেয়াল এক কথায় সব কিছু সাধারণ সৃষ্টির সব কিছুর বিপরীত। আর এই বৈপরীত্যের কারণেই সে ছুফী নামে আখ্যায়িত

হয়। ইহার অর্থ এই যে, সে সৃষ্টির জঞ্জাল হইতে পবিত্র এবং বিমুক্ত, সে নিজের এবং প্রভুর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল, সে পার্থিব বন্ধু, নিজের নফস, তবিয়ত-প্রকৃতি, প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা এবং গোমরাহীর অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত। তাই সে এলমে হাকীকত, গূঢ় রহস্যের ভেদ এবং সান্নিধ্যের নূর প্রভৃতির অধিকারী।

এই শ্রেণীর লোককে আল্লাহ মানুষের মনের গুপ্ত বিষয় এবং রহস্যের ভেদ অবগত করাইয়া দেন এবং ইহাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। এই অবস্থায় উপনীত হইবার পর কোন শয়তানই আর সেই বান্দাকে প্রতারিত করিতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই শ্রেণীর বান্দার দিকেই লক্ষ্য করিয়া ইবলীসকে সম্বোধন করতঃ বলেন যে, হে শয়তান! আমার বান্দার উপর তোমার কোন প্রভাব খাটিবে না। তাহাকে কেহই পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। কোন ভুল ভ্রান্তির দিকে চালনা করিতে সক্ষম হইবে না এবং তাহার নিজের এমন কোন নফসানী খাহেশ তথা প্রবৃত্তের চাহিদাও থাকিবে না, যাহা তাহাকে আহলে সুন্নত অল জামাতের তরীকা হইতে এতটুকু মাত্র বিচ্যুত করিতে পারে।

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে, উক্ত অবস্থার কারণ এই যে, আমি নিজেই তাহার ভিতর হইতে সমস্ত খারাবী এবং নির্লজ্জতা দূর করিয়া দিয়াছি। অতএব সে আমার মুখলেছ বান্দায় পরিগণিত।

আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণানুসারেই একথা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ খোদ এই বান্দার হেফাজতকারী, মকামে সুলুকের উপরে অবিচল থাকার সাহায্যকারী, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তাকারী।

হাঁ, তবে ইহা ঠিক তখনই সম্ভব, যখন বান্দা আল্লাহর পথে সুস্থির থাকিয়া খাঁটি ও হক কাজে ব্যাপৃত থাকে ও নিজের সৃষ্টিকুলের সাথে বিচ্ছিন্নতা এবং নানারূপ পেরেশানীর ভিতরেও ধৈর্যাবলম্বন করে, স্বীয় ফারায়েজসমূহ যথাযথভাবে পালন করিয়া চলে, শরীয়তের বিধি-বিধান ও আহকামে ইলাহীর হেফাজত করে এবং মাকামে সুলুকের উপরে দৃঢ়পদে স্থির থাকে। দিলকে সম্পূর্ণ খালেছ এবং অকপট করিয়া ফেলে, চরিত্রকে নিখুঁৎ নিষ্কলঙ্ক, পাক-পবিত্র এবং বা-আদব বানাইয়া লয়। এইভাবে বান্দা যখন সব দিক দিয়া পরিপূর্ণতা অর্জন করে, তখন তাহাকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল খেলওয়াত এবং অমূল্য নিয়ামত বেলায়াত দান করা হয়।

নবুয়ত এবং বেলায়াতের পার্থক্য

নবুয়ত এবং বেলায়েতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবুয়ত আল্লাহর তরফ হইতে একটি বাণী এবং ফিরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর তরফ হইতে একটি অহী (বা নির্দেশ) ফিরেশতা জিব্রাইল অহী আনয়ন করেন এবং আল্লাহর তরফ হইতে উহার উপর কবুলিয়তের মোহর লাগইয়া দেওয়া হয়। ইহার সত্যতার স্বীকৃতি লাযিম বৈ কি! আর ইহা অস্বীকারকারী কাফির। কেননা নবুয়তে অস্বীকৃতি মূলতঃ আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস না করারই নামান্তর মাত্র।

বেলায়েত হইল, আল্লাহতায়ালা স্বীয় বন্ধুগণকে নিজের কথা ইলহামের মাধ্যমে জানাইয়া দেন। ইহা আল্লাহ স্বয়ং সরাসরিভাবে তাহার প্রিয় বান্দাদের প্রতি পৌছাইয়া দিয়া থাকেন। আল্লাহর খাস বান্দাদের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় এই ইলহাম তাহাদের উপরে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে উক্ত বান্দাদের দিলে এক অপূর্ব প্রশান্তি এবং স্বস্তির উদ্ভব ঘটে। খাস বান্দাগণ যখন হালের (বা বিশেষ অবস্থার) মধ্যে থাকেন তখন তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত এই ইলহাম প্রাপ্ত হন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, নবীদের জন্য অহী নির্দ্ধারিত ও অলীদের জন্য নির্দ্ধারিত ইলহাম। তবে যাহারা নবীদের প্রতি আগত অহীকে অস্বীকার করে, তাহারা কাফির। কেননা নবীদের অহী অমান্য বা অস্বীকার করা মূলতঃ আল্লাহর বাণী বা নির্দেশ অমান্য করারই নামান্তর।

অবশ্য আউলিয়াদের ইলহাম অমান্য করা কুফরী নহে। ইলহামের প্রকৃত তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে আল্লাহ পাকেরই এলমের মাধ্যমে কাহারও অন্তরে এক রহস্যভেদের আকারে উদয় হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা তাঁহার যে বান্দাকে ভালবাসেন, সেই ভালবাসা উক্ত বান্দার অন্তরে ইলহামকে অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং সুসংবদ্ধতার সাথে পৌঁছাইয়া দেয় এবং আশেকে-ইলাহী বান্দার অন্তর উহাকে শান্ত এবং স্থিরভাবে গ্রহণ করিয়া লয়।

সুলুকের পথে মুবতাদি (মুরীদের) কর্তব্য

সুলুকের পথের মুবতাদী অর্থাৎ নব অভিযাত্রী তথা মুরীদের প্রথম কর্তব্য নিজের আকীদা ও বিশ্বাসকে পাকা-পোক্ত এবং দুরস্ত করা। বিশেষতঃ সলফে ছালেহীন এবং আহলে সুন্নত অল জামাতের পূর্ব যমানার ওলামায় কেরামের আকীদা ও বিশ্বাসের হুবহু অনুরূপ আকীদা ও বিশ্বাস নিজের মধ্যেও সৃষ্টি করিয়া লওয়া। আল্লাহর নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং ছিদ্দীকীনদের তরীকায় নিজেকে পরিচালিত করা একান্ত জরুরী। কোরআন ও হাদীসের আওয়ামের ও মানাহী (নির্দেশ এবং নিষেধাবলী) সমূহ পালন করিয়া চলা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিতে হইলে কোরআন ও হাদীস স্বরূপ ডানা (বা পাখা) দুইটি অপরিহার্য। উহা ছাড়া সুলুকের পথে উড্ডীয়মান হইবার কোন সাধ্য নাই।

ইহার পরে প্রয়োজন রহিয়াছে চেষ্টা, শ্রম এবং সাধনার। আলস্য এবং ঔদাসীন্য এই পথের যাত্রীদের জন্য অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রবল দুইটি বাধা।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

উচ্চারণ ঃ অল্লাযীনা জ্বাহাদূ ফীনা-লানাহদি ইয়ান্নাহুম সুবুলানা।'

অর্থাৎ—যাহারা আমার রাস্তায় চেষ্টা এবং শ্রমরত তাহাদের পথ আমি নিজেই বাতাইয়া দেই।

জনৈক বিজ্ঞ বোযর্গ বলেন যে, যে ব্যক্তি অনুসন্ধান এবং পরিশ্রমে নিয়োজিত, সে অবশ্যই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করে।

সারকথা এই যে, বিশুদ্ধ এ'তেকাদ ও আকীদার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয় এবং চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা রাহে হাকীকাত (অর্থাৎ খাঁটি ও আসল পথ) অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয়।

সালেকদিগের খাঁটি মনে প্রতিজ্ঞা করা চাই যে, বারেগাহে ইলাহীতে উপনীত হওয়া পর্যন্ত সে আল্লাহ পাকের রাজীর খেলাফ একটি পদক্ষেপও করিবে না। সমালোচক এবং কুৎসাকারীদের শত সমালোচনা এবং কুৎসা রটনায়ও দিলকে পেরেশান এবং ব্যথিত হইতে দিবে না। কেননা যাহারা সত্য পথের পথিক, তাহারা কখনও সে পথের মধ্যে থমকিয়া যায় না বা এতটুকু কালক্ষেপণ করে না। তাহারা একইভাবে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেই থাকে। আর তাহাদের ইহাও অভ্যাস নয় যে, কেরামতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া পথে তাহাদের গতি রহিত করে। কেননা আসলেই তাহাদের কোশেস ও সাধনার হাতিয়ার কেরামতকে মনে করা ঠিক নয় এবং মূলতঃ তাহা উহার হাতিয়ারও নয়। আসলে কেরামত আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার পক্ষে একটি প্রতিবন্ধকতা। অবশ্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হইবার পর কেরামত প্রদর্শন করায় কোন আপত্তি নাই। কেননা কেরামত হইল আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সুতরাং ঐ উদ্দেশ্য সাধন করার পরে যখন তখন কেরামতের আশ্রয় গ্রহণ কিংবা সৃষ্টি কুলকে উহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আর তখন উহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাজেই কেরামতের ক্ষেত্রে ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিছুটা শক্তির সঞ্চার হওয়া মাত্রই উহার প্রদর্শন আরম্ভ করা রীতি ও নীতির খেলাফ।

বেলায়েত প্রাপ্ত অলীদের জন্য নীতি হইল, যতদূর সম্ভব, কেরামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া উহা গোপন রাখা। পক্ষান্তরে নবীদের তাহা নীতি নয়। তাঁহারা যখন যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা মো'জেযা জন সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের মর্যাদার কোন হানি হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। নবুয়ত এবং বেলায়েতের মূল পার্থক্য এইখানেই। সুতরাং এ ব্যাপারে অলীদের নিজস্ব নীতি ও রীতির অনুসরণ করা চাই।

মুরীদদের জন্য একটি বিশেষ কর্তব্য, অর্থ সম্পদ যখন যাহা তাহাদের হাতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া। ইহাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা মনের ভিতরে উদয় হওয়া একেবারেই অবান্তর যে, সবকিছু খরচ করিয়া ফেলিয়ে ইফতার ও সেহরী কিভাবে চলিবে? সর্বদা মনের ভিতরে খেয়াল রাখিতে হইবে যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই রুজী রিজিকের যিম্মাদার। আর এই কথাটিও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিগত যমানার কোন অলী ব্যক্তিই এমন ছিলেন না, যিনি নিজের নিকট আগত মাল খরচ করিতে এতটুকু মাত্র কৃপণতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

মুরীদদের জন্য আরও প্রয়োজন এই যে, সদা-সর্বদা বিনয় এবং নম্রতাকে নিজেদের স্বভাব হিসাবে গড়িয়া লইবে এবং আনন্দ ও উৎফুল্লতাকে বর্জন করিয়া পেরেশানী, বিষণ্নতা ও চিন্তা-ভাবনাকে বেশী পছন্দ করিবে। পানাহারে উদর পূর্ণ রাখার চাইতে ক্ষুধার্থ থাকার অভ্যাস করিবে। মানুষ তাহাকে তিরস্কার, গালিমন্দ এবং দুর্ণাম-বদনাম করিলে অসন্তুষ্ট হওয়ার বদলে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করিবে। কেননা ইহাতে অপকারের বদলে তাহার উপকার এবং মঙ্গল হইবে। কেননা ইহার দ্বারা সে নিজের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

লোকে তাহাকে সম্মান এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক, কি না করুক, সে সকলকে সম্মান প্রদর্শন করিবে।

মুরীদদের অন্যতম কর্তব্য, নিজের পূর্বেকার গুনাহ্ হইতে অনবরত আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও পরবর্তীতে কোন গুনাহর কার্য না হওয়ার জন্য আল্লাহর হেফাজতের প্রত্যাশী থাকা।

মুরীদদের অন্যের অপদস্থতা কামনা করা চাই না, অন্যে তাহার অপদস্থতা ও যিল্লতী কামনা করুক, কিন্তু তাহার উচিত অন্যের সম্মান ও মান-মর্যাদার প্রত্যাশা করা। যদি কোন মুরীদ ব্যক্তি তাহার মনকে এভাবে গড়িতে না পারে তবে তাহার অন্তরে মারেফাতের ভেদ কিছুতেই উন্মুক্ত হইবে না এবং সে এই পথে কোন ক্রমেই কামিয়াব হইতে পারিবে না।

পীর বা মুর্শিদের সাথে মুরীদের আদব

পীর বা মুর্শিদের কোন কাজ বা কথার-প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরোধিতা করা মুরীদের পক্ষে কঠিন বেআদবী। প্রকাশ্যে পীরের সহিত বেআদবী করা মারাত্মক অন্যায় তথা পাপের কার্য আর গোপনে বা অপ্রকাশ্যে পীরের কথা বা কাজের সমালোচনা করা বা উহার বিপরীত ভাব পোষণ করা নিজের ধ্বংস এবং অকল্যাণ ডাকিয়া আনা ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব প্রকাশ্যে ও গোপনে দুই অবস্থায়ই পীরের সাথে বেআদবী ও তাহার কথা ও কাজের সমালোচনা করা কোনক্রমেই উচিত নহে।

মুর্শিদকে শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করিতে দেখিলে তাঁহাকে উহা আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইতে বা ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

উহা প্রকাশ্যে বলিলে মুর্শিদ মনোক্ষুণ্ন হইতে পারেন। তাঁহার কোন অন্যায় দেখিলে তাহা গোপন রাখিবে এবং উহার পিছনে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে নাকি তাহার অনুসন্ধান করিবে। যদি তেমন কোন কারণ না পাওয়া যায়, তবে আল্লাহর দরবারে এ ব্যাপারে দোয়া মুনাজাত করিবে।

মুর্শিদ কোন কারণবশতঃ ক্রোধান্বিত হইলে বা মুরীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া বরং কেন তিনি অসন্তুষ্ট বা এরূপ ক্রোধান্বিত হইলেন, সেই কারণ খুঁজিয়া বাহির

করিবে। নিজের কৃত কোন অন্যায় কাজ ইহার কারণ হইলে, সেই অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ না হয়, তজ্জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। তারপর মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজ কৃতকার্যের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। মনে করিবে যে, আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য অবশ্যই মুর্শিদের সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

যেমন কেহ কোন রাজা বাদশাহর দরবারে যাইতে চাহিলে, ঐ দরবারের নিয়মকানুন, আদব-কায়দা অবশ্যই প্রথমে শিখিতে হইবে। আর ইহা শিখিবার জন্য বাদশাহর দরবারের কোন অভিজ্ঞ অমাত্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ এই অমাত্যই তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত।

যদি এই অবস্থা হয় তবে যিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ, মহারাজাধিরাজ, সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তাঁহার মহান দরবারে পৌঁছার জন্য কেমন শিক্ষা লাভের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই শিক্ষা অর্জন করা একমাত্র আল্লাহর অলী ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে সম্ভব নহে।

দুনিয়ার চিরন্তন নীতিই হইল এই যে, একজন পীর হইবেন এবং আর একজন মুরীদ হইবে। একজন শিক্ষাদাতা হইবেন এবং আর একজন হইবে শিক্ষার্থী। একজন হইবে আদেশ দাতা ও অন্যজন আদেশ পালনকারী। যতদিন এ দুনিয়া আছে, ততদিনই এই নিয়ম চলিতে থাকিবে।

আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সব জিনিসের নাম পরিচয় শিখাইয়া দিলেন। এই ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ শিক্ষাদাতা ও হযরত আদম হইলেন তাহার শিষ্য। তারপর হযরত আদম (আঃ)কে ফিরেশতাদের সমাবেশে সম্মানিত স্থানে বসাইয়া ফিরেশতাদিগকে উক্ত বস্তুসমূহের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাহা বলিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদম (আঃ) ঐ বস্তুসমূহের নাম বলিয়া দিলেন এবং ফিরেশতাগণ তাঁহার মাধ্যমেই উহা জানিয়া লইলেন। এক্ষেত্রে হযরত আদম (আঃ) শিক্ষক হইলেন এবং ফিরেশতারা তাঁহার শিষ্য হইলেন।

তারপর হযরত আদম (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করিলেন। এ সময় তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন। এই অবস্থায় ফিরেশতা জিব্রাইল তাঁহাকে দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া হযরত আদম (আঃ)-এর ওস্তাদ হইলেন এবং হযরত আদম (আঃ) তাঁহার ছাত্র হইলেন। তারপর হযরত আদম (আঃ) তাঁহার পুত্র হযরত শীশ (আঃ)কে সবকিছু শিক্ষাদান করিলেন। এইভাবেই দুনিয়াতে একে অন্যের নিকট হইতে আপনাপন প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইয়াছে।

মাশায়েখ মুর্শিদগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ প্রদর্শক। সুতরাং মুরীদের জন্য পীর বা মুর্শিদের প্রয়োজন অপরিহার্য। লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত মুরীদের পীরের সংশ্রব পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের পূর্বে পীর মুরীদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। তখন মুরীদ এমন সব রহস্য অবগত হন, যাহার বিষয় তাহার পীরও কোন খবর রাখেন না। মুরীদ সেই অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। যাহা হইতে পরহেজ করিতে হইবে তদসম্পর্কেও তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহতায়ালা কখনও মুরীদকে ধনী করেন, আবার কখনও বা কপর্দকহীনে পরিণত করেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তাহার অন্তরে ঠাই পায় না। এই পর্যায়ে পীর হইতে মুরীদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং পীরের নিকট যাওয়া মুরীদের পক্ষে হারাম হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা হইয়া থাকে।

অনেক সময়ই মানুষ ধারণা করিতে পারে না যে, এই গভীর অরণ্য, এই অকূল সমুদ্র এইসব কি বা কেন? মানুষ তখনই ইহা তাহাদের অবোধগম্য বলিয়াই মনে করে। মূলতঃ আল্লাহতায়ালা ইহা তাঁহার নিজস্ব জ্ঞানের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তবে নবী, রাসূল এবং কোন

কোন বিশিষ্ট বান্দার মধ্যে যাহাদিগকে এই রহস্যের ভেদ অবগত করাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনকে কোন একটা রহস্য সম্বন্ধে একমত করান নাই। সুতরাং যে কাজ বা যে বিষয় রহস্যাবৃত সেই কাজে বা বিষয়ে পীরের সাথে মুরীদের কোন সম্পর্ক নাই এই অবস্থায় তাহারা উভয় ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক।

পীরের সম্মুখে মুরীদের নিস্প্রয়োজনীয় কোন কথা বলিতে নাই। নিজের প্রশংসা বা গুণ প্রকাশমূলক কোন কথাও বলিতে নাই। একমাত্র নামাযের সময়েই প্রয়োজনে কিংবা বিশেষ কারণবশতঃ পীরের জায়নামাযের সামনে নিজের জায়নামায বিছানো যাইতে পারে অন্য কোন সময় নহে। নামাযের পরে আবার নিজের জায়নামায উঠাইয়া লইতে হয়। অতঃপর পীরের খেদমতে একাগ্রতার সাথে নিযুক্ত হইতে হয়।

পীর সাহেবের দরবারে যদি কোন মাসয়ালা সম্পর্কে আলাপালোচনা চলিতে থাকে, তবে নিজে তাহার উত্তর জানিলেও যদি পীর সাহেব তাহাকে এ বিষয় কিছু বলিতে না বলে, তবে মুরীদ শুধু চুপ করিয়া থাকিবে এবং লক্ষ্য করিয়া শুনিবে। কারণ মনে করিতে হইবে, পীর সাহেব যাহা কিছু বলেন তাহা আল্লাহর তরফ হইতে বলেন। এমন কি পীর সাহেব কোন প্রকার ভুলত্রুটি করিলেও নীরব থাকা চাই। প্রকাশ্যে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া বরং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাইবে যাহাতে আল্লাহ তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া দেন।

স্মরণ রাখিবে, মুরীদের কল্যাণ ও মঙ্গল শুধু চুপ করিয়া থাকার মধ্যে, চুপ থাকা ছাড়া কোন উত্তম পথ তাহার জন্য নাই।

সেমা অনুষ্ঠান কালীন আদব

সেমার (কাওয়ালীর অনুরূপ গজলাদি) অনুষ্ঠান চলা কালে মুর্শিদের সম্মুখে কোনরূপ অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা নৃত্যাদি করিয়া উঠা চাই না। এসময় যদি মুরীদের প্রতি মুর্শিদের কোন খাস তাওয়াজ্জুর ফলে তাহার ভিতরে কোন বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাহার কারণে আত্মবিস্মৃতির ভাব সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যে অঙ্গভঙ্গী কিংবা দেহ নাড়াচাড়া শুরু হইতে থাকে, এমতাবস্থায় সৃষ্ট অবস্থাকে মাফ করা যাইতে পারে; কিন্তু বিধান হইল, এই বিশেষ অবস্থা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় নাড়া-চাড়া ও অঙ্গভঙ্গী থামিয়া যাওয়া চাই, উহা যেন এতটুকু মাত্র অবশিষ্ট না থাকে।

সেমা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা হইল, কাওয়ালী, বাজনা এবং নৃত্যকে আমরা জায়েয মনে করি না, তবে দেখা যাইতেছে, এ যুগের বহু দরবেশ নিজ নিজ খানকায় উহার আম প্রচলন শুরু করিয়াছে। তবে এই ব্যাপক প্রচলনের কারণেই যে একটি নিষিদ্ধ জিনিস সিদ্ধ হইয়া যায়, তেমন কোন কথা নয়।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, বাজনা ও নৃত্যহীন আল্লাহ ও রাসূল (দঃ)-এর স্তুতি এবং নাত ও হামদ সূচক সেমা অত্যন্ত খালেছ ও পবিত্র দিলে যদি করা হয় এবং অনুষ্ঠানে কোনরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা বিভিন্ন অলী-আউলিয়া কর্তৃক সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

তবে সিদ্ধ, কি নিষিদ্ধ যাহাই হউক না কেন, সেমার অনুষ্ঠানেও মুরীদদিগের মুর্শিদের আদব রক্ষা করা কর্তব্য। সেমার মজলিসে খোদ মুর্শিদ উপস্থিত থাকিলে মুরীদগণ কাওয়ালকে কখনও একথা বলিবে না যে, তুমি তোমার এই গজল বন্ধ রাখিয়া অমুক বিষয়ের একটি গজল বল বা তোমার এই গজলটি খুবই উত্তম। ইহা আর একবার বল। এইসব ব্যাপার শুধু মুর্শিদের উপরই নির্ভর করা চাই।

মুরীদ যদি তাহার মুর্শিদ বা ওস্তাদ হইতে সত্যিকারভাবে কোন কিছু শিক্ষা লাভ করিতে চাহে, তবে মুরীদের মনে তাহার মুর্শিদ সম্পর্কে এইরূপ দৃঢ় এবং বদ্ধমূল ধারণা থাকিতে হইবে যে, এই যমানায় আমার মুর্শিদ অপেক্ষা অধিক বোযর্গী অন্য কোন পীর বা মুর্শিদের নাই। এইরূপ মনোভাব

থাকিলেই সে তাহার মুর্শিদ হইতে মূল উদ্দেশ্য সাধনে বহু উপকার লাভ করিবে। তাহাছাড়া আল্লাহর দরবারে তাহার মকবুলিয়ত হাসিল হইবে। পীরের যবান হইতে এমন সব কথা উচ্চারিত হইবে, যাহা তাঁহার অনুকূলে আসিবে।

মাশায়েখের বিরোধিতা করা যে কোন ক্ষেত্রে বা ব্যাপারে মুরীদের জন্য উচিত নহে। কেননা উহা তাহার জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে। এই জন্যই মাশায়েখের খেলাফ বা বিরোধিতা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন রকমই করা চাই না।

মুরীদের জন্য আর একটি বিশেষ কর্তব্য হইল যে, তাহার ভিতরকার যাবতীয় হাল, রহস্য এবং গুপ্ত বিষয়সমূহ মুর্শিদের কাছে প্রকাশ করিবে। কোন কিছুই তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিবে না। পক্ষান্তরে স্বীয় মাশায়েখের কোন গোপন বিষয় বা কথা অন্যের নিকট তাঁহার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করিবে না।

মুরীদের জন্য তাহার পীরের নিকট হইতে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার অনুমতি প্রার্থনা করা জায়েয নহে। আহলে তরীকতের মতে মুরীদের এই কাজ তাহার মুরীদী নষ্ট হওয়ার জন্যও যথেষ্ট। কেননা মুরীদের এইরূপ ইচ্ছার সৃষ্টি তাহার মুরীদ সুলভ মূল ইরাদাহরই পরিপন্থী।

মুর্শিদ মুরীদকে যে নির্দেশ দান করে, তাহা হুবহু পালন করাই তাহার একমাত্র প্রধান আদব। অতএব এ ক্ষেত্রে এতটুকু মাত্র অবহেলা করা মুরীদের জন্য বরবাদীর কারণ বৈ কি!

মুরীদকে আদব শিখানো এবং শিক্ষা দান করা

মাশায়েখে তরীকতের কর্তব্য হইল কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে মুরীদকে গ্রহণ করা। তাহাছাড়া অন্য কোন গরজে বা ব্যক্তি স্বার্থে কাহাকেও মুরীদ করা বা মুরীদের নিকট হইতে কোন অর্থ সম্পদ গ্রহণ করাও সিদ্ধ নহে। মুরীদের আগমন আল্লাহর পক্ষ হইতে পীরের জন্য একটি দান মনে করিতে হইবে। সুতরাং পীর মুরীদকে সততার সাথে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সুশিক্ষা দান করিবে। মুরীদ স্বেচ্ছায় পীরকে কিছু দিলে তাহা গ্রহণ করায় দোষের কিছু নাই। ইহা মুরীদের কল্যাণ লাভের জন্য সহায়তা স্বরূপ।

মুরীদকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে পীরকে আল্লাহতায়ালাই সামর্থ্য দান করিয়া থাকেন। পীরের উচিত নিজের সামর্থ্য অনুসারে মুরীদের প্রতিপালন এবং তত্ত্বাবধান করা। মুরীদের কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে গোপনে তাহার পক্ষ হইতে নিজেই তাওবাহ করিবে। অবশ্য এ ব্যাপারে মুরীদকে যাহা কিছু বলা এবং আর যাহা কিছু করা দরকার তাহা বলিবে এবং করিবে। আর পীরের জন্য মুরীদের যে কোন রহস্য গোপন রাখা চাই। যেহেতু নেক লোকদের অন্তর রহস্য গোপন রাখার কবর স্বরূপ। এই জন্যই পীরের নিকট মুরীদ শান্তি লাভ করে। পীর মুরীদদের গোপন রহস্যের ভাণ্ডার তুল্য।

মুরীদকে সর্বদা আল্লাহর পথে হাজির থাকার জন্য প্রস্তুত রাখিবে। তাহাকে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে দেখিলে গোপনে তাহাকে সাবধান এবং সতর্ক করিয়া দিবে যেন পুনরায় তাহার দ্বারা এইরূপ কাজ আর সংঘটিত না হয়।

কোন মুরীদ কোন প্রকার অন্যায় করিলে যদি সকলকেই নসীহত করার মনস্থ করা হয় তবে তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া এই প্রকার বলিবে, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা এই অন্যায় কাজ সংঘটিত হইতেছে, তবে তাহা যাহার দ্বারাই হৌকনা কেন, সে ঐ কাজ পরিত্যাগ করুক আর তোমরা কেহই যেন ঐরূপ কাজে লিপ্ত না হও। সকলকে একত্রিত করিয়া এইভাবে বলার ভিতরে যথেষ্ট ফায়দা রহিয়াছে। কেননা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এভাবে বলিলে হয়ত সে লজ্জায় বা রাগে পীরের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইয়া গেল। অধিকন্তু ঐ মুরীদ রাগের বশবর্তী হইয়া অযথা পীরের নামেই মিথ্যা অপবাদ

রটাইয়া দিতে পারে এবং তখন অন্যান্য মুরীদগণও হয়তবা তাহা বিশ্বাস করিয়া পীরের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।
আর পীর যদি উক্ত মুরীদের ঐরূপ অন্যায় কাজে অত্যধিক বিরক্ত এবং রাগান্বিত হইয়া প্রকাশ্যেই মুরীদকে সাবধান, সতর্ক এবং তিরস্কার করিতে উদ্যোগী হয়, তবে এমতাবস্থায় পীরের উচিত কঠোর রিয়াজাত এবং মুজাহাদার দ্বারা নিজের নফসানিয়াতকে দমন করা। এবং নিজের মনকে শান্ত ও সংযত করিয়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করা।

ধনীদের সাথে (গরীব) দরবেশের সম্পর্ক

ধন-সম্পদশালী ও আমীর ওমরাদের সাথে উঠা বসা করা দরবেশদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং তাহাদের সাথে সংশ্রব পরিত্যাগ করা একেবারেই অপরিহার্য।
যদি একান্তই তাহাদের কাছে যাতায়াত রাখিতে হয়, তবে তাহাদের আয়ত্তের কোন কিছুর প্রতি লোভ লালসা করা এবং উহা পাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করিবে। ধনীদের দান-দক্ষিণা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া বরং নিজের ধর্ম রক্ষা করিয়া চলা সহস্রগুণে শ্রেয়।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পদশালীর কাজ এই উদ্দেশ্যে করিয়া দেয় যে, তাহার দ্বারা সে উপকৃত হইবে। তবে তাহার ধর্মের দুই অংশ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কাজ করিলে ধর্মের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত। যাহাদের সংশ্রবে ও যাহাদের ধন দৌলতে ঈমানের আলো নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহাদের সংশ্রব হইতে অবশ্যই দূরে থাকা চাই। কিন্তু যদি মসজিদে, মজলিসে বা সফর ইত্যাদিতে তাহাদের সাথে সাক্ষাত ঘটিয়া যায় তবে তাহাদের সাথে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করিবে। ইহা করা খুবই মঙ্গলজনক। সদ্ব্যবহার এবং সদাচরণ প্রদর্শন সর্বক্ষেত্রে ও সকলের সঙ্গেই করা কর্তব্য। ইহার জন্য প্রকাশ্য নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যাহা ঐ সব ধনী, সম্পদশালী ও আমীর উমরাদের চারিত্রিক সংশোধনের কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।
অবশ্য নিজেকে নিজে ভাল বলা ও ধনীদের উপর মর্যাদা দেওয়া উচিত নহে। বরং মনে করা চাই এইরূপ যে, আমার চেয়ে সকলেই ভাল, আমি সর্বাপেক্ষা অধম। ইহাতে নিজের গর্ব এবং অহঙ্কারের দিকে ধাবিত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়।
ইহা সত্তেও ধনী ও আমীর উমারা হইতে দূরে থাকা কর্তব্য, তাহার কারণ হইল, তাহাদের তাসীর পার্থিব মোহ এবং মায়া মমতা বিজড়িত, যাহার প্রভাব এড়াইয়া থাকা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এই বিপদ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য ঐরূপ নির্দেশ যে, তোমরা ধন-সম্পদশালী ও আমীর উমারাদের কাছে যাতায়াত করিও না।
যদিও তাহাদের কাছে কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য না যাওয়া হয়, তবু তাহারা তোমাদের আনা-গোনা দেখিয়া মনে করিবে, তোমরা তাহাদের নিকট কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেছ। তাই তাহারা তোমাদেরকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে করিবে। অতএব তাহাদেরকে তোমরা সৎ পথে আহ্বান করিলেও তাহা কার্যকরী হইবে না। কেননা, তাহারা উহার প্রতি কোন গুরুত্বই দিবে না। তাহারা মনে করিবে, উহা তোমাদের শুধু বাহিরের দেখানো ব্যাপার। আসলে তোমরা তাহাদের কাছে যাইতেছ শুধু নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। ইহার ফলে তাহাদের তো কোন উপকারই হইল না, অযথা তোমরা তোমাদের মর্যাদার হানি ঘটাইলে।
দরবেশদের বোযর্গী প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত নহে। আর তাহারা যেন এইরূপ মনে না করে যে, আমরা ইহকাল ও পরকালের প্রতিক্রিয়াসমূহ হইতে মুক্ত। সর্বদা তাহাদের দরবেশীকে মূল্যহীন মনে করা চাই।
যে নিজেকে খুবই সম্মানিত মনে করে, তাহার কোনই সম্মান নাই।

পক্ষান্তরে ধনবানদের উচিত দরবেশদেরকে সম্মান করা, দান খয়রাত করা। কেননা, ধনবানগণ শুধু ধন-সম্পদের সাময়িক প্রহরিমাত্র। তাহারা উহার প্রকৃত মালিক নয়।

আর দরবেশদের কর্তব্য হইল ধনীদের ধন-সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত হওয়া, এমনকি ইহকাল-পরকালের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি লালসা না করা, বরং তাহাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশী হওয়া।

দুনিয়াবী কোন বস্তুর প্রতি সামান্য মাত্র অন্তর ঝুকানোও দরবেশীর নিদর্শন নহে বরং উহা দরবেশদের বিপরীত রীতি। পার্থিব মায়া-মোহ ও লোভ-লিপসা হইতে অন্তরকে সম্পূর্ণ নিস্কলুশ এবং নিখুঁৎ রাখিতে হইবে। মনে এই আশা পোষণ করিবে যে, আল্লাহ্ আমার অন্তরকে পবিত্র নূরে আলোকিত করিয়া দিবেন এবং সেই নূরের আলোক প্রাপ্তির জন্য আমাকে তদোপযোগী হইতে হইবে। অযোগ্য পাত্রকে আল্লাহ্ কস্মিনকালে কোন মূল্যবান বস্তু দ্বারা পুরস্কৃত করেন না।

যখন দরবেশ তাহার মনের অবস্থাকে এইরূপ করিয়া লইতে পারিবে, তখনই আল্লাহ তাহার অন্তরকে রহস্যের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়া তাহার দরবেশীকে সার্থক করিয়া দিবেন।

ফকীর দরবেশদের সাথে ধনীদের ব্যবহার

যখন কোন ফকীর দরবেশের সাথে তোমার সংশ্রব বা উঠা-বসা ঘটিবে, তখন পানাহার, পোশাক পরিধান কিংবা অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে ফকীর দরবেশদের গুরুত্ব প্রদান করিবে এবং তাহাদেরকে অগ্রগণ্য মনে করিবে। আর তাই তাহাদেরকে অগ্রাধিকার দান করিবে। কোন ক্ষেত্রেই নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা বড় ভাবিবে না ও অগ্রাধিকার দিবে না, কেননা ইহা তোমাদের জন্য বিশেষ ক্ষতির কারণ।

আবু সাআদ ইবনে আহমদ ঈদা (রহঃ) বলেন যে, আমি ত্রিশ বৎসর যাবত ফকীর দরবেশদের সংশ্রবে অতিবাহিত করিয়াছি। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে তাহারা কোন একটি দিন আমার কোন কাজে মনোক্ষুণ্ন হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে আমিও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহাদের সাথে কিভাবে কাটাইয়াছিলেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহাদের সংশ্রবে থাকাকালে আমি আমার নফসের প্রতি সন্দেহভাজন ছিলাম। যখন আমি তাহাদের কাছে উপস্থিত হইতাম, তখন খুবই আদবের সাথে, বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হইতাম। তাহাদের সাথে আমি যারপর নাই ভদ্র ব্যবহার করিতাম। আমার সাধ্যে যখন যাহা কুলাইত, আমি তাহাদের জন্য হাদিয়া, বখশেষ এবং নজর-নিয়াজ লইয়া যাইতাম।

কিন্তু এইসব করিবার পরও আমি মনে করিতেছি না, আমি খুব কিছু করিয়াছি, বরং আমি আল্লাহর দরবারে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যে, তিনি আমাকে দরবেশদের সাথে যে সামান্য কিছু ভাল ব্যবহার করার সামর্থ্য দিয়াছেন, সে জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। আর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আমাকে এব্যাপারে পূর্ণ সামর্থ্য দান করুন যেন এক্ষেত্রে আমার ভিতরে এতটুকু অপূর্ণতা না থাকে।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আহলে কোরআন আহলুল্লাহ এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী কাজ করে, সে আহলুল্লাহ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোরআন তেলওয়াত করে। অথচ তদনুযায়ী কাজ করে না, সে ব্যক্তি আহলুল্লাহ নয়।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করে, সে ব্যক্তি কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী নয়। সুতরাং যে তোমার উপঢৌকন গ্রহণ করে, তুমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ নয়।

দরবেশ তোমার নিকট প্রার্থনা করিবে, তুমি সেই আশায় না থাকিয়া বরং তুমি তাহার প্রার্থনা করার পূর্বেই তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দাও। কখনও কোন দরবেশ যদি তোমার নিকট কিছু ধার-করজ

চায়, তবে প্রকাশ্যে তুমি তাহাকে ধার-করজ হিসাবে দাও। কিন্তু মনে মনে এই নিয়ত কর যে, আমি তাহাকে যাহা দিলাম, তাহা তাহার খেদমতের উদ্দেশ্যেই দিলাম। অবশ্য নিজের মনের একথা দরবেশের নিকট প্রকাশ করিও না। তাহার কোন বন্ধু জানিতে চাহিলে বলিবে, আমি তাহাকে উহা উপঢৌকন হিসাবে দিয়াছি। কারণ তাহার নিজের নিকট ইহা প্রকাশ করিলে সে তোমার এই দানকে নিজের উপর একটা বোঝা হিসাবে মনে করিবে। অতএব কোন কার্যক্রম দ্বারাই দরবেশের মনে অশান্তি কিংবা অস্বস্তি সৃষ্টি করা ঠিক নহে।

দরবেশের প্রার্থনা অনতিবিলম্বে পূর্ণ করিবে। তাহাকে অপেক্ষমান রাখিও না, কারণ তাহার প্রয়োজন খুবই অল্প সময়ের জন্য। যদি জানিতে পার যে, পরিবারে দরবেশ একা নহে, তাহার পরিবার পরিজনও আছে। তবে তোমাদের সাধ্যমত তাহাদিগকেও সাহায্য করিবে। দরবেশ যখন নিজের অবস্থার কথা বলিবে, নীরবে মনোযোগ সহকারে তাহার কথা শুনিবে, মুখে বিরক্তি কিংবা অধৈর্যের ভাব প্রকাশ করিবে না। বা বক্রদৃষ্টিতেও তাহার দিকে তাকাইবে না। যদি একান্তই তোমার নিকট তাহাকে দিবার মত কিছু না থাকে, তবে অত্যন্ত মোলায়েমভাবে তাহার নিকট ওজর পেশ করিবে এবং ভবিষ্যতে তাহাকে সাহায্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে বলিয়া তাহার নিকট প্রতিশ্রুতি দিবে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সে যেন কোনক্রমেই তোমার প্রতি মনোক্ষুণ্ন বা দ্বিভাব পোষণ করিয়া বিদায় না হয়। যে ভাবে হউক, কথা এবং ব্যবহার দ্বারা তাহাকে খুশী করিয়া বিদায় দিবে।

স্মরণ রাখিবে, দরবেশ ব্যক্তি যখন তোমার নিকট তাহার গোপন বিষয় ব্যক্ত করিয়া বঞ্চিত ও নিরাশ হয়, তখন সে লজ্জিত হইয়া পড়ে এবং পরিতাপ করে। এমন কি সে নফসের নিকট এইভাবে পরাজিত হইবার পর আল্লাহর দরবারে বলে, হে মাবুদ! অনাহারে থাকাই কি আমার নছীবে ছিল? তবে কেন তুমি আমাকে এভাবে অপরের দারস্থ করিলে? এই অবস্থায় দরবেশের অন্তরের নূর ম্লান হইয়া যায়। তাহার ঈমানের আলো নির্বাপিত প্রায় হয়।

রোজকিয়ামতে যখন তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে তখন তুমিও রেহাই পাইবে না। কারণ তাহার এই অবস্থার জন্য তুমিও অনেকটা দায়ী।

দরবেশের উচিত, প্রয়োজন যতই দেখা দেউক না কেন, কাহারও দ্বারস্থ না হওয়া। যদি তাহা না হইয়া পারে, তবে আল্লাহ তাহার হৃদয়কে সম্পদশালী করিয়া দিবেন এবং তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে অফুরন্ত মেহেরবানী দান করিবেন।

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে, পুণ্যবানদের যে কোন বিষয়ের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহতায়ালা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দরবেশদের ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদেরকে বেহেশত প্রদান করিবেন। আল্লাহ বলেন, রোজকিয়ামতে বেহেশতীগণ তাহাদের কাজের জন্য আনন্দোৎফুল্ল থাকিবেন। কোরআনে পাকের বাণীর দ্বারাই প্রমাণিত যে, উপরোল্লিখিত কাজের দ্বারা দরবেশগণ বেহেশতের অধিকারী হইবে। দরবেশ যখন তাহার কাজ শুরু করিয়াছিল, তখন সে বেহেশত আল্লাহর নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়া দিয়াছিল!

আল্লাহতায়ালা কোন এক আসমানী কিতাবে এরশাদ করিয়াছেন যে, বান্দাদিগের মধ্যে আমার নিকট ঐ বান্দা অধিক প্রিয়, যে প্রতিদানের আশা না করিয়া আমার ইবাদাত করে, যেন আমার প্রভুত্বের হক আদায় হইয়া যায়।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যদি বেহেশত এবং দোজখ সৃষ্টি না করিতেন, তবে কেহই তাঁহার ইবাদত করিত না। সকলেই তাঁহাকে স্মরণ করা হইতে উদাসীন থাকিত।

হযরত আলী (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বেহেশত এবং দোজখ যদি সৃষ্টি না করিতেন, তবে কেহই আল্লাহর নির্দেশ পালন করিত না।

অতএব দরবেশ যখন এই সব অবস্থামুক্ত আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরকে খাঁটি ও পবিত্র করিয়া লয়, তখন সে খাঁটি মুরীদ আখ্যায় আখ্যায়িত হয়। সে তখন সত্যিকারের মুরীদরূপে পরিণত হয়। এ সময় আল্লাহ্ তাহার সকল অবস্থায় সাথী হন এবং তাহার ভিতরে আল্লাহ্ প্রেমের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন। নিত্য নূতন নিয়ামত ও উপঢৌকন দ্বারা তাহাকে পুরস্কৃত করেন। যেমন আল্লাহ্ তাহার খাস বন্ধুদিগকে পবিত্র কোরআনে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, কেহ-ই অনবগত নহে যে, তাহার চোখের শান্তির জন্য কি কি বস্তুকে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।
হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার নেককার বান্দার জন্য এমন বস্তু রাখিয়াছি, যাহা কেহ কোনদিন দেখে নাই, কেহ্ কোন দিন তাহার কথা শুনে নাই এবং ঐ সম্বন্ধে কাহারও অন্তরে কোন ধারণাও জন্মে নাই।
কোন দরবেশ যদি অন্তরের সম্পদ লাভ করিবার পরেও তাহার নিজের বা তাহার পরিবারবর্গের জন্য কিছু চাহে, তখন মনে করিবে যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই সে উহা চাহিতেছে, বা তাহাকে চাহিতে বাধ্য করা হইয়াছে। উহা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর ছিল না।
হে লোকগণ! তোমরা বাহিরের ধনী হইলেও অন্তরের দিক দিয়া একেবারেই দরিদ্র। যদি তোমরা দরবেশকে বঞ্চিত কর অর্থাৎ খালি হাতে ফিরাইয়া দাও, তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, তোমার পরিণাম সম্বন্ধে তুমি অনিশ্চিত রহিলে। নিশ্চয় তোমার এই অবাঞ্ছিত কাজের জন্য আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দান করিবেন। তুমি সম্পদশালী হইতে অচিরেই দরিদ্র হইয়া যাইবে এবং দ্বারে দ্বারে হাত বাড়াইয়া ফিরিবে।
অতএব তোমার উচিত, তুমি তোমার এই অবাঞ্ছিত কাজের জন্য দ্রুত তাওবাহ্ করিয়া তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন কর, আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলেই তুমি আল্লাহর আযাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। জানিও আল্লাহতায়ালা বড়ই করুণাময় এবং দয়াশীল ও ক্ষমা প্রদানকারী।

ফকীরী বা দারিদ্র্যকে ভালবাসা

ফকীর বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার দারিদ্র্য বা অভাবানটনকে এইরূপ ভালবাসিবে, ধনবান ব্যক্তি তাহার ধন-দৌলতকে যেমন ভালবাসে। ধনবান ব্যক্তি সর্বদা এইজন্য পেরেশান এবং চিন্তাযুক্ত থাকে যে নাজানি কোনক্রমে তাহার এই ধন-সম্পদ হাত ছাড়া হইয়া যায়। এইভাবে দরিদ্রেরও উচিত সর্বদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকা যে, কোনক্রমেই যেন তাহার অভাব ও দারিদ্র্য দূর না হইয়া যায়। এ ব্যাপারে তাহার আল্লাহর দরবারে দোয়া করা চাই যে, হে মাবুদ! তুমি আমাকে এই অভাবানটনের মধ্যেই বহাল রাখ।
ফকীর গরীবদের জন্য একটি পালনীয় শর্ত এই যে, কোন প্রকারে তাহাদের হাতে মাল আসিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু মাল যেন তাহারা গ্রহণ না করে বা হাতে না রাখে। প্রয়োজনানুযায়ী মাল গ্রহণ করাও শুধু আল্লাহ্ পাকের এই হুকুম তামীল করার জন্য যে, তোমরা তোমাদের প্রাণ হালাক করিয়া ফেলিও না। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ অলা-তাক্বতুলূ আনফুসাকুম ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুম রাহীমা।
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের জান হালাক করিও না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।
যে কোন ব্যক্তির নফসের হক আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ নফসের হক আদায় না করা হারাম। নফসের হক এই যে, প্রাণ রক্ষা এবং দেহ সজীব রাখার জন্য পানাহার করা ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি পরিধান করা। কেননা ইহার অভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করাও সম্ভব নয়।

নফসকে খানা-পিনা প্রদান করা ওয়াজিব। তাই বলিয়া আবার নফসের লালসা পূরণ করা উচিত হইবে না। যথা নফস যদি কোন সুস্বাদু বা মজাদার খাদ্য খাওয়ার জন্য আগ্রহ করে, তবে তাহার সে আগ্রহ পূরণ করা চাই না। হাঁ তবে দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যদি কোন মজাদার খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করা না-জায়েয নহে।

ফকীর বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি একেবারে খালি হাত বা কপর্দক শূন্য হইয়া পড়ে, তবে তাহাতে পেরেশান না হইয়া বরং যেন অন্তরে শক্তি ও সাহস বজায় রাখে। কেননা যাহার মালের যত ঘাটতি ও কমতি হইয়া থাকে তাহার দিলে আল্লাহ তত বেশী নূর দান করেন। কিন্তু এমত ক্ষেত্রে যদি তাহার মনে অস্থিরতা, অশান্তি এবং আল্লাহর দরবারে এই অবস্থার জন্য অভিযোগ করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আল্লাহ তাহাকে একটি কঠোর পরীক্ষার ভিতরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অথবা তাহার দ্বারা হয়ত কোন কঠিন গুনাহর কার্য সংঘটিত হইয়াছে, যাহার ফলে এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় তাহাকে ধৈর্যাবলম্বন করতঃ আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করিয়া নিজেকে স্থির এবং অবিচল রাখিতে হইবে এবং নফসকে এই বলিয়া ধিক্কার এবং তিরস্কার করিতে হইবে যে, হে নফস! তুমি শান্ত হও, তোমারই কারণে আমার যে পদস্খলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহা আমার জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনিত। যদি তুমি শান্ত না হও তবে তোমাকে আমি এমনভাবে জব্দ করিব যে, তুমি একেবারে শায়েস্তা হইয়া যাইবে অর্থাৎ আমি পানাহার একেবারে পরিত্যাগ করিব।

ফকীর দরবেশের কর্তব্য এই যে, তাহার পরিজনের সংখ্যা যত বেশী হইবে, ততই রোজগারের প্রতি নির্লিপ্ত হইয়া আল্লাহর উপরে ভরসা করিয়া থাকিবে। প্রকাশ্যে পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য চেষ্টা করিলেও অন্তরে নির্লিপ্ত থাকিবে। কেননা আল্লাহর নিকট তাহাদের জীবিকা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তাহাদের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কোন না কোনভাবে অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিবে। তাই এই চিন্তা হইতে দূরে থাকা চাই। আল্লাহতায়ালা যে জীবিকার বিষয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহার প্রতি নিঃসন্দেহ থাকিবে। আল্লাহর কোন কথা-কাজ বা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কোনরূপ সমালোচনা বা তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলিয়া বরং তাঁহার নিকট কাকুতি মিনতি করিবে যেন আল্লাহ তোমার সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। আরও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমার উপরে যে দায়িত্ব আল্লাহ অর্পণ করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করার তাউফিক যেন তিনি তোমাকে দান করেন। কারণ আল্লাহই তোমাকে পরিবার পরিজন দিয়াছেন, আবার তাহার প্রতিপালনের ভারও তোমার উপরে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনবরতই দোয়া করিতে থাকিবে, যেন তুমি কোন ব্যাপারেই সমস্যাসঙ্কুল না হইয়া পড়। কাকুতি মিনতি সহকারে ও খালিছ দিলে তাঁহার সকাশে ফরিয়াদ করিলে অবশ্যই তিনি পরম বন্ধুর মত তোমার সাথে ব্যবহার করিবেন।

ফকীর দরবেশদের আর এক কর্তব্য ভবিষ্যতের চিন্তা না করা। বর্তমানের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখাই কর্তব্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কিছু হইতে চক্ষুবন্ধ করিয়া রাখিবে। কোন বস্তু ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিবে না। অন্যের অবস্থার দিকে লালায়িত হইবে না। সর্বদাই দেখা যায়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর দিকে মনোযোগী হইলেই দরবেশের ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে।

যাহারা আহলে হাল, তাহাদের পক্ষে নিরাপত্তা ও নিয়ামত এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, খাদ্য তো সকলেরই স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জনের মূল বস্তু কিন্তু উহাই আবার কাহারও কাহারও জন্য অসুস্থতার কারণ হইয়া দেখা দেয়। চিকিৎসকের নির্দ্ধারিত খাদ্যই রোগীর জন্য আহার করা চাই। অতএব যাহা নির্দেশ করা হয়, দরবেশের জন্য তাহা পালন করাই কর্তব্য। নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা বিসর্জন দিয়া সমস্ত কিছু মালিকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই বিধেয়।

দরবেশদের কর্তব্য, সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। ইহাতে দরবেশের দরবেশীতে অনেক ফায়েদাহ হাসিল হয়।

হযরত রাসূল করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে বস্তু স্বাদ ও আনন্দকে দূর করিয়া দেয়, তাহাকে স্মরণ কর। তাহা মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু নহে।

দরবেশের সুয়াল (সাহায্য প্রার্থনা)

দরবেশদিগের একটি কর্তব্য হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার কাছে একবেলা চলিবার মত কিছু থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের কাছে কিছু চাহিবে না। তবে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি যদি এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, কিছু না হইলেই চলে না, তবে তেমন অবস্থায় কোনরূপে এখনকার মত চলিয়া যায়, এই পরিমাণ কাহারও নিকট প্রার্থনা করা যায়।

দরবেশদের জন্য সুয়াল করা কেবল তখনই সিদ্ধ যখন সব দিক হইতেই তাহার জন্য কিছু আসিবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কোন দিকেই কোন কিছু পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক কথায় যখন সে একেবারে অনন্যোপায় হইয়া পড়ে।

অবশ্য এমন অবস্থায়ও দরবেশের নিজের জন্য সুয়াল না করা উত্তম। বরং এমতাবস্থায় সে তাহার পরিবার পরিজনের জন্য সুয়াল করিতে পারে। তবু যদি দরবেশের নিকট একটি কানা কড়িও থাকে ততক্ষণ পর্যন্তও সে কাহারও নিকট সুয়াল করিবে না। আল্লাহতায়ালারও বিধান এই যে, যাহার নিকট একটি কপর্দকও রহিয়াছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই বান্দার জন্য গায়েবী সাহায্য মদদ প্রেরণ করেন না।

দরবেশের সুয়াল করার একটি শর্ত এই যে, সে যেন সৃষ্টির দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ ধারণা না রাখে বরং তাহার ধারণা থাকিবে এই যে, আল্লাহই তাহাকে সাহায্য করিবেন। তবে কোন মাখলুক উহার উসিলা বা উকীল হইতে পারে মাত্র।

মাখলুক বা সৃষ্টির নিকট সাহায্য প্রার্থনার অর্থ হইল, তাহাদের কাজে নিজের এবং পরিবার-পরিজনদের অভাবানটনের কথাটা প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এ সময় কোন কথার যেন আল্লাহর প্রতি কোনরূপ শেকায়েত বা অভিযোগমূলক কিছু বলা না হয়।

সৃষ্টির নিকট দরবেশের সাহায্য প্রার্থনার ধরন এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, হে আল্লাহর বান্দা! আমার জন্য আপনার নিকট আল্লাহর তরফ হইতে কিছু দেওয়া হইয়াছে কি? অথবা হে আল্লাহর বান্দা! আপনার উপরে আমার বোঝা বহনের কিছু দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে কি?

এই ধরনের বাক্য দ্বারা সুয়াল করা দরবেশের জন্য সিদ্ধ। কিন্তু সরাসরিভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা দরবেশের জন্য নাজায়েয। যে দরবেশ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকে কোন কিছু করিবার মালিক মনে করে সে দরবেশ-ই নয়। বরং আল্লাহর সহিত অংশী স্থাপনকারী।

দরবেশকে যদি কেহ কিছু দান করে তবে শোকর করিবে, আর দান না করিলে ধৈর্যাবলম্বন করিবে। সত্যিকার দরবেশদের স্বভাবই এই।

যদি কেহ দরবেশের সুয়ালের প্রতি কর্ণপাত না করে, তবে সেজন্য পেরেশান কিংবা অধৈর্য হওয়া চাই না। যে কিছু দিল না, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বা কটূক্তি প্রয়োগকারী হওয়া দরবেশের শানের খেলাফ। সুতরাং এইরূপ কিছু হওয়া বা করার বদলে বরং এই অবস্থায় শুধু আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করা চাই যে, মাবুদ! তুমি আমার বিষয় যা হয় কিছু করিয়া দাও। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু করার মালিক। তাহার প্রিয় বান্দার ফরিয়াদ তিনি নিশ্চয়ই কবুল করেন এবং যাহার ফলে দরবেশ যে ব্যক্তির নিকট সুয়াল করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে মুহূর্তে তাহার মনের অবস্থাটাই পরিবর্তিত হইয়া সে-ই হয়ত দরবেশের দরজায় সাহায্যের খাঞ্চা লইয়া উপস্থিত হইবে। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহে এইরূপই হইয়া থাকে।

দরবেশের আচরণ

দরবেশদের উচিত তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ প্রদর্শন করা। তাহাদের সাথে হাসিখুশী মুখে উঠা-বসা করা চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা শরীয়তের খেলাফ কোন কাজে লিপ্ত না হয় ততক্ষণে তাহাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের খেয়াল করা দরবেশের শান নয়। হাঁ যদি তাহারা দ্বীনী শরীয়তের বিপরীত কোন কিছু করিতে আরম্ভ করে, তবে আর তাহাদের সাথে দরবেশের সম্পর্ক বহাল রাখার প্রশ্নই উঠে না।

দরবেশদিগের পক্ষে যতটা সম্ভব বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা কর্তব্য। অবশ্য যদি কোন সৎ ও বৈধ কাজ কিংবা সৎ ও বৈধ ক্ষেত্র হয়, তবেই। অসৎ বা অবৈধ কাজে বা ঐরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার কোন কথাই উঠে না বরং এইরূপ ক্ষেত্রে বন্ধুকে সৎ পথে আনিবার চেষ্টা করাই দরবেশের অন্যতম কর্তব্য।

কোন বন্ধু যদি দরবেশের সাথে বিরোধিতা কিংবা শত্রতা শুরু করে, তবে দরবেশের তাহা সহ্য করিয়া যাওয়া চাই এবং বন্ধুর পক্ষ হইতে যে দুঃখ কষ্ট আসে, তাহা ধৈর্যের সাথে বরণ করিয়া লওয়া চাই। কোন অবস্থাতেই তাহার সহিত শত্রুতামূলক বা বিদ্বেষসূচক আচরণ প্রদর্শন করিবে না, কোন ক্রমেই বন্ধুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। তাহার সহিত কোন প্রকার ছলনা, চাতুরি, প্রতারণা কিংবা যে কোন রকম অশালীন অথবা দুর্ব্যবহার করা চাই না।

বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাহার গীবাত, শেকায়েত, দুর্নাম, বদনাম করা দরবেশীর খাসলাত নহে। যদি অন্য কেহ দরবেশের সম্মুখে তাহার বন্ধুর বিষয় সমালোচনা করে বা অহেতুকভাবে তাহার অপবাদ শুরু করে, তবে দরবেশের উচিত, শান্ত ও মোলায়েমভাবে বুঝাইয়া শুনাইয়া তাহার যবান বন্ধ করিয়া দেওয়া।

দরবেশের উচিত নয়, তাহার এক বন্ধুর আয়েবের কথা অন্য বন্ধুর কাছে প্রকাশ করা। বরং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা গোপন রাখা চাই।

বন্ধু বিমার হইলে দরবেশের কর্তব্য তাহার সেবা-যত্ন করা । যদি কোন বিশেষ কারণে তাহা সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ তাহার রোগ মুক্তির পর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের এই অক্ষমতার ওজর পেশ করিয়া তাহার রোগারোগ্যের জন্য দরবেশের শোকর করা চাই।

কেহ দরবেশের প্রতি জুলুম করিলে তাহার উচিত উহার বদলা লওয়ার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করা।

কেহ দরবেশের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে চাহিলে যতদূর সাধ্য তাহার উচিত ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টা করা।

কেহ দরবেশের সাথে অনবরত অসদাচরণ প্রদর্শন করিতে থাকিলে দরবেশের উচিত অনবরতই তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং আল্লাহর দরবারে এই প্রর্থনা করা যে, আল্লাহ্ তাহাকে সুমতি প্রদান করুন।

কাহারও কোন দ্রব্য তাহার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা দরবেশের জন্য জায়েয নহে। কিন্তু নিজের কোন দ্রব্য নিজের অনুমতি ছাড়া অন্য কেহ ব্যবহার করিলে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া চাই না।

যে কোন প্রকার কার্যকলাপে দরবেশের উচিত পরহেজগারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা। পরহেজগারীর খেলাফ কোন কিছুই করা দরবেশের জন্য শোভা পায় না।

দরবেশের নিকট হইতে কেহ কোন বস্তু ধার নিলে সে তাহা আপনা হইতে ফিরাইয়া না দিলে, দরবেশের পক্ষে তাহা তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া শানের বিপরীত। তবে একান্তই যদি ঐ বস্তুর প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে উহা চাহিয়া আনিয়া নিজের কাজ সারিয়া আবার উহা সেই ব্যক্তির নিকট পৌছাইয়া দেওয়া দরবেশী বৈকি!

যে সকল কাজ সর্ব সাধারণের জন্য বৈধ, কিন্তু পরহেজগারীর দৃষ্টিতে না করিয়া পারিলে ভাল, দরবেশের পক্ষে অবশ্যই সেই সব কাজ হইতে পরহেজ করা চাই। পক্ষান্তরে যে সকল কাজ ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নত নহে কিন্তু করা উত্তম। অবশ্য সর্ব সাধারণ লোক সেগুলি খুব কমই করিয়া থাকে, কিন্তু দরবেশদিগের সেই সব কাজ করার অভ্যাস করিয়া লওয়া অবশ্য কর্তব্য।

যদি কোন বন্ধু হাসিখুশী ও আনন্দোৎফুল্ল মনে দরবেশের কাছে উপস্থিত হয়, তবে নিজের পেরেশানী ও দুঃখ ক্লেশের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার খুশী ও আনন্দে বিঘ্ন ঘটানো দরবেশের মোটেই উচিত নহে। বরং এমতক্ষেত্রে নিজের অবস্থা গোপন রাখা চাই।

যে লোক যে শ্রেণীর বা ধরনের, তাহার সহিত সেই ধরনের আলাপ পরিচয় এবং ব্যবহার করা চাই। মোটকথা, ব্যবহার দ্বারা সব লোককেই সন্তুষ্ট রাখা দরবেশের কর্তব্য। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই শরীয়তের সীমারেখার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। কাহাকেও খুশী করিতে গিয়া যদি শরীয়তের গণ্ডি অতিক্রম করিতে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে শরয়ী নির্দেশেরই গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয় তবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাইবে না।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, আমাদের নবী-রাসূলদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে তাহার জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাপ অনুসারে কথা বার্তা বলিবে এবং যে যে শ্রেণীর লোক তাহার সহিত সেই অনুসারে ব্যবহার করিতে হইবে। সামাজিক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি কিছুটা নীচুস্তরের লোক তাহার সহিত স্নেহ আদর পূর্ণ এবং যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র, তাহাকে তাজীম এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আপ্যায়িত করিবে। আর যে মধ্যম শ্রেণীর লোক তাহার সহিত বন্ধুত্ব এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে।

দরবেশের পানাহারের আদব

লোভ-লালসার সাথে, শুধু নফসকে তৃপ্তি প্রদান করার জন্য আল্লাহকে ভুলিয়া পানাহারে লিপ্ত হইবে না। অর্থাৎ পানাহারের সময়েও অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করিতে থাকিবে।

পানাহারের মজলিসে নিজের অপেক্ষা সম্মানিত লোক থাকিলে তাহার আগে খাদ্যের প্রতি হাত প্রসারিত করিবেন না। বরং সে খাদ্যে হাত দিবার পর তোমারও খাদ্যে হাত বাড়াইবে। খেদমতের উদ্দেশ্য বা খুশীর জন্য যে কোন কারণেই হউক নিজের সম্মুখের খাদ্য উঠাইয়া অন্যের সম্মুখে দিবে না। অবশ্য মেহমান ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারে। কোন মেহমানকে নিজের সাথে খাওয়ার আহ্বান করিয়া তাহাকে কষ্ট দিবে না। তোমাকে মেজবান যেখানে খাইতে বসিতে দেয়, সেখানেই বসিবে। অন্যত্র বসিতে যাইবে না। যাহাদের সাথে খাইতে বসিবে তাহাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের হাত গুটাইয়া বসিবে না। ইহাতে তাহারা লজ্জিত হইয়া ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও হয়ত আর না খাইয়া উঠিয়া পড়িবে।

ভোজনরত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত খাইতে আগ্রহী বলিয়া মনে হইবে ততক্ষণে তাহার নিকট হইতে আহার্য দ্রব্য উঠাইয়া লইবে না। বরং তাহাকে আরও খাইতে অনুরোধ করিতে থাকিবে। দুইজন এক বরতনে খাইতে বসিলে যাহার খাদ্য সে খাইবে। একজন অপরজনকে খাওয়াইয়া দিবে না। খাওয়ার সময়ে কেহ অধিক খেদমত করিতে চাহিলে যেমন হাত ধোয়াইয়া দিতে এবং বরতনাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিবে। নিজের হাত নিজেই ধুইবে।

কেন বিশেষ প্রকার খাদ্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিবে না। কারণ তাহাতে মেজবানের অসুবিধা হইতে পারে বা উহা তাহার অস্বস্তির কারণও হইতে পারে। কোন বিশেষ খাদ্য খাওয়ার আসক্তির কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও হইতে পারে। কোন বিশেষ খাদ্য খাওয়ার আসক্তির কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও ঘটিতে পারে, ইবাদত বন্দেগীতে বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। যে খাদ্য সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আসিবে তাহাতেই খুশী থাকিবে এবং আগ্রহের সাথে আহার করিবে। আর তাহাতেই আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করিবে।

নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক

কয়েকজন দরবেশ এক সঙ্গে থাকিলে কেহ নিজের জিনিস পত্র এবং কাপড় চোপড় এই নিয়তে পৃথক করিয়া বিশেষ হেফাজতে রাখা চাই না যে, অন্য কাহাকেও উহা ব্যবহার করিতে দিবে না। কেননা দরবেশদের আচরণ এইরূপ হওয়া তাহাদের শানের খেলাফ। কেহ কাহারও কোন বস্তু ব্যবহার করিতে চাহিলে প্রয়োজনে একে অন্যকে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে। একজনের জায়নামাযের উপর অন্যজনে পা রাখিলে তাহাতে জায়নামায ওয়ালার মনোক্ষুণ্ন না হওয়া চাই। অবশ্য একে অপরের জায়নামাযে তাহার অনুমতি ছাড়া দাঁড়াইয়া যাওয়াও উচিত নহে। মোটকথা, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বিবেচনাশীল হইতে হইবে। অর্থাৎ একজনে অন্যের কোন বস্তু তাহার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করিবে না। আবার কেহ ব্যবহার করিয়া বসিলে, যাহার জিনিস, তাহার বিরক্ত কিংবা অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হইবে না।

কয়েকজনে একত্রে বসবাস করিলে বা এক সাথে সফর করিলে, কেহ তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য কিংবা অধিক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করিবে না। কেননা তাহাতে নিজেদের মধ্যে দ্বিভাব এবং পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সূচনা ঘটিতে পারে।

একত্রে থাকা কালে কেহ অন্যের সাথে কথাবার্তা বলা বা পরামর্শ করা ছাড়া হঠাৎ করিয়া খুব জোরে যিকির শুরু করা রীতির খেলাফ, ইহা অন্যান্যদের অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ হইতে পারে। অতএর এইরূপ না করিয়া বরং নীরবে যিকির-আযকার করাই সকলের জন্য ভাল হইবে। অন্যান্য দরবেশের সামনে একজনের অত্যধিক নফল নামায পড়াও ভাল নহে। কেননা একে তো ইহাতে রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। আর তাহা না হইলেও দরবেশগণ হয়ত অযথাই রিয়াকারী ভাবিয়া নিজেরা গুনাহ্‌র ভাগী হইবে।

অন্যান্য সকলে যদি জাগিয়া থাকে তবে তাহার মধ্যে একজনের হঠাৎ শয়ন করা ঠিক নহে। হাঁ, তবে কাহারও চোখে নিদ্রা ছাপাইয়া আসিতে পারে, তবু সকলের মধ্যে একার শয়ন করা দৃষ্টিকটু মনে হইবে বলিয়া একটু কষ্ট এবং অসুবিধা হইলেও কিছু সময় অপেক্ষা করিবে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে রত হইয়া চক্ষুর নিদ্রাকে দূরে সরাইয়া দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন দরবেশের কাছে কোন জিনিস প্রার্থনা করে তবে নিজের কিছুটা অসুবিধা কিংবা কষ্ট হইলেও তাহাকে সেই জিনিস দিয়া দিবে। এমন কি যদি দরবেশের নিকট কোন বিষয়ে সূক্ষ্ম পরামর্শ তলব করে, তবে অত্যন্ত মনোযোগ এবং একাগ্রতার সাথে তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে উচিত এবং সূক্ষ্ম পরামর্শ প্রদান করিবে।

পরিবার পরিজনদের সাথে সম্পর্ক

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সৎস্বভাববিশিষ্ট এবং চরিত্রবান করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। তাহাদের ভরণ-পোষণ এবং অন্যান্য যাবতীয় দায়িত্বও পালন করিবে।

পরিবারের সকলের আহারের পর সবশেষে নিজে আহার করিবে। তাহাদের সকলের সাথে কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্বের আচরণ প্রদর্শন না করিয়া বরং খাদেমের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাও তাহাদের যাবতীয় কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা আল্লাহর নির্দেশ মনে করিবে । নিজের সুখ-সুবিধা ও শান্তির দিকে বেশী লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের সুখ শান্তির দিকেই মনোযোগী থাকিবে। পরিবারের খেদমত করিতে জীবিত থাকিতে হইবে, এই নিয়তে নিজে পানাহার করিবে। পরিবারে লোকদের দ্বারা নিজে উপকার লাভ করিবে, এইরূপ নিয়ত করা চাই না।

দরবেশের গৃহে একদিনের উপযোগী রুজী থাকিলে আর একদিনের রুজীর জন্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ কাজ।

মিতব্যয়ী হওয়া দরবেশীর পরিচয়, নিজেই শুধু নহে, বরং পবিরার-পরিজনদেরকেও মিতব্যয়ী বানাইতে চেষ্টা করিবে।

অবশ্য দরবেশ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া অনাহারের কষ্ট বরণ করিয়া লইতে পারে ও পরিবারের লোকদের সেই ক্ষমতা না থাকে তবে এমত ক্ষেত্রে দরবেশের তাওয়াক্কুল অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত নহে বরং তাহাদের জন্য জীবিকার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদের জন্য জীবিকা উপার্জনে সততার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, নিজে পুরা দরবেশী অবলম্বন করিলেও যদি তাহার পরিবার-পরিজনের জীবিকা হালাল না হয়, তবে তাহার দরবেশী নিরর্থক হইবে। পরিবার-পরিজনকে হালাল রুজী যোগাইয়া দিতে পারিলে তাহার দরবেশীর ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। পক্ষান্তরে হালাল রুজীর বরকতে পরিজনদের মধ্যেও তাহার দরবেশীর প্রভাব দ্রুত কার্যকরী হইবে এবং তাহারাও আল্লাহর রহমতে দরবেশের দপ্তরভুক্ত হইয়া যাইবে।

গৃহে মেহমান আসিলে নিজে যেমন তাহার যত্ন করিবে পরিবার-পরিজনদেরকেও তদ্রুপ করিতে শিক্ষা দিবে। নিজে মেহমানের সাথে একত্রে বসিয়া আহার করিবে। তবে নিজের জন্য বিশেষ কোন ওজর থাকিলে পরিবারস্থ কাহাকেও অন্ততঃ মেহমানের সহিত আহারে বসাইবে। নিজে বা পরিবারে কেহই যেন এমন কোন কাজ না করে, যাহা দ্বারা মেহমানের মনে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে যে, তাহার প্রতি বিরক্তি, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইতেছে।

গৃহে যদি পযার্প্ত পরিমাণে আহার থাকে তবে তো কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি উহা পরিমাণে কম থাকে তবে মেহমানকে আগে আহার করাইয়া পরিবারের লোকেরা পরে আহার করিবে, যাহাতে মেহমান আসুদাহভাবে আহার করিতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে পরিবারস্থ লোকদেরকে পূর্বেই বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইতে যে, তাহাদের কোন কথা, আচরণ বা ব্যবহারে যেন ইহা প্রকাশ না পায় যে, গৃহে অপ্রচুর খাবার ছিল। তাহা হইলে মেহমান আসুদাহ হইয়া ভোজন করা সত্তেও তাহার মনে শান্তি থাকিবে না। বরং অস্বস্তিতে মন খারাপ হইয়া যাইবে। সে নিজের প্রতিও বিরক্ত হইয়া পড়িবে।

যে গৃহে যত বেশী মেহমানের আগমন ঘটে, যে গৃহে আল্লাহর রহমতও তত বেশী নাযিল হয়। এই কথা খাঁটি যে, মেহমান তাহার নিজের জীবিকা সাথে লইয়াই মেজবানের গৃহে আগমন করে এবং পানাহারের পরে যখন সে চলিয়া যায়, তখন গৃহস্বামীর পাপও সে সাথে করিয়া লইয়া যায়।

দরবেশের নিজের কোথাও দাওয়াত থাকিলে এবং তখন নিজের গৃহে জীবিকার অভাব থাকিলে সন্তান-সন্ততিকে উপবাস রাখিয়া নিজে দাওয়াত গ্রহণ করতঃ তৃপ্তির সাথে পানাহার করা কোন মতেই উচিত নহে। ইহা মানবতার পরিপন্থী। অতএব এই অবস্থায় দাওয়াত কবুল করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

অবশ্য দাওয়াতকারী ব্যক্তি যদি বিবেচনাশীল এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন হয় এবং দরবেশের গৃহে তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য খানা পাঠাইয়া দিবার কথা পূর্বাহ্নেই উল্লেখ করে, তবে তাহার গৃহের দাওয়াত কবুল করা যাইতে পারে।

সন্তান-সন্ততির তালীম-তারবিয়াত

দরবেশ ব্যক্তির জন্য নিজের সন্তান-সন্ততিকে শরীয়তের এলম শিক্ষা দান করা অবশ্য কর্তব্য, যেন তাহারা তাহাদের আমলসমূহ শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক করিয়া লইতে পারে।

সন্তান-সন্তদিদেরকে কখনও দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্যসুলভ শিক্ষা লাভ করিতে নিযুক্ত করিবে না। কেননা তাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে কোন কিছুই জানিতে পারিবে না। ফলে তাহাদের ইহকাল অর্জিত হইলেও পরকাল বরবাদ হইয়া যাইবে। অথচ পরকালের সাফল্যই প্রত্যেকের জন্য লক্ষ্য হওয়া চাই।

তবে অবস্থা যদি এমনই নাযুক অর্থাৎ সঙ্কটজনক হয় যে, রুজী রিজিকের জন্য পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষা দান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে পার্থিব শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীন ও শরীয়ত মত জীবন যাপনের অপরিহার্য বিষয়গুলিও যাহাতে আয়ত্ত করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা চাই।

সন্তান-সন্ততিকে পিতা-মাতার খেদমত এবং তাজীম সম্পর্কে শিক্ষাদান করা দরবেশদের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব এবং কর্তব্য বৈ কি! একইভাবে সহধর্মিণীকেও স্বামীর খেদমত করা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া চাই।

মুজাহিদাহ

আলাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

উচ্চারণ ঃ অল্লাযীনা জাহাদূ ফীনা লানাহদিইয়ান্না হুম সুবুলানা।

অর্থাৎ যাহারা আমার পথে চেষ্টা যত্ন করে, আমি আমার নৈকট্য লাভের পথ তাহাদেরকে প্রদর্শন করিয়া থাকি।

আবু নছর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, শ্রেষ্ঠ জিহাদ কি? হুযুর (দঃ) এরশাদ করিলেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য (উচিত) কথা বলাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

আবু সাঈদ (রাঃ) এই কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আবু আলী দাক্কাক বলেন, যে ব্যক্তি বহির্ভাগকে মুজাহিদাহ দ্বারা শোভিত করে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার অভ্যন্তরকে মুশাহিদাহ দ্বারা সুশোভিত করিয়া দেন। যে ব্যক্তি প্রারম্ভ কালে কষ্ট স্বীকার না করে, সে তরীকতের ঘ্রাণও লাভ করে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার কাজ আরম্ভ কালে দাঁড়ানোর অভ্যাস না করে, কাজের শেষে তাহার বসার সৌভাগ্য হয় না।

সাররী সাকতী (রহঃ) বলিতেন, ওহে যুবকগণ! আমার বয়সে পৌছার পূর্বেই তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা কর। কেননা ইহার পর তোমরা অলস হইয়া যাইবে এবং ইবাদাত-বন্দেগী করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। যেমন আমি অলসতা করি। অথচ সত্য ঘটনা ছিল এই যে, হযরত সাররী সাকতী (রহঃ) তখন যুবকদের অপেক্ষা অনেক বেশী ইবাদাত করিতেন।

হাসান রাজ্জাক (রহঃ) বলেন যে, তিনটি বস্তুর ভিত্তির উপর সুলুক প্রতিষ্ঠিত। যথা ঃ (ক) ক্ষুধার কষ্টে অধীর হইয়া আহার করা (খ) নিদ্রায় একেবারে ঢলিয়া পড়ার অবস্থা হইলে শয়ন করা এবং (গ) চুপ করিয়া থাকিলে যখন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন কথা বলা।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ এই কাজগুলি না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নেককারদের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। কাজগুলি হইল ঃ (১) আলোচনার দরজা খোলা রাখিয়া নিয়ামতের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া (২) সম্মান লাভের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া লাঞ্ছনার পথ উন্মুক্ত রাখা (৩) সম্পদের আশা পরিত্যাগ করতঃ দারিদ্র্য গ্রহণ করা এবং (৪) সব আশা ভরসা পরিত্যাগ করতঃ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা।

আবু ওমর ইবনে মোনায়েম বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে যুবক মনে করে, তাহার দ্বীন তাহার নিকট হীন ও অপদস্থ হয়।

আবু আলী রুদবারী বলেন, পাঁচ দিন অনাহারে থাকার পর সুফী যদি বলেন, আমি ক্ষুধার্ত, তখনই তাহাকে জীবিকা অর্জনে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যাহাকে হীন ও অপদস্থ হওয়ার দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়, সেই আল্লাহর অধিক প্রিয় বান্দা। যে অপদস্থ হওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার মত হীন ও অপদস্থ আর নাই।

মুহাম্মদ ইবনে ফজল বলেন, আশা আকাঙ্ক্ষা করা হইতে যে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত সুখী।

তিনি আরও বলেন যে, নফসের খাহেশ তোমার জন্য কয়েদখানা সদৃশ, উহা হইতে মুক্তি পাইলেই তুমি শান্তির স্বাদ লাভ করিবে।

প্রকাশ্য কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করা প্রাথমিক কাজ। তারপর নিজেকে যে কোন অন্যায় কাজ করা হইতে পবিত্র রাখিতে হয়। কখনও কখনও এমনও হইয়া থাকে যে, অনাহারে থাকার অভ্যাস হইয়া যায় ঠিকই কিন্তু কিছু কিছু বদ অভ্যাস তখনও থাকে। উহা পরিত্যাগ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। যেমন নিজের সম্বন্ধে মানুষের প্রশংসা শুনিতে খুবই ভাল লাগা। ইহা মারাত্মক ক্ষতিকর। আবার কখনও কখনও মানুষের মুখে নিজের ইবাদাত-বন্দেগীর প্রশংসা শুনিয়া ইবাদাত-বন্দেগীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু আবার যখন মানুষ তাহার প্রশংসা করা ছাড়িয়া দেয়, অমনি তাহার ইবাদাতের মাত্রাও কমিয়া যায়। ইহা খুলুছিয়তের অনুপস্থিতি এবং এক ধরনের সূক্ষ্ম শিরক। সততা, দানশীলতা, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সৎস্বভাব ও সৎ গুণাবলী অলী-আল্লাহ্ এবং আবদালগণের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু তুমি যখন একবারও তোমার মধ্যে এই সমস্ত স্বভাবের সন্ধান করিবে, দেখিবে যে, তোমার মধ্যে উহার একটিরও অস্তিত্ব নাই। যদি তুমি সত্যিকার আবেদ হইতে, তবে লোকদেখানো কোন কাজ করিতে না।

আবু হাফস (রহঃ) বলেন, তোমার নফস একটি অন্ধকারময় গৃহ বিশেষ। ইখলাস হইল উহার প্রদীপ। উহার আলো তাহার তাউফিক। যে ব্যক্তির অন্তরের সাথে তাউফিকে-ইলাহী শামিল না হয়, উহাতে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

হযরত আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লোক নিজের নফস ব্যতীত অন্য কিছুকে ভাল মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ত্রুটী-বিচ্যুতি ও দোষ-গুণ কিছুই দেখিতে পায় না।

হযরত আবু হাফস (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের দোষ দেখিতে না পায়, সে-ই নিজের জন্য মারাত্মক ধ্বংস ডাকিয়া আনে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, একেবারে খাঁটিকথা, পাপ কুফরীর অগ্রদূত সদৃশ।

হযরত সাররী সাকতী (রহঃ) বলেন যে, বাজারে কোরআন পাঠকারী, ধনী আলেম এবং অন্যান্য ধনীদের সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করা চাই।

মুজাহিদাহর মূল বস্তু হইল, লোভ লালসা পরিত্যাগ করা এবং একমাত্র আল্লাহর খুশী হাসিলের লক্ষ্যে একাগ্রচিত্তে ইবাদাত করা।

বিপদের উপকরণ ঃ হযরত মানসুর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি আবু আলী রুদবারীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুজাহিদাহর প্রতিবন্ধক স্বরূপ যে বিষয়গুলি রহিয়াছে, তাহার প্রধান উপকরণ তিনটি। যেমন ঃ (১) তবিয়তের অসুস্থতা (২) অভ্যাসের দাস হইয়া থাকা এবং (৩) সংসর্গের দোষ।

আবু মানসুর (রহঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবিয়তের অসুস্থতার তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন, উহা হইল নিষিদ্ধ জীবিকা। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, অভ্যাসের দাস হইয়া থাকার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, কুদৃষ্টি এবং নিষিদ্ধ বস্তুর দ্বারা ফায়েদাহ হাসিল করা। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, সংসর্গের দোষের তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন, নফস কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করিলেই তাহা পুরা করিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া।

হযরত আবুল হাসান ওয়ারাক (রহঃ) বলেন যে, আমি মুজাহিদাহর প্রারম্ভে যখন মসজিদে-আবু ওসমানে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন দিবাভাগে আমার নিকট তোহফা-স্বরূপ যাহা কিছু আসিত, সাথে সাথে আমি তাহা অন্যান্যকে দিয়া দিতাম, এমন কি রাতে আমার নিকট এক রতি মাল কিংবা একটি কপর্দকও থাকিত না। ঐ সময় যাহারা আমার সহিত অহেতুকভাবেও অসৎ আচরণ করিত, আমি শুধু আমার নফসকে শায়েস্তা করার জন্য তাহার কোন প্রতিকার তো করিতামই না

বরং উলটা তাহার নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতাম। আর যখন কাহারও কোন আচরণ ও ব্যবহারে আমার মনে তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার উদ্রেক হইত, অমনি আমি তাহার নিকট গিয়া নানাভাবে তাহার খেদমতে ব্যাপৃত হইতাম।

মুজাহিদাহর মূল কথা হইল, সর্বক্ষেত্রে নফসের বিরোধিতা করা, নফসকে দাবাইয়া রাখা। নফস যাহা করার জন্য প্রেরণা দিবে, তাহার বিপরীত কাজ করা। নফস বলিবে, দক্ষিণ দিকে যাও, যাইতে হইবে উত্তর দিকে। নফস বলিবে, বসিয়া থাক, কিন্তু তোমার উচিত হইবে উঠিয়া চলিতে শুরু করা। মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে নফসের খাহেশের বিপরীত কাজ করা চাই। এইভাবে করিতে থাকিলে বাধ্য হইয়া নফস শায়েস্তা হইয়া যাইবে।

মুরাকাবা বা মুজাহিদাহর সাহায্যকারী উপকরণ

মুরাকাবা দ্বারা মুজাহিদাহর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। ফিরেশতা জিব্রাইল হুযুরে পাক (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহ্সান কি? হুযুরে পাক (দঃ) জবাবে বলিলেন, তুমি এমনভাবে ইবাদাত কর যেন আল্লাহতায়ালাকে দেখিতেছ। আর যদি তোমার অবস্থা তেমনটা না হয়, তবে মনে করিবে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে দেখিতেছেন। মুরাকাবা ইহাই, বান্দা ইয়াকীন রাখিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাহার সব কিছুরই খবর রাখেন। সদা-সর্বদা বান্দার মনে এই কথাটা জাগরুক থাকার নামই মুরাকাবা। বান্দার জন্য যত রকম ভালাই এবং কল্যাণকর বস্তু রহিয়াছে, সকল কিছুর মূলই হইল এই মুরাকাবা। সালেকের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য মুরাকাবাই হইল প্রধান অবলম্বন।

কোন কোন বোযর্গের মতে নিম্নোক্ত বস্তুগুলির দ্বারা মুজাহিদাহ পূর্ণতা লাভ করে। উহা হইল ঃ আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান লাভ করা, আল্লাহর শত্রু ইবলীস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা, এই বিষয়ে খুব খেয়াল থাকা যে, আমার নফস প্রায়শঃ আমাকে অন্যায়ের প্রতি উৎসাহ্ দিবে। ইবাদাত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা। কোন ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়গুলিতে জ্ঞান লাভ না করিয়া সারা জীবন ইবাদাত করিলেও তাহার সেই ইবাদাত কোন কাজে আসিবে না।

আল্লাহকে এইভাবে চিনা চাই যে, তিনি একক। তাহার কোন শরীক নাই। তিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তাঁহার ইচ্ছায়ই সব কিছু হইতেছে। তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁহার অগোচরে কোন কিছুই হয় না এবং হইতে পারে না। তিনি ছাড়া আর কেহ কাহারও কোন আশা পূর্ণ করিতে পারে না। তিনিই বিচার দিনের মালিক। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন। আবার যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিয়া শাস্তি প্রদান করিবেন।

আল্লাহতায়ালাকে এইভাবে চিনিতে পারিলেই তাহার কর্তব্য হইয়া পড়ে হক ও না হক পার্থক্য করিয়া চলা এবং শয়তানের প্ররোচনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিরাপদ থাকা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শয়তানের বিরোধিতা করা চাই। সর্বদা আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করা চাই, যেন শয়তানের মত ভীষণ শত্রুর উপরে জয়যুক্ত হওয়া যায়, আল্লাহ্ পাক যেন তদোপযুক্ত শক্তি দান করেন। কেননা তাঁহার সাহায্য ছাড়া এমন প্রতাপশালী শয়তানের উপর জয়লাভ করা সম্ভবপর নয়।

নফসের উপরেও খুব কঠোর হইতে হইবে এবং অতি সূক্ষ্মভাবে উহার নিকট হইতে হিসাব কিতাব গ্রহণ করিতে হইবে। নফসের সাহায্যেই শয়তান মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। নফসের হিসাব কিতাব গ্রহণে অলসতা করিলে সে প্রতাপান্বিত হইয়া তোমাকে একেবারে অধপাতে নিয়া ছাড়িবে। নফসকে শয়তানের বসিবার আসন এবং গুপ্ত পরামর্শের গোপন স্থান বলা যায়। আমি বহুত নামায পড়ি, রোযা রাখি, আল্লাহর বহু ইবাদাত করি, এইরূপ ধারণা করা উচিত নয়। তোমার ঐসব ইবাদাত-বন্দেগী তো একেবারেই লোক দেখানো। তাহা না হইলে তোমার মনে নিজের ইবাদাত-বন্দেগী সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা কিছুতেই হইত না। ঐধারণা অন্তর হইতে মুছিয়া

ফেলিয়া একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রতিদানের আশা না করিয়া আল্লাহর কাজ করিয়া যাইতে থাক শুধু ইহাই তোমার জন্য মঙ্গলময়।

শয়তানের পরিচয়

শয়তান আল্লাহ্, সৎকাজ এবং বেহেশত হইতে দূরবর্তী এবং অপকর্ম, কুকাজ ও দোজখের নিকটবর্তী।

আল্লাহতায়ালা তাঁহার পয়গম্বর এবং অন্যান্য বান্দাগণকে বলেন, তোমরা বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাহা হইলে দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিবে এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ আল্লাহর দর্শন লাভে সক্ষম হইবে। আল্লাহতায়ালা ইহাই বলিতে চাহেন যে, আমার বান্দা! শয়তান আমার নিকট হইতে দূরে এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী। শিষ্টতার সাথে নিজের অবস্থাকে সুরক্ষিত কর, যেন শয়তান কোন প্রকার ধোকা বা প্রবঞ্চনা দ্বারা তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে। ভালভাবে শিষ্ঠতা লাভের উপায় হইল, আল্লাহর নির্দেশিত কার্যসমূহ পালন করা। নিষেধকৃত কার্যসমূহ হইতে বিরত থাকা এবং জান-মাল, সন্তান-সন্ততি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন উহাতে সন্তুষ্ট থাকা। যেই ব্যক্তিই ইহাতে দৃঢ়পদ থাকে, শয়তান তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে। সে পরকালে নবী, সিদ্দীক এবং বোযর্গদের সাথে চির শান্তিময় বেহেশতে অবস্থান করিবে। আর এই সান্নিধ্য খুবই শান্তিময়। এখানে সে সর্বদা আল্লাহতায়ালার অশেষ নিয়ামত দ্বারা তৃপ্ত হইতে থাকিবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, হে শয়তান! আমার খাস বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা ও আধিপত্য খাটিবে না।

অতএব যখন মহান প্রভুর দরবার হইতে কোন ব্যক্তির বন্দেগীর সনদ মিলিয়া যায়, তখন হীন, নীচ শয়তান তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয় না। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন প্রকারের শয়তান তাহার নিকট আসিবে না এবং পাপ ও অন্যায়ের প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। শয়তান এইরূপ ব্যক্তির নিকট আসিলে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যায়।

এই অবস্থায় এক অদৃশ্য আওয়াজ আসে, যে ব্যক্তি নফসের বিরোধিতা করিয়া সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সঠিক পথে চলে, সে ব্যক্তি এইরূপ মর্যাদাই পাইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন ফিরেশতাগণ তাহার আত্মা আল্লাহর দরবারে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকেন। ফিরেশতাগণ তাহার সুনাম করেন, আল্লাহ্ তাঁহার এইরূপ বান্দার জন্য গর্ব অনুভব করেন। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করিয়া চলে, সে ব্যক্তি অবশ্যই শয়তানের ধোকা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

সুতরাং মানুষের উচিত শয়তান হইতে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা এবং তাহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া। আল্লাহ্ বলেন, শয়তান হইতে দূরে থাক, শয়তান তোমাদের শত্রু। তোমরাও তাহার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। তাহার সাথে দোজখে থাকার জন্য সে তাহার সম্প্রদায়কে আহ্বান করে।

আল্লাহ্ আরও বলেন, শয়তান বহু লোককে গোমরাহ্ করিয়া দিয়াছে, তোমরা কি তাহা উপলব্ধি করিতে পার না? শয়তানের অনুসরণ করা প্রত্যেকটি দুর্ভাগ্যের মূল। যদি কেহ শয়তানের বিরোধিতা করে, তবে সে পরকালে অশেষ নিয়ামত ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অতিবাহিত করিবে।

শয়তান 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম' পাঠ করাকে এবং আশেকদের অন্তরে নূরের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে অত্যন্ত ভয় পায়। যদি তুমি আশেক না হও তবে আউযু পাঠ করাকে তোমার জীবনের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া মানিয়া লও। যখন আশেক হইবে, তখন তোমার অন্তরের নূরের শিখাই শয়তান ও তাহার দলবলকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

যেমন হযরত রাসূলে করীম (দঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন যে, ওমর! তোমার ছায়া দেখিলেই শয়তান ভয়ে পলায়ন করে।

হুযুরে পাক (দঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, যে জনপদে ওমর গমন করে, শয়তান সে জনপদ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

কথিত আছে যে, শয়তান হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিলে পাগলের মত হইয়া যাইত।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন শয়তান জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি সত্যবাদী এবং তাহার শত্রু, তখন সে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়। কিন্তু খুব সংগোপনে তাহার দিকে খেয়াল রাখে। একটু সুযোগ পাইলেই তাহার উপর হামলা চালায়।

অতএব মানুষের উচিত সত্যবাদী হওয়া এবং শয়তানের প্ররোচনা হইতে সর্বতোভাবে নিরাপদ থাকা। কারণ শয়তান মানুষের পুরাতন শত্রু এবং সে অতি সূক্ষ্ম পথে মানুষের মধ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে। মানুষের সমস্ত রগে এমন কি প্রতিটি রক্ত কণিকার মধ্য দিয়া সে চলিতে পারে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মুনাজাত করিতেন, হে প্রভু! আমাকে ব্যভিচারী এবং হত্যা করা হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখনও ব্যভিচার করার আশঙ্কা করেন কি? তিনি জবাবে বলিলেন, কেন ভয় করিব না? আমার শয়তান যে এখনও জীবিত।

শয়তান হইতে বাঁচিবার উপায়

যে সকল হাতিয়ার শয়তানের ধোকা হইতে মানুষকে পরিত্রাণ পাওয়ায় সাহায্য করে, উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হইল, কালেমায় তাওহীদ পাঠ করা এবং আল্লাহতায়ালার যিকির করা।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আমার দুর্গ। যে ব্যক্তি এই কালেমা পাঠ করে সে আমার দুর্গে চলিয়া আসে। তাহার শাস্তির কোন ভয় নাই। আল্লাহ আরও বলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রতার সাথে কালেমায় তাওহীদ পাঠ করে এবং আমার আদেশ নিষেধ মানিয়া চলে, পাপীষ্ঠ শয়তান তাহাকে সামনে দেখিলেই দ্রুত চলিয়া যায়। সে শয়তানের শয়তানী হইতে এমন ভাবে বাঁচিয়া থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রাঘাত হইতে ঢালের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে।

"বিসমিল্লাহ" বহু সংখ্যক বার পাঠ করা চাই। তাহাতে শয়তান হইতে নিরাপদ থাকিবে।

হুযুরে পাক (দঃ) বলেন, আমি শুনিলাম, এক ব্যক্তি বলিতেছে, শয়তান ধ্বংস হউক। আমি তাহাকে বলিলাম এমন কথা বলিও না। ইহা বলিলে সে মনে করে যে, সে খুব একটা কিছু। আমার ইযযতের কসম, আমি উহার উপর জয়লাভ করিয়াছি সুতরাং তুমি বল, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। ইহা পাঠ করিলে শয়তান কুঁকড়াইয়া পিপড়ার ন্যায় হইয়া যায়। সে আর ভয়ে তাহার নিকটেই আসে না।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর মেহেরবানী ব্যতীত দুনিয়াদারের ন্যায় সম্পদের লালসা করে, উহার প্রশংসা করে, সম্পদ সঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকে, তবে সে যেন শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই অবস্থায় তাহার সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ শয়তানের সম্পদে পরিণত হয়।

অতএব মানুষের কর্তব্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং তাহারই উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করা। প্রত্যেকটি হারাম এবং সন্দেহজনক বস্তু হইতে দূরে থাকা। যাহা হালাল উহা সামান্য হইলেও উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে।

যে ব্যক্তি হালাল হারামের পরওয়া করে না, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি উদাসীন থাকেন যে, দোজখের কোন দরজা দিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি রাহমানের যিকির করা হইতে বিরত থাকে, আমি তাহার উপর তাহার শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই, তখন শয়তান এই ব্যক্তির উঠা-বসার সঙ্গী হইয়া যায়। শয়তান তখন নানাভাবে তাহাকে ধোকা দিতে থাকে। যেমন হারামকে হালাল করিয়া দেখায়, সৎকাজে বাধা প্রদান করে, ওয়াজিব ও সুন্নত কাজ করিতে দেয় না ইত্যাদি। এমন ব্যক্তি উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরকালে ইহার হাশর শয়তানের

সাথে হইবে। অনেক লোক বার্দ্ধক্যে শয়তানের ধোকায় পড়িয়া ঈমান হারাইয়া ফেলে। ইহারা অনন্তকাল ধরিয়া শয়তানের সহিত দোজখে থাকিবে। ফিরাউন, হামান, কারুন, নমরুদ ইত্যাদির সাথে ইহাদের হাশর হইবে।

হে মাবুদ! আমরা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে শয়তানের আনুগত্য ও সাহচর্য হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শয়তানের অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন সাহাবাগণ হুযুরে পাক (দঃ)কে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) প্রমুখও ছিলেন। এমনি সময়ে হুযুরে পাক (দঃ) বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার পবিত্র ললাটে ঘর্ম বিন্দু মুক্তা মালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঘর্ম মুছিয়া তিনি বলিলেন, এই মালউনের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনি স্বীয় মস্তক নীচের দিকে ঝুঁকাইলেন।

হযরত আলী (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার জনক জননী আপনার উপর কোরবান হউক। আপনি কাহাকে এ অভিশাপ দিলেন?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহর শত্রু শয়তানকে। এই মরদুদ এখন তাহার গুহ্যদ্বারে লেজ প্রবেশ করাইয়া সাতটি ডিম প্রসব করিল। উক্ত সাতটি ডিম হইতে সাতটি শয়তান পয়দা হইয়া আদম সন্তানদিগকে ধোকা দিবার কাজে নিযুক্ত হইয়া গেল।

এই শয়তানের প্রথমটির নাম মুদহাশ। ইহা আলেমদিগকে লোভ লালসার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়টির নাম হদীস। সে নামাযীদিগকে নামায আদায় করা হইতে বিরত রাখে। তাহাদিগকে খেল-তামাসার দিকে আকৃষ্ট করে। নামাযীদের চোখে তন্দ্রার ঘোর আনিয়া দেয়, অমনি নামাযী ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুম ভাঙ্গিবার পরেই সে নামায পড়িতে শুরু করে। কেহ যদি তাহাকে বলে যে, তুমি তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে। অজু ব্যতীত নামায কিভাবে পড়িলে? তখন সে উত্তর করে যে, কোথায়, আমি তো ঘুমাইয়াছিলাম না। এইভাবে বিনা অজুতেই যে নামায আদায় করে অথচ সে তাহা আবার স্বীকার করে না।

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) বলেন, যাহার হাতে মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবন, সেই আল্লাহর শপথ, এইরূপ নামাযী অর্দ্ধেক কিংবা এক চতুর্থাংশ ছওয়াবও পাইবে না। বরং তাহার পুণ্যের বদলে পাপের যোগাড় হইবে।

তৃতীয়টির নাম যালবানুন। ইহার কার্য হাটে-বাজারে। অর্থাৎ হাটে বাজারে যত রকমের অপকর্ম আছে, সেইগুলি সে ঘটাইয়া থাকে। মাল বিক্রেতাকে প্ররোচনা দিতে থাকে ঃ মাপে কম দাও, ক্রেতাকে বলে, নিজের হাতে মাল মাপিয়া একটু বেশী লইবার চেষ্টা কর। তাছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে বলে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর, ব্যবসায়ে বেশী লাভবান হইবে। বিক্রেতাকে পরামর্শ দেয়, খারাপ মাল নীচে এবং মধ্যে রাখিয়া ভাল মালগুলি উপরে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখ। আর নিজের মালের খুব প্রশংসা কর। ক্রেতাকে পরামর্শ দেয়, ক্রয়কৃত মালের মূল্য কিছু কম দিবার জন্য নানা বাহানার আশ্রয় গ্রহণ কর। কেননা মাল কিনিবার কালেই লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়।

চতুর্থটির নাম বতর। ইহার কাজ হইল বিপাদপন্ন লোকদিগকে ধৈর্যহীন এবং অস্থির করিয়া তোলা, যাহাতে তাহার পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি ঈমান নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায়। বিপদে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে আল্লাহর দরবারে সেই ধৈর্যশীলের জন্য অসীম পুণ্য লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা শয়তানের একটি বড় কৃতিত্ব বটে।

পঞ্চমটির নাম মানশুত। এই শয়তানের কাজ হইল মানুষকে মিথ্যা বলায় এবং পরনিন্দা করায় উৎসাহ প্রদান করা। একজনকে অপর জনের নামে দুর্ণাম অপবাদ রটাইতে এই শয়তানই প্ররোচনা দিয়া থাকে। মানুষকে চোগলখুরী অর্থাৎ একেকজনের নিকট একেক রকমের কথা বলিয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া ইহার একটি প্রধান কার্য।

ষষ্ঠটির নাম দাসেম। সে লোকদেরকে জিনাকারী ব্যভিচারী হইতে প্ররোচনা যোগায়। মানুষের চোখ এবং মন নষ্ট করিয়া দিতে এবং তারই মাধ্যমে কুকাজ ঘটাইতে এই শয়তানই সদা তৎপর। যাহাদের চরিত্র আয়নার মত স্বচ্ছ ও পবিত্র, এই শয়তান তাহাদের পিছনে লাগিয়া অচিরেই তাহাদের চরিত্রে দাগ বসাইয়া দেয়।

সপ্তম শয়তানটির নাম আওয়ার। তাহার কাজ মানুষকে চুরি, ডাকাতী, রাহাজানী, ছিনতাই এবং লুটতরাজ শিক্ষা দেওয়া ও এইসব কাজে উৎসাহিত করা। সে মানুষকে বলে, এই সব কাজের মাধ্যমে তুমি অনায়াসে ধনদৌলত ও মাল-সামান উপার্জন করিয়া নিজের অভাব মিটাইতে ও ধনী হইতে পারিবে। কার্য সিদ্ধির পরে এক সময়ে কাঁদিয়া কাটিয়া আল্লাহর দরবারে দোওয়া করিলেই গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া যে কোন হারাম পথে রুজী উপার্জনের প্রেরণা দেওয়াও এই আওয়ার শয়তানের কাজ।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দলহান নামক আর একটি শয়তান আছে, সে অজু করার সময়ে লোকদিগকে ধোকা দিয়া থাকে। তাহার আওতামুক্ত হওয়ার জন্যও আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা চাই।

একদা ওসমান ইবনে আমের বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমার নামায, আমার কিরাত এবং আমার যিকিরের মধ্যে শয়তান আসিয়া ধোকা দেয়। হুযুরে পাক (দঃ) বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ। যখন এমন অনুভব কর, তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তিনবার বাম দিকে থুক নিক্ষেপ কর। এই শয়তানের নাম খনযুব।

ওসমান ইবনে আমের বলেন, এই আমল করার পর হইতে শয়তান আর আমার নিকট আসে নাই।

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নাই, যাহার সাথে একটি করিয়া শয়তান নাই।

লোকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার সাথেও আছে কি?

হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিলেন, হাঁ, তবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে মুসলমান বানাইয়া আমার অনুগত করিয়া দিয়াছেন। সে ভাল ছাড়া আমাকে মন্দের দিকে চালনার চেষ্টা করে না।

আল্লাহতায়ালা যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করেন, তখন হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় তাহারও বাম পাঁজর হইতে তাহার স্ত্রীকে পয়দা করেন। শয়তানের সঙ্গমে তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া একুশটি ডিম প্রসব করে। ডিম হইতে বাচ্চা হইয়া উহারা বন-জঙ্গল এবং নদী-সাগরে বিস্তার লাভ করে। উহাদের বংশধর এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রত্যেকটি ডিম হইতে দশ হাজার পুত্র কন্যা পয়দা হয়। উহারা বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এমন কি বৃক্ষ পত্র ও পর্বত গহ্বর পর্যন্ত ছড়াইয়া যায়। এমন কি সারা দুনিয়ার আনাচে কানাচে উহারা ছড়াইয়া পড়ে।

আল্লাহ বলেন, আমাকে ছাড়িয়া কি তোমরা শয়তান ও উহার বংশধরকে বন্ধু করিয়াছ? যাহারা শয়তান ও উহার বংশধরের অনুসারী, তাহাদের প্রতিদান খুবই ভয়াবহ। এই অবস্থায় বিনা তাওবাহতে মারা গেলে চিরকাল শয়তানের সাথে দোজখে বাস করিবে। সুতরাং এই পরম শত্রু এবং ক্ষতিকারক দল হইতে নিরাপদ থাকার জন্য সদা নেক কাজ ও আল্লাহর ইবাদাত কর এবং সৎ লোকের সাহচার্য অবলম্বন কর।

নফসে আম্মারাহ

কুকার্যে প্রেরণা এবং উৎসাহদানকারী নফস অর্থাৎ নফসে আম্মারাকে আল্লাহ যেখানে রাখিয়াছেন, সেখানেই রাখিয়া দিবে এবং উহাকে তদ্রূপই মনে করিবে, আল্লাহতায়ালা উহার কথা যেইরূপ বলিয়াছেন। আর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মুতাবেকই উহার তদারক করিবে।

মূলতঃ নফসে আম্মারা বান্দার জন্য ইবলীস অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক এবং প্রধান শত্রু। ইবলীস উহার মাধ্যমেই বান্দার উপর জয়যুক্ত হয়। নফস.শয়তানের নির্দেশ অনুযায়ী-ই কাজ করিয়া থাকে। বান্দার কর্তব্য নফসের অবস্থা এবং প্রকৃতিকে উত্তমরূপে চিনিয়া লওয়া। আসলে নফসের প্রকৃতি দুর্বল কিন্তু উহার লালসা ও পিপসা অত্যন্ত প্রবল এবং শক্তিশালী।

নফস অত্যন্ত হটকারী, জেদী, অবাধ্য, দুরাশা পোষণকারী, সে যাহা বলে তাহা সবই না হক এবং বাতিল, তাহার সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম ধোকা ও প্রতারণা, তাহার কোন একটি কাজই ভাল নহে, সে যাহা বলে, কিছুই সত্য নহে।

অতএব বান্দার সাবধান ও সতর্ক থাকা চাই, নফসের কোন কথাই বিশ্বস করা চাই না এবং ইহার আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে বাধা প্রদান করা চাই। ইহাকে স্বাধীনতা দিলে সে অধিক বখাটে এবং দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে। ইহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে অবাধ্য হইয়া যায়। যদি ইহার আকাঙ্ক্ষা পুরা করা হয় তবে বান্দার ধ্বংস অনিবার্য। এই নফস সমস্ত বিপদাপদের ভিত্তি, অপদস্থতার কারণ এবং ইবলীসের অমূল্য সম্পদ। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত নফসের প্রকৃত রূপ অন্য কেহই ধরিতে পারে না। উহার লক্ষণ ও নমুনা সম্পর্কে আল্লাহ্ যাহা বলেন, তাহা এই যে, যখন সে খুব ভীত সন্ত্রস্তের ভাব দেখায়, বুঝিবে যে, এখন তাহার শান্তি এবং স্বস্তি বিরাজ করিতেছে। যখন সে কোন কিছুকে সত্য বলিয়া দাবী করে, বুঝিবে যে, উহা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছু নহে। যখন সে খুব ইখলাসের ভাব দেখায়, বুঝিবে যে, তাহা শুধু রিয়াকারী ও আত্মগরীমা, এই সমস্ত কিছুক্ষণের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অতএব এই কারণেই মানুষের উচিত, সর্বক্ষেত্রে নফসের বিরোধিতা করা ও উহার বিপরীত পথে চলা। উহার প্রকৃতিই এই যে, প্রতি মুহূর্তেই সে বান্দাকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইবার চেষ্টায় রত থাকে।

এই ভয়ঙ্কর নফসের ফাঁদ হইতে বাঁচিতে হইলে বান্দার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, নফস যতই প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া রাখুক না কেন, ঐ ফাঁদ হইতে বহুদূরে বিচরণ করিতে হইবে। উহার নিকটে কিছুতেই যাওয়া চলিবে না। বরং আল্লাহর উপর দৃঢ় ভরসা রাখিয়া আল্লাহর পথেই সুস্থির থাকিতে হইবে। আর আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, কোনক্রমেই যেন নফসের প্রলোভনে অন্তরে দুর্বলতার সৃষ্টি না হয়।

আমরা সকলেই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এই ফরিয়াদ করিতেছি, হে মাবুদ! তুমি আমাদেরকে আমাদের এই প্রধান শত্রু ইবলীস ও নফসে আম্মারার প্রতারণা হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আমীন!!

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা। এতক্ষণ আমরা যে মহা মনিষীর লিখিত গ্রন্থ গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীনের অনুবাদ পেশ করিলাম, সেই মহা সাধক তাপসকুল শ্রেষ্ঠ—গাউছুল আজম হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জীবন ঘটনার সম্যক পরিচয় অবগত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই মনে থাকা স্বাভাবিক। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহার জীবন ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইবার আপনাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি।

।। সমাপ্ত।।

পরিশিষ্ট

গাউছুল আজম হযরত বড়পীর (রহঃ)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পূর্বাভাস

পরম করুণাময় ও অনন্ত কুশলী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের করুণার শেষ নাই, কৌশলের সীমা নাই এবং শক্তিরও পরিমাপ নাই। তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে পরম কৌশল ও রহস্যের হাতছানী। বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

আল্লাহ্ পাক বেহেশতে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া আলমে আরওয়াহ্ নামক প্রান্তরে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন। পরম সুখ ও আনন্দের ভিতর হযরত আদম (আঃ)-এর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্ত সর্বদাই তিনি মহা প্রভুর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। একদা আল্লাহ্ পাক তাহার পৃষ্ঠদেশে কুদরতের হস্ত বুলাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক মানুষের আত্মা সৃষ্টি হইয়া দলে দলে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। হযরত আদম (আঃ) অগণিত অদৃশ্য আত্মার বিপুল সমরোহ্ ও কমনীয়রূপ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইলেন এবং সবিস্ময়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিলেন—"হে বারে এলাহী! আমার সম্মুখে অনিন্দ্য কান্তিধারী যে সকল মানবাত্মা পরমানন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে উহারা কাহারা? কি তাহাদের পরিচয়? কেনইবা তাহাদিগকে বার বার দেখিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, যতই দেখি কেবল দেখিবার অভিলাষ বাড়িয়া যাইতেছে। ওগো দ্বীন দুনিয়ার মালিক! কেন আজ আমি নিজের মধ্যে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি? কেন আমি আত্মহারা হইতেছি?"

হযরত আদম (আঃ)-এর ইদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সর্বনিয়ন্তা আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিলেন—'হে আদম! তুমি যাহাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছ, যাহাদের সৌন্দর্য ও চপলতা তোমাকে অভিভূত করিয়াছে, তাহারা তোমারই ঔরসজাত অনাগত বংশধরগণের আত্মার সারি। আজ তুমি তাহাদিগকে ভালভাবে চিনিয়া রাখ। তোমার জীবনে একত্রীভূত অবস্থায় তাহাদিগকে দেখিবার সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসিবে না।'

হযরত আদম (আঃ) চাহিয়া দেখিলেন, নবী ও রাসূলগণের আত্মার কাফেলা, অলী-আল্লাহগণের আত্মার কাফেলা, মুমিন-মুসলমান নর-নারীর আত্মার কাফেলা, খোদাদ্রোহী বিধর্মী পাপীষ্ঠদের আত্মার কাফেলা, ছেলে-বুড়া, যুবক-যুবতীর আত্মার কাফেলা—একের পর এক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সুমধুর সুরে আল্লাহর পবিত্র নাম যিকির করিতেছে।

তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, অলী-আল্লাহগণের আত্মার সারির পুরোভাগে যে আত্মা রত্নটি সকলকে পথ দেখাইয়া চলিতেছে, উহা অত্যন্ত সুন্দর, অতিশয় মনোহর ও অবর্ণনীয় চিত্তাকর্ষক। তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে পুনরায় মিনতি জানাইলেন—'হে করুণাময় আল্লাহ! উহা আমার কোন সন্তানের রূহ? তখন আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিলেন খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তোমার এই সন্তানের নাম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী। নবুয়াতের দরজা বন্ধ হইবার পর পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাব হইবে। সে হইবে বেলায়েতের মর্যাদার অধিকারী ও মারেফাতের সর্বগুণে গুনান্বিত সে হইবে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এবং আশেক বান্দা। সর্বোপরি তাহার পৃষ্ঠ দেশে অঙ্কিত থাকিবে আমার প্রিয় হাবীব আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদচিহ্ন। সে স্বীয় প্রতিভা ও সাধনার দ্বারা পবিত্র ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে।' আল্লাহর এহেন নির্দেশ শ্রবণ করিয়া হযরত আদম (আঃ) সিজদায় পতিত হইয়া মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন। আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গুজারি করিলেন।

খোশ খবর

গ্রীষ্মকাল। দ্বি-প্রহরকালে সূর্যের প্রখর কিরণ। ধূসর মরুময় আরব দেশ ধু ধু করিতেছে। নিদারুণ গ্রীষ্মতাপে চতুর্দিক হইতে গনগনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধূম্ররাশি উত্থিত হইতেছে। পথ-ঘাট নীরব-নির্জন। জনমানবের গতিবিধিহীন। মনে হয় দিগন্ত বিহারী প্রচণ্ড সূর্যের কিরণের আতপতাপে আরব দেশ যেন একেবারে জনপ্রাণী শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্মল আকাশে ও রাস্তাঘাটে কোন পাখী ও পশুর গমনাগমন পরিদৃষ্ট হইতেছে না। এমন সময় মদীনার একটি সুবিস্তৃত বৃক্ষ শাখার নীচে ইসলামের মুকুটমণি, আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) প্রাণপ্রিয়—হযরত হাসান এবং হোসেন (রাঃ)-এর সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসেঙ্গ মহানবী (দঃ) কনিষ্ট দৌহিত্র হযরত হোসেন (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রিয় হোসেন! আমার অবর্তমানে যদি কোন ব্যক্তি তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে অথবা অকারণে অন্যায়ভাবে তোমাকে কষ্টে নিপতিত করে, কিংবা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, তবে তুমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে আশা রাখ? হযরত হোসেন (রাঃ) বিনম্র বদনে উত্তর দিলেন—'হে নানা ভাই। আমার উপর যদি ঈদৃশ অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম বর্ষিত হইতে থাকে, তবে আমি তাহাকে প্রথম ও দ্বিতীয়বার ক্ষমা করিয়া দিব। কিন্তু তৃতীয়বারে আমার প্রতিশোধের কঠোর হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। যদ্যপি সে বন-জঙ্গলে, সাগর-সলিলে, দুর্গম গিরিগুহায় লুকায়িত হয়, তথাপি অপকর্মের ফলভোগ করা ব্যতীত তাহার নিস্তার নাই—সে আমার আক্রোশ হইতে রেহাই পাইবে না।

বিশ্বনবী (দঃ) হযরত হোসেন (রাঃ)-এর মুখে এই ধরনের জবাব শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। খুশী ও আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল। তিনি সস্নেহে হযরত হোসেন (রাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে শীতল হস্ত বুলাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে আমার নয়নমণি! ন্যায় ও সত্যের মূর্ত প্রতীক, শেরে-খোদা আলী (রাঃ)-এর সুযোগ্য এবং মর্যাদার অধিকারী পুত্রধন! আল্লাহ্ পাক তোমার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যানিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহারই বদৌলতে ভবিষ্যতে তোমার বংশে নবরত্নের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহাদের প্রত্যেকেই হইবে এক একজন ইমাম। তাহাদের সত্য নিষ্ঠা ন্যায়নীতির জন্য আবহমান কাল ধরিয়া এই নশ্বর পৃথিবী গর্বানুভাব করিবে এবং তাহাদের কীর্তিগাঁথার যশোগান গাহিতে থাকিবে। হে আমার বংশের প্রদীপ, তোমার দ্বারাই আমার বংশের সূত্র বিশ্ব ধরিত্রীর বুকে টিকিয়া থাকিবে। তুমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহাদের নাম স্মরণ রাখ। তাহারা হইল ঃ ১। হযরত জয়নুল আবেদীন (রঃ) ২। হযরত মুহাম্মদ বাকের (রঃ) ৩। হযরত জাফর সাদেক (রঃ) ৪। হযরত মূসা কাজেম (রঃ) ৫। হযরত মূসা আলী রেজা (রঃ) ৮। হযরত হাসান খালেস (রঃ) এবং ৯। হযরত ইমাম মাহদী (রঃ)।

অতঃপর বিশ্বনবী (দঃ) জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হযরত হাসান (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে আমার হৃদয়ের নিধি! আমার অবর্তমানে যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনিষ্ঠ সাধনে ব্রতী হয় কিংবা অন্যায়ভাবে তোমাকে দুঃখ কষ্টে নিপতিত করে, অথবা অকারণে উত্যক্ত করিতে শুরু করে তখন তুমি উহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে প্রত্যাশা কর? ধীর-স্থির প্রশান্ত মেজাজের অধিকারী হযরত হাসান (রাঃ) অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টতা সহকারে উত্তর করিলেন—'হে স্নেহ-সিন্ধু নানা ভাই! আমি শত্রু, অন্যায় আচরণকারী ও অসদ্ব্যবহারকারিগণের সহিত সুপ্রসন্ন ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইব এবং আমার সাধ্যমত সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাদিকে সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি সর্বদা প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ এবং কোপদৃষ্টিসুলভ আচরণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইব।'

বিশ্বনবী (দঃ) হযরত হাসানের (রাঃ) উত্তর শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং পরমানন্দের অশ্রুমালা তাঁহার দুই কপোল প্লাবিত করিয়া মুক্তার মালা রচনা করিতে লাগিল। তিনি পরিতুষ্ট চিত্তে

মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন, 'হে আমার আদরের ধন! বিশ্ব দুলালী, নবী নন্দিনী, খাতুনে জান্নাত ফাতেমার (রাঃ) অঞ্চলের অপূর্ব রত্ন। তোমার মহৎ চিন্তা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও গঠনশীল মনোবৃত্তি দেখিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার বদৌলতে তিনি তোমাকে এক মহামূল্যবান উপহার প্রদান করিবেন। সেই উপহার জগৎবরেণ্য ও বিশ্ব অলী আল্লাহ্ প্রদত্ত আসন অলংকৃত করিবেন। তিনি মোহান্ধ বিশ্বের অসংখ্য বিপদগামী বান্দাকে, পথভ্রষ্ট ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত সম্প্রদায়কে প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান বলিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রেম ও মহব্বতের অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন রচনা করিবেন। তাঁহার বক্ষনিসৃত মহাজ্ঞানের আলোকে অনেক সুফী ও সাধক, অনেক ভক্ত ও অনুরক্ত, অনেক তাপস ও সাধক, অনেক নর-নারী নিজদিগকে আলোকিত করিয়া তুলিবে। তাঁহার প্রচেষ্টায় অজ্ঞানান্ধকার ও যাবতীয় কুসংস্কারের সমাধি রচনা হইবে। আর তাঁহার দ্বারা যে রূহানী শক্তির বিকাশ ঘটিবে, অহা পৃথিবী প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়, প্রেম ও ভালোবাসা, উদারতা ও মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য ও গৌরবের মশাল স্বরূপ বিশ্ববাসীকে কিরণ দান করিতে থাকিবে। হে ভাই হাসান! আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সেই উপহার তোমারই বংশে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে আগমন করিবেন। তাহার নাম হইবে আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, মহা তাপস হযরত বড়পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। তিনি পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন।'

তারপর বিশ্বনবী (দঃ) উভয় দৌহিত্রের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত মায়া বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—'হে আমার ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা উভয়েই ভাগ্যবান ও গৌরবের অধিকারী। তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সকলেই দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মে, চিন্তায় ও আদর্শে উজ্জ্বল কীর্তি সংস্থাপন করিবে। তবে নবরত্নের সমাহারে হোসেন বংশকুল যতখানি গৌরব ও মর্যাদা লাভ করিবে শুধু মাত্র একক উপহারের দ্বারাই হাসান বংশকুল ঠিক ততখানি গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হইবে।'

পরবর্তীকালে বিশ্বনবী (দঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। হযরত হোসেনের (রাঃ) বংশে নয়টি অমূল্য রত্ন এবং হযরত হাসানের (রাঃ) বংশে পীরানে পীর দাস্তগীর গাউছুল আজম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বনবী (দঃ) কোন এক সময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাত উঠাইয়া আরজ করিলেন, ওগো দ্বীন দুনিয়ার মালিক! তুমি আমার সেই প্রতিনিধির উপর রহমত ও করুণা বর্ষণ কর, যে আমার পরে পৃথিবীতে আগমন করিবে এবং আমার হাদীস যথার্থ ও সঠিকভাবে বর্ণনা করিবে আর আমার তরীকাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মৃত প্রায় ইসলামকে নবজীবন দান করিবে।

বিশ্বনবী (দঃ)-এর উল্লিখিত প্রতিনিধিরূপে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন।

একদা হযরত হাসান (রাঃ) নির্জন কক্ষে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহ্ পাকের আরাধনা করিতেছিলেন। তিনি ফানা ফিল্লাহর মোরাকাবায় নিমগ্ন হইয়া অবলোকন করিলেন যে, আরশের ডান দিকে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি শিখা কিরণ দান করিতেছে এবং তাহার নির্মল আভায় অবগাহন করিয়া ফিরেশতাগণ বিশ্বনিয়ন্তার ইবাদতে মশগুল রহিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে স্নিগ্ধ শীতল জ্যোতিপুঞ্জ! কে তুমি এবং কেনই বা পবিত্র আরশের সন্নিকটে উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ করিতেছ? সেই জ্যোতিপুঞ্জের অভ্যন্তর হইতে আওয়াজ আসিল, 'হে ধ্যানমগ্ন আওলাদে রাসূল (দঃ)! আমরা আল্লাহ্ পাকের তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করিতেছি। হে শ্রেষ্ঠ সাধক! আমরা আপনাকে একটি খোশ খবর প্রদান করিতেছি—আপনার ছোট ভাই হোসেন (রাঃ)-এর বংশে নয়জন ইমাম রত্ন জন্মলাভ করিবেন এবং আপনার বংশে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বন্ধু তাপস শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলামের গৌরব বর্ধন করিবেন।'

এহেন খোশ খবর শ্রবণান্তে হযরত হাসান (রাঃ) আনন্দে অধীর হইলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করিলেন।

বংশ ধারা

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) মাতৃ-পিতৃ উভয় সুত্রেই ছিলেন জগদ্বিখ্যাত সৈয়দ বংশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহার পুণ্যবান পিতার বংশ সূত্র উর্ধ্বতন পর্যায়ে আওলাদে রাসূল (দঃ) কুল তিলক, ইমাম শ্রেষ্ঠ হাসান (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। অপরদিকে সাধ্বী মাতার বংশক্রম উর্ধ্বতন পর্যায়ে মিলিত হইয়াছে সৈয়দ বংশের অমূল্য রত্ন হোসেন (রাঃ)-এর সঙ্গে। এই জন্যই তিনি 'আল-হাসানী' এবং 'আল-হোসেনী' উভয়বিধ উপাধিতেও বিভূষিত হইতেন। আর তাঁহার পূর্ব পিতৃ-পুরুষ ছিলেন হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)। এবং মাতা ছিলেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ-জোহরা (রাঃ)। সুতরাং পিতা এবং মাতা উভয় সূত্রেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কারণ, রাসূলে পাকের দাদা এবং হযরত আলী মোর্তজার দাদা ছিলেন খাজা আবদুল মুত্তালিব।

পিতৃকুলের বংশসূত্র

আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পিতৃকুলের বংশ-সূত্র নিম্নরূপ ঃ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পিতার নাম (১) হযরত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (২) হযরত সাইয়্যেদ আবু আবদুল্লাহ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়েদ ইয়াহইয়া জাহেদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৪) হযরত সাইয়্যেদ মোহাম্মদ (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৫) হযরত সাইয়্যেদ দাউদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৬) হযরত সাইয়্যেদ মূসা সানী (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৭) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সানী (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৮) হযরত সাইয়্যেদ মূসা আলজোহন (রঃ) তাঁহার পিতার নাম (৯) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল-মহজ (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১০) হযরত সাইয়্যেদ হাসান মোসান্নাহ (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১১) হযরত সাইয়্যেদ হাসান (রঃ) এবং তাঁহার পিতার নাম (১২) শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)। আল্লাহ তাঁহাদের উপর রহম ও করম দান করুন।

মাতৃকুলের বংশসূত্র

হযরত সাইয়্যেদ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর মাতৃকুলের বংশ সূত্র নিম্নরূপ ঃ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর মাতার নাম (১) সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (২) হযরত আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়্যেদ আবু জামাল (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৪) হযরত মোহাম্মদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৫) হযরত আবু আতা আবদুল্লাহ (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৬) হযরত আবু আলাউদ্দিন (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৭) হযরত আলী জওয়াদ (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (৮) আলী রেজা (রঃ) তাঁহার পিতার নাম (৯) হযরত মূসা কাজেম (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১০) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১১) হযরত ইমাম বাকের (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১২) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ), তাঁহার পিতার নাম (১৩) হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং তাঁহার পিতার নাম (১৪) শেরে-খোদা হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ) পিতৃকুলের দ্বাদশতম সূত্র এবং মাতৃকুলের চতুর্দশতম সূত্র শেরে-খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পিতা-মাতার আদব-আখলাক

জগদ্বিখ্যাত তাপস হযরত বড়পীর আবুদল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা (রঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট পুণ্যবান, কামেল এবং বোযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সচ্চরিত্রতা ও আল্লাহ প্রেমের বিবিধ গুণ তাঁহার মধ্যে বিরাজমান ছিল। বড়পীর (রঃ)-এর জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) ছিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর বংশধর এবং একজন পুণ্যশীলা, পরম ধার্মিকা ও পর্দানশীলা মহিলা। সুতরাং তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই পবিত্র শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়া চলিতেন। ভাল-মন্দ, হালাল ও হারামের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পিতামাতা কিরূপ মহৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের চরিত্র মাহাত্য, গুণাবলী ও পবিত্রতা কি অপূর্ব, অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় ছিল, তাহা একটি বহুজন বিদিত জনশ্রুতি উপাখ্যান হইতেই উপলব্ধি করা যায়। জনশ্রুতিটি এইরূপঃ

বড়পীর সাহেবের ধর্ম প্রাণ সুযোগ্য পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী (রঃ) প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। খোদা-প্রেম ও আল্লাহ পাকের অক্লান্ত সাধনায়ই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তখনও তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। একদা তিনি ফোরাত নদীর তীর ধরিয়া কোন দূরবর্তী স্থানে রওয়ানা হইয়াছিলেন। দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাহার প্রয়োজনীয় রসদ-পত্র এবং পাথেয় দ্রব্য-সামগ্রীসমূহ নিঃশেষ হইয়া গেল। নানা বিপদ ও সঙ্কট তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

মাথার উপরে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য। তিনি পথ-শ্রম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুর্ভাবনায় নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং নদীর তীরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত একটি পল্লবঘেরা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। মনে তাঁহার নানা ভাবনা, নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। একদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবল জ্বালা, অপরদিকে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তাঁহার মন ও মানসিকতার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি প্রবাহমান জলস্রোতের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নদীর স্রোতের উপর কূল ঘেঁষিয়া একট পরিপক্ক লোহিতাভ আপেল ফল ভাটির টানে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি উক্ত ফলটি উঠাইয়া আনিলেন এবং পরম তৃপ্তি সহকারে উহা ভক্ষণ করিয়া আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হুঁশ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এই ভাসমান ফল ভক্ষণ করা কি ঠিক হইয়াছে? এই ফলের মালিক কে? কোথা হইতে এই ফল ভাসিয়া আসিয়াছে, ইহার কিছুইত তিনি জানেন না। তবে কি তিনি পরদ্রব্য ভক্ষণজনিত অপরাধ লইয়াই মহা বিচারক আল্লাহর সামনে হাজির হইবেন? তাহার বিবেক নিদারুণ জ্বালায় পীড়িত হইয়া পড়িল। পরিশেষে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক, এই ফলের মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইতে হইবে।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন—নদীর উজান তীর সংলগ্ন দিকে কোনও ফলের বাগান থাকিতে পারে। সেই বাগান হইতে বিচ্যুত আপেল ফলই হয়তো স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতেছিল। নদী কূল ঘেষিয়া উজানের দিকে সন্ধান করিলে ভাসমান আপেল ফলের মূল উৎসের খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে বিষণ্নচিত্তে হাঁটিতে লাগিলেন এবং মনে মনে আল্লাহ পাককে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মাথার উপরে গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য। চারিদিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ। পরিশ্রান্ত দেহ আর সামনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। তথাপি তিনি অতিকষ্টে আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিলেন। শত দুঃখ-যাতনা ও কষ্ট তাহাকে প্রদমিত করিতে পারিল না। অবশেষে ক্রমাগত কয়েকদিন চলিবার পর

সত্যিই তিনি নদীর তীরে একটি সুবৃহৎ ফলের বাগান দেখিতে পাইলেন। নানা রংয়ের অসংখ্য কাঁচা-পাকা ফল বাগানের প্রতিটি বৃক্ষে শোভা পাইতেছে। নদীর জলের উপর ঝুকিয়া রহিয়াছে একটি সুবৃহৎ আপেল গাছ। সেই বৃক্ষে পরিপক্ক, অর্ধপক্ক ও কাঁচা-পাকা অনেক আপেল রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত হইয়া দুই একটি সুপক্ক আপেল ফল নদীর পানিতে ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই বাগানচ্যুত ভাসমান ফলই তিনি ভক্ষণ করিয়াছেন।

লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই বাগানের মালিকের নাম সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউয়েমী (রঃ)। তিনি একজন খোদাভীরু ধর্মপ্রাণ সাধক। আল্লাহ পাকের মারেফাতের সাগরে সর্বদাই তিনি নিমজ্জিত থাকেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ মনে মনে ধারণা করিলেন—এই মহৎ প্রাণ পুণ্যশীল পুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হইবে না। তাই তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সৌম্য প্রশান্ত জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট গৃহস্বামী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিতে তাঁহার মস্তক অবনত হইল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিবার পর নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন এবং ফল ভক্ষণজনিত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

গৃহস্বামী সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রঃ) বহিরাগত ও অপরিচিত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসা জঙ্গীর দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁহার বাকশক্তি তিরোহিত হইল। সামান্য ফল ভক্ষণজনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য একটি লোক এতদূর পর্যন্ত আসিতে পারে, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেনক্ষ—নিশ্চয়ই এই আগন্তুকের মধ্যে এমন একটি গুণ ও সত্তা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যাহার দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে। আবার তাঁহার মনের মধ্যে একটি গোপন আকাঙ্ক্ষাও মাথা চারা দিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে উহা তিনি প্রকাশ না করিয়া বরং কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করতঃ বলিলেন, 'হে আগন্তুক! পরের দ্রব্য যদি বিনষ্টও হইয়া যায় তথাপি উহাকে ভক্ষণ করিবার অধিকার তোমার নাই। আমার অনুমতি ছাড়া আমারই বাগানের ফল ভক্ষণ করিয়া তুমি অপরাধ করিয়াছ, উহা আমি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না।'

গৃহস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আবু সালেহ মূসা জঙ্গীর (রহঃ) মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, এখন কি ঘটিল? তিনি অত্যন্ত সবিনয়ে কাতরভাবে আরজ করিলেন—'মহাত্মন! বর্তমানে আমার নিকট সহায়-সম্পদ কিছু নাই, যাহার দ্বারা উক্ত ফলের মূল্য আমি পরিশোধ করিতে পারি। আমি নিজে অপরাধ করিয়াছি এবং নিজেই উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ক্ষমা না করিলে, এই পাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই আমি দেখিতেছি না।

বাগান মালিক সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রঃ) বলিলেন, হে আগন্তুক! এই পৃথিবীর এমনই ধারা যে, উহার অধিবাসীগণ তাহাদের প্রিয়তম বস্তুর মায়া ও দাবী পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং আমারও অবস্থা তাই। সুতরাং উহার দাবী পরিত্যাগ করা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বাগান মালিকের উত্তর শুনিয়া সাইয়্যেদ সালেহ মূসা জঙ্গী (রঃ) দুঃখে ও আতঙ্কে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বাগান মালিকের মন নরম হইল না। তিনি স্বীয় দাবীতে অবিচল রহিলেন। পরিশেষে আবু সালেহ অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে আরজ করিলেন—মহাত্মন! আমার ধৃষ্টতাজনিত অপরাধ কি প্রকারে আপনি ক্ষমা করিতে পারেন উহার যথার্থ পন্থা আমাকে বলিয়া দিন। অন্যথায় আমি কেমন করিয়া এই অপরাধের কালিমা মাখা দেহ লইয়া শেষ বিচারের কালে আল্লাহ পাকের নিকট মুখ দেখাইব?

অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে আরজ করিলেন—মহাত্মন! আমার ধৃষ্টতাজনিত অপরাধ কি প্রকারে আপনি ক্ষমা করিতে পারেন উহার যথার্থ পন্থা আমাকে বলিয়া দিন। অন্যথায় আমি কেমন করিয়া এই অপরাধের কালিমা মাখা দেহ লইয়া শেষ বিচারের কালে আল্লাহ্ পাকের নিকট মুখ দেখাইব?

আগন্তুকের এহেন কাতরোক্তি রোনাজারি এবং বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বাগানের মালিক বলিলেন—"হে আগন্তুক। এতটা বিচলিত হইও না। তুমি যদি প্রকৃত খোদাভীরু হও আর পরকালের আযাবকে ভয় কর তাহা হইলে আমি তোমাকে এক সুন্দর পরামর্শ দিতেছি, তুমি দীর্ঘ বার বৎসর আমার গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করিবে। তোমার কাজ ও নিষ্ঠা দেখিয়া বার বৎসর পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব তোমাকে ক্ষমা করা যায় কি না।

সাঈয়্যেদ আবু সালেহ্ বাগান মালিকের প্রস্তাব বিনীতভাবে গ্রহণ করিলেন। বাগান মালিক আবু সালেহকে ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করিলেও ভৃত্যসুলভ শাসন ও কঠোরতা তাঁহার প্রতি কখনও প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে নিজের অগাধ জ্ঞানগরিমা, মারেফাতের গুপ্ততত্ত, মহৎ ও কল্যাণময় মধুর সংস্পর্শে আবু সালেহের জীবনকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। সুযোগ্য শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ও অনুরক্ত ছাত্র হিসাবে তিনি চরিত্র-মাহাত্ম্য, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানানুশীলন ও খোদাপ্রেমের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিলেন। এমনিভাবে বারটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

অতঃপর আবু সালেহ্ (রঃ) বাগান মালিক ও উস্তাদ সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ (রঃ)-এর নিকট পূর্বকৃত আপেল ফল ভক্ষণজনিত অপরাধ ক্ষমা চাহিলেন। উত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন—"শোন বৎস! তোমার কাজ, কথা, আচার, সততা ও নিষ্ঠা অবলোকন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে আমর শেষ বক্তব্য হইল যে—আমার একজন বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। সে অত্যন্ত কুৎসিত, বধির, খঞ্জ, বোবা এবং অন্ধ। তাহাকে আমি অন্য কোথাও পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসাবে তাহার জন্য দুশ্চিন্তায় আমার সুনিদ্রা হয় না। তোমার দ্বারা অবৈধভাবে ফল ভক্ষণের অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও। অন্যথায় আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না"

সাঈয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পার্থিব জগতের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙক্ষাকে বিসর্জন দিয়াও পরকালের মুক্তি ও সুখ-সম্ভোগকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাই পরিশেষে বাধ্য হইয়া গৃহস্বামীর এই কঠিন প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

গৃহস্বামী অতিশয় খুশী হইয়া সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ)-এর সঙ্গে স্বীয় কন্যা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

অতঃপর দিনান্তে মুক্ত আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। নিথর-নিঝুম শান্ত রজনীর কোমল হাতছানিতে বিপুলা বসুন্ধরা তন্দ্রা জড়ানো চাদর চতুর্দিকে বিছাইয়া দিল। একটি মনোরম প্রকোষ্ঠ নব-দম্পতির জন্য বাসর ঘর সাজানো হইল। নির্দিষ্ট সময় বর সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ) বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর একজন সুন্দরী, সুঠামদেহি, অপরীসীম রূপসী বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সবই অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত। তাহার অতলান্ত নির্মল দৃষ্টি শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং মৃদুভাষণের মনোহারিত্বে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ)-এর মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাও কি সম্ভব? শ্বশুর কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলীর সঙ্গে উপস্থিত রমণীর কোন দিকেই মিল হইতেছে না। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে সেই রমণী কি এই? তবে কি তাঁহার সহিত উপহাস অথবা পরীক্ষার অবতারণা হইতেছে? এই অসামান্য রূপের অধিকারী রূপবতীর গৃহে তিনি

ভুলক্রমে প্রবেশ করেন নাই তো? ইহা কি হইল? না জানি আবার কোন নূতন বিপদ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই তিনি বাসর গৃহে অবস্থান করা শ্রেয় মনে করিলেন না। ধীর পদবিক্ষেপে চিন্তাক্লিষ্টভাবে উক্তগৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য তিনি দরজার দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময় তাঁহার শ্বশুর সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্মিত হাস্যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, প্রিয় বৎস! 'আমি অনুভব করিতেছি যে, তুমি অনেকটা হতচকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছ। তবে তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই। তোমার সম্মুখে যে মেয়েটি উপবিষ্টা রহিয়াছে, সে-ই আমার কন্যা সাইয়্যেদা ফাতেমা—তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

আবু সালেহ (রঃ) আরজ করিলেন—'আপনি বলিয়াছিলেন—আপনার কন্যা কুৎসিত, বোবা, বধির অন্ধ।'

সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ সহাস্যে বলিলেন—"প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলাম এবং আমার বলার পিছনে যুক্তিও রহিয়াছে। তাহা এই যে—আমার আদরের কন্যা, তাহার চক্ষুযুগল দ্বারা কোনও পর-পুরুষকে অদ্যাবধি অবলোকন করে নাই, এমনকি আমার বাসস্থানের বাহিরে কোন বস্তু দর্শন করে নাই। এই হেতু তাহাকে আমি অন্ধরূপে আখ্যায়িত করিয়াছিলাম। জন্মান্ধ নহে বরং বহির্জগতের বেশরা দৃষ্টিপাত হইতে মুক্ত ও অন্ধ। তাহাকে এইজন্য বোবা বলিয়াছিলাম যে—একমাত্র পিতামাতা ছাড়া তাহার কণ্ঠস্বর কোনও পরপুরুষ অদ্যাবধি শ্রবণ করে নাই; আর তাহাকে খঞ্জ বলার কারণ এই যে, এই বয়স পর্যন্ত সে পদভরে হাঁটিয়া বেপর্দায় বহির্বাটিতে গমন করে নাই এবং পরপুরুষের কোন মজলিসেও গমন করে নাই। আর তাহাকে বধির বলার অর্থ এই যে, সে কেবলমাত্র পিতামাতা ছাড়া অদ্যাবধি অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে নাই। আর যেহেতু আমার কন্যাকে কেহই দেখিতে পায় নাই, এইজন্য সকলেই তাহাকে কুৎসিত বলিয়াই তুলিয়া ধরিয়াছি। হে বৎস! আমার কন্যার রূপ যেভাবে আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অলীক ও মিথ্যা নহে। কেননা সাধারণতঃ সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে যে গুণ ও অবস্থার কথা প্রচলিত হইয়া পড়ে আমার কন্যার বেলায় এইরূপ ঘটিতে দেওয়া হয় নাই। তাই এই ক্ষেত্রে সমস্ত কথা তোমাকে খোলাখুলি না বলিয়া পরোক্ষভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল এই যে, তুমি যেদিন সামান্য আপেল ভক্ষণের অপরাধ মার্জনার জন্য সীমাহীন কষ্ট উপেক্ষা করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে, সেইদিন তোমার কপালে একটি নূরের ঝলক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তোমাতে এমন একটি গোপনীয় পরম ধন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যাহা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়েতের মশালরূপে পরিচিত হইবে এবং আমি মনে মনে ধারণা করিয়াছিলাম যে, তোমার মত পুতঃচরিত্র ও প্রভুভক্ত ব্যক্তিই হইবে আমার কন্যার যোগ্য পাত্র। বলিতে কি, তোমার নিকট আমার এই বিদূষী কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিয়া এবং তোমার বুদ্ধিমত্তা, সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া আল্লাহ পাকের হাজারো শুকরিয়া আদায় করিতেছি। আর তুমি জানিয়া রাখ যে, আমার কন্যাকেও আমি শরীয়ত ও মারেফাত বিদ্যায় পরিদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছি। বর্তমান যুগের নারী সমাজের প্রতি যদি অবলোকন কর, তাহা হইলে তাহাদের তুলনায় আমার কন্যাকে দুর্লভ বলিয়া মনে হইবে।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ) স্বীয় গৃহস্বামী ও শ্বশুরের নিকট হইতে সকল রহস্যাবলী জানিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং পরম কুশলী আল্লাহ পাকের হাজারো শুকরিয়া আদায় করিলেন।

পরিশেষে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রঃ) স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে উভয় পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ বেনিয়াজের দরবারে হাত উঠাইয়া আরজ করিলেন—"হে সর্বমঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকর্তা! আজ তোমার নির্দেশে যাহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল, তাহাদের দাম্পত্য

জীবন ও সংসার জীবন তুমি আনন্দময়, সার্থক ও মঙ্গলময় করিয়া তোল। আর তাহাদিগকে এমন নেক সন্তান দান কর, যাহার গুণ-গৌরবে পবিত্র ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ইসলাম ধর্মে নব-প্রাণের সঞ্চার ঘটিবে।"

সাধক প্রবরের এই প্রার্থনা দয়াময় আল্লাহতায়ালা কবুল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই পুণ্যবান পিতা ও পুণ্যশীলা মাতার গৃহেই আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ তাপসকুল শিরমণি মাহবুবে সোবহানী সাইয়্যেদ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতৃ উদরে

বসন্তকাল! পারস্যের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন নব-অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। নব পত্র-পল্লবের সমারোহে চতুর্দিক সবুজ শ্যামলীমায় বিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। বুলবুলের কলকণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। শুভ বসন্তের আগমনী বন্যার স্রোত বহিয়া সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)-এর উদরে স্থান লাভ করেন সুলতানুল আউলিয়া, তাপসকুলের মণি, সাধু শ্রেষ্ঠ হযরত গাউছুল আযম মাহবুবে সোবহানী সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)। পিতা-মাতা পরম করুণাময়ের অশেষ শুকরিয়া আদায় করিলেন। তাহাদের পুণ্যময় জীবনের চলমান গতিধারায় নূতন আনন্দ, নূতন প্রেরণা ও নব অনুরাগের প্রাণবন্ত হিল্লোল দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া কে যেন তাহাদিগকে কানে কানে বলিয়া গেল—"হে পুণ্যময় চরিত্রের অধিকারী নব-দম্পত্তি! আল্লাহ্ পাকের দান এক অমূল্য রত্ন তোমাদের গৃহে শুভাগমন করিবে। যাহার মধুর স্পর্শে এই বিশ্বচরাচরে সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর পরিচয় সূত্র নূতন করিয়া পরিচিত্রিত হইবে। তোমরা খুশী মনে সেই রত্নের আগমনের প্রতীক্ষায় থাক।"

গর্ভাবস্থায় মাতার স্বপ্ন

সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) গর্ভবতী হইয়াছেন। মাতৃত্বের অনাস্বাদিত পূলক তাহার সমস্ত দেহে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি পরম আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। গর্ভ সঞ্চারের দিন হইতেই অনেক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন তিনি দেখিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে নানা ধরনের শুভ ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইবার পর প্রথম মাসে সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী মানব জাতির আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সহাস্য আনন্দে তাহাকে বলিতেছেন—"ওগো ফাতেমা! তুমি বিশ্বচরাচরের ভাগ্যবতী রমণী। তোমার গর্ভে যে সন্তান স্থান লাভ করিয়াছে, সে হইবে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ গাউছুল আযম। সুতরাং তুমি অতিশয় সাবধানে কাল যাপন করিও।"

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় মাসের এক শুভলগ্নে তিনি আবার স্বপ্নে দেখিলন যে—হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী স্বর্গীয় রমণী বিবি সারা (রঃ) তাহার শিয়রপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"হে সৈয়দকুল শিরমণি, হাসানকুল নন্দিনী সৌভাগ্যবতী ফাতেমা! আল্লাহ্ পাকের মারেফাত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক 'নূরে আযম তোমার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তুমি নিবিষ্ট মনে আল্লাহর গুণগানে নিমগ্ন থাকিও।"

দেখিতে দেখিতে তৃতীয় মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় আবার তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, ফেরাউনের স্ত্রী পুণ্যবতী আছিয়া (রাঃ) তাঁহাকে মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন—"ওগো পুণ্যবতী ফাতেমা! আমি তোমাকে এক অনির্বচনীয় শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি। তুমি অতিশয় সৌভাগ্যবতী ও মর্যাদাশীলা। তোমার পবিত্র গর্ভে যে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছে, পৃথিবীর বুকে তাহার উপাধি হইবে 'রওশন জমীর'। সুতরাং তুমি সতর্কতার সহিত শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাক।"

তারপর আসিল চতুর্থ মাস। সেই মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে—বিশ্বের চির বিস্ময় ও মহারত্নের অধিকারিণী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত বিবি মরিয়ম (রাঃ) উপস্থিত হইয়া কোমল স্বরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ওগো বিবি সৌভাগ্যশালিনী ফাতেমা! তোমার পবিত্র গর্ভে যিনি স্থান লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববরেণ্য শেষ্ঠ আউলিয়া হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)। সুতরাং তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিও।"

অতঃপর পঞ্চম মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—বিশ্বনবী (দঃ)-এর প্রথম ও প্রধান সহধর্মিনী খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন—"ওগো ভাগ্যবতী ফাতেমা! তোমার গর্ভে ইসলামের এক সমুজ্জ্বল রত্ন আল্লাহর মাহবুব বান্দা—মহিউদ্দিন-এর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।"

অনন্তর ষষ্ঠ মাস আসিল। একদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিশ্বনবী (দঃ)-এর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন—"ওগো ভাগ্যবতী ও সৌভাগ্যশালিনী ফাতেমা! অদূর ভবিষ্যতে এমন একজন মহাপুরুষ তোমার স্নেহশীল কোল উজ্জ্বল করিবেন, যাহার অলৌকিক ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট পৃথিবীর প্রতিটি ঈমানদার বান্দা বিমুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবে। সুতরাং তুমি সতর্কভাবে কালযাপন করিও।"

তারপর আসিল সপ্তম মাস। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিশ্ব দুলালী, নবী (দঃ) নন্দিনী রমণীকূল রত্ন হযরত হাসান ও হযরত হোসেন (রাঃ)-এর জননী হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"ওগো ফতেমা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। সাইয়্যেদ বংশের নন্দন কাননের সৌরভময় পবিত্র ফুল অচিরেই তোমার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইবেন। যাহার বিভুপ্রেমের স্রোতধারায় বিশ্ব ধরিত্রীর সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম অবগাহন করিবেন।"

তারপর আগমন করিল অষ্টম মাস। এই মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নয়নমণি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সহধর্মিণী পুতঃচরিত্রা হযরত জয়নাব (রাঃ) তাহাকে বলিতেছেন—"ওগো স্নেহের দুলালী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)! যিনি অচিরেই তোমার পবিত্র গর্ভ হইতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, তিনি হুজুর পুরনূর বিশ্বনবী (দঃ)-এর মৃতপ্রায় ইসলাম ধর্মকে নূতন বলে বলীয়ান করিয়া তুলিবেন এবং রূহানী জগতকে প্রেমের রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন, অতএব তুমি সাবধানে থাকিও।"

অতঃপর নবম মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসেনের প্রিয়পত্নী স্বপ্নযোগে বলিয়া গেলেন—"ওগো উম্মুল খায়ের ফাতেমা! অল্প দিনের মধ্যেই তোমার পবিত্র গর্ভ হইতে যিনি পৃথিবীতে আগমন করিবেন, তিনি আউলিয়াকুল শিরোমণি উম্মতে মোহম্মদীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ওগো ভাগ্যবতী রমণী! সেই পরম শুভলগ্ন আসন্ন প্রায়। সুতরাং তুমি সর্বদা সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিও। তোমার এই সন্তানের উছিলায় মুসলিম বিশ্বে প্রবাহিত হইবে আনন্দ ও খুশীর নৃত্যচপল ফলগুধারা। সারা জাহানের প্রতিটি গৃহে, বন-উপবন, শৈল-শিখরে, সাগর-সঙ্গমে, জলধির তরঙ্গ হিল্লোলে প্রবাহিত হইবে আনন্দের স্রোতধারা। তাহার উছিলায় বিশ্ব মুসলিম এক পবিত্র অবিচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। দ্বীন ও ঈমানের নূতন আলোকে এই বিশ্ব চরাচরকে তিনি মোহান্ধতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসিবেন।"

শুভজন্ম

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। চারিশত একাত্তর হিজরী সাল। মাহে শাবানের ঊনত্রিশ তারিখ। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। রৌদ্রের প্রখর কিরণ আস্তে আস্তে স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে। ঈষাণ কোণে দুই এক খণ্ড কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যাইতেছে। সূর্য অস্তমিত হইবার পূর্বে সমস্ত আকাশ ঘনকালো মেঘে ছাইয়া গেল। গাঢ় মেঘের আড়ালে দিনমণি অস্তাচলে

মুখ ডাকিয়া দিনের অবসান ঘোষণা করিল। ঐদিন রমজানের চাঁদ উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সেই আশা তিরোহিত হইয়া গেল। জিলান নগরের অগণিত উৎসাহী জনতা রমজানের চাঁদ দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নিরাশায় বেদনাক্লিষ্ট চিত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সমস্ত রাত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। মেঘের গর্জন ও গর্জের নির্ঘোষ নিনাদে মানুষের কানের পর্দা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সুবিশাল ধূসর মরুভূমির বালুকারাশির উপর দিয়া প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। জিলান নগরের জনগণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত বারিপাত দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। সুখনিদ্রার কোমল স্পর্শলাভ হইতে সকলেই বঞ্চিত হইল। দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির অবসানের নিমিত্ত সকলেই পরম করুণাময়ের নিকট সবিনয় প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সময় অতীত হইয়া তৃতীয় প্রহরের শুভাগমন ঘটিয়াছে। শিলা-বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। চতুর্দিক হইতে বিপন্ন মানুষের করুণ কাতরানীর স্বরও ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময় সাধক প্রবর সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রঃ)-এর গৃহে তদীয় পত্নী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)-এর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সাইয়্যেদ আবু সালেহ এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নিকটস্থ প্রতিবেশীদের নিকটে সাহায্যের আশায় যাইতে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। সেই সময় একদল সুন্দরী রমণী মুখ-চোখ অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। 'তাঁহারা সাহায্যার্থেই আগমন করিয়াছিলেন' এই কথা তাপস-প্রবরকে জানাইয়া দিলেন। তাহাদের আগমনের ফলে আবু সালেহ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার সহিত সকলেই চরম শুভ লগ্নের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমেই প্রসবের যাতনা বাড়িয়া চলিল। অসহ্য যন্ত্রণায় উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। কথায় বলে ইতি ও পরিসমাপ্তি সব কিছুরই শেষ প্রান্ত রচনা করিয়া দেয়। শৈশব-শেষে যৌবন, রোগের শেষে সুস্থতা, কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষ, অন্ধকারের পর আলো, নিরাশার পর আশা, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, রাত্রির পর দিন, দুঃখের পর সুখ, উত্থানের পর পতন, আগমনের পর তিরোধান অবশ্যই পাশাপাশি অবস্থান করে। একের পরিবর্তে অন্যের উপস্থিতি পৃথিবীর চিরন্তন রীতি। উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)-এর বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমেই তাহার অসহনীয় যাতনার অবসান হইয়া সুখ প্রভাতের সোনালী আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। পূর্ব দিগন্তে সোবহে সাদেকের সোনালী আভা দেখা দিয়াছে। ফজরের মধুর আজান ধ্বনি উচ্চারিত হইতে আর বেশী দেরী নাই। এমন সময় সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া ধূলার ধরণীতে আগমন করিলেন হযরত বড় পীর (রঃ)। সমস্ত বিশ্ব-নিখিল, আকাশ-বাতাস, বন-উপবন, গিরি-পর্বত, ভূধর-সাগর সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

অপূর্ব সুন্দর শিশুর মুখমণ্ডল, স্বর্ণাভ তাহার কমনীয় কান্তি, মহাভাগ্যের সৌভাগ্য রেখা সম্বলিত প্রশস্ত ললাট, কালো ভ্রমর বিনিন্দিত জোড়া ভ্রমর, রংধনুর মত সরু চিকন ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত নাসিকা, মায়া বিজড়িত ভাসমান সুবৃহৎ চক্ষুদ্বয়, নিখুঁত সুদর্শন ও উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট নয়নের পুত্তলীর মুখ চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া বিবি ফাতেমা (রঃ) সমস্ত বেদনা, দুঃখ-যাতনা নিমিষেই ভুলিয়া গেলেন। উপস্থিত পুরনারিগণ সুন্দর মনোহর শিশুর রূপ সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া নবজাত শিশুর প্রশংসা-কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং বিবি ফাতেমা (রঃ)-কে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। "ধন্য ফাতেমা! প্রকৃতই তোমার গলদেশে সৌভাগ্যের মহামূল্যবান হার শোভা পাইতেছে। জগতে তোমার তুলনা নাই।"

মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, তাপসকুলের মধ্যমণি, সুলতানুল আউলিয়া, গাউছুল আজম, সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) চারিশত একাত্তর হিজরী সনের পবিত্র রমজান মাস মোতাবেক এক হাজার আটাত্তর খৃষ্টাব্দে জিলান বা গিলান নগরের সাইয়্যেদ পরিবারে পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) ও মাতা সাইয়্যেদ উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ)-এর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পারস্যের অন্তর্গত জিলান বা গিলান নগর প্রত্যন্ত অঞ্চল। এইজন্য বড়পীর (রঃ)-এর নামের সঙ্গে জিলানী শব্দটিও সংযোজিত হইয়াছে।

সদ্য প্রসূত শিশুটির মধ্যে এক আশ্চর্যজনক চিহ্ন দেখা গেল। তাহার রক্তিমাভ কোমল ওষ্ঠদ্বয় বার বার প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি যেন অস্ফুট স্বরে কি বলিতে লাগিলেন। অনেকেই মনে করেন যে, বড়পীর ভূমিষ্ঠ হইবার পর গোনাহগার উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) মুক্তির জন্যই পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া মুনাজাত করিয়াছিলেন। আর এই জন্যই তাহার কোমল ওষ্ঠযুগল মৃদু আলোড়িত এবং প্রকম্পিত হইতেছিল।

উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রঃ) শুভদিনের শুভলগ্নে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাণপ্রিয় পুত্র রত্ন লাভ করিয়া খুশী ও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। তাহার কোলে যেন মুক্ত আকাশের চন্দ্র বিশ্ববরেণ্য সাধকরূপে খেলা করিতে লাগিল। তিনি ধূলি বিমলিন মর্তধামে বসিয়াও যেন বেহেশতের অমিয় শান্তিধারা লাভ করিলেন। যেন নিতান্ত অসহায় দরিদ্রজন রাশিরাশি গুপ্তধন লাভে কৃতার্থ হইলেন। তিনি অনিমেষ নয়নে পুত্র রত্নের মুখ চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া সন্তান বাৎসল্যের আতিশয্যে স্নেহভরে বার বার চুমু খাইতে লাগিলেন। অতীতের সমুদয় জ্বালা-যন্ত্রণা-বেদনা ভুলিয়া গিয়া অপার আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ)-এর পুত্র সন্তান হইয়াছে এই শুভ সংবাদটি মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই নবজাতককে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ শিশুর কোমল নধর কান্তি ও অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, স্বর্গীয়রূপ ও জ্যোতির্ময় বর্ণ এক বালক ফাতেমা (রঃ)-এর শীতল কোল আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মুখাবয়ব হইতে যেন শত সহস্র পূর্ণ চন্দ্রের কিরণচ্ছটা পড়িতেছে। তাহার অজানুলম্বিত সুডৌল বাহু যুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন-ধাম, রক্তরাগ বিরঞ্জিত অধঃরোষ্ঠ, সুবিন্যস্ত ও প্রশস্ত বক্ষদেশ ও কপোলের সৌন্দর্য শিখা সবকিছু মিলিয়া এক অনির্বচনীয় ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। তদুপরি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে রহিয়াছে বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পবিত্র পদচিহ্ন। আর শূন্য বায়ুমণ্ডল হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সহস্র কণ্ঠের বিশ্বপালনকর্তার গুণ ও স্তুতি। স্বর্গীয় দূতগণ যেন পরমানন্দে চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া দোয়া ও দরূদ পাঠ করিতেছে।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ ও উপস্থিত জনগণ অলক্ষ্যে প্রশংসা ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কে বা কাহারা কোথা হইতে মধুর স্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছে, কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। অজানা আশঙ্কায় তাহাদের দেহ-মন কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল— হে আবু সালেহ মূসা জঙ্গী! দুশ্চিন্তা করিও না। তুমি বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী। তোমার ত্যাগ, তোমার সাধনা আজ ধন্য। তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আল্লাহ পাকের পরম বন্ধু ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রিয় সখা। তুমি এই বালকের নাম রাখিবে 'মাহবুবে সোবহানী' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু। আর এই কথাও শুনিয়া রাখ যে, পৃথিবীর বুকে তাঁহার নাম আবদুল কাদির রূপেই সর্বত্র পরিচিত হইবে। তিনি বিশ্ব নিয়ন্তা মহা প্রভুর যোগ্যতম বান্দা। আমরা কামনা করিতেছি যেন তোমার এই পুণ্যবান পুত্র দীন ও ঈমানের বান্দা। আমরা কামনা করিতেছি যেন তোমার এই পূণ্যবান পুত্র দীন ও ঈমানের যথার্থ খেদমত করিয়া এই বিশ্ব চরাচরে অত্যুজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।'

ইতিহাসের সূত্র হইতে জানিতে পারা যায়, 'এই দৈববাণী শেষ নবী, সমস্ত রাসূলগণের সর্দার, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় সহচরগণ সমভিব্যহারে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ বংশের উজ্জ্বল রত্ন হযরত বড়পীর (রঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য করিয়াছিল।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রঃ) দৈববাণী শ্রবণান্তে পরম পুলকিত হইলেন এবং আল্লাহ্ পাকের মহিমা কীর্তনসহ্ দুই রাকআত নফল নামায আদায় করিলেন এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনে মুনাজাত করিলেন।

'ফাজায়েলে গাওসিয়া' গ্রন্থে হযরত বড়পীর (রঃ) সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) যে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনবী (সাঃ) বলিয়াছেন—'হে আল্লাহ্! আমার পরে পৃথিবীতে আমার যে প্রতিনিধি আগমন করিবে এবং যে মহান হৃদয় ব্যক্তি আমার হাদীসের মাধ্যমে আমার প্রবর্তিত তরীকাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে, তাহার প্রতি তোমার অসীম করুণা ও অনন্ত দয়া বর্ষণ কর।'

নামকরণ

সন্তান-সন্ততির নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতামাতার এক অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং সাইয়্যেদ আবু সালেহ্ মূসা জঙ্গী (রঃ) দৈববাণী নির্দেশ অনুযায়ী পুত্রের নাম রাখিলেন 'আবদুল কাদির' (রহঃ)। তিনি সেইদিন পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে অনেক মিষ্টান্ন দ্রব্য ও উপহার এবং উপঢৌকনাদি বিতরণ করিলেন। আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতের কথা খেয়াল করিয়া পুত্র রত্নকে বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার উপরই সমর্পণ করিলেন।

বিভিন্ন গুণবাচক নামসমূহ

আধ্যাত্ম সাধনার অগ্রনায়ক, তাপসকুল গৌরব সাধারণতঃ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) নামে পরিচিত হইলেও এই বিশ্ব ধরিত্রীর খোদার ভক্ত মহৎ প্রাণ সুধীমণ্ডলীর নিকট বিভিন্ন গুণবাচক নামেও

০ বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পৃষ্ঠ দেশে মোহরে নবুওয়াতের ক্ষুদ্র চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। আর বড়পীর (রঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পদচিহ্ন ছিল। ইহাই ছিল তাহার শ্রেষ্ঠ অলী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন।

তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার বহুল প্রচারিত গুণবাচক নামসমূহ্ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ (১) কুতুবুল আযম বা বড়পীর (রঃ)। (২) কোন কোন অঞ্চলে তিনি মাহবুবে সোবহানী নামে আখ্যায়িত হইতেন। (৩) আবার কেহ্ কেহ্ তাঁকে কুতুবে রাব্বানী নামেও অভিহিত করিত। (৪) আফজালুল আউলিয়া দস্তেগীর নামেও তিনি কোন কোন স্থানে আখ্যায়িত হইতেন। (৫) আবার কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা তাহাকে 'নূরে ইয়াজদানী' নামে ডাকিত। (৬) সর্বোপরি তিনি গাউসে ছামদানী মুহীউদ্দীন নামেও সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।

স্বপ্নাদেশ

পিতা-মাতার আদর-যত্ন ও স্নেহ্ দৃষ্টির ভিতর দিয়া হযরত বড়পীর (রঃ)-এর পবিত্র জীবনের সাতটি বসন্ত পার হইয়া গেল। তিনি অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। একদা তিনি নিদ্রা কাতর অবস্থায় শয্যা গ্রহণ করিয়া গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। নীরব, নিঝুম রজনী। দ্বিতীয় প্রহর কাটিয়া গিয়া তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইয়াছে। তন্দ্রাশীতল ধরিত্রীর বুকে কোথাও টুশব্দ পর্যন্ত নাই। এমন সুখময় ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—একজন উজ্জ্বল জ্যোতিবিশিষ্ট স্বর্গীয় ফিরেশতা তাঁহার

শিয়রের নিকটে আসিয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে বলিতেছেন— 'হে আল্লাহর মনোনীত আবদুল কাদির! উঠ, আর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিও না। সুখ শয্যার কোলে ঢলিয়া পড়িবার জন্য এই পৃথিবীতে তোমার আগমন ঘটে নাই। মোহগ্রস্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন জনগণকে মোহ নিদ্রায় কুহক হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তোমার আগমন ঘটিয়াছে; তোমার করণীয় কর্তব্য ও অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব সুদূর প্রসারী!'
বালক আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই এই ধরনের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার কোমল হৃদয় পটে এই সকল স্বপ্নাদেশ ও অদৃশ্য ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত করিত। অধিকন্তু মহানবী (দঃ)-এর বংশোদ্ভূত হওয়াতে এবং মাতা-পিতা ও পরিবার-পরিজনদের অনেকেই আল্লাহর প্রিয় অলী হওয়ার ফলে তাঁহার আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, সৎসংসর্গ, ধীরস্থিরতা এবং পবিত্র চিন্তা বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই সকল সৎগুণাবলী তাঁহার জীবনে মঙ্গলপ্রসূ সম্বল হিসাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। যাহার দরুন তিনি শ্রেষ্ঠ পীর ও অলীরূপে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহর মাহবুব বান্দারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।
হযরত বড়পীর (রঃ)-এর বাল্যকালের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক চিন্তাশীল লিখক লিখিয়াছেন যে, বড়পীর (রঃ) আট বৎসর বয়সের সময় অন্য একটি স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদৃশ্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—'হে আবদুল কাদির! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। কেন তুমি সর্বকুশলী আল্লাহ পাককে বিস্মৃত হইয়া সুখ নিদ্রার অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেছ, এবার উঠ, উঠিয়া বসিয়া বিশ্বনিয়ন্তার ইবাদাতে মশগুল হইয়া যাও।'
অতঃপর তিনি মোহনিদ্রার দুর্ভাবনার আমেজ বিসর্জন দিয়া সর্বকুশলী আল্লাহ পাকের মহব্বতের অথই সাগরে নিজেকে বিলীন করিয়া দিলেন।

বাল্যকালের শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর বাল্যশিক্ষার হাতে খড়ি হইয়াছিল জ্ঞানবান পিতা ও গুণবতী মাতার মাধ্যমে। তিনি স্বীয় পিতা এবং মাতার নিকট হইতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গৃহে বসিয়াই সমাপ্ত করিয়াছেন। সর্ব প্রথমেই তিনি পবিত্র কোরআন পাঠ করেন এবং পূর্ণ কোরআন শরীফ হেফজ করেন। গৃহশিক্ষার বাহিরে জিলান নগরের স্থানীয় মক্তবেও তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রখর ধীশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার ফলে বাল্যকালেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সহকারী ফিরেশতা

হযরত বড়পীর (রঃ) দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য জিলান নগরের একটি মক্তবে ভর্তি হইলেন। তৎকালে মসজিদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বালকদের মক্তব বসিত। জনসংখ্যার তুলনায় মক্তবের সংখ্যা ছিল কম এবং ছাত্রদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এইজন্য প্রতিটি মক্তবে শিক্ষার্থীদের ভীড় লাগিয়া থাকিত। স্বল্প পরিসরে কোণ ঠাসা হইয়া কোন রকমে ছাত্রগণ নিজ নিজ পাঠ অধ্যয়ন করিত। একদিন হযরত বড়পীর (রঃ) মক্তবে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব হইতেই মক্তবের ছাত্রগণ এমনভাবে স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল যে, উক্ত প্রকোষ্ঠে আর কাহারও বসিবার স্থান ছিল না। এমন সময় অদৃশ্য হইতে আওয়াজ আসিল, "হে শিক্ষার্থীগণ! এই বালকের জন্য তোমরা একটু স্থান করিয়া দাও, যাহাতে তিনি বসিতে পারেন।" কিন্তু উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলী পঠিত বিষয়ে নিমগ্ন ছিল বলিয়া কেহই এই আওয়াজের দিকে তেমন লক্ষ্য করিল না। পরিশেষে গম্ভীর কণ্ঠে দৈববাণী ঘোষিত

হইল, "হে শিক্ষার্থীগণ! তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আল্লাহর প্রিয় অলী দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? উঠ, তাহাকে বসিবার স্থান করিয়া দাও। অযথা বিলম্ব করিয়া সময় নষ্ট করিও না।" এই অদৃশ্যবাণী উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সকলের কর্ণেই ভীষণভাবে আঘাত করিল। সকলেই হতচকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে হযরত বড়পীর (রঃ)-কে বসিবার স্থান করিয়া দিয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করিল। উপরোক্ত দৈববাণী তাঁহার সহকারী ফিরেশতার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এই অদৃশ্য ফিরেশতা সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত।

পিতার মৃত্যু

এই জগতে আশা কাহার না আছে। ধনের আশা, জনের আশা, প্রভাবপ্রতিপত্তি ও সহায়-সম্পদের আশা, পার্থিব উন্নতির আশা, অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশা, আল্লাহ-প্রেমের আশা, বস্তুতঃ মানুষের সমুদয় জীবনটাই যেন আশার দোলনায় দোদুল্যমান। বড়পীর (রঃ)-এর বৃদ্ধ পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রঃ)-এর অন্তরেও একটি আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিয়াছিল। আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সে এই ভাগ্যমন্ত ও মর্যাদার অধিকারী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া এবং স্বীয় পুত্রের অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন যে—যেমন করিয়াই হউক তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিবেন। বড়পীর (রঃ) পবিত্র কোরআন মুখস্ত করিবার পর প্রয়োজনীয় তা'লীম ও তাওয়াজ্জুহ্ স্বীয় সুযোগ্য পিতার নিকটই লাভ করিয়াছিলেন এবং পুণ্যশীল জননীও তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগী করিয়াছিলেন।

সাইয়্যেদ আবু ছালেহ (রঃ) স্বীয় পুত্রের তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, জ্ঞানলিপসার একাগ্রতা, উচ্চ শিক্ষা লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন গুণ-গরিমার প্রতি সতর্কতা, প্রথম হইতেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। গৃহশিক্ষা ও মক্তবের শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁহার জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে জিলান নগরে কোন উচ্চতর শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে নাই। এইজন্য স্বীয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবার কথা বার বার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রের বয়স ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একাকী কোথাও পাঠাইতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। পুত্রের জন্য এই মঙ্গল চিন্তা সর্বদাই তাহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিত। কিন্তু তাঁহার সেই আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। তাঁহার পবিত্র মনের দ্বন্দ্ব-কোলাহল আল্লাহ পাকের অমোঘ ইশারায় মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আল্লাহর প্রিয় তাপস, একাদশ বর্ষীয় পুত্ররত্ন, বৃদ্ধা স্ত্রী ও অসংখ্য ভক্ত এবং অনুরক্তকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া মর জগৎ হইতে বিদায় লইয়া অমর ধামে আল্লাহর সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। তখন হিজরী চারিশত একাশি সাল। সমস্ত জিলান নগরী শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।"

বাগদাদ নগরী

আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাগদাদ। মুসলিম খলিফাগণের যত্ন ও প্রচেষ্টা মুক্ত চিন্তাধারা এবং পৃষ্ঠপোষকতার দরুন বাগদাদ নগরী জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের আসন লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র ইসলামী শাস্ত্রীয় বিধানমণ্ডলীই নহে, বরং বিশ্বের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাগদাদ। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে বাগদাদের অবস্থানকে সবাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই নগরী কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল-খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন, জ্যামিতি, দর্শন, চিকিৎসা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্যের বিদ্যাচর্চা এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানে জ্ঞানার্জন শলাকা লইয়া উপযুক্ত শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণ শিক্ষার্থীদিগকে অকাতরে শিক্ষাদান করিতেন। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এই বাগদাদ হইতেই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী ও মনীষিবৃন্দ এই মহা নগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চা ও অনুসন্ধিৎসাই ছিল তাহাদের একমাত্র পাথেয়। ফলে তাহাদের সান্নিধ্যে ধন্য হইবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে বিদ্যা-শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের মানসে বাগদাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। এই বাগদাদ নগরীই যেন অদৃশ্য হতাছানীতে কিশোর বড়পীর (রঃ)-কে ডাকিতেছিল।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রঃ)-এর জীবদ্দশায়ই বড়পীর (রঃ) কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বড়পীর (রঃ)-কে সংসার ধর্ম বিষয়ক যাবতীয় কার্য সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করিতে হইত না। এই সকল কার্যাদির তদারক আবু সালেহ (রঃ) নিজেই সম্পন্ন করিতেন। পিতার স্নেহ শীতল ছায়ায় বড়পীর (রঃ) বিদ্যা চর্চা, এবাদত-বন্দেগী ও আধ্যাত্ম সাধনায় সর্বদাই নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু আবু সালেহ (রঃ)-এর মহাপ্রয়াণের পর সমাজ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কিশোর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর উপর পতিত হইল। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ছাড়া তাঁহার আর কেহই ছিল না। এমতাবস্থায় নানা বিষয় সমৃদ্ধ পৃথিবী চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেছিল।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রঃ)-এর সংসার অস্বচ্ছল ছিল না। কিছু জায়গা-জমি, ফলের বাগান এবং প্রয়োজনীয় গবাদি পশুও ছিল। এই সকল বিষয়বস্তু হইতে যাহা কিছু আয় হইত উহাতে তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত বড়পীর (রঃ) বাধ্য হইয়া গৃহস্থালী ও সাংসারিক কাজকর্ম নিজ হস্তে করিতেন। ফলে তাঁহাকে দৈনন্দিন বিদ্যা চর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। যাহার দরুন তাঁহার কচি মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, বেদনার তীব্র জ্বালা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হইত। এই প্রতিবন্ধকতামূলক অবস্থার সহিত নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার খোদাপ্রদত্ত উৎসাহী মন, মায়াঘেরা সংসারের সংকীর্ণ সীমারেখার পরিমণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ-প্রেমের উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করিবার জন্য সর্বদাই ছটফট করিত। তাঁহার মনের এই আকুলি-বিকুলির কথা স্নেহময়ী জননীর নিকটও তিনি ব্যক্ত করিতেন। বৃদ্ধাজননী তাঁহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও অব্যক্ত বেদনার তীব্র করুণ সুর তাঁহার সংবেদনশীল অন্তরে বাজিতেই থাকিত।

বাগদাদ গমন

যাহা হউক বড়পীর (রঃ) অষ্টাদশ বৎসর বয়সে স্নেহময়ী মাতার আশীর্বাদ ও পদধুলি গ্রহণ করিয়া এক কাফেলার সহিত এক শুভ দিনে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অন্তরে ছিল আল্লাহ পাকের উপর নির্ভরশীলতা এবং মাতৃআজ্ঞা পালনের দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার বিভিন্ন কারামত ও সৎ গুণাবলীর কথা চতুর্দিকে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কাফেলার দলপতি বড়পীর (রঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে কাফেলার সঙ্গীরূপে লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন! সুদূর ও দুর্গম মরু পথ অতিক্রম কালে যাহাতে তাঁহার কোন অসুবিধা না হয় এবং দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করিতে না পারে, সেই দিকে তিনি সবিশেষ যত্নবান ও মনোযোগ দান করিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রক রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতের হাতে অদৃষ্টচাকা ঘুরাইয়া কখন কাহাকে কোথায় উপনীত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। সসীম মানুষ অসীমের রহস্যাবলী উপলব্ধি করিতে কিছুতেই সক্ষম নহে।

বাগদাদগামী এই কাফেলা অবিশ্রান্ত কয়েকদিনের পথ চলিবার পর বিশ্রাম লাভের আশায় একদা কোন এক মরুপ্রান্তরে তাঁবু গাড়িল। প্রয়োজনীয় পানাহার ও ভোজন পর্ব সমাপনান্তে শ্রান্তি ও অবসাদগ্রস্ত দেহ নিয়া সকলেই সুনিদ্রায় গা ঢালিয়া দিল। আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ স্নিগ্ধ শীতল কিরণ বিকিরণ করিতেছিল। ক্রমেই রাত বাড়িয়া চলিল। গভীর রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত অতর্কিতে ঘুমন্ত কাফেলাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের হুঙ্কার ও অস্ত্রের ঝনঝনানীর শব্দে লোকজন চোখ মেলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু ডাকাত দলের অস্ত্রের আঘাতে অনেকেই ধরাশায়ী হইল। ডাকাত দলের অত্যাচার ও লুণ্ঠন পুরোদমে চলিতে লাগিল। কাফেলার লোকজন ডাকাত দলকে প্রতিরোধ করিবার কোন অবকাশই পাইল না। কাফেলার কেহ কেহ কোন রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া সুবিশাল মরু প্রান্তরের এদিক-সেদিক ছুটিয়া পালাইল। ডাকাত দল কাফেলার সর্বস্ব লুণ্ঠন ও কুক্ষিগত করিয়া ত্বরিৎ গতিতে প্রস্থান করিতে লাগিল। বালক বড়পীর (রঃ) দস্যুদলের আক্রমণে হতচকিত হইয়া অদূরে নির্বাক কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিলেন। ডাকাত দলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্মম অত্যাচার তাঁহার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি এক দৃষ্টে কেবল তাকাইয়া রহিলেন। একের পর এক ঘটনাবলীর নৃশংস চিত্র দর্শনে তাহার কোমল অন্তঃকরণ মর্মদাহে জ্বলিতে লাগিল।

কাফেলা লুণ্ঠনকালীন অদূরে দণ্ডায়মান যুবক বড়পীরের প্রতি ডাকাত দলের একজনের নজর পড়িল। ডাকাত বড়পীরের কাছে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি অকপটে তাঁহার কাছে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান দিলেন। ডাকাতরা কাফেলার অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাথে এই স্বর্ণমুদ্রাও নিয়া ডাকাত-সর্দারের কাছে জমা দিল। এবং ডাকাতকে মুদ্রা প্রদানকালীন বড়পীরের আচরণের কথাও সর্দারকে অবহিত করিল। সর্দার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বড়পীরকে ডাকাইল। পরিশেষে মরু-দস্যু-সর্দার বড়পীরের আচরণে মুগ্ধ হইল। ফলে সর্দার দস্যুদলসহ তাওবাহ্ করিয়া সৎ পথে ফিরিয়া আসিল।

নিযামিয়া মাদ্রাসায়

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তৎকালে সারা মুসলিম জাহানের উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ ছিল বাগদাদ নগরী। সেখানে উন্নত ও উচ্চ পর্যায়ের অনেকগুলি শিক্ষায়তন ছিল। সেইখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধাও ছিল অপরিসীম। তন্মধ্যে নিযামিয়া মাদ্রাসা উন্নতির চরম শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহার সুনাম ও সুব্যবস্থার কথা দেশ বিদেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে বৈষয়িক শিক্ষার সহিত আধ্যাত্মিক শিক্ষাও প্রদান করা হইত। সেই স্থানেই শিক্ষার্থীগণ বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রূহানী শিক্ষার চর্চাও করিত। ফলে মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব দিবার রত্ন হিসাবে তাহারা গড়িয়া উঠিতেছিল।

হযরত বড়পীর (রঃ) বাগদাদে উপনীত হইয়া শীর্ষস্থানীয় নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া এবং ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যথা—(১) হাদীস শাস্ত্র, (২) তফসীর শাস্ত্র, (৩) ফিকাহ, (৪) সাহিত্য, (৫) ভূগোল, (৬) ইতিহাস, (৭) দর্শন এবং (৮) বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য একান্ত মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন শুরু করিলেন। প্রখর ধী-শক্তি তাহার শিক্ষা গ্রহণের পথ আরও সুগম করিয়া তুলিল। নূতন নূতন পাঠ ও জ্ঞান চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন।

যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য

প্রকৃত শিক্ষাদান কার্য উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মাধ্যমেই উপযুক্ত ও কর্মনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের জীবন গড়িয়া উঠে।

এইক্ষেত্রেও বড়পীর (রঃ) ভাগ্যবান ছিলেন। সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্যে তাহার বিদ্যাচর্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। যে সকল মনীষীদের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাঁহাদের নাম পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করিলাম।

হাদীস শাস্ত্র

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এলমে হাদীস এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হযরত বড়পীর (রঃ) যে সকল হাদীস শাস্ত্রবিদ অধ্যাপকবৃন্দের নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান বাকেল্লানী (রঃ), (২) হযরত আবুবকর আহমদ ইবনে মুজাফফর (রঃ), (৩) হযরত মুখতার মোহাম্মদ ইবনে আলী (রঃ), (৫) হযরত ইবনে মাইমুন আলফারসী (রঃ), (৬) হযরত আবু জাফর ইবনে আহমদ ইবনে হোসাইন কারী (রঃ), (৭) হযরত আবুল কাশেম আলী ইবনে আহমদ জিলান আল ফারসী (রঃ), (৮) হযরত আবু তালিব আবদুল কাদির ইবনে আহমদ (রঃ), (৯) হযরত আবুল বারাকাত হাব্বাতুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ), (১০) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আহমদ (রঃ), (১১) হযরত আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে মোখতার (রঃ), (১২) হযরত আবু আবদিল্লাহ (রঃ), (১৩) হযরত আবুল মুবারক ইবনে তুইয়ুরী (রঃ) (১৪) হযরত আবু মনসুর আবদুর রহমান এনফেরাম (রঃ) এবং (১৫) হযরত আবু বারাকাত তালহা (রঃ)।

তাফসীর শাস্ত্র

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তফসীর শাস্ত্র এক বিশেষ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। হযরত বড়পীর (রঃ) নিম্নলিখিত মুফাসসিরগণের নিকট তাফসীর শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ঃ (১) হযরত আবুল খাত্তাব মাহফুজ হাম্বলী (রঃ) (২) হযরত আবুল হাসান মোহাম্মদ ইবনে কাযী (রঃ) (৩) হযরত আবদুল ওয়াফী আলী ইবনে আকীল হাম্বলী (রঃ) এবং (৪) হযরত কাযী আবু সাঈদ মুবারক ইবনে আলী মাখযুমী (রঃ)। এই চারিজন বিখ্যাত মুফাসসির তৎকালে তফসীর শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

আদব ও সাহিত্য

নিযামিয়া মাদ্রাসার বিখ্যাত দুইজন সাহিত্যিক পণ্ডিত হযরত বড়পীর (রঃ)-এর আদব ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। (১) হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম (রঃ) এবং (২) হযরত আবু যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া তাবয়েমী (রঃ)।

দর্শন ও ব্যাকরণ

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর দর্শন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে (১) হযরত আবু ইসহাক জামিল ইবনে মান্নাফ (রঃ) এবং (২) হযরত আবু তামীম সুরখী ইবনে আহমদ সুরখী (রঃ) ছিলেন অন্যতম।

তাহাছাড়া তিনি বিভিন্ন মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়-বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তেরটি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

হযরত বড়পীর (রঃ) আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং জন্মগত প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তি ও একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার ব্যাপক দখল জন্মিয়াছিল। যে কোন বিষয়ে ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনা করা ও বিষয়বস্তুর আলোচনা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুযোগ্য অধ্যাপকমণ্ডলী তাহাকে পরম যত্ন ও স্নেহের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেন। ফলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তেরটি শাস্ত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নিযামিয়া মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক কাজী আবু সাঈদ মোবারক (রহঃ) হযরত বড়পীর (রঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আদর ও যত্ন করিতেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন, "হে আবদুল কাদির! শীঘ্রই বিশ্বের জনমণ্ডলী তোমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা বিশ্ববাসী উপকৃত হইয়া দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে।"

হাদীস শাস্ত্রে বড়পীর (রঃ) অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী গ্রহণের সময় বিজ্ঞ অধ্যাপকগণ মন্তব্য করিয়াছেন—"হে আবদুল কাদির! হাদীস শাস্ত্রের সনদ দানের এই প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার প্রবর্তন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রের মর্মোদঘাটন ও তত্ত্বলাভে আমরা তোমার নিকট হইতে প্রভূত উপকৃত হইয়াছি।"

নিযামিয়া মাদ্রাসার জাহেরী এলেম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারেফাত সম্বন্ধেও বাগদাদের বিভিন্ন সুফী ও সাধকের নিকট হইতেও বরকত লাভ করিয়াছিলেন। জাহেরী এবং বাতেনী এলেমের পুণ্য জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয়মন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল।

পীরে কামেলের সাহচর্যে

আধ্যাত্মিক সাধনার পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম অনুধাবনের নিমিত্তে পীরে কামেলের সাহচর্য প্রত্যেক সাধকের জন্য অপরিহার্য। উপযুক্ত পীরের ফয়েজ লাভে প্রতিটি সাধক কৃতার্থ হইতে পারে। হযরত বড়পীর (রঃ)-ও এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন তরীকতের শ্রেষ্ঠ বোযর্গ মহাসাধক শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করিলে শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রঃ) তাঁহার মধ্যে প্রকৃত শিষ্যত্বের যোগ্যতা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে মুরীদ করিলেন এবং মারেফাতের গুপ্ততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। কীর্তিমান সুখ্যাতিসম্পন্ন শিষ্য অচিরেই পীরের দীক্ষায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মারেফতের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এমন কি কামালিয়াতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া পরিপূর্ণরূপে কামিয়াবী হাসিল করিলেন। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত পীরের দরবারে অবস্থান করিয়া ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হইলেন। পরিশেষে পীর কেবলা তাঁহাকে অন্যত্র গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পীরের বিনা অনুমতিতে স্বেচ্ছায় কোন কিছুই তিনি করিতেন না।

তাহাছাড়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মারেফাতের তত্ত্বলাভে অনেক সহায়ক হইয়া থাকে। বড়পীর (রঃ) ছিলেন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পবিত্র কোরআন, হাদীস শাস্ত্র, তাফসীর শাস্ত্র, ফিকাহ শাস্ত্র, দর্শন ও ভূগোল শাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রসায়ন ও ইতিহাস শাস্ত্র প্রভৃতি তেরটি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় মনীষা বিদ্যমান ছিল। স্বীয় কঠোর সাধনা ও বিভিন্ন সাধকদের সাহচর্যে পূর্বাহ্নেই তিনি রুহানী জগতের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিতরূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদুপরি কামেল পীরের সাহচর্য তাঁহাকে পরিপূর্ণ কামিয়াবীর উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী করিয়া সৌভাগ্যের চরম শিখরে তুলিয়াছিল।

পীরের সাজরা

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর পীরের সাজরা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। উহা হইতে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, আল্লাহ্ পাক ও তদীয় প্রিয় রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর সহিত তাঁহার রূহানী যোগাযোগ কতখানি সক্রিয় ছিল।

বড়পীর (রহঃ)-এর পীর ছিলেন ঃ (১) হযরত শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (২) শায়খ আবুল হাসান আলী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৩) হযরত আবুল ফারাহ তারতুসী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৪) হযরত আবুল ফজল (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৫) হযরত আবুল কাসেম (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৬) হযরত আবুবকর শিবলী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৭) হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৮) হযরত সাররী সাকতী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৯) হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১০) হযরত খাজা হাসান বসরী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১১) হযরত ইমামুত তরীকত সাইয়্যিদিনা হযরত আলী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১২) সায়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতিমুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এইখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল এই যে—পীরের এই সিলসিলা অনুযায়ী হযরত বড়পীর (রহঃ) ছিলেন ত্রয়োদশ ব্যক্তি। মারেফাতের পরিভাষায় এই সনদকে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

মাতার ইন্তেকাল

উম্মুল খায়ের সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ) কত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহার সঠিক তথ্য কোথাও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। তবে অনেকেই মনে করেন যে, তিনি বিরাশি বৎসর বয়সে জিলানেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। সেই সময় হযরত বড়পীর (রহঃ) নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার বাগদাদ গমনের পর স্নেহময়ী মাতার সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ)-এর মাজার জিলানের উপকণ্ঠে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ পাক এই পুণ্যবতী রমণীর প্রতি রহম ও করম করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

কর্মজীবনের ডাক

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সম্মুখে কর্তব্য ও দায়িত্বের অপরিসীম পথ পড়িয়া রহিয়াছিল। গুরুদায়িত্বের যথাযথ প্রয়োগ ব্যবস্থার জন্য তিনি পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, কর্ম প্রতিষ্ঠায় উদগ্র আকাঙ্খা, কর্মজীবনে মনোনিবেশ করিবার জন্য অলক্ষ্যে তাঁহাকে ডাক দিতেছিল। এই ডাককে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই সাধনার সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন। আখেরী নবী (সাঃ)-এর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্রতী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে দেখা দিল কর্মময় স্বর্ণ যুগের নব প্রভাব।

অধ্যাপনা গ্রহণ

বাগদাদের শ্রেষ্ঠ আলেম, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ নিযামিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যাপক হযরত আবু সাঈদ মুবারক (রহঃ) ছাত্র হিসাবে হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন এবং বড়পীর (রহঃ)-এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেন। নিযামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষানবীশ অবস্থায় হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে তিনি প্রভূতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নিজে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন।

বড়পীর (রহঃ)-এর মধ্যে অসাধারণ ধী-শক্তি, সীমাহীন পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার প্রতি সুধারণা পোষণ করিতেন। বড়পীর (রহঃ) নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপনের পর শায়খ মুবরাক (রহঃ) নিজের মাদ্রাসার পরিচালনা ও অধ্যাপনার দায়িত্ব হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট সোপর্দ করিলেন। ইহাতে বড়পীর (রহঃ) স্বীয় জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। দেশ ও জাতি গঠনে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিরলস সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন।

তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সুচারুরূপে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অতুলনীয় অগাধ পাণ্ডিত্যে এবং অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ সবিশেষ উপকৃত হইতে লাগিল। শিক্ষার্থীগণ অনেকদিন পর তাহাদের আকাঙ্খিত জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান লাভ করিয়া মধু মক্ষিকার ন্যায় তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া রহিল। হযরত বড়পীর (রহঃ) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কষ্টলব্ধ জ্ঞান ও মনীষা এবং পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের উপরই তাঁহার অগাধ জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ খোদাপ্রদত্ত অনুপম মনীষা প্রকৃত জ্ঞানালোকের উজ্জ্বল কিরণে চতুর্দিক তিনি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎসমুখ অনন্ত ও অবিনশ্বর জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত ছিল। ফলে প্রচলিত ঘুণেধরা শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করিয়া তিনি নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। যুগ ও পরিবেশের উপযোগী তাঁহার এই ব্যবস্থার ফলে জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থীবৃন্দ সদলবলে উক্ত শিক্ষায়তনে ভীড় জমাইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের জন্য সকলেই উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

যে তেরটি বিষয়ে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন সেই বিষয়গুলি তিনি শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্যক্রমকে দুইভাগে ভাগ করিয়া নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত তাহা পরিচালনা করিতেন। প্রথম ভাগের সময়কাল ছিল প্রভাত হইতে বেলা দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। এই ভাগে তিনি হাদীস শাস্ত্র, ন্যায় বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব এবং উসুল ও সাহিত্য বিষয়াদি সম্বন্ধে পাঠদান করিতেন। আর দ্বিতীয় ভাগের সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পর হইতে এশার নামায পর্যন্ত বিলম্বিত। এই সময় তিনি পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, তৌহীদ ও আইন শাস্ত্রাদি নিয়া আলোচনা করিতেন।

বিদ্যায়তন সম্প্রসারণ

শায়খ মুবারক (রঃ) অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকালে কাদিরিয়া মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ও পরিসর তেমন বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু হযরত বড়পীর (রহঃ) সেই বিদ্যায়তনের শিক্ষকতা শুরু করিবার পর ইহার ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া এমন এক পর্যায়ে পৌছিল যে, মাদ্রাসায় গৃহ ও তৎসংলগ্ন অবিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাহাদের সংকুলান দায় হইয়া উঠিল। খোলামাঠে, বৃক্ষছায়া ও বাসগৃহের ছাদসমূহের উপর কিংবা অলিগলিতে দাঁড়াইয়া বড়পীর (রঃ)-এর তালীম ও তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে বড়পীর (রহঃ) মাদ্রাসার সম্প্রসারণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সঙ্গতিসম্পন্ন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিলেন। কেহবা অর্থ সাহায্য করিয়া আবার কেহবা স্বেচ্ছা শ্রমের দ্বারা মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করিল। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র মাদ্রাসা বৃহদাকার শিক্ষায়তনে পরিণত হইল।

কিতাব প্রণয়ন

হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর কর্মময় জীবন ছিল মানব জাতির জন্য এক পবিত্র জীবনাদর্শ। মানব জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহাতে তাঁহার কর্ম প্রচেষ্টা ও আদর্শ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের সহিত তাঁহার জীবনের বহুলাংশে মিল ছিল। মহানবী (দঃ)-এর পবিত্র আদর্শের মূর্তমান বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁহার জীবন পথ। বড়পীর (রহঃ) আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও সাধনার পথে জীবনকে অতিবাহিত করেন নাই। এমনকি তিনি বিশ্বজগতের মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারে উদাসীন ও গণ্ডীবদ্ধ তপস্যায়ও নিরত ছিলেন না। বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এবং মানব সমাজের সামগ্রিক পরিশুদ্ধির জন্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সারা জীবন কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি বিভিন্ন সময় বক্তৃতা, কল্যাণমূলক বিবৃতি, জ্ঞান সাধনা ও অধ্যাপনা এবং আলোচনার

মাধ্যমে স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ এবং নমুনা মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করিতেন। তাহা ছাড়া, তিনি ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ এমন সব অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা মুসলিম গণমানসে হেদায়েতের উজ্জ্বল মশালরূপে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে। পাঠক ও পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার অমর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হইল।

(ক) ফতহুল গাইব ঃ এই অমূল্য গ্রন্থখানা সুফীবাদ ও মারেফাতের আধ্যাত্মিক উপদেশ, ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনের মঙ্গল নির্দেশক আলোর পরশ সমতুল্য। আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ইহা এক জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। ইহাতে আধ্যাত্ম সাধনার বিপদসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রমের সুষ্ঠু পথ বিবৃত রহিয়াছে। বস্তুতঃ অজানা জগতের বন্ধ দুয়ার খুলিবার জন্য এই গ্রন্থখানিকে চাবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

(খ) গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন ঃ 'গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন' ইসলামী সাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক মত ও পথের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং হানাফী মাযহাবের বিধানসমূহ সঠিক প্রমাণ সহকারে আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধি-বিধান ও রীতি-পদ্ধতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। মোটকথা ইসলামী আইন ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে ঃ (১) শিষ্টাচার, (২) স্বভাব, (৩) সম্মান দেখানো, (৪) পাকা চুল বাছা, (৫) নখ কাটা, (৬) ঘরে প্রবেশ, (৭) পানাহারের নিয়ম, (৮) অযুর দোয়া, (৯) নিদ্রা যাওয়া, (১০) হালাল রুজী ও নির্জনতা অবলম্বন, (১১) পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, (১২) বিবাহশাদী, (১৩) স্ত্রীর কর্তব্য, (১৪) আমাদের ঈমান, (১৫) বেহেশত এবং দোযখ, (১৬) মহানবী (সাঃ)-এর ফজীলত, (১৭) আউযুবিল্লাহর ফজীলত, (১৮) বিসমিল্লাহর ফজীলত, (১৯) বিসমিল্লাহর অর্থ, (২০) বেহেশতের শান্তি, (২১) দোজখের শাস্তি, (২২) আল্লাহর ফরমান, (২৩) পথভ্রষ্ট ফেরকা, (২৪) মাস-দিনসমূহের ফজীলত ও বর্ণনা (২৫) গুনাহের বিবরণ, (২৬) তওবা, (২৭) পরহেযগারীর মূল্য, (২৮) কোরবানীর ফজীলত, (২৯) রোযার ফজীলত, (৩০) ঈমানের বর্ণনা, (৩১) নামাযের বর্ণনা, (৩২) শোকর ও তাওয়াক্কুলের বর্ণনা, (৩৩) জীবন যাত্রার বিধানাবলী, (৩৪) উম্মতে মুহাম্মদীর ফজীলত, (৩৫) ধর্মীয় বিধি-বিধান, (৩৬) শয়তানের অবস্থা ও উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়, (৩৭) আন্তরিক পরিশুদ্ধি, (৩৮) পীর ও মুরীদের বিবরণ, (৩৯) সাধারণ ক্ষেত্র এবং (৪০) পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের বিবরণ ইত্যাদি।

(গ) কাসিদাতুল গাউসিয়া ঃ হযরত বড়পীর (রঃ) কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিতেন। বর্ণিত গ্রন্থটি হযরত বড়পীর (রঃ) কর্তৃক রচিত একটি আরবী কাব্যগ্রন্থ। ইহার প্রতিটি কবিতায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা রূহানী রস সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতা মঞ্জুরীত এক কুসুম কানন বিশেষ। বিশ্বের অগণিত মানুষ ইহা শ্রদ্ধাভরে পাঠ করিয়া থাকে। ইহাতে খোদার প্রেমের জ্বলন্ত অগ্নি বিধৃত রহিয়াছে।

(ঘ) মাকতুবাতে গাউসিয়া ঃ চিঠিপত্র লিখার প্রতিও হযরত বড়পীর (রঃ)-এর ঝোক ছিল। তাঁহার নিকট শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত লোকজন প্রায়ই পত্র লিখিত। তিনি তাহাদের সেই সব পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহার চিঠিপত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও উপদেশে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাছাড়া সেইগুলিতে তাঁহার রচনা কৌশল ও ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্ট ছিল।

(ঙ) আল ফাতহুর রাব্বানী ঃ ইহা এক মূল্যবান গ্রন্থ। আল্লাহ পাকের সহিত মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার মিলনের আধ্যাত্মিক পথের প্রক্রিয়াসমূহ ইহাতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মূলতঃ ইহা ৩রা শাওয়াল পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ হিজরী হইতে

২৫শে রজ্জব পাঁচশত ছিচল্লিশ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ দশ মাস যাবত প্রতি সপ্তাহে হযরত বড়পীর (রঃ) খানকাহ শরীফ ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলির সংকলন মাত্র। ইহা প্রথমে মিসরে ছাপা হয়। অতঃপর মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাটি (রঃ) উহার উর্দু অনুবাদ ফুয়ুজে ইয়াজদানী নামে প্রকাশ করেন। তারপর আনোয়ারে সোবহানী নামে ফুয়ুজে ইয়াজদানীর ব্যাখ্যা গ্রন্থও ভারতের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে আমরা উক্ত বিষয় এখানে তুলিয়া ধরিতে বিরত রহিলাম।

(চ) ফারসী কবিতা লিখার প্রতিও হযরত বড়পীর (রঃ)-এর বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফারসী ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। নীচে ফারসী মুনাজাত কবিতাটি ইহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের দৃষ্টি উহার দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

তা আবাদ ইয়ারব যেতু মিন লুতফিহা দারাম উমেদ,
অযতু গর উমেদ দারাম আযকুজা দারাম উমেদ।
যিস্তাম উমর বছে চু দুশমন মগীর,
বেওফায়ে কারদাহ আম আমতু ওফা দামার উমেদ।
মান ফকীরাম, মান গরীবাম বেকাছায় বিমার আযার,
এক কাদাহ যা শরবতে নারুশ শাফা দারাম উমেদ
এক বদম গোফতাহ আমবন মান্দাআম বাদকারদা আম,
বাওজুদই খাতাহ মান আতা দারাম উমেদ।
হামতু দাদী মান চাহা কারদামতু পুরশীদ যে লুতফ,
হামতু মিদানী কেহ আম তুমান চাহা কারদাম উমেদ।

প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগী

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সূর্যের মত সর্বদাই কিরণ দান করিতেন, তবুও বিভিন্ন কিতাবে তাঁহার প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগী সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ।

তিনি দীর্ঘ আঠার বৎসর যাবত দৈনিক একবার একপায়ে দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন। আর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করিয়াছেন। এই সময় রাত্রে তিনি নিদ্রা যাইতেন না। সমস্ত রজনী বিনিদ্রভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রত্যেক নূতন ইবাদত আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি নূতন করিয়া অজু করিতেন।

ফজরের নামায সমাপনান্তে তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং যিকির-আযকার, অজিফা ও দোয়া-কালাম পাঠ করিতেন। জোহরের নামাযের পর তিনি আল্লাহ পাকের পবিত্র নামসমূহ, নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র নামসমূহ, দরূদে শিফা ও দরূদে আকবার কয়েকবার পাঠ করিতেন। তাছাড়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুইশত রাকায়াত নফল নামায আদায় করিয়া এই কালাম অধিক সংখ্যকবার পাঠ করিতেনঃ 'আল মুহিতুল হাছিবুল গাইবুল খালিক্কুল রাবিউল মুনাব্বির।' আর প্রত্যহ গভীর নিশীথে তিনি বার রাকয়াত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করিয়া তিনশত ষাট বার চল্লিশটি পবিত্র নাম পাঠ করিতেন। তাহা ছাড়া দোয়ায়ে ছাইফুল্লাহ, দোয়ায়ে সাফী বানতাহ আযাতত ও দোয়ায়ে বানতাহা আতবার কয়েকবার পাঠ করিতেন। প্রত্যুষে তিনি চাশতের নামায আদায় করিতেন এবং দোয়ায়ে আযমতে কবীর তেলাওয়াত করিতেন।

যিকির-আযকার ও পবিত্র নামসমূহ পাঠ করিবার সময় কখনও কখনও তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চলমান পৃথিবীর আবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া মাকামে অয়াহদানিয়্যাতের অদৃশ্য জগতে হারাইয়া যাইতেন। পৃথিবীর দৃশ্যপট হইতে তখন তাঁহার ছবি মুছিয়া যাইত। ফানাফিল্লাহর সাগরে বিচরণ

করিয়া আবার তিনি মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিতেন এবং সিজদায় পতিত হইয়া আল্লাহর শোকরগুজারী করিতেন। এই অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহর আশেক বান্দাগণই ভাল জানেন, ইহা বর্ণনার জিনিস নহে।

জীবন যাত্রার ধারা

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর জীবনযাত্রার ধারা ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময় অধ্যায়স্বরূপ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাধনার সুমহান শৈলচূড়াতে অবস্থান করিতেন। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি, লিপ্সা বা আগ্রহ কখনই তাঁহার মনে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। আল্লাহর প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা সর্বদাই তাঁহার হৃদয়মন জুড়িয়া থাকিত। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন গৃহবাসী আপন জনের মত। স্বভাবধর্মী মানব চরিত্রের সমুদয় গুণাবলী তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মহানবী (সাঃ)-এর পুণ্যময় জীবনাদর্শের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অলি-আল্লাহ রূপে চির বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার সুদীর্ঘ একানব্বই বৎসর জীবনে পার্থিব যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থাদি তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। আল্লাহর ধ্যান-ধারণা ও উপাসনাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল তাঁহার নিকট মূল্যবান। অযথা সময় নষ্ট করাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করিতেন। যৌবনে তিনি ভোগ-সম্ভোগকে বিসর্জন দিয়া শিক্ষা ও আধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। অতঃপর হিজরী পাঁচশত একুশ সালে একান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাগদাদে বসবাস শুরু করেন। এই সময় তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময় একাদিক্রমে তিনি চারিজন রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার সহধর্মিণীগণ সর্বদা তাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও খেদমতের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে তৎপর থাকিতেন। তাহার চারিজন স্ত্রীর গর্ভে সর্বমোট ঊনপঞ্চাশ জন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সাতাইশজন ছেলে ও বাইশজন কন্যা সন্তান ছিল। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। পারিবারিক সংসার যাত্রার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা ও আদর-যত্নের প্রতি সর্বদাই তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। আদর্শ গৃহস্বামী, আদর্শ পিতা ও শিক্ষক হিসাবে তাঁহার জুড়ি ছিল না।

'আওয়ারিফুল মাআরিফ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত বড়পীর (রঃ)-কে প্রথম জীবনে বিবাহ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন—'ইহা নিশ্চিত যে, আমি বিশ্বনবী (সাঃ)-এর আদেশ পালনার্থেই কেবল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। অন্যথায় বিবাহ না করাই ছিল আমার সিদ্ধান্ত। বিবাহিত জীবনে আল্লাহর যিকির-আযকারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এইজন্য কখনও বিবাহের বাসনা আমার মনে উদয় হইলে তাহা হইতে আমি দূরে থাকিতাম। পরিশেষে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে আমি চারিজন পত্নীর পাণি গ্রহণ করিলাম।

তিনি শিক্ষকতা, সভা-সমিতি, ফাতোয়া প্রদান, আধ্যাত্ম শিক্ষা চর্চা তথা শতকর্মের ব্যস্ততার ভিতর দায়িত্বকে কখনও অবহেলা করেন নাই। রোগীর সেবা ও অসুস্থের যত্ন করা, নিজ হাতে গৃহের কাজ-কর্ম করা, ঝাড়ু দেওয়া, পানি আনয়ন করা, রান্না-বান্নায় সাহায্য করা, গরীব দুঃখীদিগকে সাহায্য করা, পরিবারের সদস্যদিগকে লইয়া একত্রে আহার করা এবং সর্বোপরি নিয়মিত নফল রোযা পালন করা হইতে কখনও তিনি নিবৃত্ত হইতেন না। এত কিছুর ভিতরেও তাঁহার ধর্ম সাধনা পূরাদমে পরিচালিত হইত।

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর জীবিতকালেই তাঁহার কতিপয় ছেলে-মেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় কখনও তিনি বিচলিত হন নাই। পার্থিব জীবনের আগমন ও তিরোধানের বিষয়টিকে নিতান্ত সহজভাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলে। মৃত সন্তানাদির দাফন-কাফন, জানাযার নামায পড়া ইত্যাদিতে নির্বিকার চিত্তে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি সদ্য প্রসূত

সন্তানকে হাতে লইয়া প্রায়ই বলিতেন যে, 'ইহা জড়পিণ্ড মাত্র।' ফলে সন্তানের প্রতি অহেতুক মায়া বন্ধন তাঁহার মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিত না এবং কাহারও মৃত্যুতে তিনি অধীর হইতেন না। এইজন্য দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার সন্তানাদির মৃত্যু সংবাদে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতায় কোন রকম বিঘ্নই ঘটিত না। এমতাবস্থায়ও তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে থাকিতেন।

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর পবিত্র জীবন যাত্রার ধারা ছিল বহুমুখী গুণের অপূর্ব সমাবেশে অম্লান। ত্যাগ ও সাধনা, শিক্ষাকতা ও জ্ঞানচর্চা, পরিবারে ভরণ-পোষণ ও পরিচর্যা, ধৈর্য ও সংযমশীলতা এবং সর্বোপরি বৈষয়িক জীবনের দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়া চারিত্রিক জীবনের পাথেয় সংগ্রহের যে পুণ্যাদর্শ তাঁহার মধ্যে বিরাজমান ছিল, তাহা যুগ-কালের সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল যাবত সমুজ্জ্বল থাকিবে।

জীবন সায়াহ্ন

শায়খ শাহাবুদ্দীন (রঃ) 'বেহাজাতুল আসরার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজরী পাঁচশত একষট্টি সালে রবিউল আউয়াল মাসে হযরত বড়পীর (রহঃ) কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স নব্বই বৎসর। দিনে দিনে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। রোগে আক্রান্ত হইবার পর শত চেষ্টায়ও তাহা নিরাময়ের দিকে গেল না। বরং দৈনন্দিন তাহা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, তাহার নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার অবসান এইবার ঘটিবে। পার্থিব জগতের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে অমরধামে মহাপ্রভুর সন্নিধানে যাইতে হইবে। তাঁহার বিদায়ের করুণ সুর যেন অলক্ষ্যে রহিয়া রহিয়া বাজিতে লাগিল।

পরবর্তী রবিউস সানী মাসের প্রথম শুক্রবার হইতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কট লগ্নে দিনে দিনে দর্শনার্থীগণের ভীড় বাড়িয়া চলিল। দেশ বিদেশ হইতে অনেক দরবেশ, ফকীর, আমির ওমরাহ, বিজ্ঞ পণ্ডিত, মুরীদ, মো'তাকেদীন ও অলী-আল্লাহগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার চারিপার্শ্ব ঘিরিয়া রহিলেন। কেহ বা তাঁহার মুবারক অঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কেহ বা পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। কেহ বা বড়পীর (রঃ)-এর নূরানী মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায়! এইবার বুঝি হুযুর আমাদিগকে জন্মের মত শোক সাগরে ভাসাইয়া পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।' বিয়োগ বেদনার ভয়াল তরঙ্গমালায় সকলের দেহ মন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

হযরত বড় পীর (রঃ) সকলের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখাবয়ব অবলোকন করিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন—'আনা লা উবালী বিশাইয়িন, ওয়া লা বিমালাকাল মাউতি'। অর্থাৎ আমি বিশ্বভূবনের প্রতিটি বস্তু ও পদার্থ হইতে নির্ভয় রহিয়াছি। এমনকি মৃত্যুদূত আজরাইলকেও আমি পরোয়া করিতেছি না।

তারপর জীবন সায়াহ্নের চরম মুহূর্ত আসন্ন হইয়া পড়িল। হযরত বড়পীর (রঃ)-এর চোখে-মুখে অদৃশ্য জগতের নূরানী লীলা-খেলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট জনমণ্ডলী ও বেদনাকাতর পুত্র-কন্যা এবং পরিজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত মধুর স্বরে বলিলেন—"হে আমার প্রিয়জনেরা! তোমরা আমার পার্শ্ববর্তী স্থান ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া বস। নিকটে আসিবার জন্য ভীড় করিও না। আমি যদিও তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিতেছি, কিন্তু আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান বিরাজ করিতেছে। জানিয়া রাখ, তোমার ব্যতীত অন্যান্য বহু পবিত্রাত্মা এইখানে আগমন করিয়াছেন। আমাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করিবার জন্য দলে দলে স্বর্গীয় ফিরেশতাগণ আসিয়াছেন। আর চাহিয়া দেখ, আল্লাহর প্রিয়পাত্রগণও উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য স্থান করিয়া দাও এবং তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তোমরা আগন্তুক পবিত্রাত্মাদের স্থান

সংকীর্ণ করিবার চেষ্টা করিও না। আর তখন তিনি মুহূর্মুহু অবস্থায় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—"ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুলাহ্ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া গাফরাল্লাহু ওয়ালাকুম ওয়া তাবা আলাইকুম।" অর্থাৎ আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হউক। আর আল্লাহ্ পাক আপনাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনাদের তওবা কবুল করুন।

অন্তিমকালের শেষ নসীহত

সাইয়্যেদ আহমদ (রঃ) 'আনোয়ারে আহমদী' নামক গ্রন্থে বড়পীর (রঃ)-এর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত বড়পীর (রঃ)-এর অন্তিম সময় অত্যাসন্ন মনে করিয়া উপস্থিত জনগণ চিন্তাক্লিষ্ট ও বিমর্ষভাবে শেষ নসীহত শুনিবার জন্য আবেদন করিল। বড়পীর (রঃ) উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, "আলাইকা বিতাকওয়াল্লাহি ওয়া ত্বাআতিহী, ওয়ালা তাখাফ আহাদাউ ওয়ালা ফারজুহু ওয়ালা তাছিক বিআহাদিন ছিওয়াল্লাহি আযযা ওয়াজ্বাল্লা, ওয়ালা তা'তামিদ ইল্লা আলাত তাউহিদিল্লাযী আলাইহি ইজ্‌মাউল কুলি।" অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁহার এবাদত বন্দেগী করা, আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করিও না, কাহারও আশা অন্তরে পোষণ করিও না। আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও প্রতি নির্ভরশীল হইও না, আর সেই তাওহীদ সম্পর্কে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করে উহা ব্যতীত অন্য কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না!

অতঃপর তিনি ম্রিয়মান ও বিমর্ষচিত্ত পুত্র সন্তানদিগকে খেতাব করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রিয় পুত্রগণ! আমার জীবনের এই অন্তিমলগ্নে তোমাদিগকে সংক্ষেপে কিছু নসীহত করিয়া যাইতেছি। এই শেষ নসীহতগুলি পালন করিবার প্রতি তোমরা যত্নবান হইও। ইহার অন্যথা যেন না হয় সেইদিকে সর্বদা খেয়াল রাখিও।"

হে আমার সন্তানগণ! তোমরা কস্মিনকালেও ভুলক্রমে গুনাহের পথে পদ চারণা করিয়া দোযখের দিকে অগ্রসর হইও না। কষ্টলব্ধ পুণ্য কর্মানুষ্ঠানগুলিকে পৃথিবীর মায়া মোহে জড়িত হইয়া নষ্ট করতঃ পরকালের পাথেয় শূন্য হইও না। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য—উভয়ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকিও। শরীয়তের নীতি নির্দেশগুলি নিয়মানুসারে আদায় করিও। সর্বশক্তিমান ও মহান কুশলী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিও না। পার্থিব জীবনের অভাব অনটন, আশা-আকাঙ্খা, বিপদাপদ, মঙ্গলামঙ্গল, আরাম-আয়েশ, দুঃখ-বেদনা সর্বাবস্থায় তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইও। চরম সঙ্কট ও বিপদাপন্ন অবস্থায়, কিংবা দুঃখ-দুর্দশা ও দৈন্যতার মধ্যে পরিলিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও অংশী স্থাপন করিও না। কেননা প্রকৃতই তিনি অংশী হইতে চির পবিত্র। তৌহীদের শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য আবহমান কাল ধরিয়া নবী ও রাসূলগণ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইতেছেন। তোমরা পাঞ্জেগানা নামায আদায়ে তৎপর হইও। নামাযের হেফাজত করিও।

আর জানিয়া রাখ, দয়াময় আল্লাহ্ পাকের নিকট কেহ যদি আমার উছিলা দিয়া প্রার্থনা করে অবশ্যই তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে। কিন্তু প্রকৃতই যদি উহা কবুল না হয়, তবে বিশুদ্ধ চিত্তে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ একাদশবার সূরায়ে ইখলাস, একশত মর্তবা দরূদ পাঠ করিবে। তারপর একাদশ বার আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে স্বীয় মনোবাসনা তুলিয়া ধরিবে। অবশ্যই আল্লাহ্ পাক উহা কবুল করিবেন ও পূর্ণ করিবেন। কিন্তু সাবধান! স্মরণ রাখ; যদি কেহ আমার নামে কোন কিছু মানত করে, বিসর্জন দেয়, কিংবা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন বস্তু আমার নিকট প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সেই মহা গুনাহগার ব্যক্তি অংশীবাদী বেঈমান অবস্থায় জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইবে।

আশু বিপদাশঙ্কায় মুহ্যমান অশ্রুসিক্ত নয়ন, বিষণ্ন বিবর্ণ চেহারা ও বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তঃকরণের সহিত উপস্থিত জনতা তাঁহার অন্তিম নসীহত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলেন এবং উহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন।

পরলোক গমন

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাধক, রূহানী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত বড়পীর (রঃ)-এর জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পূর্বাকাশে মহাশোকের চিহ্ন যেন ক্রমেই ফুটিয়া উঠিল। আকাশ-বাতাস কেমন যেন থমথমে ভাব ধারণ করিল। ধুলার ধরণী মলিন বসন পরিধান করিয়া শোকাকুল হইয়া উঠিল।

শায়খ আবদুল ফতেহ্ বাগদদী (রঃ) 'মাশায়েখ আউলিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রবিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের সময় হযরত বড়পীর (রঃ) স্বীয় পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! তোমরা আমাকে গোসল করাইয়া দাও। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত গোসল দিলেন। গোসল সমাপনান্তে বড়পীর (রঃ) শান্তিপূর্ণভাবে এশার নামায আদায় করিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিজদার হালতে তিনি এই দোয়া পাঠ করিলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" অর্থাৎ—হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি উম্মতে মুহাম্মদীকে মার্জনা করিয়া দিন আর উম্মতে মুহাম্মদীর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাহাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করিয়া দিন। এমন সময় অদৃশ্য হইতে দৈববাণী ঘোষিত হইল, "হে আমার প্রিয়তম বান্দা, আমি তোমার অন্তিম প্রার্থনা কবুল করিয়াছি এবং সেই সঙ্গে আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খাঁটি উম্মতদিগকে মার্জনা করিয়াছি।"

অতঃপর সিজদাহ্ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তিনি পবিত্র জবানে পাঠ করিলেন, "ইস্তাআতু বি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাইয়্যাল্লাযী লাইয়ামূতু ওয়ালা ইয়াখশা ছুবহানা মান তাআহযাযা বিলক্কুদরাতি ওয়ালা ক্বাহরি আলাল ইবাদি বিল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" অর্থাৎ—আমি সেই আল্লাহতায়ালার সাহায্য কামনা করিতেছি যিনি ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই, তিনি নির্ভয়দাতা ও চিরঞ্জীব। বান্দাদিগকে মৃত্যু দান করিতে তিনি ক্ষমতাবান! আমি তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার প্রিয় রাসূল।

ক্রমশঃ তাঁহার নূরানী চেহারায় অনির্বাচনীয় দ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুদিত আননে তিনি যেন কোথাও চলিয়া গেলেন। সবার অলক্ষে মালাকুল মউত আজরাইল ফিরেশতা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইয়া সালাম প্রদান করিলেন। সালামের উত্তর দান করতঃ তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া আগন্তুকের প্রতি তাকাইলেন। আজরাইল ফিরিশতা একখণ্ড লিপি তাঁহার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। উহাতে আরবী ভাষায় লিখিত ছিল—"হাজাল মাকতুবু মিনাল মুহিব্বি ইলাল মাহবুবি।" অর্থাৎ এই পত্র প্রেমিকের নিকট হইতে প্রেমাস্পদের কাছে প্রেরিত হইল। হে বন্ধু! বিরহ ও বিচ্ছেদ জ্বালার অবসানকল্পে দীদারে মাহবুবের জন্য শীঘ্র উপস্থিত হও।

আল্লাহর দরবারের এই পত্র পাঠ করিয়া বড়পীর (রঃ) আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি আজরাইল ফিরেশতাকে কর্তব্য সত্বর সম্পাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠরত অবস্থায় তাঁহার পবিত্ররূহ দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রিয় বন্ধুর দরবারে চলিয়া গেল। পাঁচশত একষট্টি হিজরী ১১ই রবিউস সানী মতান্তরে ৯ই অথবা ১০ই অথবা ১৭ই সোমবার প্রভাতে একানব্বই বৎসর বয়সে পীরানে পীর দস্তেগীর হযরত বড়পীর (রঃ) পৃথিবীতে শান্তি ও আদর্শের নমুনা প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-সন্তান ও ভক্ত-অনুরক্তদিগকে ইহ-জনমের মত পরিত্যাগ করিয়া বেহেশতে গমন করিলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জাগতিক মৃত্যুর তুহীন শীতল স্পর্শে তাঁহার কর্মজীবনের অবসান ঘটিলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও আদর্শ পৃথিবী প্রলয় পর্যন্ত অম্লান থাকিবে।

শেষকৃত্য ও সমাধি

মুহূর্তে মধ্যে হযরত বড়পীর (রঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহাকে এক নজর দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল । রাস্তা ঘাট, বাড়ীঘর লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। মানুষের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাইটুকুও অবশিষ্ট রহিল না। অত্যধিক লোক সমাগমের

দরুন দিনের বেলা তাঁহার শেষকৃত্য সমাপন করা সম্ভব হইল না। শায়খ আবদুল ওয়াহহাব (রঃ) পবিত্র দেহকে গোসল দিলেন এবং শ্বেতবস্ত্রে কাফন পরিধান করাইলেন। সুগন্ধি দ্রব্য মাখা খাটের উপর শবদেহ রাখিয়া দিলেন। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইয়া রাত্রির আগমন ঘটিল। লক্ষ লক্ষ মানব জ্বিন ফিরেশতা পরিবেষ্টিত অবস্থায় গভীর রাত্রে তাঁহার প্রিয়তম মাদ্রাসায়ে কাদিরিয়ার বারান্দায় তাঁহাকে সমাহিত করা হইল। তাঁহার প্রিয়তম মাদ্রাসার সংলগ্নেই তিনি চিরসমাধি লাভ করিলেন।

সন্তান—সন্ততি

হযরত বড়পীর (রঃ) একান্ন বৎসর বয়সে দাম্পত্য জীবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং একাব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই চল্লিশ বৎসর বিবাহিত জীবনে তিনি চারিজন পত্নীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি স্ত্রীর গর্ভে মোট ঊনপঞ্চাশজন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাতাইশজন পুত্র ও বাইশজন কন্যা। সমসাময়িক গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সংখ্যা বিদ্যমান দেখা যায়। বেহেজাতুল আসরার নামক গ্রন্থে হযরত শায়খ সোহরাওয়ার্দী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত বড়পীর (রঃ)-এর সন্তান-সন্ততি ছিল বত্রিশজন। তাহাদের মধ্যে দশজন পুত্র ও বাইশ জন কন্যা সন্তান ছিল।

তবে ছেলে-সন্তানের সংখ্যা যাহাই হৌক না কেন তাঁহারা সবাই ছিলেন সর্বমান্য মহান পিতার অনুসারী ও বিজ্ঞ আলেম এবং বোযর্গ। আধ্যাত্ম সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত, মোজাহাদা, জাহেরী ও বাতেনী এলেমের ক্ষেত্রে তাহাদের সকলেই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হযরত বড়পীর (রঃ)-এর মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন, হাদীস, অছুল, ফেকাহ, আকায়েদ ও মারেফাত শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তাঁহারা এই জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন। হযরত বড়পীর (রঃ) নিজেই অধিকাংশ ছেলে-সন্তানের লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন এবং কাহাকেও সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তাঁহার অধিকাংশ কন্যা সন্তানই তাঁহার জীবদ্দশাতে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। আর অবশিষ্টদের মধ্যে কাহারও বিবাহ তাহার জীবদ্দশায়ই সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং কাহারও বিবাহ তাঁহার পরলোকগমনের পর সম্পন্ন হইয়াছিল। জামাতাগণের সবাই ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, শেষ্ঠ বোযর্গ ও আধ্যাত্ম সাধক।

হযরত বড়পীর (রহঃ)—এর স্বভাব—চরিত্র

গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রঃ) একদিকে যেমন দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার বলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, রিয়াকারী, মিথ্যা কথা বলা, ছল-চাতুরী, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি রিপুসমূহ তথা শয়তানী খাছলতসমূহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিনয়, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, সদালাপ, ধৈর্য, পরোপকারিতা, মমতা প্রভৃতি সদগুণসমূহের দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাহার মহান চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অতি উল্লেখযোগ্য কতিপয় দিকের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে সন্নিবেশ করা হইল।

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা

সুখে-দুঃখে জীবনের সর্বাবস্থায় বড়পীর (রঃ)-এর আল্লাহর উপর অটল নির্ভরশীলতা বিদ্যমান ছিল। আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি যেমন আল্লাহর শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন, তেমনি বিষাদ-মলিন পরিবেশেও তাহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের স্বীকারোক্তি। তিনি সর্বতোভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সাধনার সুমহান শৈলচূড়াতে আরোহণ করিবার সৌভাগ্য লাভে কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিলেন।

আচার-ব্যবহার

বড়পীর (রঃ) এক অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কোমলতা, দয়া, উদারতা ও ক্ষমা গুণ তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মধুময় আচার-ব্যবহার ও আচরণের মধ্য দিয়া এই সকল গুণ সুন্দররূপে বিকশিত হইয়া উঠিত। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও প্রতিজ্ঞা পালন করার মহৎ গুণটি তাহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। ছোটদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্য এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন তাহার সুন্দরতম আদর্শে পরিণত হইয়াছিল। অতুলনীয় নিরহঙ্কার, নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহার অতুল যোগ্যতার কাছে আত্মসচেতনতা ও সীমাহীন মর্যাদার রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা রাজা বাদশাহ পর্যন্ত নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র, অপাংক্তেয় বিবেচনা করিতেন এবং যখন কোনও রাজা-বাদশাহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তখন তিনি সামান্য সাধারণ ভৃত্যসম কৃতাঞ্জলী পুটে বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু বড়পীর (রঃ) সীমাহীন যোগ্যতা ও অতুলনীয় মর্যাদার জন্য দাম্ভিকের মত স্পর্ধা ও অহংকার করিতেন। মূলতঃ তিনি শাসক ও বাদশাহদের প্রতি রুচিশীল যথোপযুক্ত আচার প্রদর্শন করিতেন।

বিখ্যাত আধ্যাত্ম সাধক বোযর্গ হযরত শায়খ আবু মুজাফফর মনছুর (রঃ) বলিয়াছেন—"হযরত বড়পীর (রঃ) হইতে অধিক দয়ালু, প্রতিশ্রুতি পালনকারী, উদারচিত্ত, ক্ষমাশীল ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী কোন ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতিপালনে তিনি সর্বতোভাবে কৃতসংকল্প ছিলেন। কথার খেলাফ করা তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার আধ্যাত্ম সাধনার যুগে একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন—আমি সত্বরই আসিতেছি, আপনি আমার জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করুন। হযরত বড়পীর (রঃ) সেইখানে অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন! অতঃপর দীর্ঘ বার মাসের মধ্যে সেই ব্যক্তি আর তথায় ফিরিয়া আসিল না। কিন্তু বড়পীর (রঃ) স্বীয় অঙ্গীকার পালনার্থে সেই ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত এক বৎসর কাল সেইখানে পরম ধৈর্যের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন।

সাহসিকতা

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর সৎসাহস ও দৃঢ় মনোবল ছিল উন্নত শির—অবিচল হিমাদ্রি শিখরের মত। প্রতিটি কাজের মধ্যে এবং প্রতিটি কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহার অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মতই তিনি চিঠি-পত্রে স্বয়ং বাদশাহকে খেতাব করিতেন। প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রজাসাধারণ কর্তৃক বাদশাহর নিকট কিছু লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে হইলে প্রাথমিক প্রশংসা স্তুতিবাদ ও চিত্তহারী ভাষায় অলংকার বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তিনি ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন এবং ইহাকে নিকৃষ্ট ধরনের শেরেকের মত মনে করিতেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় কন্দরে একমাত্র আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি ছাড়া সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দুর্বলতা ছিল না! মানুষকে তোষামোদের নীতি তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই সাহস ও দৃঢ় মনোবল শুধু কেবল মানুষের প্রতিই নহে; বরং আল্লাহ পাকের মাখলুক মহাশক্তিধর মায়াহীন জীবকেও তিনি নিজের দৃঢ় প্রত্যয় নির্মলতার দরুন ভীতির চক্ষে দেখিতেন না।

এই প্রসঙ্গে হযরত শায়খ ওসমান হারুনী (রঃ)-এর উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমি বড়পীর (রঃ)-কে নিজ মুখে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, গভীর অরণ্য সংকুল প্রদেশে যখন আমি কঠোর সাধনায় লিপ্ত ছিলাম তখন দুর্ধর্ষ সৈনিক বেশে অসংখ্য পদাতিক ও অশ্বারোহী শয়তান আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মানসে ভীষণ ভীতিপ্রদ মূর্তি ধারণ করিয়া নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং আমার দিকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নিক্ষেপ সহকারে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা চালাইত। এই শয়তানের দল 'আমাকে হত্যা করিবে, যুদ্ধে

পরাভূত করিবে' ইত্যাদি বলিয়া আমার প্রতি রুদ্ররোষ প্রকাশ করিত। কিন্তু আমার নির্মল হৃদয় কন্দর ছিল ধীর-স্থির, অসম-সাহসী ও বেপরোয়া নির্ভয়, ইহাতে আমার কখনই পরিবর্তন ঘটিত না। তদুপরি এমন সময় আমার অন্তর প্রদেশে অদৃশ্য বাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিত—'হে আবদুল কাদিল ! গাত্রোত্থান কর, অগ্রসর হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর। করুণাময় আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমাকে সাহায্য দান করিবেন ও শত্রুদল তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে।' উহাতে আমি উৎসাহিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং আল্লাহ পাকের পরম করুণার ফলে বিজয় মাল্য আমার গলায় অর্পিত হইত।

ধৈর্য ও সংযম

ধৈর্য ও সংযম তাঁহার মহান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার ধৈর্য ও সংযম এবং সহনশীলতা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়া তিনি স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'এমনও সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে যখন আমার উপর এলমে বাতেনের এমন গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইত যাহা পৃথিবীর কোনও অভ্রভেদী পাহাড়-পর্বতের উপর অর্পণ করা হইলে নিমেষেই উহা ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িত। সেই অসীম বোঝাসমূহ যখন আমার উপর অর্পিত হইত, তখন আমি মৃত্তিকাশায়ী অবস্থায় চিত্তে পবিত্র কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিতাম ঃ 'ফাইন্না মা'আল উছরি ইউছরান, ইন্না মা'আল উছরি ইউছরা।" অর্থাৎ তারপর নিশ্চয়ই সঙ্কটের পাশাপাশি আছানী অবস্থান করিতেছে এবং মুশকিলের সঙ্গে সঙ্গে আছানী বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলে আমার ধৈর্য ও সংযমের স্নিগ্ধ সমীরণ বিপুলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

স্নেহ-মমতা ও গম্ভীর্য

স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)। তিনি স্বীয় ভক্ত ও অনুরক্তদিগকে যেমন স্নেহ-মমতা ডোরে বাঁধিয়া রাখিতেন, তেমন তাঁহার অনুপম, অপত্য স্নেহের আকর্ষণে তাহারা তাঁহাকে মনে-প্রাণে ভালবাসিত এবং গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত। এইজন্য ভক্ত ও অনুরক্তগণ তাঁহার সাহচর্যে ও পবিত্র দরবারে উপস্থিত থাকাকালে পরম ও চরম পুলক অনুভব করিত এবং আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত থাকিত। এই প্রসঙ্গে হযরত শায়খ আবুল কাসেম (রঃ)-এর উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'কখনও হযরত বড়পীর (রঃ)-এর মজলিসে আমার উপর এমন অবস্থার সূত্রপাত ঘটিত যে, তখন আমার মনে হইত আমি যেন কোন এক সুখ স্বপ্নজালে আবদ্ধ রহিয়াছি। আর তাহার পবিত্র দরবার হইতে বহির্গমনের পর মনে হইত যেন সেই পরম সুখ স্বপ্ন অকস্মাৎ ভঙ্গ হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।'

প্রকৃতপক্ষে স্নেহ মমতা ও গাম্ভীর্য এই দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ মাত্র। একই সময়ে তাঁহার মধ্যে পরস্পর দুইটি গুণ বিরাজমান দেখা যাইত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌম্য প্রশান্ত মূর্তির মধ্যে স্নেহ মমতা, দয়া ও প্রাণ স্পন্দনের নিতান্ত অভাব আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তাঁহার সম্মুখে লোকজন কথা বলিতে পর্যন্ত সাহসী হইত না। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সুধাঝরা মধুর স্নিগ্ধ হাসি এবং কোমল ও সরল আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া জনগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাহার সদাচরণে পর্যাপ্ত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে ধন্য হইত। এই দুই পরস্পর বিরোধী গুণ তাঁহার দরবার কক্ষে স্থায়ী আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। তাঁহার নির্মল দরবার কক্ষে নিজের পুণ্যময় ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রভাবে এক মধুমাখা নীরবতা বিরাজ করিত। কিন্তু সেই নীরতার ভিতর দিয়া এক আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিধারা ও মহিমামাধুর্য বিকশিত হইয়া উঠিত, তাঁহার দুর্বার প্রভাবময় আকর্ষণে সমাগত লোকজন পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। ইহার মূলে ছিল তাঁহার হৃদয়ে স্নিগ্ধতা, মমত্ববোধ ও জনগণের প্রতি অপত্য গভীর স্নেহের নিরঙ্কুশ প্রভাব। এই কারণেই তাহার পবিত্র দরবারে সমাগত লোকজন সর্বতোভাবে পার্থিব দুনিয়ার ভাবনা-চিন্তা, আমোদ-আহলাদ সবকিছুই বিস্মৃত হইয়া যাইত।

ভদ্রতা ও সদাচার

হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর চরিত্র মাধুর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যবহারে ভদ্রাচার প্রদর্শন করা। দুঃখী-দরিদ্র ও হৃতসর্বস্ব নিঃস্ব লোকের যত্ন করা ও বিশেষ আদর-আপ্যায়ন তাঁহার পবিত্র অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই সকল অবহেলিতদের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতেন না! পক্ষান্তরে তাহাদের সহিত একত্রে উঠা বসা, আহার-বিহার এবং সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। একান্ত আপনজন ও নিকটাত্মীয়ের মত তাহাদের কুশলাদি ও অবস্থাদির কথা আলোচনা ও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাহাদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় আচরণের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইতেন এবং তাহাদের গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। তাঁহার একান্ত অনুরাগী, নিয়মিত সহচর ও সভাসদবৃন্দের কেহ হঠাৎ কোনদিন যদি দরবারে হাজির না থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিতান্ত অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠার ভিতর কাল কাটাইতেন, এমনকি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বলিতেন, 'আজ অমুক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না কেন, তাহার খোঁজ-খবর মঙ্গলজনক ত?'

তিনি নিজের জন্য কাহারও প্রতি কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টির ভাব প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু কাহারও দিক হইতে যদি কোন শরীয়ত বিরোধী কার্য প্রকাশ পাইত তবে তিনি প্রথমে তাহাদিগকে বিনয়-বচন ও হেকমতের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। অতঃপর যদি সেই ব্যক্তি উক্ত অপকর্ম হইতে বিরত না হইত তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত, অসন্তুষ্টি ও অবজ্ঞার ভাব দেখাইতেন। কিন্তু এই বিরক্তি ও অবহেলার পিছনে স্বীয় ব্যক্তিগত কার্যকারণ নিহিত ছিল না। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহ প্রেম সম্ভূত স্থিতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর তখন তিনি তাহাকে ধমক দিতেন, শাসন করিতেন ও আযাবের ভীতি প্রদর্শনে তৎপর হইতেন।

হযরত বড়পীর (রঃ) মানুষের অঙ্গীকার, কথা ও ওয়াদাকে কখনও অবিশ্বাস করিতেন না। অকপটে বিশ্বাস করাই ছিল তাঁহার সহজাত স্বভাব। কেহ যদি কসম করিয়া কোন কিছু বলিত, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অকারণে কাহারও প্রতি সন্দেহ পোষণ করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। আর মানুষের প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করিতেন যে, সকলেই এই কথা ধারণা করিত যে, হয়ত তিনি তাহাকেই সকলের চেয়ে অধিক অনুগ্রহ ও ভালবাসা দান করিতেছেন।

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ একজন বিখ্যাত বোযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে—"হযরত বড়পীর (রঃ) অত্যন্ত সৎস্বভাব, সরল প্রকৃতি ও নিতান্ত কোমল প্রাণসম্পন্ন ছিলেন। করুণাময় আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রতিটি মুনাজাত কবুল করিয়া লইতেন। তাঁহার পবিত্র জবান হইতে কোনও শ্রুতিকটু, কর্কশ ও অশ্লীল বাক্য কুত্রাপি বাহির হইত না। তাহাছাড়া তাঁহার পবিত্র দরবারে বসিয়া কেহ নিরর্থক বাক্য, বিশ্রম্ভালাপ, কৌতুক ও অশ্লীল বাক্য বলিতে সাহস পাইত না। কেননা বড়পীর (রঃ) অহেতুক বাক্যালাপ ও কটু কথাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করিতেন এবং সেইগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

দানশীলতা দয়া ও মায়া

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর সমতুল্য দানশীলতা, দয়া-মায়া ও পরোপকার এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার দয়া-মায়ার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কাহাকেও কোন অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট ও যাতনায় অতীষ্ঠ দেখিলে তাঁহার পবিত্র কোমল হৃদয়ে দয়ার বাণ ডাকিয়া যাইত। বিপদাপন্ন ও বিপদগ্রস্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে তিনি কর্মতৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা সহকারে ঝাপাইয়া পড়িতেন। দুঃখী ও দরিদ্র, অনাথ ও সাহায্য প্রার্থীকে

প্রসন্ন চিত্তে দান করিতেন। তাহার দানের হস্ত এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, কোন প্রার্থনাকারী তাঁহার দরবার হইতে বঞ্চিত অবস্থায় ভগ্ন ও ভারাক্রান্ত অন্তঃকরণে প্রত্যাবর্তন করিবার নজির দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রার্থীর মনের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য তিনি সহাস্য আননে নিজের মালপত্র দান করিতেন, এমনকি কখনও অন্যের নিকট হইতে ধার আনিয়া হইলেও প্রার্থীকে দান করিতেন।

একদিনের ঘটনা। কোন জুমাবারে একজন ধনশালী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হযরত বড়পীর (রঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া কহিল, 'মহাত্মন! যাকাতের প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের পর আমি অতিরিক্ত দান-খয়রাত করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু এই দান কাহাকে করিব, কে ইহার যথার্থ হকদার? এই সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নাই। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই দানের প্রকৃত হকদারের কথা আমাকে বলিয়া দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।' প্রত্যুত্তরে হযরত বড়পীর (রঃ) বলিলেন, 'হে ভাই! তোমার ধারণা অনুযায়ী উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সবাইকে নির্বিশেষে তোমার এই অর্থ দান কর। ইহার ফলে করুণাময় আল্লাহ্ পাক হয়ত তোমাকে সেই বস্তু দান করিবেন, যাহা তুমি পাইবার যোগ্য অথবা যাহা তুমি পাইবার যোগ্য নও।

প্রখ্যাত সাধক শায়খ আবু মুহাম্মদ তালহা ইবনে মুজাফফর (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বড়পীর (রঃ) তাঁহার কর্মবহুল জীবনে একদিনের ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন—'আধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে একবার ক্রমাগত বিশদিন যাবৎ আমার কোন আহার্য বস্তুর সংস্থা ছিল না। ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। বন্য ফল-মূল, নির্দোষ কটুখাদ্য ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুণ্নিবৃত্তির মানসে ঘোর অরণ্য মধ্যে, অতীতের রাজা-বাদশাহের বিরান ও পরিত্যক্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হর্ম্যরাজির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমার বহু পূর্ব হইতেই সত্তরজন ক্ষুধাতুর দরবেশ সেইখানে উপস্থিত হইয়া জীবন বাঁচাইবার উপযোগী আহার্য অন্বেষণে ইতস্তত ঘুরাফিরা করিতেছেন। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। আমি বিষণ্ন চিত্তে বাগদাদের জনপদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম। এমন সময় পথিমধ্যে একজন আগন্তুকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমার হাতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিল, "এই মুদ্রাগুলি আপনার জননী পাঠাইয়াছেন।" আমি মুদ্রাগুলি লইয়া পুনরায় দরবেশদের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং কিছু অর্থ নিজের জন্য রাখিয়া বাকীগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিলাম। অতঃপর আমার সমস্ত মুদ্রা দ্বারা খাদ্যবস্তু ক্রয় করতঃ নিকটস্থ দরিদ্র নিঃস্ব ও অনাহারক্লিষ্ট লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সকলের সঙ্গে আহার করিলাম। এইরূপ ঐ দিনের সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বেই আমার সমস্ত মুদ্রা খরচ হইয়া গেল। আমার নিকট কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

আর একদিন হযরত বড়পীর (রঃ) একটি লোককে ব্যথিত, বিমর্ষ, দুঃখিত ও বিষণ্ন দেখিয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে লোকটি অত্যন্ত করুণ স্বরে বলিল—হুজুর! আমাকে এই নদী পার হইতে হইবে। কিন্তু আমার নিকট একটি কপর্দকও নাই যে, মাঝিকে দিতে পারি। খেয়াঘাটের মাঝি বিনা ভাড়ায় আমাকে পার করিতে অস্বীকার করিয়াছে। আর এই খেয়ানৌকা ছাড়া নদী পার হওয়ার কোন উপায়ও দেখিতেছি না।' হযরত বড়পীর (রঃ) তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক লোক এক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি তৎক্ষণাত সেই বিমর্ষ লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এই থলিয়া গ্রহণ কর এবং উহা খেয়ার মাঝিকে দিয়া বলিও, তোমাকে বহুদিনের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হইল বিনিময়ে আমাকে নদী পার কর এবং ভবিষ্যতে যত অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব ও অসহায় লোক আসিবে তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায় নদী পার করিয়া নিও।'

লেবাছ্ পোশাক

লেবাছ-পোশাকের দিক দিয়া হযরত বড়পীর (রঃ) এক অনন্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। লেবাছ-পোশাক সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধরা-বাধা নিয়ম ছিল না। যখন যে ধরনের লেবাছ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত তখন তাহাই তিনি সানন্দে পরিধান করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আড়ম্বর প্রিয় ও সৌখিন চিত্তবৃত্তিকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সময় ও চাহিদার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। স্বীয় অবস্থার সহিত তাল মিলাইবার পিছনে অন্তর্নিহিত রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

সাধারণ প্রাথমিক স্তরে তাঁহার লেবাছ-পোশাক ছিল অত্যন্ত সাধারণ মূল্যমানের। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তিনি একটি মাত্র পশমী জামা পরিধান করিয়াই অবলীলাক্রমে কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরিবেশ অনুযায়ী শরীয়তের বিধি সম্মত আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তৎকালীন বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত অতি মূল্যবান পোশাকের মত তিনিও পোশাক পরিধান করিতেন। বাজারের সর্বোচ্চ মূলের উৎকৃষ্ট কাপড় তিনি ব্যবহার করিতেন।

বাগদাদ নগরীর বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী শায়খ আবুল ফজল আহমদ ইবনে কাসেম হইতে বর্ণিত আছে যে, 'একদা হযরত বড়পীর (রঃ)-এর জনৈক খাদেম আমার দোকানে উপস্থিত হইয়া এমন উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিল যাহার প্রতি গজের মূল্য এক স্বর্ণ মুদ্রার কমও নহে এবং বেশীও নহে। আমি খাদেমকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই অতি উচ্চমূল্যের বস্ত্র কাহার জন্য আবশ্যক?' খাদেম উত্তরে বলিলেন, 'হযরত বড়পীর (রঃ) স্বীয় ব্যবহারের জন্যই এই ধরনের কাপড় ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন।' তাহার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে ভাবোদয় হইল যে, ফকীর-দরবেশ ও সাধকগণ যদি এইরূপ করিয়া উচ্চমূল্য সম্পন্ন বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা হইলে রাজা, বাদশাহ ও আমীর-উমরাগণের পোশাক কিরূপ হইবে? তাহা হইলে শাসক সম্প্রদায়ের জন্য কোন পরিচ্ছদই রহিল না। ইত্যাকার ভাবোন্মত্ত অবস্থায় আমি প্রতিগজ কাপড় এক স্বর্ণ মুদ্রা করিয়া বিক্রয় করিলাম। কিন্তু অস্বস্তিকর ভাবনা আমার মনে কাঁটার মত বিধিতে লাগিল। ইহার যথার্থ মর্ম অনুধাবন করিবার জন্য আমি হযরত বড়পীর (রঃ)-এর পাক দরবারে হাজির হইলাম। হযরত বড়পীর (রঃ) দিব্যদৃষ্টির বলে পূর্বাহ্নেই আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুতরাং আমাকে দেখিয়াই তিনি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সহাস্য আননে বলিলেন—

'হে আবুল ফজল! আল্লাহ্ পাকের শপথ! তাঁহার নির্দেশ ছাড়া কোন পরিচ্ছদই আমি ব্যবহার করি না। আমার জন্য যে বহুমূল্য পোশাক ক্রয় করা হইল, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ আমি লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্ বলেন, 'বিহাক্কি আলাইকা ইলবিছ্ কামিছান যিরাউহু বিদিনারিন' অর্থাৎ আবদুল কাদির! আল্লাহর কুদরতের শপথ, তুমি প্রতিগজ এক স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যমানের একটি জামা পরিধান কর। হে আবুল ফজল! এই কথা জানিয়া রাখ, ইহা মর্যাদা ধ্বংসকারী পোশাক নহে। বরং ইহা মৃত লাশের সামান্য আচ্ছাদন মাত্র।

হুলিয়া মোবারক

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর হুলিয়া মোবারক অর্থাৎ দোহাকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ (রঃ) ও শায়খ আবু সাঈদ (রঃ) সাহেবদ্বয় বলিয়াছেন যে, গাউছুল আযম মধ্যমাকার ও স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ কান্তি বিশিষ্ট সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষদেশ দীর্ঘ ও ঘন শশ্রুরাজি, যুগম ভ্রূযুগল, সুস্পষ্ট পরিষ্কার ও উচ্চ মধুর কণ্ঠস্বর, তাঁহার সৌন্দর্যকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাক-পবিত্রতা ও সৌন্দর্য প্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ তাঁহার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ ছিল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার নির্মল অন্তঃকরণ ছিল স্বচ্ছ ধব ধবে দর্পণসম পরিষ্কার এবং ফুটন্ত কুসুমসম নরম ও কোমল।

তাঁহার পবিত্র মুখ নিঃসৃত সুধা ঝরা বাক্যসমূহ মেঘ মল্লারের মত বাজিয়া উঠিত। তিনি কোনও বক্তৃতার মঞ্চে ভাষণ দান করিতে থাকিলে কিংবা বাক্যালাপ শুরু করিলে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ ফণিনীর মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নীরব-নিস্তব্ধ ও নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। তাঁহার সভায় কেহই অমনোযোগী হইতে পারিত না। তাহাছাড়া তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ নেত্রদ্বয়ের তীর্যক দৃষ্টিশক্তির প্রভাবও ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি যে সকল জনতা বা লোকের উপর পড়িত, সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি ও জনতা মনোমুগ্ধের মত তাঁহার অনুগত, আজ্ঞাবহ ও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িত।

উপঢৌকন ও নিয়ায

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর পবিত্র দরবারে অসংখ্য লোক অহর্নিশি নানা প্রকার উপঢৌকন ও নিয়ায এবং হাদিয়া পেশ করিত। সাধারণ জনগণ হইতে শুরু করিয়া দেশের বিত্তবান আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশাহ, উজির-নাজির এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ উপঢৌকন লইয়া বিনম্রভাবে তাঁহার দরবারে হাজির হইত। কিন্তু তিনি এই জাতীয় নজর-নিয়ায ও উপঢৌকনাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না এবং এইগুলি গ্রহণ ও স্পর্শ করিতেন না। আবার কখনও তাঁহার অনুপস্থিতিতে অসংখ্য লোক সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ও অর্থ-কড়ি তাঁহার বিছানার তলদেশে সংগোপনে রাখিয়া যাইত, কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল পাওয়া যাইত না। কেননা পরবর্তী সময় উহা জানিতে পারিলে তিনি তাহা স্বীয় কাজে ব্যবহার না করিয়া অন্যের কাজে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দান করিতেন এবং সেই সকল অর্থ কড়ি অন্যত্র ব্যয় করাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর দরবারে পেশকৃত উপঢৌকন সংক্রান্ত একটি আশ্চর্য ঘটনা বিভিন্ন বোযুর্গগণের কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে উক্ত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল। বাগদাদের এককালীন খলীফা মনসুরের পুত্র ইউসুফ একদা একতোড়া স্বর্ণমুদ্রা উপহার স্বরূপ হযরত বড়পীর (রঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। কিন্তু হযরত বড়পীর (রঃ) এই স্বর্ণমুদ্রার তোড়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে খলীফার উযীর বিনয় সহকারে অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও কাতরতা প্রকাশ করিলে অবশেষে তিনি তাহা লইয়া উভয় হস্ত দ্বারা মর্দন করিতে লাগিলেন। ফলে থলিয়ার মধ্যে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা ছাড়া অন্যান্যগুলি গলিয়া তাজা রক্তের মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই আশ্চর্যজনক ও অভাবিতপূর্ণ ঘটনার কথা খলীফারও কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার যথাযথ মর্ম অনুধাবনের জন্য স্বয়ং বড়পীর (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইহার তত্ত্ব প্রকাশের জন্য আরজ করিলেন। নির্বিকার চিত্তে হযরত বড়পীর (রঃ) খলীফার দিকে তাকাইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—"হে খলীফা। নিঃসহায় অনাথ এতিমদের উপর অকথ্য যুলুম ও অত্যাচার করিয়া তাহাদের তাজা রক্ত সদৃশ এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি সঞ্চয় করতঃ রাজ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছ। সেই রক্তের প্রবাহমান স্রোতধারাই এখন টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ও তোমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।" হযরত বড়পীর (রঃ)-এর কথা শুনিয়া খলীফা হতবাক্ হইয়া গেলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করতঃ বিস্ময়াপন্ন ও নির্বাকভাবে তাঁহার পবিত্র দরবার হইতে বাহির হইলেন।

কেহ কোন প্রকার খাদ্য-সামগ্রী, ফল-ফলাদি ও তোহফা ইত্যাদি সহকারে হযরত বড়পীর (রঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনিও তাহাকে অনুরূপ উপঢৌকন দানে কৃতার্থ করিতেন। এই তোহফা

সামগ্রী তিনি উপস্থিত জনগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। এই ব্যাপারে তিনি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নত পূর্ণভাবে পালন করিতেন। মহানবী (সাঃ)-এর দস্তুর এই ছিল যে, যদি কেহ কোন কিছু দান করিত, বিনিময়ে তিনিও তাহাকে কিছু দান করিতেন। এই সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর ইরশাদ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"যখন কোন উপহারাদি তোমাদিগকে প্রদত্ত হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিতে সচেষ্ট হইবে। কেননা উহাতে পরস্পরের ভালবাসা ও মহব্বত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

অনেক সময় স্বয়ং রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ বিভিন্ন প্রকার উপহার, উপঢৌকনসহ তাঁহার দরবারে হাজির হইতেন। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগণ বৈষয়িক মর্যাদা সম্পন্ন উক্ত পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া এবং অধিকাংশ সময় গর্হিত কার্যে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাহাদিগকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা বড়পীর (রঃ)-এর ধাতে সহিত না। এইজন্য তিনি তাহাদের উপঢৌকনাদি স্পর্শ করিতেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি রুটি ও তরকারী বিক্রেতা আবুল ফাতাহ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে দিয়া দিবার জন্য সহকারী পরিচালককে আদেশ দান করিতেন। এমনও অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার বিছানার নীচ হইতে প্রাপ্ত অর্থ কড়ি, তরিতরকারীর মূল্য বাবত প্রদান করা হইত। নিয়ম এই ছিল যে, তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় চারটি রুটি প্রস্তুত করিয়া আহারের জন্য উহা তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইত। তিনি রুটিগুলি স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিতেন এবং উপস্থিত সঙ্গী সাথীদের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে গ্রহণ করিতেন।

বড়পীর (রঃ)-এর নসীহত

হযরত বড়পীর (রঃ)-এর সারাটা জীবনই ছিল নসীহতের অমূল্য আধার। তাঁহার মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি অমূল্য বাণী, ওয়াজ নসীহত, দুর্লভ শিক্ষা-সম্পদ ও অমূল্য শিক্ষায় ভরপুর ছিল। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ নসীহত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহার বিশদ বিবরণ পাঠক ও পাঠিকাগণের সম্মুখে পেশ করিতেছি।

আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ ও মহান পবিত্র নামকে 'ইসমে আযম' বলা হইয়া থাকে। ফজীলত, মর্তবা ও মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে এই নামটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে! পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইঙ্গিত না থাকায় আলেম সম্প্রদায় ইহাতে মতভেদ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইসমে আযমের গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটনে মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই।

ইসমে আযম সম্পর্কিত হযরত বড়পীর (রঃ)-এর অভিমতগুলি 'কালাইদু'জ যাওন্নাহির' নামক কিতাবে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে হযরত বড়পীর (রঃ)-এর অভিমত এই যে, 'আল্লাহ' নামটি হইল ইসমে আযম। যখন যিকির ও স্মরণকারীর হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব জাগরুক থাকে না, তখনই সালেক এই নামের প্রকৃত স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। এই কথা স্পষ্টতঃ বলা যায় যে, আল্লাহ পাক কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি বলেন, 'কুন' অর্থাৎ হইয়া যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইয়া যায়। অনুরূপভাবে রূহানী জগতে 'আল্লাহ' নামটি 'কুন'-এর সমপর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ নামের ফল 'কুন'-এর মত প্রতিক্রিয়াশীল।

হযরত বড়পীর (রঃ) বলিয়াছেন—"হে লোকসকল! জানিয়া রাখ, আল্লাহর নাম যাবতীয় দুশ্চিন্তা, দুঃখ কষ্ট, বিষণ্নতা, শোক-যাতনা, বেদনা, হাহাকার দূর করিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার বিপদসঙ্কুল ও

কঠিন কাজ সহজসাধ্য করিতে সহায়তা করে। এই শব্দের তেজে বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার শাশ্বত নূর সর্ববিজয়ী ও চির অক্ষয়। ইহা সর্বত্র সমানভাবে আগেও বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে। করুণাময় আল্লাহতায়ালা সকল বিজয়ীদের হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় জয়ন্তির অধিকারী। তাঁহার কুদরতের ভিতর দিয়াই সর্ব প্রকার রহস্যময় ঘটনাপুঞ্জ ও বিস্ময়কর কার্যাবলী আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার আধিপত্য সর্বোপরি ক্ষমতার সোপান। আল্লাহ পাক বান্দাদের হৃদয়স্থিত গোপনীয় ভেদসমূহ যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। গর্বিতদের গর্ব চূর্ণও ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা ধ্বংস করা তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে পরিসাধিত হয়। ছোট বড়, জাহের বাতেন, সবকিছু সম্পর্কেই তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁহার জ্ঞান সীমার বাহিরে কোন কিছুই নাই। তিনি আল্লাহওয়ালাদিগকে স্বয়ং হেফাজত করেন। আল্লাহপ্রেমিক ব্যক্তি অন্যতে আকর্ষণ অনুভব করে না। আল্লাহর পথের পথিক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে থাকিয়া নৈকট্য লাভে কৃতার্থ হয়। যে আল্লাহর জন্য সচেষ্ট, আল্লাহও তাহার জন্য সচেষ্ট থাকেন। যে পার্থিব সুখ শান্তি, বিষয় বৈভব আল্লাহর দীদারের আশায় বর্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহার সময় আল্লাহর নৈকট্যের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায়। আর সে তদবস্থায় আল্লাহর সহিত গোপন প্রেমালাপে মত্ত থাকে।

হে খোদাবিস্মৃত বান্দাগণ! পার্থিব জগতে আল্লাহ নামের প্রবলানুরাগ অনুধাবন করতঃ আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যাও। জানিয়া রাখ, শান্তিময় চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে এই নামের চর্চা সর্বাধিক হইবে। পার্থিব দুনিয়ার বেদনাপূর্ণ অবস্থায় যে আল্লাহ তোমাদিগকে অসংখ্য অযাচিত দানে কৃতার্থ করিয়াছেন তিনি আখেরাতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। বরং সেখানেও তোমাদিগকে বহু কিছু প্রদান করিবেন।

সময় থাকিতে আল্লাহর যিকির কর। তাঁহার দ্বারপ্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর। তাহা হইলে আল্লাহ এবং তোমাদের মধ্যকার আবরণ অপসারিত হইয়া যাইবে এবং জ্যোতির্ময়ের অবিনশ্বর আলোর ঝর্ণাধারা উদ্ভাসিত হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, অসংখ্য প্রেমভিখারী তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িয়াছে। কত প্রেমিক প্রেমের সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। তুমি আরও দেখিতে পাইবে যে, প্রেমাস্পদের বিরহ বেদনায় যে চাতক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত করুণ স্বরে বিলাপ করিত, প্রত্যুষ হইতে দিনান্ত পর্যন্ত তাঁহারই স্মরণে মুদিত নয়নে অধীর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিত, যাহার করুণ হাহাকারের কোনই ইয়ত্তা ছিল না, সে পরম প্রেমাস্পদের মধুর মিলনে সার্থক হইয়াছে।

রেযা, তাসলীম, শওক এবং ইশতিয়াকের পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশাবলী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কায়মনে, নিঃসঙ্কোচ আদায় করার নামই তাসলীম। আর আল্লাহ পাকের নিকট হইতে অভাব অনটন, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট কিংবা বিপদাপদ আপতিত হইলে মুখে সন্তুষ্টি ও বিরক্তি এবং হৃদয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করাকে রেযা বলা হয়। আর আল্লাহর দীদারের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় জীবন-যাপন করাকে শওক ও ইশতিয়াক বলে। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিতেছেন—'ওয়া মাঈঁ ইয়াতাওয়াক্কাল 'আলাল্লাহি ফাহুওয়া হাসবুহু' অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার আল্লাহই যথেষ্ট।

সুতরাং শওক ও ইশতিয়াকের সহিত আল্লাহকে স্মরণ কর। ফলে তাঁহার দীদার ও নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে। স্তুতি ও প্রশংসার সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদিকে করুণার সাথে স্মরণ করিবেন এবং যথার্থ পুরস্কার প্রদান করিবেন। যদি তোমরা তওবা ও অনুশোচনা দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে তিনি অসীম ক্ষমা ও কৃপার সহিত তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি নিজের

আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া স্মরণ কর, তবে তিনি অমরতা দান সহকারে তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি নম্রতা ও কাকুতি মিনতির সহিত স্মরণ কর, তবে তিনি আপরাধ ক্ষমা করতঃ বেশী করিয়া স্মরণ করিবেন। যদি তোমরা অকপটভাবে তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে তিনি অশেষ জীবিকা প্রদানপূর্বক স্মরণ করিবেন। যদি তোমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে স্মরণ কর তাহা হইলে তিনি ইযযত, মর্যাদা ও সম্মান পরিবৃদ্ধি করতঃ তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। যদি অবিচার, অত্যাচার ও পাপাসক্তি ত্যাগপূর্বক তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে আগ্রহাতিশয্যে তিনি তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। যদি অন্যায়, গর্হিত কর্ম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ কর, তবে তিনি অনুগ্রহ, ক্ষমা ও করুণা দান করতঃ তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি তোমরা ইবাদত-বন্দেগী সহকারে তাহাকে স্মরণ কর, তবে তিনি অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ দান করিয়া স্মরণ করিবেন।

মোটের উপর যদি তোমরা সর্বস্তরে, সর্বস্থানে, সর্বমুহূর্তে, সর্বক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে তিনিও তোমাদিগকে অনুরূপ প্রতিদান সহকারে স্মরণ করিবেন। তোমরা কালামে পাকের নিম্ন আয়াতটি অত্যন্ত গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সহিত স্মরণ রাখিও। ইরশাদ হইতেছে, 'আলা যিকরিল্লাহি আকবার, আল্লাহু ইয়া'লামু মা তাছনাউন'—অর্থাৎ সাবধান! আল্লাহ্ পাকের স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

মুত্তাকীগণের জন্য দশটি উপদেশ

হযরত বড়পীর (রহঃ) মুত্তাকীগণের জন্য দশটি অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

১। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য ও জাহেরী-বাতেনী সমুদয় পাপরাশি বর্জন কর ও নিজের অঙ্গাবয়ব হেফাজত কর। তবে অতি সত্বরই তোমার অন্তর প্রদেশে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইহার সুন্দর প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

২। স্বীয় জীবিকা সংস্থানের দায়-দায়িত্ব অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত করিও না। ইহা পুরাপুরি আল্লাহর দায়িত্ব। তবেই তুমি 'আমরু বিল মারুফ' এবং 'নেহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে সক্ষম হইবে। আর সৎকাজে নির্দেশও অসৎ কাজে নিষেধের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ও পরম সম্মান রহিয়াছে। আর ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার পরিমাপ সর্বাংশে সহজ হইবে।

৩। মানুষের নিকট সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষা করা হইতে বিরত থাকিও। কেননা ইহাতে সম্মান, মর্যাদা, নির্ভরশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রহিয়াছে। আর ইহা দ্বারা, যোহদ ও অরা অর্থাৎ অনর্থক কাজ, কথা ও চিন্তা ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

৪। কোন মুসলমানকে নিশ্চিতভাবে মুনাফিক বা কাফির বলিতে নাই। ইহাই সুন্নত তরীকা। আল্লাহ ছাড়া কেহই—কে মুনাফিক, কে মুশরিক এবং কে কাফির তাহা জানে না। যদি এই ধরনের পরিচয়ে কাহাকেও অভিষিক্ত না করিতে পার তবে আল্লাহর জ্ঞানে অনধিকার চর্চা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে এবং আল্লাহর রহমত লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে।

৫। কাহাকেও বদদোয়া ও অভিসম্পাত করিও না। ধৈর্য ও সংযমের সহিত তোমার উপর আপতিত অবিচার ও দুঃখ কষ্ট সহ্য কর। ফলে লোকজন তোমাকে মহব্বত করিবে ও ভক্তি-শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে।

৬। বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার ও আদবের মধ্যেই ধর্মভীরুতা ও সর্বাধিক মর্যাদা নিহিত আর যাবতীয় ইবাদত ঐগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, ইহা অবলম্বন কর। কেননা স্বভাব-চরিত্র দ্বারাই ভাললোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়।

৭। আর কাহাকেও অভিশাপ ও বদদোয়া দিও না। সত্যপরায়ণ ও পুণ্যবান লোকদের ইহাই কাজ। তবেই আল্লাহ্ পাক তোমার মর্যাদা সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং অন্যের অনিষ্টকারিতার ও ক্ষতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৮। মিথ্যা কথা বর্জন কর। হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতূক সহকারে কখনও মিথ্যা কথা বলিও না। যদি সত্য কথা বলিবার অভ্যাস আয়ত্ব করিয়া লইতে সক্ষম হও, তবে আল্লাহ্ পাক তোমাকে রূহানী দৃষ্টিশক্তি ও এলেম প্রদান করিবেন।

৯। আল্লাহর নাম লইয়া শপথ করিও না। হুঁশিয়ার, তোমার জিহ্বা হইতে যেন 'আল্লাহর নাম লইয়া শপথ' বাক্যটি উচ্চারিত না হয়। এই নসীহত অনুসারে নিজের স্বভাবকে গঠন করিতে পারিলে তোমার অন্তরলোকে আল্লাহর নূরের জ্যোতির দরজা উন্মুক্ত হইবে এবং তুমি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হইবে। আর সৎকর্মের স্পৃহা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

১০। শপথ ও প্রতিজ্ঞা করা হইতে বাঁচিয়া থাক। ইহাতে তোমাকে বদান্যতা ও লজ্জাশীলতার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হইবে।

মানুষ সৃষ্টি রহস্য

মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন— "সুবহানাল্লাহ! মহাশক্তিশালী বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ পাক মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে পয়দা করিয়াছেন। মানুষের এই দুর্বল দেহে কত শত সৃষ্টি কৌশল প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং ফাতারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন অর্থাৎ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাক অতীব বরকতময়। আর মানুষ যদি স্বীয় কুপ্রবৃত্তিতে মত্ত থাকিবার অভ্যাস ত্যাগ করে তবে তাহার বুদ্ধিমত্তার উন্নতির দরুন মানবীয় স্বভাবকে ফিরেশতার স্বভাবে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইবে। মানবদেহে স্বভাবজনিত স্থূলতা ও সহজাত স্থবিরতা না থাকিলে সে সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত। মানব হৃদয় এক পরম ধনভাণ্ডার, যাহা নানা প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রহস্যাবলীর পূর্ণ আকর।"

মানুষ আলো এবং অন্ধকারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাহার রূহ বা আত্মা এবং দৃষ্টিশক্তি বাহ্যতঃ বিভিন্ন জড়ধর্মী পদার্থের পর্দান্তরালে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই আলোকজ্জ্বল পর্দার জন্যই আল্লাহ পাক মানুষের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ওয়ালাক্বাদ কাররামনা বানী আদামা।' অর্থাৎ অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদাশীল করিয়াছি। পরম জ্ঞানী আল্লাহ্ পাক মানুষের রূপ-গুণ, সৌন্দর্য ফিরেশতাদের নিকট প্রকাশ করিয়াই তাহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। মানুষের দেহ স্থূল ও রূহ সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ রূহের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সে সত্তা সমুদ্রে জ্ঞান তরণীতে আরোহণ করতঃ আত্মার শক্তিসাগরের দিকে ছুটিয়া যায়। সে সত্তার দুনিয়াতে নফস হইল সেনাপতি। উহা নিজ অনুভূতি স্বরূপ সেনাবাহিনী সমভিব্যহারে পরস্পর সংগ্রাম ও লড়াই করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ও সক্ষম। সেনাপতি হইল রূহ আর আকল বা জ্ঞান উহার সৈন্যদল অধিনায়ক। অপরদিকে নফস সত্তার সেনাপতির মালিকের নাম জঘন্য প্রবৃত্তি বা কাম-রিপুসমূহ ; যথা—কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ইত্যাদি। সুতরাং জ্ঞান ও জঘন্য প্রবৃত্তি এই উভয় বাদশাহর সৈন্যদলে আল্লাহর আদেশ রূপ মুয়াযযিন অহরহ চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছে—'হে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বীর সৈনিকগণ! সম্মুখে অগ্রসর হও এবং হে কুপ্রবৃত্তির সাহসী বীরগণ! তোমরাও অগ্রসর হও। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে উভয় পক্ষই সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে এবং একে অপরের উপর বিজয় লাভ মানসে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও নানারূপ ছলনা কৌশল প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু নেপথ্যে আল্লাহ ঘোষণা করিতেছেন—'উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে যতই পরাজিত করিতে সচেষ্ট হউক না কেন, আমার সাহায্য ব্যতীত কাহারও

পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার সাহায্য প্রাপ্ত দলই চির যুগ আমার সাহচর্য লাভ করিবে এবং ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্যশালী হইবে।

আল্লাহ পাকের করুণা ও দানই তাহার সহায়ক। এই দান ও করুণা আল্লাহর অলীগণের প্রতি সর্বদাই প্রবাহিত হয়। তাই হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা স্বীয় নফসের ফরমারদারী ত্যাগ করতঃ জ্ঞানের অনুগামী হও। ফলে চিরসৌভাগ্য তোমাদিগকে সালাম করিবে। আর পরম কুশলী আল্লাহ পাকের অতুলনীয় ক্ষমতার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর। আর দেখ তিনি কত নিপুণতার সহিত অমর ধামের রূহ এবং ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব দুনিয়ার নফসের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। এখন ইচ্ছা করিলে এই অদৃশ্য রূহ পাখি আল্লাহর অনুগ্রহ পক্ষ বিস্তার করিয়া স্থুল দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় বৃক্ষ শাখায় নীড় রচনা করিতে পারে, আর আল্লাহর দীদার শাখায় আসন গ্রহণ করিয়া মধুর স্বরে প্রেম সঙ্গীত আওড়াইতে পারে এবং মারেফাতের সুপ্রশস্ত অঙ্গন হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বের মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার আহরণ করিতে পারে এবং স্থূল নফসকে উহার অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

কুপ্রবৃত্তির বেশে যখন তুমি দেহ খাঁচায় আবদ্ধ হইবে না অর্থাৎ মাটির দেহ বিনষ্ট হইবার পর গূঢ়তত্ত্বের ভাণ্ডাররূপে তোমার হৃদয় মন যখন সজাগ থাকিবে, তুমি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অনুকম্পা লাভ কর, তবে আল্লাহর ক্ষণিকের কৃপাদৃষ্টি তোমাকে মহান আরশ পর্যন্ত উন্নীত করিবে এবং তোমার হৃদয়কে প্রজ্ঞার তথ্যাবলীতে পূর্ণ করতঃ আল্লাহর গুপ্ত রহস্য ধন-ভাণ্ডারে পরিগণিত করিবে, এমতাবস্থায় তুমি জ্ঞানচক্ষে আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য ও চিরন্তন নূর দেখিতে পাইবে এবং পার্থিব জগতের স্বল্পমেয়াদী, ক্ষণস্থায়ী যাবতীয় বস্তু হইতে অনাসক্ত হইবে। আল্লাহর দীদারের আয়নায় রূহানী চক্ষে আলমে মালাকুত-এর সৌন্দর্যাবলী তোমার নজরে পড়িবে। আর তোমার অন্তর হইতে বহির্জতের সমুদয় প্রভাব বিচ্ছুরিত গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশের ছত্র-ছায়ায় হৃদয়ের দৃষ্টিতে বিজয় কেতন উড়িতে অবলোকন করিবে।

হে লোক সকল! স্মরণ রাখ, যখন অলীক কল্পনা, কু-ধারণা, কু-চিন্তা ও অহমিকাসমূহ তোমাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন শুধু যথার্থ জ্ঞানই সমুজ্জ্বল নক্ষত্র সম তোমার পথের দিশা আলোকিত করিয়া তুলিবে। আর ইহাই তত্ত্ব জগতের অগ্রপথিক। আর যখন তোমার অন্তরে নানা প্রকার অলীক ধারণা, অসার চিন্তা-ভাবনার উদয় ঘটে, তখন এই দিব্যজ্ঞানের ফলে সকল সন্দেহ অপসারিত করেন। এইজন্য তোমরা অধিক পরিমাণে যতই জ্ঞানার্জন করিবে ততই তোমাদের জীবনে পরম সার্থকতা দেখা দিবে।

রিয়াকারের পরিচয়

পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ হিজরী, উনিশে শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার অপরাহ্ন বেলায় হযরত বড়পীর (রঃ) কাদিরিয়া মাদ্রাসায় উপদেশাবলী দান প্রসঙ্গে রিয়াকারের পরিচয় ও পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রিয়াকারদের লেবাছ পোশাক খুব পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহাদের হৃদয় প্রদেশ অপবিত্র ও কলুষপূর্ণ। রিয়াকারগণ বাহ্যিকভাবে খুবই ধর্মভীরু দেখায়, কিন্তু অভ্যন্তরে তাহাদের অপবিত্রতা ও কলুষতা বিরাজমান। তাহারা নির্দোষ জিনিসেরও পরহেজগারী প্রদর্শন করে এবং ধর্মের দোহাই দিয়া প্রতারণাপূর্বক জীবিকার্জন করে আর এই ক্ষেত্রে তাহারা বেশ অসতর্ক। তাহারা প্রকাশ্য হারাম ভক্ষণে কুণ্ঠিত নয়। এই প্রকার ধরিবাজ লোকদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ; কিন্তু খাঁটি মুমিনদের নিকট তাহারা অপরিচিত নহে। ধর্মভীরুতা তাহাদের লোক দেখানো মাত্র।"

সৎস্বভাব

গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন—"সৎস্বভাব বলিতে বুঝায় অন্যের অবিচার অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া অনুভব করা।" উহার মূল তাৎপর্য এই যে, কেহ যদি তোমার উপর অত্যাচার ও যুলুম করে এবং উহা তোমার অন্তর প্রদেশে কোন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে, আর সেই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তোমার রসনা হইতেও কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপিত না হয় তবেই প্রমাণিত হইবে, তুমি সৎস্বভাবের অধিকারী।

ইলমে শরীয়ত

কেহ কেহ এইরূপ ধারণা করে যে, ইলমে তরীকত ও ইলমে শরীয়ত দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস ও ভিন্ন পথ। উহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত কোন প্রকার বিশেষ সম্বন্ধ নাই আর পরস্পর সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তাও নাই। তাহার শরীয়তের প্রয়োজনীয়তাকে তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। তাহারা বলে যে, আল্লাহর দীদার লাভের একমাত্র উপায় হইল ইলমে তরীকত লাভ করা। সাধারণ লোকেরা তাহাদের প্রচারের ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ দেখিয়া মনে করে যে, তাহারা ইলমে তরীকত সম্বন্ধে কতই না অভিজ্ঞ। তাহাদের সমতুল্য আর কেহই জানে না। মূলতঃ তাহারা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই কথার সত্যতা প্রমাণ প্রসঙ্গে হযরত বড়পীর (রহঃ) বলেন যে, তোমরা প্রথমে ইলমে শরীয়তের জ্ঞানার্জন কর, তারপর নির্জনতা অবলম্বন কর। কারণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন না করিয়া আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হয় তাহার সফলতা অর্জনের নজীর বড় একটা পরিদৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব প্রথমে শরীয়তের বাতি প্রজ্জ্বলিত কর, অতঃপর আল্লাহর দীদারের নিমিত্ত অধিক মাত্রায় যিকির-আযকারে মনোযোগ আকৃষ্ট কর। আর যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত ইলমে শরীয়ত অনুসারে আমল করে, আল্লাহ্ পাক তাহার ইলম বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং শিক্ষক ও বই পুস্তকের মাধ্যম ব্যতীত তাহাকে অযাচিত পরম জ্ঞান দানে কৃতার্থ করেন।

তাক্বওয়া বা পরহেজগারী

তাক্বওয়া বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন—তাক্বওয়া বা পরহেজগারী হইল শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ পরিত্যাগ করা এবং নির্দোষ ও নিষ্কলুষ বস্তুকে অবলম্বন করা।

ধৈর্য

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন—ধৈর্যের তিনটি অবস্থা বিদ্যমান। যথা ঃ (১) নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতে ধৈর্য ধারণ করতঃ বিরত থাকা। (২) বহু বাধাবিপত্তি ও দুঃখ-ক্লেশ সত্ত্বেও শরীয়ত নির্দেশিত কার্যাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করা। (৩) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশানুযায়ী ভালবাসার বস্তু অর্জন করা অথবা কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া যাহা সহ্য করা সাধ্যাতীত।

সুতরাং উপরোক্ত তিন প্রকার অবস্থায় সুদৃঢ় ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্ পাক ও তদীয় রাসূল (সাঃ)-এর নীতিমালা ও বিধি-বিধানসমূহ হৃষ্টচিত্তে ও কায়মনে প্রতিপালন করাকে ধৈর্য বলা হয়। ধৈর্যের প্রকারভেদ তিনটি। যথা ঃ ধৈর্য বা সবর বিল্লাহ, ধৈর্য বা সবর মা'আল্লাহ এবং ধৈর্য বা সবর 'আলাল্লাহ।

(১) আল্লাহ্ পাক যাহা কিছু নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা যথার্থভাবে প্রতিপালন করা এবং যাহা কিছু নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে সতর্কভাবে বিরত থাকাকে 'সবর বিল্লাহ' বলে। (২) আর সবর মা'আল্লাহ হইল প্রফুল্ল চিত্তে পরমুখাপেক্ষী না হওয়া সম্পর্কিত কথাবার্তা বলা। (৩) আর আল্লাহ পাক আদেশ নিষেধের দ্বারা যে সকল দানের অঙ্গীকার ও আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন,

সেইগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিনিয়ত শরীয়তের বিধি-নিষেধের উপর থাকার নাম হইল সবর 'আলাল্লাহ।

সিদক বা সত্যবাদীতা

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, জাহের ও বাতেন একই সমতলে অর্থাৎ এক রূপরেখা এবং বাতেনকে জাহেরের তুলনায় মূল্যবান মনে করাকে সিদক বা সত্যবাদীতা বলে। আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজ্বাল্লির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ ও কথা প্রতিসাধন করাই কাজ-কর্মে সত্যবাদীতার লক্ষণ। আর আল্লাহ্ পাক যে অবস্থা পছন্দ করেন, সেই অবস্থায় কালযাপন করাই হইল সিদকের গূঢ় অবস্থার ধারক, বাহক ও পরিচায়ক।

হায়া বা লজ্জা

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, 'শুধুমাত্র পাপের জন্য লজ্জিত হইয়া, ভীত হইয়া নহে সমুদয় পাপকার্যকে পরিত্যাগ করাকে হায়া বা লজ্জাশীলতা রূপে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ্ পাক সর্বস্থানে উপস্থিত আছেন, সবকিছু দর্শন করিতেছেন মনে করিয়া খাঁটি বান্দাগণ পাপের পথে পা বাড়াইতে লজ্জা অনুভব করেন। আর হৃদয় অধিক পাপ কার্যের দরুন মসীলিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে লজ্জাশীলতার অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না।'

ওয়াফা ও ইখলাছ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ পাকের অধিকারসমূহ নিয়ম মাফিক আদায় করা কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায়, চিন্তাভাবনায়, তাঁহার নির্ধারিত সীমানা অতিক্রান্ত না করা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থায় আল্লাহ্র রেজামন্দির দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম ওয়াফা। আর রিয়া হইতে যথাযথভাবে পরিপূর্ণ মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করাকে এখলাসরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

যোহদ বা সংযম

হযরত বড়পীর (রঃ) বলিয়াছেন—'পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া এবং পার্থিব ক্ষণভঙ্গুর সুখ-সম্ভোগ ও বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া পরকালীন চিরস্থায়ী অনন্ত সুখ-সম্পদ ও উপকরণের আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন থাকার নাম যোহদ বা সংযম। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, যোহদ হাসিলের জন্য দশটি বিষয় অবম্বন করা দরকার। এইগুলি ছাড়া যোহদ লাভ সম্ভব হয় না। (১) জিহ্বাকে হেফাজত করা, (২) পরনিন্দা পরিত্যাগ করা, (৩) কাহারও প্রতি হাসি, তামাসা, অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা, (৪) যাহার সহিত বিবাহ সিদ্ধ এবং বর্তমানে সিদ্ধ না হইলেও পরবর্তীকালে সিদ্ধ হইতে পারে, এমন গায়ের মোহররমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা। (৫) বিনয়, নম্রতা ও সরলতা অবলম্বন করা, (৬) আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ দান ও উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, (৭) লোভ-লালসা, কাম বর্জন করতঃ আল্লাহ্র রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করা, (৮) পাঞ্জেগানা নামায ও অন্যান্য ফরয কার্যাবলী যথাযথ আদায় করা, (৯) নিজ আত্মার সুযোগ-সুবিধা, সুখ-শান্তির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট না থাকা এবং (১০) মহানবী (দঃ)-এর প্রবর্তিত সুন্নত এবং শরীয়তের বিধি বিধানসমূহ প্রকৃতভাবে প্রতিপালন করা এবং স্বীয় অভ্যাসকে সৎস্বভাবের অনুবর্তী করা।

তাওবা করা

তাওবার অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা মন্দ ও অনিষ্টকর, তাহা হইতে দূরে থাকিয়া শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী নেক আমল করার নাম

তাওবা। আর তাওবাকে তিনভাবে ভাগ করা যায়; যথা ঃ অনুতাপ, ভীতি এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং পাপ কার্যের পরে অনুশোচনা সহকারে তাওবা করাকে অনুতাপজাত তাওবা বলা হয়। আর ভয়জাত তাওবা, আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাওবা করা। আযাবের ভয় ও পুণ্যের আশা ব্যতীত শুধু কেবল আল্লাহ্ পাককে পাওয়ার আশায় তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনার্থে যে তাওবা করা হইয়া থাকে উহাকে এনাবতজাত তাওবা নামে অভিহিত করা হয়।

তাওবা কবুলের নিদর্শনাবলী

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর বিশেষ রহমতের দৃষ্টি যখন কোন বান্দার প্রতি নিপতিত হয় এবং তিনি যখন স্বীয় রহমতের দ্বারা তাহাকে আপন সান্নিধ্যে আকর্ষিত করেন, তখন অনুধাবন করা যায় যে, বান্দার তাওবা কবুল ও গ্রহণীয় হইয়াছে। এমতাবস্থায় মানুষের হৃদয় অহরহ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট ও অনুরক্ত হয় আর তাহার কলব ও রূহ আল্লাহর পথে অনুগামী হয়। তখন সে নিজের সমুদয় কার্যকলাপ, গতিবিধি আল্লাহর বিধি-নিষেধ মোতাবেক সুনিয়ন্ত্রিত করে। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বাহিরে কোন কিছুর চিন্তা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না।

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন,—'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া সব সময় আল্লাহর যিকির-আযকার এবং প্রেমে নিমজ্জিত থাকার নাম আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল। এই হালতে মানুষ পার্থিব সহায়-সম্পদ ও উপকরণাদির কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। কোনও বস্তু লাভে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল। মাকামে ফানার ঘাঁটিতে যেমন সাধক সমস্ত গায়রুল্লাহকে বিস্মরণ হইয়া যায় তেমনি মানুষ যখন প্রকৃত তাওয়াক্কুলের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন বাহ্যিক জগতকেও তদ্রুপ ভুলিয়া যায়। জানিয়া রাখ, তাওয়াক্কুল ও ইসলামের মূলতত্ত্ব এবং হাকীকত একই। ইবাদত-বন্দেগীর বিনিময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা না করাই ইসলামের সারবত্তা।

পরিশিষ্টাংশ শেষ